Acharyya Prafulla Chandra Ray

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের
প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী

চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ

১৫নং কলেজ স্কোয়ার

কলিকাতা

১৯২৭

মূল্য দেড় টাকা মাত্র

১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে
শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্, এস্-সি
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রিণ্টার—শ্রীচন্দ্রমাধব বিশ্বাস
কুন্তলীন প্রেস
৬১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচীপত্র

প্রকাশকের নিবেদন

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের নাম বাংলা দেশের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। বাংলাদেশের ছাত্রবৃন্দ তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া থাকে। তাঁহার জ্ঞানগরিমা, অসাধারণ বিজ্ঞান-চর্চ্চা, দেশ হিতৈষণা, সর্ব্বোপরি তাঁহার ঋষিকল্প চরিত্র, কোমল এবং প্রেমিক হৃদয় দেশবাসীকে গুণমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তিনি ছাত্র সমাজের একাধারে গুরু, বন্ধু ও সহায়। জাতীয় শিল্পের উন্নতির জন্য তাঁহার অসীম উদ্যম, দেশহিত-ব্রতে তাঁহার অনাড়ম্বর ও কঠোর স্বার্থত্যাগ, সমাজের কল্যাণে তাঁহার আজীবন চেষ্টা, বিজ্ঞান-চর্চ্চার প্রতিষ্ঠাকল্পে তাঁহার অসাধারণ উদ্যম ও উৎসাহ—ইহা কিছু নূতন করিয়া আজ আর বলিবার আবশ্যক আছে মনে করিনা। যাহাতে তাঁহার জীবনের আদর্শ ও উপদেশাবলী দেশের ভবিষ্যৎ যুবক-সম্প্রদায়ের পক্ষে পথ-প্রদর্শক হইতে পারে, তাহাদিগকে দেশমাতৃকার সেবা ও মঙ্গলব্রতে অনুপ্রাণিত করিতে পারে, সমাজের কলঙ্ক অপনোদন পূর্ব্বক সমাজকে স্থিতিশীল ও প্রতিষ্ঠাবান করিবার উপায় নির্দ্দেশ করিতে পারে—এই মহৎ উদ্দেশ্যেই আমরা আচার্য্যদেবের বহুবিধ সারগর্ভ প্রবন্ধ ও বক্তৃতারাজির একত্র সমাবেশ করিয়া সাধারণে প্রকাশ করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছি। দুই চারিটি ভিন্ন অধিকাংশ প্রবন্ধই আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতার সারাংশ এবং বিভিন্ন বক্তৃতা-লেখক (Reporter) কর্ত্তৃক সংগৃহীত। অতএব প্রবন্ধগুলিতে কিছু কিছু পুনরুক্তি দোষ ঘটা স্বাভাবিক। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার বহুমুখী

প্রতিভাবলে সমাজ, শিল্প, জাতীয় উন্নতি, জাতিগঠন ইত্যাদি সম্বন্ধে যে সমস্ত ভাবধারার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় প্রকাশিত ছিল। যে উদ্দেশ্যে এই সমস্ত মূল্যবান প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়া একত্র প্রকাশ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি, আমাদের সেই উদ্দেশ্য কথঞ্চিৎ ফলবান হইলেও আমরা আমাদের পরিশ্রম সার্থক মনে করিব। এই সঙ্গে শ্রীপ্রসন্নকুমার রায় লিখিত ও "প্রকৃতি"তে প্রকাশিত "আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র" নামক প্রবন্ধ অবলম্বনে সঙ্কলিত আচার্য্যদেবের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনীও সংযোজিত হইল।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

জন্ম ও বংশকথা

বর্ত্তমান খুলনা সহরের সাতচল্লিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে সুপ্রসিদ্ধ কপোতাক্ষতীরে রাড়ুলি গ্রাম প্রফুল্লচন্দ্রের জন্মস্থান। প্রফুল্লচন্দ্র যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, উহা পাঠান রাজত্বের ধ্বংসের সমকালে বা কিঞ্চিৎ পরে হুগলী জেলার সপ্তগ্রাম হইতে আসিয়া যশোহর ঝিকরগাছার নিকটবর্ত্তী বোধখানায় বসতি স্থাপন করেন। এই বংশের অনেকে বাদশাহ বা বাঙ্গালার নবাবগণের অধীনে নানা সম্মানজনক কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র হইতে ঊর্দ্ধতন ষষ্ঠ পুরুষে রামপ্রসাদ রায়; ইনি মুর্শিদাবাদে নবাব সিরাজউদ্দৌলার সরকারে কর্ম্ম করিতেন। সিরাজের পরাভবের পর ইনি মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া রাড়ুলি গ্রামে বসতি স্থাপন করেন বলিয়া বোধ হয়।

প্রফুল্লচন্দ্রের পিতা হরিশ্চন্দ্র রায় চৌধুরী যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাকে বাঙ্গালা দেশের তামস যুগ, 'Dark Age' বলা যাইতে পারে। তিনি পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। উচ্চ ইংরাজী জ্ঞান লাভ করিবার জন্য তিনি কৃষ্ণনগর কলেজে জুনিয়ার স্কলারসিপ বিভাগে ভর্ত্তি হইয়া সুবিখ্যাত অধ্যাপক রিচার্ডসন সাহেবের নিকট বহুদিন অধ্যয়ন করেন। খুলনায় ইংরাজী শিক্ষার প্রচারে হরিশ্চন্দ্র একজন অগ্রদূত ছিলেন। দেশমধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান প্রচার করিবার জন্য তিনি সর্ব্বপ্রথম স্বীয় বাসভবনে একটী আদর্শ

মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি স্বীয় বাসভবনে এক বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, এবং সকলকে উৎসাহিত করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথমে স্বীয় পত্নী ও ভগিনীকে উক্ত বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন।

হরিশ্চন্দ্র তাঁহার প্রজাগণকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। প্রজারা আসিয়া তাঁহার নিকট নিজ নিজ দৈন্য জানাইলেই তিনি তাহাদিগের খাজনা মাপ করিতেন; অথচ গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব তাঁহাকে ধার করিয়া চালাইতে হইত। এই কারণে ক্রমে অনেক সম্পত্তি তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া যায়। হরিশ্চন্দ্রের সততা ও ন্যায়নিষ্ঠা সম্বন্ধে বহু ঘটনা অনেকের বিদিত আছে।

কলিকাতার আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের জমিদার বাবু অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতা রামতারণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় হরিশ্চন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। "হরিশ্চন্দ্রের বন্ধুত্বের প্রতি রামতারণের এত বিশ্বাস ছিল যে, তিনি কেবল মুখের কথায় বিনা দলিলে তাঁহাকে অনেকগুলি টাকা কর্জ্জ দিয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্র * * * যখন রামতারণের দেনা পরিশোধ করিতে অসমর্থ বিবেচনা করিলেন, তখন কাহাকেও কিছু না বলিয়া তাঁহার বাটীর সন্নিকটস্থ একখানি উৎকৃষ্ট জমিদারি রামতারণের বরাবর একখণ্ড বিক্রয় কোবালা লিখিয়া রেজেষ্টারী করিয়া রাখিয়াছিলেন। রামতারণ ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতেন না; পরে যখন হরিশ্চন্দ্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, হরিশ্চন্দ্র ঐ কোবালাখানি রামতারণের হস্তে প্রদান করিয়া দেনা হইতে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন।"

কলিকাতা সমাজেও হরিশ্চন্দ্রের বেশ প্রতিপত্তি ছিল। তিনি British Indian Association নামক জমিদার সভার সভ্য ছিলেন এবং অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তির সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহার

বন্ধুগণের মধ্যে কৃষ্ণদাস পাল, শিশির কুমার ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দিগম্বর মিত্র প্রভৃতি অনেক প্রধান ব্যক্তির নাম করা যায়।

১৩০২ সালের (ইং ১৮৯৫) ২৭শে বৈশাখ তারিখে প্রায় সত্তর বৎসর বয়সে হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া গিয়াছিলেন।

হরিশ্চন্দ্র ভাড়াশিমলা গ্রামে নবকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের কন্যা ভুবনমোহিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ভুবনমোহিনী যেরূপ অসামান্য রূপবতী সেইরূপ অসামান্য গুণবতীও ছিলেন। তাঁহার মধুর প্রকৃতি ও কোমল হৃদয় নিতান্ত পরকেও আপন করিয়া লইত। প্রফুল্লচন্দ্র আজ যে পরোপকার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার দীক্ষা তাঁহার পিতামাতার নিকটেই হইয়াছিল। ১৩১১ সালে ভুবনমোহিনীর মৃত্যু হয়।

হরিশ্চন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ১২৬৩ সালের ১৭ই বৈশাখ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ওকালতি পরীক্ষা পাশ করিয়া তিনি ডায়মণ্ডহারবারে ওকালতি করেন। বর্ত্তমানে বার্দ্ধক্যবশতঃ অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

নলিনীকান্ত হরিশ্চন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র; ১২৬৫ সালে ইঁহার জন্ম হয়। ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে প্রবেশ করিয়া তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং তথায় শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বাটীতে গিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই সুচিকিৎসক বলিয়া ইঁহার খ্যাতি প্রচারিত হইয়া পড়ে। কিন্তু ক্যাম্বেলের বিদ্যায় ইনি অধিক দিন সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। তিনি বম্বে মেডিক্যাল কলেজে ৬ বৎসর অধ্যয়নের পর ডাক্তার হইয়া বাড়ী আসেন। তাঁহার সার্ব্বজনীন সামাজিকতা এবং দৈবপ্রকৃতিক সহৃদয়তা তাঁহাকে লোকমাত্রেরই বরণীয় ও ভালবাসার বস্তু করিয়া রাখিয়াছে।

নলিনীকান্ত রাড়ুলিবাসিগণের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তিনি স্বীয় বাসভবনকে এক সরকারি দপ্তরখানায় পরিণত করিয়াছিলেন ;—একই বাটীতে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, সমবায় ঋণদান সমিতির আফিস ও সাবরেজেষ্টারি আফিস বিরাজমান। নলিনীকান্ত বাটীতে থাকিয়া কর্ণধাররূপে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনা করিতেন। ১৩২৯ সালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

১২৬৮ সালের শ্রাবণ মাসে প্রফুল্লচন্দ্রের এবং ১২৭১ সালে তাঁহার অনুজ পূর্ণচন্দ্রের জন্ম হয়। সর্ব্বকনিষ্ঠ গোপাল অল্প বয়সেই মারা গিয়াছেন।

বাল্যকাল ও শিক্ষা

চতুর্থ বৎসরে প্রফুল্লচন্দ্রের 'হাতে খড়ি' হয়। পাঠশালার পড়া শেষ করিয়া নলিনীকান্ত ও প্রফুল্লচন্দ্র উভয়েই মধ্য-ইংরাজী স্কুলে প্রবেশ করেন। পুত্রগণের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কিরূপে তাহাদিগকে সুশিক্ষা দিবেন ইহাই হরিশ্চন্দ্রের চিন্তার বিষয় হইয়া উঠে। কলিকাতায় রাখিয়া তাহাদিগের পড়ার বিশেষ কোন সুবন্দোবস্ত করিতে না পারিয়া অগত্যা স্বয়ং পুত্র ও পরিজনবর্গকে লইয়া কলিকাতায় গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। হরিশ্চন্দ্র নিজেই তাহাদিগের পাঠের তত্ত্বাবধান করিতেন, অন্য কোন গৃহ-শিক্ষকের আবশ্যক হইত না।

কলিকাতায় আসিয়া জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র হিন্দু স্কুল এবং নলিনীকান্ত ও প্রফুল্লচন্দ্র হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি হন। প্রফুল্লচন্দ্র হেয়ার স্কুলের অষ্টম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়া তথায় চারি বৎসর অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্ চ্যান্সেলার মাননীয় শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় প্রফুল্লচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন। উত্তরকালে প্রফুল্লচন্দ্র অধ্যয়ন ও আহারাদি সম্বন্ধে যেরূপ সংযত ও মিতাচারী

হইয়াছেন, এই সময়ে তিনি তদ্রূপ ছিলেন না। পাঠে অত্যাসক্তি নিবন্ধন প্রায় দিবারাত্রি পুস্তক লইয়াই থাকিতেন। সন্ধ্যা রাত্রিতে নয়টার বেশী পড়িতেন না বটে, কিন্তু শেষ রাত্রিতে তিনটার সময় উঠিয়া পুস্তক পাঠ করিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন; কোনরূপ বিঘ্ন ঘটিলে তিনি মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হইতেন। একদিন উঠিয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রদীপে তৈল নাই এবং ঘরেও কোনরূপে তৈল পাইবার উপায় নাই, তখন অনন্যোপায় হইয়া ফুলেল্ তৈল প্রদীপে ঢালিয়া পড়িতে আরম্ভ করেন। আহার সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ সংযম ছিল না; নিজের খেয়ালে যাহা আসিত, তাহাই আহার করিতেন; আহার সময়েরও কোনরূপ ধরাবাঁধা নিয়ম ছিল না, যতবার খুসি আহার করিতেন। শরীরের প্রতি এইরূপ অনিয়মিত অত্যাচারের ফলে বালক প্রফুল্লচন্দ্র শীঘ্রই পীড়িত হইয়া পড়েন, এবং দুরন্ত আমাশয় রোগ তাঁহাকে আক্রমণ করে। তিনি এই রোগে প্রায় দুই বৎসর ভুগিয়াছিলেন; প্রথম বৎসর রোগভোগে এবং দ্বিতীয় বৎসর রোগ-জনিত দুর্ব্বলতায় তাঁহাকে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া বাটীতেই বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল।

আহার ও অধ্যয়ন রীতি সম্বন্ধে এই সময়ে প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। পাঠ ও ভোজন বিষয়ে যে সংযম তাঁহার মহৎ চরিত্রের অংশ স্বরূপ হইয়া তাঁহাকে সাধারণের আদর্শ স্থানীয় করিয়াছে, তাহার বীজ এই সময়েই উপ্ত হইয়াছিল। যাহাকে বলে 'ঠেকিয়া শেখা' তাঁহার তাহাই হইয়াছিল। আহারে অসংযত বালক রোগে পড়িয়া একেবারেই সংযমী হইয়া উঠিলেন। অধ্যয়ন প্রণালী সম্বন্ধেও এই সময়ে ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটে। অসুখে পড়ার পর হইতে তিনি কদাচ শেষ রাত্রিতে পড়িতেন না; এবং

রোগমুক্তির পর হইতে ইঁহাকে রাত্রি নয়টার পর পড়াশুনা করিতে কখনও দেখা যায় নাই।

প্রফুল্লচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনা, রাসায়নিক গবেষণা ও লোক-হিতকর অনুষ্ঠান এত অধিক যে তাহাতেও পৃথিবীর বিস্ময় উৎপাদিত হইয়াছে। রুগ্নদেহে এই অদ্ভুত সাফল্য লাভের একমাত্র কারণ আত্মহারা হইয়া কার্য্যসম্পাদনের চেষ্টা। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার জীবনের কৃতকার্য্যতার কারণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "He believes in doing one thing at a time and doing that well"—এক সময়ে এক টি মাত্র কাজে হাত দিবে এবং তাহাই সুসম্পন্ন করিবে—এই একনিষ্ঠাই জীবনের সফলতার কারণ।

প্রফুল্লচন্দ্র দ্বাদশ বর্ষ বয়সে পীড়িত হন এবং স্কুলের সহিত সর্ব্ব-প্রকার সম্পর্ক-বিরহিত হইয়া দুই বৎসর বাটীতে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্রের পিতার সুবৃহৎ লাইব্রেরীর কতকাংশ কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইয়াছিল এবং কতকাংশ বাটীতে ছিল। স্কুলের পড়ার কোন চাপ না থাকায় প্রফুল্লচন্দ্র গভীর অভিনিবেশ সহকারে এই সকল পুস্তকপাঠে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময় হইতেই তাঁহার ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রতি অত্যন্ত আসক্তি জন্মে। এই সময়ে ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাসের চর্চ্চা ভিন্ন তিনি ল্যাটিন ও ফরাসী ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই পাশ্চাত্য ভাষা-জ্ঞান উত্তরকালে তাঁহার বিলাতে শিক্ষালাভের পথ সুগম করিয়া দেয়।

রোগমুক্ত হইয়া প্রফুল্লচন্দ্র কলিকাতায় এলবার্ট স্কুলে (Albert School) প্রবেশ করেন। তখন এই বিদ্যালয়ের সুনাম বঙ্গদেশময় ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছিল, এবং ইহা একটি শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় বলিয়া গণিত হইত। সুবিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেনের অনুজ লব্ধপ্রতিষ্ঠ কৃষ্ণবিহারী

-সেন তখন এই স্কুলের অধিনায়ক (Rector) ছিলেন। তিনি ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতেন। তাঁহার ন্যায় ইংরাজী ভাষার শিক্ষক তখনকার দিনে বাস্তবিকই দুর্লভ ছিল। শুধু তখনকার দিনে কেন, ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হইতে অদ্য পর্য্যন্ত যে সমস্ত বাঙ্গালী শিক্ষক ইংরাজী ভাষার অধ্যাপনায় কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন, কৃষ্ণবিহারী তাঁহাদিগের অন্যতম। এই বিদ্যালয়ে ব্রাহ্ম শিক্ষকগণের সাহচর্য্যে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়া উঠেন; কালক্রমে কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতায় এই শ্রদ্ধা হইতে আকর্ষণ জন্মে, এবং ১৮৮২ খৃঃ অব্দে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য হন। প্রফুল্লচন্দ্র এফ্‌, এ, পড়িবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রপলিটান কলেজে ভর্ত্তি হন।

ঠিক এই সময়ে বঙ্গদেশে এক নবজাগরণের সাড়া পড়িয়া যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ বিষয়ক আন্দোলন সমাজের সর্ব্ব-স্তরে প্রবেশ করিয়া সকলকেই ভালমন্দ বিবেচনায় নিয়োজিত করিয়াছিল। কেশবচন্দ্র সেনের উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতায় অনেকেই ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদার মত পোষণ করিতে আরম্ভ করেন। অন্য দিকে মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি ভারতসভা স্থাপিত করিয়া জাতীয় মিলনের পথ পরিষ্কার করিতেছিলেন। যুবক প্রফুল্লচন্দ্রের উপর ইঁহাদের সকলেরই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতায় অনুপ্রাণিত হইয়া ইনি ব্রাহ্মমতাবলম্বী হন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ প্রচারের চেষ্টা ও হিন্দু নেতৃগণের অযৌক্তিক প্রতিশোধ-তৎপরতা দেখিয়া তিনি হিন্দুসমাজের সংস্কারের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে থাকেন। আনন্দমোহনের দৃঢ়তা, সততা ও দেশসেবাব্রতে তিনি অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার ভক্ত হইয়া উঠিলেন। সর্ব্বোপরি দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথের জ্বালাময়ী

বক্তৃতায় তাঁহার হৃদয়ে দেশাত্মবোধ জাগিয়া উঠে, এবং তিনি ভারতে রাজনৈতিক সংস্কারের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করেন। এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ মেট্রপলিটান কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতায় তিনি এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, মাত্র তাঁহার নিকট পড়িবার সুযোগ হইবে বলিয়াই তিনি মেট্রপলিটান কলেজে প্রবেশ করেন। এই কলেজে পড়িবার সময় প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করিয়া সুবিখ্যাত অধ্যাপক স্যার জন এলিয়ট ও স্যার আলেকজাণ্ডার পেডলার সাহেবের নিকট যথাক্রমে পদার্থবিজ্ঞান (Physics) ও রসায়নশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন।

প্রফুল্লচন্দ্র ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিভাগে এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষার কয়েকমাস পূর্ব্বে তিনি বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়েন। হরিশ্চন্দ্রের ইচ্ছা ছিল, তিনি পুত্রগণকে বিলাত পাঠাইয়া তথায় সকলকে উচ্চ শিক্ষা দিবেন। কিন্তু ক্রমশঃ তাঁহার অবস্থা হীন হইতে থাকায়, তিনি স্বীয় সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিয়া বিশেষ দুঃখিত হইয়া পড়েন। প্রফুল্লচন্দ্র পিতার মনোভাব অনেকটা অবগত ছিলেন, তাই ধীরে ধীরে গিলক্রাইষ্ট (Gilchrist) বৃত্তি পরীক্ষার জন্য আপনাকে প্রস্তুত করিতে থাকেন। ১৮৮২ খৃঃ অব্দে তিনি উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করেন।

১৮৮২ খৃঃ অব্দে বি, এ, পরীক্ষা দেওয়ার পূর্ব্বেই প্রফুল্লচন্দ্র বিলাত যাত্রা করেন। বাল্যকাল হইতেই ইতিহাস ও ইংরাজী সাহিত্যের উপর তাঁহার খুব ঝোঁক ছিল। তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন, ভারতের স্থায়ী মঙ্গল করিতে হইলে য়ুরোপীয় ভাষা ও সাহিত্যের দ্বারা তাহা সম্ভাবিত নহে, পরন্তু য়ুরোপীয় বিজ্ঞানের উপরই ভারতের স্থায়ী উন্নতি

নির্ভর করিতেছে, তখন এডিনবরায় প্রবেশ করিয়া পাঠ্য নির্ব্বাচন করিতে তাঁহার ক্ষণকাল বিলম্ব হইল না ; তাঁহার চির ঈপ্সিত ইতিহাস ও সাহিত্যের চর্চ্চা পরিত্যাগ করিয়া তিনি রসায়নশাস্ত্র অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করিলেন।

প্রফুল্লচন্দ্রের সৌভাগ্যক্রমে তিনি এডিনবরায় প্রবেশ করিয়া তৎকালীন য়ুরোপ-প্রসিদ্ধ দুই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের পাদমূলে উপবেশন করিয়া শিক্ষালাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন। সুবিখ্যাত পি, জি, টেইট (P. G. Tait) সাহেব পদার্থ বিজ্ঞানের এবং এ, সি, ব্রাউন (Alexander Crum Brown) রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। ইঁহারা উভয়েই প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন ; ইঁহাদেরই শিক্ষাগুণে অতি অল্প দিনের মধ্যেই প্রফুল্লচন্দ্র রসায়নশাস্ত্রের দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকেন। অতি শীঘ্রই একজন বিজ্ঞানানুরক্ত মেধাবী ছাত্র বলিয়া তাঁহার খ্যাতি সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে, এবং তিনি সকলের প্রিয় হইয়া উঠেন।

কলেজের নির্দ্দিষ্ট কালের পর তিনি খুব অল্প সময়ই পাঠে ব্যয় করিতেন। কিন্তু যেটুকু সময় পাঠে নিয়োগ করিতেন, তাহা গভীর মনোযোগের সহিতই করিতেন। নিয়মিত অধ্যয়নের ফলে প্রফুল্লচন্দ্র ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বি-এস্-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ডি-এস্-সি ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁহার রচিত প্রবন্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়ায় তিনি 'Hope Prize' নামক সম্মানজনক পুরস্কারও লাভ করিয়াছিলেন। ঐ পুরস্কারের মূল্য পঞ্চাশ পাউণ্ড, অর্থাৎ তখনকার দিনে প্রায় ছয়শত টাকা ছিল। ঐ বৃত্তিলব্ধ অর্থে তিনি আরও ছয় মাসকাল এডিনবরায় অবস্থিতি করিয়া তাঁহার আরব্ধ রাসায়নিক গবেষণা শেষ করিতে পারিয়াছিলেন।

বিজ্ঞানের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেও প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার চিরপ্রিয় ইতিহাসকে তাঁহার হৃদয় হইতে একেবারে অপসারিত করিতে পারেন নাই। তাঁহার অবকাশকাল স্বদেশের ইতিহাসচর্চ্চায় অতিবাহিত হইত। বি-এস্-সি পরীক্ষা দেওয়ার প্রাক্কালে তিনি 'India before and after the Mutiny' নামক এক প্রবন্ধ রচনা করিয়া উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন। ইহাতে সিপাহীবিদ্রোহের পূর্ব্বে এবং পরে ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছিল। এই পুস্তক একদিকে যেমন তাঁহার ইংরাজীভাষার অভিজ্ঞতার পরিচায়ক, অন্য পক্ষে তেমনি তাঁহার গভীর স্বদেশানুরাগ, ভারতের ইতিহাসে এবং সাধারণ রাজনীতিমূলক বিষয়গুলিতে তাঁহার সূক্ষ্ম জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করে। উক্ত পুস্তক অতি ক্ষুদ্র হইলেও উহা বিলাতের প্রধান প্রধান লোকের এবং সংবাদপত্রের প্রশংসালাভে সমর্থ হইয়াছিল। এই প্রবন্ধে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এত তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছিল যাহা অন্যত্র পাওয়া দুর্ঘট। তাঁহার ইতিহাস লিখিবার প্রণালী কি সুন্দর, উহা পাঠ করিলে জানা যাইবে।

প্রেসিডেন্‌সি কলেজে অধ্যাপনা ও রসায়নচর্চ্চা

ডি-এস-সি ডিগ্রী প্রাপ্তির পর বিলাতের বিজ্ঞানাগারে স্বীয় আরব্ধ গবেষণা পরিসমাপ্ত করিয়া প্রফুল্লচন্দ্র ভারতীয় শিক্ষা-বিভাগে প্রবেশ করিবার জন্য তদানীন্তন ভারত-সচিবের নিকট আবেদন করেন। কর্ম্মপ্রাপ্তি সম্বন্ধে তাঁহার বিলাতী বন্ধুগণও বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কি কারণে বলা যায় না, তাঁহার ন্যায় উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত এবং রসায়নশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তিকে ভারত-সচিব মহোদয় ভারতীয় শিক্ষা

বিভাগে (Indian Educational Service) গ্রহণ করা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই।

১৮৮৮ সালের আগষ্ট মাসে প্রফুল্লচন্দ্র স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ভারত-সচিবের উপদেশানুযায়ী কর্ম্মপ্রাপ্তির জন্য বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করেন। সুখের বিষয় বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া তাঁহাকে প্রাদেশিক শিক্ষা-বিভাগে (Provincial Educational Service) গ্রহণ করতঃ গুণগ্রাহিতার কথঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী জুন মাস হইতে মাসিক ২৫০৲ টাকা বেতনে প্রফুল্লচন্দ্রকে প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়নশাস্ত্রের সহকারী অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত করা হয়। এই সময়ে সুবিখ্যাত টনি সাহেব (C. H. Tawney) প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ এবং আলেকজান্দার পেডলার সাহেব (যিনি পরে সার হইয়াছিলেন) রসায়নশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন।

প্রফুল্লচন্দ্র যখন কর্ম্মপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন সুপ্রসিদ্ধ ক্রফট্ (Croft) সাহেব শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর। তিনি এই সময় দার্জ্জিলিংএ ছিলেন। ২৫০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইয়াছেন শুনিয়া প্রফুল্লচন্দ্র মনের দুঃখে দার্জ্জিলিংএ ডিরেক্টর সাহেবের নিকট ছুটিয়া যান। কিন্তু ডিরেক্টর সাহেব তাঁহার আবেদন সমবেদনার সহিত গ্রহণ না করিয়া বরঞ্চ একটু তীব্রভাবই প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন—"There are other works in life, who asks you to accept service ?"—"চাকুরী ভিন্ন জীবনে অনেক কাজ করিবার আছে, কে তোমাকে চাকুরী লইতে সাধাসাধি করিতেছে ?" ডিরেক্টর সাহেবের এই শ্লেষোক্তিতে প্রফুল্লচন্দ্রের আত্মাভিমানে অত্যন্ত আঘাত লাগে এবং তাঁহার চাকুরী

করিবার সাধ একেবারে চলিয়া যায়; কিন্তু তাঁহাকে দায়ে ঠেকিয়া কর্ম্মগ্রহণ করিতে হয়; তিনি বিলাত হইতে উচ্চ রসায়নীবিদ্যা আয়ত্ত করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন, অন্য পথে যাওয়াও সুবিধাজনক নহে। বিশেষতঃ মৌলিক গবেষণা দ্বারা নূতন নূতন তত্ত্বাবিষ্কার করিবার স্পৃহা তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছিল। এমন কি, প্রেসিডেন্সি কলেজ ভিন্ন অন্য কোন কলেজে নিযুক্ত হইলেও তাঁহার এই বাসনা ফলবতী হইবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং একরূপ বাধ্য হইয়াই 'রোগী যেন নিম খায় মুদিয়া নয়ন' গতিকে তাঁহাকে এই কর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইল।

ঈপ্সিত জ্ঞানানুশীলনের পথে এইরূপে নানা বিঘ্ন-বাধা উপস্থিত হওয়ায় প্রফুল্লচন্দ্রের জ্ঞানপিপাসু চিত্ত সহজেই বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। তিনি শিক্ষাবিভাগের এই সকল নীরব অত্যাচার মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিলেন বটে; কিন্তু পরাধীনতার একটা গ্লানি আসিয়া বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় তাঁহার সর্ব্ব শরীরে এমন একটা জ্বালা উৎপন্ন করিল যে তাহারই ফলে তাঁহার সমগ্র জীবন ভবিষ্য বংশীয়গণের মুক্তির সন্ধানে উৎসৃষ্ট হইয়াছে।

এই সময়ে প্রফুল্লচন্দ্রের অন্তরপ্রদাহে সার জগদীশচন্দ্রের পারিবারিক স্নেহ, যত্ন ও ভালবাসা কতকটা বাহ্য প্রলেপের কাজ করিয়াছিল। প্রফুল্লচন্দ্র যখন এডিন্‌বরায় অধ্যয়ন করিতেন, বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রত্ন বিজ্ঞানাচার্য্য সার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় তখন কেম্‌ব্রিজের ছাত্র ছিলেন। উভয়ের প্রথম লণ্ডনে সাক্ষাৎ হয়। প্রথম সাক্ষাৎ হইতেই চুম্বকের ন্যায় উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইতে থাকেন এবং প্রথম আলাপ হইতেই উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্দ্যের সৃষ্টি হয়। "সম্বন্ধমাভাষণ-পূর্ব্বমাহুঃ"। জগদীশচন্দ্র ১৮৮৬ সালে ভারতীয় শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ

করেন। প্রফুল্লচন্দ্র কলিকাতায় ফিরিয়া তাঁহার এই অকৃত্রিম সুহৃদের গৃহে প্রায় এক বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এখানে বন্ধুপত্নীর নিকট অমুজোচিত স্নেহ লাভ করিয়া তাঁহার ক্লান্ত দেহ সুস্থ ও ক্ষুব্ধ চিত্ত শান্ত হইল।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মাবকাশের পর কলেজ খুলিলেই প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজের বিজ্ঞানাগারে প্রবেশ করিয়া সেই যে টেষ্ট টিউবকে (test tube) সাদরে বরণ করিয়া লইলেন, তাঁহার জীবনের অর্দ্ধ শতাব্দী অতীত হইয়া গিয়াছে, তবুও তিনি তাহার সহিত সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। তিনি সেদিনও বলিয়াছেন— 'বিজ্ঞানাগারই আমার শান্তি ও কর্ম্মের স্থল; সেখানে টেষ্ট টিউব-এর সহিত আলাপে আমি আমার বার্দ্ধক্য ভুলিয়া যাই,—৩৩ বৎসর, এক শতাব্দীর এক তৃতীয়াংশ কাল বিজ্ঞানাগারের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া বাহ্য জগতের সহিত সকল সম্বন্ধচ্যুত হইয়া পড়িয়াছি।'

প্রফুল্লচন্দ্রের আজীবন সাধনার ফল, তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত আবিষ্ক্রিয়া, বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফারমাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের প্রতিষ্ঠা ও হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস-সঙ্কলন প্রেসিডেন্সি কলেজের বিজ্ঞানাগারেই সম্ভাবিত হইয়াছিল।

প্রফুল্লচন্দ্র যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করেন তখন এদেশে বিজ্ঞানশিক্ষার অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। পরীক্ষাপাশের উদ্দেশ্য ভিন্ন অন্য কোন অভিপ্রায়ে কেহ বিজ্ঞানচর্চ্চা করিতে ইচ্ছা করিত না। পরীক্ষাপাশের সুবিধা হইবে মনে করিয়া যাহারা পদার্থবিজ্ঞান বা রসায়নশাস্ত্র পাঠ করিত, পরীক্ষাপাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা উহা বিস্মৃত হইতে আরম্ভ করিত। এই সময়ে যাহারা এম, এ পরীক্ষায় প্রথম

বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম স্থান অধিকার করিত তাহারা ভ্রমে কোন দিনও মৌলিক গবেষণার কথা মনে করে নাই।

প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রধান চেষ্টা হইল ছাত্রগণের মনে বাস্তবিক বিজ্ঞানালোচনার জন্য একটা আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করা। প্রথম হইতে ছাত্রগণকে বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য তিনি প্রায়ই প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যাপনা করিতেন। 'কলেজে নব প্রবিষ্ট ছাত্রগণের মনে রসায়নশাস্ত্র শিক্ষার জন্য আগ্রহ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি নিম্নতম শ্রেণীতে অধ্যাপনা করিতেন। তিনি রাসায়নিক তত্ত্ব বিশ্লেষণে অথবা বিভিন্ন মতবাদের আলোচনায় সময় ক্ষেপ না করিয়া কিরূপে রসায়নের সেবায় আত্মনিয়োগ করা যায় তাহার দৃষ্টান্ত ছাত্রগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতেন; বিদ্যার জন্য বিদ্যাচর্চ্চা, সত্যানুসন্ধান, নূতন তথ্যের আবিষ্কার, রসায়নশাস্ত্রের পরিপুষ্টির জন্য রসায়নশাস্ত্র অধ্যয়ন প্রভৃতি খাঁটি সত্যগুলি ছাত্রগণের মনে সুপ্রবিষ্ট করিয়া দিতেন; উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণের সম্মুখে তাঁহার নিজের আবিষ্ক্রিয়ার বিবরণ সবিস্তারে বর্ণনা করিতেন; কেবলমাত্র পরীক্ষায় পাশের জন্য সাহায্য করিতেন না। মধ্যে মধ্যে কৌতুকজনক সন্দর্ভের অবতারণা, সামাজিক ব্যাধির আলোচনা প্রভৃতি দ্বারা ছাত্রগণের মনে পৌরুষের আদর্শ জাগাইয়া উহা লাভ করিবার পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। নিম্নশ্রেণীতে প্রীতিকর রাসায়নিক পরীক্ষা উপস্থাপিত করিয়া ছাত্রগণকে রসায়নবিজ্ঞানের গুপ্ত রহস্যের সহিত পরিচিত ও উহা উদ্ঘাটনের জন্য উৎসাহিত করিতেন।'

এই সময়ে এফ্ এ ও বি, এ পরীক্ষায় রসায়নশাস্ত্র পঠিত হইত বটে, কিন্তু কাহাকেও হাতে-কলমে কোন কাজ করিতে হইত না; এমন কি, এম, এ পরীক্ষার জন্যও হাতে কাজ সামান্য মাত্র আবশ্যক

হইত। সুতরাং প্রেসিডেন্সি কলেজের যন্ত্রাগারের অবস্থাও তত উন্নত ছিল না। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্রাগারে কাজ করিয়া আসিয়া কলিকাতার এই সামান্য যন্ত্রাগারে স্বাধীন গবেষণার কার্য্য চালান প্রফুল্লচন্দ্রের পক্ষে একরূপ অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। কত ধৈর্য্যের সহিত যে তাঁহাকে এই সময়ে নানা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সত্যের পথে অগ্রসর হইতে হইয়াছে, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়।

আদর্শ অধ্যাপকরূপে প্রফুল্লচন্দ্রের যশ সুপ্রতিষ্ঠিত হইল বটে, তাঁহার চেষ্টায় যন্ত্রাগারেরও যথেষ্ট উন্নতি হইল, কিন্তু তাঁহার অন্তরে অন্তরে যে অনিদ্র বাসনা চক্ষু চাহিয়া জাগিয়া রহিল, তাহাকে শান্ত করিবার কোন উপায়ই তিনি সহজে করিতে পারেন নাই। সেই যে এডিনবরায় অধ্যয়নকালে তিনি ব্যথিত চিত্তে লক্ষ্য করিয়াছিলেন জাপানী ছাত্রগণের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে লণ্ডন ও বার্লিনের বৈজ্ঞানিক পত্রগুলি পূর্ণ হইতেছে; আর জাপানের সভ্যতার মূলাধার ভারতবর্ষ মহানিদ্রায় শায়িত; তিনি যে আশা করিয়াছিলেন, ভারতের এ মহানিদ্রা ঘুচাইয়া পুনরায় জ্ঞানের বর্ত্তি প্রজ্জ্বলিত করিতে হইবে, ভারতীয় ছাত্রগণের মৌলিক গবেষণায় ও প্রবন্ধগৌরবে জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিতে হইবে*। কিন্তু বহু দিন চলিয়া গেল, কোন ছাত্রই তৃষ্ণার্ত্ত চিত্তে তাঁহার নিকট আসিল না; যদি বা দুই এক জন আসিল, তাহারা দুই এক মাস কাজ করিয়া ডেপুটীগিরি বা ওকালতীর গন্ধে ছুটিয়া পলাইল।

প্রফুল্লচন্দ্র নীরবে তাঁহার গবেষণার পথে অগ্রসর; শ্রান্তি নাই, বিশ্রাম নাই, সমান ভাবে নীরব কর্ম্মী পথ বাহিয়া চলিয়াছেন! তাঁহার কেবলই মনে হইতেছে, তিনি যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছেন তাঁহার অবর্ত্তমানে কে তাহা সঞ্জীবিত রাখিবে? তিনি

* Essays and Discourses by Sir P. C. Roy (G. A. Natesan.)—৩২ পৃষ্ঠা।

ভগবানকে কাতর ভাবে সর্ব্বদাই অন্তরের বেদনা জানাইতেছেন,—"আমি মরি হে মুরারি, দুখ নাই অন্তরে গো", কে আমার এই আরদ্ধ কর্ম্মের স্রোত বহমান রাখিবে?

দেবতার অনুগ্রহে তাঁহার ও দেশের মুখরক্ষা হইল! পূর্ব্বে কোন কোন ছাত্র তাঁহার সহিত সামান্য ভাবে গবেষণায় নিয়োজিত হইলেও, তাঁহাদের কার্য্য স্থায়ী হয় নাই। কিন্তু বাস্তবিক স্রোত ফিরিল ১৯১০ সাল হইতে, যখন শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত প্রমুখ ছাত্রগণ আসিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজের নির্জ্জন লেবরেটারী মুখরিত করিয়া তুলিলেন। যতীন্দ্রনাথ সেন, জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত, হেমেন্দ্রকুমার সেন, নীলরতন ধর, রসিকলাল দত্ত, বিমানবিহারী দে, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, মেঘনাদ সাহা প্রভৃতি কৃতী ছাত্র নানা মৌলিক প্রবন্ধে য়ুরোপ ও আমেরিকার বৈজ্ঞানিক পত্রগুলির স্তম্ভ পূরণ করিতে লাগিলেন। দিন দিন নূতন আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা বাঙ্গালী মস্তিষ্কের উর্ব্বরতার সাক্ষ্য বাহিরে প্রচারিত হইতে লাগিল। প্রফুল্লচন্দ্র হিন্দু রসায়নীবিদ্যার ইতিহাস সঙ্কলনকালে বাঙ্গালীর জড়ত্ব সম্বন্ধে যে হতাশ ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন দশ বৎসরের মধ্যেই তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া তাঁহাকে পুনরায় আশার সঙ্গীত গাহিতে হইল।

প্রেসিডেন্সি কলেজে কার্য্যারম্ভ করিবার পর, প্রফুল্লচন্দ্র পিতৃঋণের জন্য বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। নিজ অসাধারণ মিতব্যয়িতার ফলে তিনি তিন বৎসরে প্রায় ৪০০০৲ টাকা পিতৃঋণ পরিশোধ করেন এবং কলিকাতায় নিজ খরচা বাদে ৮০০৲ শত টাকা বাঁচাইয়া তাহা দ্বারা ১৮৯২ সালে বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের পত্তন করেন। এই সময় ইনি জগদীশচন্দ্রের বাটী হইতে আসিয়া ৯১ নম্বর অপার সার্কুলার রোডের বাটীতে অবস্থিতি করিতে থাকেন। এইখানেই বেঙ্গল

কেমিক্যাল ওয়ার্কসের জন্ম হয় এবং অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই বাটীতেই ইহার প্রধান আফিস ছিল। বেঙ্গল কেমিক্যালের জন্য অনেক জিনিষের পরীক্ষা এই সময় প্রেসিডেন্সি কলেজের লেবরেটারীতে (যন্ত্রাগারে) হইত।

১৮৯৫ সাল প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনের প্রধান স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসর তাঁহার গবেষণার ফল স্বরূপ Mercurous Nitrite আবিষ্কৃত হয়। ইহাই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার। এই বৎসরই গন্ধকদ্রাবক প্রস্তুত করিবার যন্ত্রপাতি (Sulphuric Acid Plant) সংস্থাপিত হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের কার্য্যারম্ভ হয়। আবার এই বৎসরই তাঁহার স্নেহময় পিতার মৃত্যু হইল। এইরূপ পরস্পর-বিরোধী হাসিকান্না, সুখদুঃখ, হর্ষ ও বিষাদের সঙ্ঘাতে তাঁহার প্রকৃতি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে বিভোর হইয়া পড়ে।

১৯০২ খৃঃ অব্দে তাঁহার হিন্দু রসায়নীবিদ্যার ইতিহাসের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়। প্রাচীন ভারতে রসায়নীবিদ্যার কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল, তাহা প্রমাণ করিবার জন্যই তিনি বহু পরিশ্রমে এই ইতিহাস প্রণয়ন করেন। ১৯০৫ খৃঃ অব্দে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ১৯০৭ সালে উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ প্রচারিত হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সি কলেজের রাসায়নিক যন্ত্রাগারের উন্নতিসাধন করিবার ও রাসায়নিকগণের সংস্পর্শে আসিবার অভিপ্রায়ে বাঙ্গালা সরকার প্রফুল্লচন্দ্রকে ১৯০৪ খৃঃ অব্দে য়ুরোপের প্রধান প্রধান যন্ত্রাগার পরিদর্শন করিবার জন্য প্রেরণ করেন। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্ম্মণীর প্রধান প্রধান যন্ত্রাগার দেখিয়া তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তাহার ফলে ১৯১২ সাল হইতে প্রেসিডেন্সি কলেজের রাসায়নিক যন্ত্রাগারের বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

য়ুরোপে প্রবাসকালে প্রফুল্লচন্দ্র যখন যেখানে গিয়াছিলেন, তথায় বিশেষ সম্মানলাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে প্রফুল্লচন্দ্রের গবেষণার কথা পৃথিবীময় রাষ্ট্র হইয়া বৈজ্ঞানিকদিগের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। তিনি এখন হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাসেরও প্রণেতা বলিয়া সর্ব্বত্র সম্মানিত। তাঁহার আদর্শ চরিত্র য়ুরোপীয়গণের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিলনা, তাই য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ বহু অনুষ্ঠানে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন।

প্রফুল্লচন্দ্র স্বকীয় গবেষণা ও মৌলিক আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা য়ুরোপীয় বিদ্বন্মণ্ডলীর নিকট সম্মানিত; হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস প্রণয়ন ও প্রকাশে তাঁহার যশঃ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত; তাঁহার আদর্শচরিত্রে তিনি লোকমাত্রেরই বরণীয়; তাঁহার আদর্শ শিক্ষাপ্রণালীর ফলে দেশে মৌলিক গবেষণার স্রোত প্রবাহিত; কিন্তু আমাদের গবর্ণমেণ্ট তাঁহার গুণগ্রহণে কতকটা অন্ধ ছিলেন। তাঁহাকে যে প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগে কোণ-ঠেসা করিয়া রাখা হইল, তাহার আর কোন নড়চড় হইল না। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার সরকারী চাকুরী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "তিনি ২৫০৲ টাকা মাসিক বেতনে ১৮৮৯ খৃঃ অব্দে শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করেন এবং সেই বেতনে সাত বৎসর কর্ম্ম করার পর, তাঁহার বেতন ৪০০৲ টাকা হয়। আরও সতের কি আঠার বৎসর পরে তাঁহাকে প্রাদেশিক শিক্ষা-বিভাগের উচ্চতম সোপানে উন্নীত করা হয় এবং তিনি ৭০০৲ টাকা বেতন পাইতে থাকেন।" স্যর জগদীশচন্দ্র বসু প্রভৃতির ন্যায় কার্য্যকুশলতা প্রদর্শন করিয়াও স্থায়ীভাবে উচ্চতম ভারতীয় শিক্ষাবিভাগে (Indian Educational Service) উন্নীত হইতে পারেন নাই।

এই কারণেই পাবলিক সার্ভিস কমিশনে প্রফুল্লচন্দ্র বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে,—"It was not consistent with a sense of

self-respect that men equally educated, doing the same kind of work and of equal calibre, should be ranked in two different services."

প্রফুল্লচন্দ্রের কার্য্যকালে মিঃ পেডলার (পরে সার), মিঃ পি, মুখার্জ্জি, মিঃ ষ্টেপল্‌টন ও মিঃ ক্যানিংহাম যথাক্রমে প্রেসিডেন্সি কলেজের রাসায়নিক বিভাগে প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। মিঃ পেডলার ও মিঃ মুখার্জি প্রফুল্লচন্দ্রকে অত্যন্ত প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। মিঃ ষ্টেপল্‌টন কিছু ক্ষমতাপ্রিয় ছিলেন। মিঃ ক্যানিংহাম প্রফুল্লচন্দ্রের গুণমুগ্ধ ছিলেন এবং বাঙ্গালী ছাত্রগণকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। ক্যানিংহামের চেষ্টায় বাঙ্গালাদেশে বিজ্ঞান শিক্ষার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। প্রফুল্লচন্দ্রের উপরে তাঁহাকে সংস্থাপিত করায় তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া গভর্ণমেণ্টের কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ১৯১০ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। ক্যানিংহামের পর হইতে প্রফুল্লচন্দ্রের উপর প্রেসিডেন্সি কলেজের রাসায়নিক বিভাগের কর্ত্তৃত্বভার দেওয়া হয় এবং অবসর গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত তিনি প্রধান অধ্যাপকের কাজ করিতেন।

১৯১২ সালে লণ্ডন নগরে বৃটিশ সাম্রাজ্যের যাবতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক মহাসম্মেলন (Congress of the Universities of the Empire) হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী উহার প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন। এই সম্মেলনে তাঁহারা বিশেষ যোগ্যতার সহিত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ও ছাত্রগণের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের যোগ্যতার পুরস্কার স্বরূপ এবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয় ডাঃ সর্ব্বাধিকারীকে এল, এল, ডি এবং ডার্হাম বিশ্ববিদ্যালয় ডাঃ রায়কে ডি-এস্-সি ডিগ্রী প্রদান করেন। এই বৎসর গভর্ণমেণ্টও প্রফুল্লচন্দ্রকে সি, আই, ই উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

বিজ্ঞানশিক্ষা প্রচারের জন্য ১৯১২ সালে স্যার টি, পালিত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের হস্তে পনের লক্ষ টাকা দান করেন। পরবর্ত্তী বৎসরে এই মহদুদ্দেশ্যে স্যার রাসবিহারী ঘোষ মহোদয়ও অতিরিক্ত দশ লক্ষ টাকা দান করেন। এই দুই মহাত্মার অর্থ-সাহায্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্রবে বিজ্ঞান-কলেজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। প্রফুল্লচন্দ্র বিলাতে থাকিতেই সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহোদয় তাঁহাকে পালিত-প্রতিষ্ঠিত রাসায়নিক অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি ঐ পদ গ্রহণে স্বীকৃত হইলে ১৯১৬ সালে বাঙ্গালা সরকারের অনুমতি লইয়া তাঁহাকে ঐ পদে নিযুক্ত করা হয়। ১৯১৪ সালে বিজ্ঞান কলেজের নবনির্ম্মিত ভবনে বিস্তারিত ভাবে কার্য্যারম্ভ হইয়াছে।

১৯১৭ সালে প্রফুল্লচন্দ্র সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্যাবসানে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রগণ তাঁহাকে যে অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন তাহা শিক্ষকের প্রতি ছাত্রগণের ভক্তি ও শ্রদ্ধার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

রাসায়নিক গবেষণা

স্বাধীন চিন্তা ও মৌলিক গবেষণার গৌরবে যাঁহারা বিদেশে বাঙ্গালী জাতির সম্মানবৃদ্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের নামই সর্ব্বাগ্রে স্মরণীয়। সহস্রাধিক বৎসরের জড়তার ফলে স্বাধীন ভাবে কোন বিষয়ের সত্যানুসন্ধানের শক্তি বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক হইতে যেন চিরবিদায় লইয়াছিল। এই উষর ক্ষেত্রে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র আবির্ভূত হইয়া আমাদিগের সম্মুখে শুধু গবেষণার নূতন পথ খুলিয়া দিয়াছেন এমন

নহে, পরন্তু এই প্রারম্ভাবস্থায় তাঁহারা যে নূতন তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা বিজ্ঞানচর্চ্চাগর্ব্বিত য়ুরোপীয়গণেরও বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছে।

তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণশক্তি ও ঘটনার কারণনিরূপণের ইচ্ছা প্রফুল্লচন্দ্রের শৈশবদশাতেই প্রতিভাত হইয়াছিল। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় তিনি এক শ্রেণীর নূতন যৌগিক পদার্থ (Conjugated Sulphates of the Copper Magnesium Group) আবিষ্কার করেন। এই গবেষণার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ যে তাঁহাকে তথাকার সর্ব্বোচ্চ সম্মান ডি-এস্-সি ডিগ্রী প্রদান করেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

নাইট উপাধি লাভ, বিলাতযাত্রা, দেশসেবা, দানশীলতা, জাতীয় শিক্ষা ও রাজনীতি ক্ষেত্র।

বিগত জার্ম্মাণ-যুদ্ধের সময়, যুদ্ধ চালাইবার জন্য বহুপরিমাণে গোলাগুলি ও বারুদের প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই সময় বেঙ্গল-কেমিক্যাল ভারত সরকারকে বহু পরিমাণে ঐ সকল জিনিষ সরবরাহ করে। যুদ্ধে এই সাহায্যের জন্য ও মৌলিক গবেষণার জন্য সম্রাট্ বেঙ্গল কেমিক্যালের নেতা আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্রকে 'স্যর' উপাধিতে বিভূষিত করেন। উচ্চাঙ্গের রসায়ন-চর্চ্চা করিবার জন্য ১২৯১ সালের আগষ্ট মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আচার্য্য রায়কে বিলাতে প্রেরণ করেন। খুলনা জেলা ব্যাপী যখন ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল—সেই সময় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র দেশের লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া তিন লক্ষ টাকা

সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আচার্য্যের দানশীলতার কথা বাংলা দেশের সকলেই অবগত আছেন—তাই দেশবাসী বিশ্বাস করিয়া তাঁহার হাতে তিন লক্ষ টাকা অনায়াসেই প্রদান করিয়াছিল।

এই সময় অসহযোগ আন্দোলন প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছিল এবং মহাত্মা গান্ধী চরকা-মন্ত্র প্রচার করিতেছিলেন। আচার্য্য রায় প্রথমে চরকা ও খদ্দরের পক্ষপাতী ছিলেন না। খুলনার দুর্ভিক্ষ তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন ঘটায়। দুর্ভিক্ষের প্রকোপ প্রশমিত হইলে তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকদিগকে কি কার্য্য দেওয়া যাইতে পারে যাহাতে তাহারা সমস্ত দিন ব্যাপৃত থাকিয়া স্ব স্ব জীবিকার সংস্থানেও সক্ষম হয়। তিনি দেখিলেন যে দুর্ভিক্ষ পীড়িত নরনারীরা অবসর সময়ে চরকা কাটিলে, তাহাদের অনেক সাহায্য হইবে। এই সময়ে তিনি চরকা-মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন এবং তাঁহার অদম্য চেষ্টা ও উৎসাহে খুলনার ঘরে ঘরে চরকা চলিতে লাগিল। আচার্য্য রায়ের দেশ সেবা এই খানেই শেষ হইল না। শীঘ্রই দেশ সেবার অন্য সুযোগ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

১৯২২ সালে সেপ্টেম্বর মাসে উত্তর-বঙ্গে ভীষণ বন্যা হয়। বন্যাপীড়িত নরনারীর দুঃখ দুর্দ্দশার কথা চিন্তা করিয়া প্রফুল্লচন্দ্র স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি কলিকাতাবাসীকে এক মহতী সভায় আহ্বান করিয়া "বেঙ্গল রিলিফ কমিটি" নামে একটী কমিটী সংগঠন করিলেন। বন্যা পীড়িতদের সাহায্যের সকল ভার ও বন্দোবস্ত এই কমিটির হস্তে অর্পণ করিয়া তিনি কার্য্যে অগ্রসর হইলেন। শুধু বাংলা দেশ নয়, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি ভারতের নানা প্রদেশ হইতে এই কার্য্যে তিনি আশাতীত সাহায্য পাইয়াছিলেন। সুদূর প্রবাসী ভারতবাসীগণও তাঁহাকে এই কার্য্যে সাহায্য করিয়া-

ছিলেন। ভিক্ষালব্ধ প্রায় দশ লক্ষ টাকা তিনি তাঁহার যুবকমণ্ডলীর সাহায্যে বন্যাপীড়িতদের দুঃখ দূর করিতে ব্যয় করিয়াছিলেন।

১৯২২ সালে বিজ্ঞান চর্চ্চার জন্য আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দশ হাজার টাকা দান করেন। তাঁহার জীবনের সঞ্চিত অর্থের অধিকাংশই এই কার্য্যে দান করিয়া তিনি অপূর্ব্ব দানশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। ১৯২৫ সালে বক্তৃতা দিবার জন্য নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় আচার্য্য রায়কে আহ্বান করেন। পারিশ্রমিক হিসাবে সমস্ত প্রাপ্য টাকা তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রত্যর্পণ করেন। বিজ্ঞান-মন্দিরের স্থাপনার প্রারম্ভ হইতেই আচার্য্য রায় রসায়নশাস্ত্রের পালিত অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত আছেন। পালিত ট্রাষ্টের নিয়মানুসারে অধ্যাপকের ষাট বৎসর বয়স হইলে কর্ম্মত্যাগ করা দরকার—তবে ট্রাষ্টিরা ইহার ব্যতিক্রম করিতে পারেন। ষাট বৎসর পূর্ণ হইলে আচার্য্য রায় পদত্যাগ-পত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে আরও পাঁচ বৎসরের জন্য অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। এই সময় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন—তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্বই প্রকাশ পায়। তিনি লেখেন—"আমার জীবনের বাকী দিন গুলি বিজ্ঞানমন্দিরের পরীক্ষাগারে কাটাইয়া দিতে খুবই ইচ্ছা করি, কিন্তু এই কাজের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হইতে আর পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে আমি অক্ষম। সেই জন্য আমার নিবেদন যে পালিত অধ্যাপকের প্রাপ্য মাসিক এক হাজার টাকা আমি বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রত্যর্পণ করিতেছি, যাহাতে এই টাকা বিজ্ঞান মন্দিরে রাসায়নিক বিভাগে ব্যয় হইতে পারে।" তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ দান খাদি-প্রচারের জন্য। তিনি আজীবন প্রায় ৫৬০০০৲ টাকা—'বেঙ্গল কেমিক্যাল' ও অন্যান্য কোম্পানীর 'শেয়ার' সঞ্চয় করিয়াছিলেন।

খাদি প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়া দেশের কাজে উৎসর্গ করিয়াছেন। সমস্ত ভারতবাসী তাঁহার স্বার্থত্যাগের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছে।

জাতীয় শিক্ষায় আচার্য্য রায়ের বিশ্বাস আছে। বাংলা ভাষার মধ্য দিয়া শিক্ষা দিবার তিনি বিশেষ পক্ষপাতী। জাতীয় শিক্ষার পক্ষপাতী বলিয়া, স্যর আশুতোষ চৌধুরীর মৃত্যুর পর, তাঁহাকেই "জাতীয় শিক্ষা পরিষদের" (National Council of Education) সভাপতি করা হইয়াছে। তাঁহারই উৎসাহ ও চেষ্টায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। এই কারণে ১৯২৩ সালে আলিগড় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় উপাধিদান সভায় তাঁহাকে আহ্বান করেন। এই উপলক্ষে তিনি যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা সকলের দৃষ্টিই আকর্ষণ করিয়াছিল।

প্রথম জীবনে আচার্য্য রায় রাজনীতি হইতে দূরে থাকিতেন। অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেও তিনি রাজনীতি ক্ষেত্রে যোগ দেন নাই। খুলনা দুর্ভিক্ষের পর হইতে তিনি চরকার কার্য্য-কারিতায় বিশ্বাস করিয়া—চরকা ও খদ্দর প্রচারের ভার গ্রহণ করিলেন। এই সময় হইতে তিনি রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং রাজ-নৈতিক হিসাবে উৎকল, কোকনদ ও অন্যান্য স্থান হইতে তাঁহার নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল। এই উপলক্ষে দেশপ্রাণ প্রফুল্লচন্দ্র এখন ভারতময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী

১

বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার

দ্বিতীয় সাহিত্য সম্মিলনীর অভিভাষণে এক স্থলে বলিয়াছিলাম যে, "প্রায় সহস্র বৎসর যাবৎ হিন্দুজাতি একপ্রকার মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। যেমন ধনীর সন্তান পৈতৃক বিভব হারাইয়া নিঃস্বভাবে কালাতিপাত করেন, অথচ পূর্ব্বপুরুষগণের ঐশ্বর্য্যের দোহাই দিয়া গর্ব্বে স্ফীত হন, আমাদেরও দশা সেইরূপ। লেকী বলেন যে, খৃঃ অঃ দ্বাদশ শতাব্দী হইতে ইউরোপ খণ্ডে স্বাধীন চিন্তার স্রোত প্রথম প্রবাহিত হয়। প্রায় সেই সময় হইতেই ভারতগগন তিমিরাচ্ছন্ন হইল। অধ্যাপক বেবর (Weber) যথার্থই বলিয়াছেন যে, ভাস্করাচার্য্য ভারতগগনের শেষ নক্ষত্র। সত্য বটে, আমরা নব্য স্মৃতি ও নব্য ন্যায়ের দোহাই দিয়া বাঙ্গালীমস্তিষ্কের প্রখরতার শ্লাঘা করিয়া থাকি, কিন্তু ইহা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যে সময়ে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রভৃতি মন্থন ও আলোড়ন করিয়া নবম বর্ষীয়া বিধবা নির্জ্জলা উপবাস না করিলে তাহার পিতৃ ও মাতৃকুলের ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন কয় পুরুষ নিরয়গামী হইবেন, ইত্যাকার গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন, যে সময়ে রঘুনাথ, গদাধর ও জগদীশ প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ বিবিধ জটিল টীকা টিপ্পনী রচনা করিয়া টোলের ছাত্রদিগের আতঙ্ক উৎপাদন করিতেছিলেন,

যে সময়ে এখানকার জ্যোতির্ব্বিদবৃন্দ প্রাতে দুই দণ্ড দশ পল গতে নৈঋত কোণে বায়স কা কা রব করিলে সে দিন কি প্রকারে যাইবে ইত্যাদি বিষয় নির্ণয় পূর্ব্বক কাকচরিত্র রচনা করিতেছিলেন, যে সময়ে এ দেশের অধ্যাপকমণ্ডলী "তাল পড়িয়া ঢিপ্ করে, কি ঢিপ্ করিয়া তাল পড়ে" ইত্যাকার তর্কের মীমাংসায় সভাস্থলে ভীতি উৎপাদন করিয়া সমবেত জনগণের অন্তরে শান্তিভঙ্গের আয়োজন করিতেছিলেন, সেই সময়ে ইউরোপে গ্যালিলিও, কেপ্‌লার, নিউটন প্রভৃতি মনস্বিগণ উদীয়মান প্রকৃতির নূতন নূতন তত্ত্ব উদ্ঘাটন পূর্ব্বক জ্ঞান-জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিতেছিলেন ও মানবজীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছিলেন।

উপরে যে মন্তব্য প্রকটিত হইল, তাহা একবার বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। বিশেষতঃ বঙ্কিমচন্দ্র এক স্থলে স্মরণীয় বাঙ্গালীর মধ্যে উল্লিখিত মহাত্মাগণ ও কুল্লুকভট্টের নাম করিয়া বলিয়াছেন, "অবনতাবস্থায়ও বঙ্গমাতা রত্নপ্রসবিনী।" এখন বিবেচনার বিষয় এই যে, আজ বর্ত্তমান জগতের ভীষণ জীবনসংঘর্ষের দিনে আপনাদের জাতীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইলে রঘুনন্দন ও কুল্লুকভট্টের টোলে প্রবেশ লাভ করিয়া পুনরায় ন্যায়, সাংখ্যের গবেষণায় নিযুক্ত হইতে হইবে, কি বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান ও প্রতিভার রশ্মি লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইতে হইবে? আমরা আজ কালবারিধি তীরে দাঁড়াইয়া শুধু কি উত্তাল তরঙ্গমালা গণিয়া হতাশ মনে গৃহে ফিরিব? ক্ষুদ্র জলাশয়ে আবদ্ধ হইয়া ভাবিব, আমরা বেশ আছি? অথবা নিরাশার তীব্র দংশনের ক্ষোভ মিটাইবার নিমিত্ত ভাবিব, বর্ত্তমান জগতের শিক্ষা ও দীক্ষা ভ্রান্তিমূলক, উহা মানব-হৃদয়ে জ্বালাময়ী তৃষ্ণা জনন করিয়া সুখ, শান্তি ও আধ্যাত্মিক চিন্তা-শীলতার পথ কণ্টকসমাকীর্ণ করে?

কোন জাতির গৌরব ও মহত্ত্ব নিরূপণ করিতে হইলে, কি কি উপাদানে এই মহত্ত্ব গঠিত সর্ব্বাগ্রে তাহারই পর্য্যালোচনা করিতে হইবে। আমার বোধ হয়, ভূদেব ও বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত অভিমতের উপর নির্ভর করিয়া যাঁহারা বাঙ্গালীর, এমন কি, হিন্দু জাতির গৌরবের শ্লাঘা করিয়া থাকেন, তাঁহারা অজ্ঞাতসারে ভ্রান্ত অভিমত পোষণ করেন মাত্র। রঘুনন্দন ও কুল্লুকভট্টের টীকা টিপ্পনী শ্লাঘার বিষয় জ্ঞান করিয়া যদি উঁহারই আদেশ অভ্রান্ত সত্য মানিয়া, সেই অতীতপ্রায় কূট শিক্ষায় মনোনিবেশ আমাদের গৌরবের বিষয় বলিয়া অনুমিত হয়, আর বর্ত্তমানের নূতন আশা, নূতন উদ্দীপনা ঠেলিয়া ফেলিয়া প্রাচীনের প্রচলন স্থির ধীর কর্ম্ম বলিয়া আদৃত হয়, জানি না এ মৃতপ্রায় জাতি নূতনের প্রবল অসহনীয় সংঘর্ষে আর কত দিন বাঁচিতে সক্ষম হইবে! স্বাধীন চিন্তা জাতীয় জীবননদের উৎস। এই উৎস যে দিন হইতে শুকাইতে আরম্ভ করিয়াছে সেই দিন হইতে মৌলিকতা ও অনুসন্ধিৎসা তিরোহিত হইয়াছে, সেই দিন হইতে বাঙ্গালী জাতির অধোগতির সূত্রপাত হইয়াছে। আজ সহস্র বৎসরকাল এই স্বাধীন চিন্তার স্রোত আলস্য এবং অন্ধবিশ্বাসরূপ গভীর কর্দ্দমে আবদ্ধ হইয়া জাতীয় জীবনের প্রস্রবণকে বন্ধ করিয়াছে। যখনই স্বাধীন চিন্তা, বিচার শক্তি, ইত্যাদির হ্রাস হইয়া আইসে, চরিত্র-মধ্যে যখন স্বীয় অভিমত পোষণ করিবার সাহস চলিয়া যায়, তখন পরের গ্রাসে আহার করিবার প্রবৃত্তি বাড়িয়া উঠে। ফলতঃ এরূপ জীবন ইতর প্রাণীর জীবনাপেক্ষা অল্প মাত্রই বিভিন্ন, কেন না, প্রাকৃতিক আদেশ প্রতিপালনই মানুষের একমাত্র লক্ষ্যের বিষয় নহে। একটি গাভী প্রত্যূষ হইতে প্রদোষ পর্য্যন্ত ঘাস খায়, ক্লান্ত হইয়া রাত্রে বিশ্রাম করে, দিবসভুক্ত নবতৃণাঙ্কুর উদ্গীরণ ও রোমন্থন করে—স্বীয় বৎসকে স্তন্য দেয় ও যথাসম্ভব তাহাকে মানুষের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার

প্রয়াস পায়; পরম স্নেহাস্পদ বৎসটির গাত্র স্নেহনিদর্শনস্বরূপ অবহেলন করে। এই প্রকার জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করাই কি মানবের উদ্দেশ্য? আহার, বিহার, নিদ্রাই কি ঈশ্বর-সৃষ্ট শ্রেষ্ঠজীবের কেবল একমাত্র কর্ত্তব্য? আপনার গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ থাকিয়া নিস্ফল সম্স্বার্থ-গবেষণায় কালাতি-পাত করা, জাড্যভিমান, পাণ্ডিত্যাভিমানে স্ফীত হইয়া উচ্চ নীচের কল্পিত ভেদাভেদকে গভীরতর করা, আর মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি স্বাধীন চিন্তাকে বিসর্জ্জন দিয়া, দুর্ব্বোধ শ্রুতি ও স্মৃতির টীকাকরণে মস্তিষ্কের প্রখরতা ক্ষয় করা কি বিধাতার অভিপ্রেত? পরম করুণাময় পরমেশ্বর কি মানুষকে জ্ঞান, ধৃতি, ক্ষমা ইত্যাদি দুর্ল্লভ গুণালঙ্কৃত করিয়াও এতদপেক্ষা মহত্তর চরিত্র ও অনুষ্ঠান দাবী করেন না?

সহস্রাধিক বৎসরের ইতিহাস এই সাক্ষ্য দেয় যে, সমগ্র ভারতবাসী অহিফেনসেবীর ন্যায় জড়, নিস্পন্দ ও অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে। জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে এই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখন যে জাতি এইপ্রকার হীনাবস্থায় পতিত হয়, তখন পুরাতনের প্রতি একটা অযথা অতিরিক্ত শ্রদ্ধা স্থাপন করে, এবং আত্মশক্তির উপর সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসহীন হইয়া পড়ে। অনন্ত পরিবর্ত্তনশীল জগতের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কত সামাজিক প্রথা ও ব্যবস্থা পরিবর্তিত হইতেছে। কালের চঞ্চল স্রোতে, পার্থিব জগতে যেমন যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, মনোজগতেও যে তাদৃশ বিপ্লব স্বাভাবিক, ইহা অন্ধবিশ্বাসচালিত হইয়া সে জাতি বুঝিতে পারে না। তখন কি এক মোহিনী শক্তি আসিয়া হৃদয়দ্বার চাবি বন্ধ করিয়া চলিয়া যায়, সত্যের ও বিচারের সহস্র কুঠারাঘাতেও তাহা ভাঙ্গে না। যখন মানব-সমাজ এই প্রকার তমসাচ্ছন্ন হয়, তখন শাস্ত্র অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত হয়—পথ দেখিবার আলোকের অভাবে ঋষিবাক্য বর্ত্তিকাস্বরূপ গৃহীত হয়। আমাদেরও তাহাই ঘটিল। প্রত্যূষ হইতে

সায়ংকাল পর্য্যন্ত, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত হিন্দু নিজকে এমন দৃঢ় নিগড়ে বন্ধন করিলেন যে, জীবনের যাহা কিছু কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, স্বীয় স্বাধীনতা অম্লানবদনে বিসর্জ্জন দিয়া, তাহা শাস্ত্রের নির্দ্দেশ অনুসারে করিতেই হইবে ইহাই স্থিরনিশ্চয় করিলেন। কিন্তু কেন করিব, এ কথাটি ভুলিয়াও মনে উদয় হইল না! শাস্ত্রকারের—

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনে বিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥

এই অমূল্য উপদেশ অনুসারে চলিবার ইচ্ছা বা সাহস কাহারও রহিল না। সুতরাং এই দুর্দ্দিনে দুই শ্রেণীর লোকের আধিপত্য বিস্তার হইল। এক শ্রেণী শাস্ত্রকার, অপর শ্রেণী শাস্ত্রব্যাখ্যাতা। স্বাধীন-চিন্তার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে মৌলিকতা (Originality) চলিয়া গেল, সুতরাং বুদ্ধিবৃত্তি ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ হইয়া ঋষিবাক্যের অর্থ লইয়া অযথা গণ্ড-গোলে ব্যাপৃত হইল। ইহাই টীকা টিপ্পনীর প্রারম্ভ। আবার শ্রুতি ও স্মৃতিতে বিষম বিরোধ উপস্থিত হইল। শ্রুতি প্রামাণ্য এই উক্তিও ঐ সময়ে প্রকটিত হইল। সমাজ যখন এই অবস্থায় পতিত হয়, তখন আবার আর এক প্রকার বিপদ আসিয়া সম্মুখীন হয়। নিজের উদ্যম-শীলতার ও নিজের কৃতকর্ম্মতার উপর ঘোর অবিশ্বাস জন্মে, অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ব্যাপারসমূহের উপর ততই অচল বিশ্বাস আসিয়া দাঁড়ায়। "আমি কিছুই করিতে পারি না, আমাকে কিছুই করিতে হইবে না, মায়ের কাছে জোড়া মহিষ মানিব, পীর পৈগম্বরের দরগায় সোয়া পাঁচ আনার সিন্নি দিব, আর আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে," ইত্যাকার বিশ্বাস আসিয়া দুর্ব্বলচিত্ত মানবকে আশ্রয় করে। স্বাধীন চিন্তা বিসর্জ্জনের ইহাই সর্ব্বশেষ অধ্যায়। পীড়া হইলে ঔষধ সেবনের প্রয়োজন নাই, "জলপড়া" পান করিলেই চলিবে, মৃতপীরের স্কীর্ণ

বসন স্পর্শ করিলেই আরোগ্যলাভ হইবে, ইহাই তখন বিচার শক্তির প্রাখর্য্য প্রমাণ করিতে থাকে। কেহ বা স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া ঔষধ খুঁজিলেন। কোন রমণীর উপর "আশ্রয়" হইয়াছে, ইত্যাদিবৎ দৈবঘটনার উপর তখন প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মিল। সমগ্র ইউরোপও মধ্যযুগে (Middle Ages) এই শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছিল। লেকী বলেন, চারি সহস্র ধর্ম্ম-শাস্ত্রাভিজ্ঞ (theologians) পিটর লোম্‌বার্ড নামক এক মহাপুরুষের বচনাবলীর উপর টীকা করিয়াছেন। উক্ত ঐতিহাসিক অন্যত্র লিখিয়াছেন :—

There was scarcely a town that could not show some relic that had cured the sick......The virtue of such relics radiated blessings all around them. (1, 141-42).

এই প্রকার অলৌকিক ও দৈবঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া ৫৫ খণ্ড বৃহদায়তন পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে। পাঠকগণ ইহাতে বুঝিবেন যে ইউরোপেও কুল্লুকভট্ট ও রঘুনন্দনের 'জাতিভাই"এর অভাব ছিল না। যে সময়ে লোকে এইপ্রকার কেবল মহাপুরুষগণের উক্তি ও তাঁহাদের টীকা টিপ্পনী লইয়া ব্যতিব্যস্ত থাকে, সে সময় প্রকৃত উন্নতি ও গৌরবের সময় নহে, বরং অধোগতির প্রারম্ভ।

কিন্তু ভারতের প্রকৃত গৌরবের সময়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক। ভারত যে শাস্ত্রবাদগ্রস্ত হইয়া চিরকাল কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল, এমন নহে। প্রাচীন ভারতে অনুসন্ধিৎসা-বৃত্তি যথেষ্টই বলবতী ছিল এবং স্বাধীন চিন্তার স্রোত অপ্রতিহত ভাবে প্রবাহিত হইয়াছিল। এমন কি মহর্ষি কপিল ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করেন নাই, কেন না ইহা সহজে প্রমাণ হয় না। কপিল তথাপি বেদের দোহাই দিয়াছেন। যাহা হউক ষড়্‌দর্শন ও উপনিষদে বেদ অভ্রান্ত ও অপৌরুষেয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, সুতরাং সমগ্র হিন্দুজাতির মুখ বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু চার্ব্বাকমুনি প্রভৃতিও

অগ্রাহ্য করিয়া ঘোষণা করিলেন :—"কতিপয় প্রতারক ধূর্ত্তেরা বেদ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে স্বর্গ নরকাদি নানাপ্রকার অলৌকিক পদার্থ প্রদর্শন করতঃ সকলকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে এবং তাহারা স্বয়ং ঐ সকল বেদবিধির অনুষ্ঠান করতঃ জনসমাজের প্রবৃত্তি জন্মাইয়াছে এবং রাজা-দিগকে যাগাদিতে প্রবৃত্ত করাইয়া তাহাদিগের নিকট হইতে বিপুল অর্থলাভ করিয়া, স্বীয় স্বীয় পরিজন প্রতিপালন করিয়াছে। তাহাদিগের অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া উত্তরকালীন লোকসকল ঐ সমস্ত বেদোক্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করাতে, বহুকাল অবধি এই প্রথা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। বৃহস্পতি কহিয়াছেন, অগ্নিহোত্র, বেদাধ্যয়ন, দণ্ডধারণ, ভস্মগুণ্ঠন, এই সমস্ত বুদ্ধি পৌরুষহীন ব্যক্তিদিগের উপজীবিকা মাত্র। বেদে লিখিত আছে, পুত্রেষ্টিযাগ করিলে পুত্র জন্মে, কারীরীযাগ করিলে বৃষ্টি হয়, শ্যেনযাগ করিলে শত্রুনাশ হয়। তদনুসারে অনেকেই ঐ সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন, কিন্তু কোন ফলই দৃষ্ট হইতেছে না—এক স্থানে বিধি আছে সূর্য্যোদয় হইলে অগ্নিহোত্র যাগ করিবে, অন্য স্থানে কহিতেছে সূর্য্যোদয়ে হোম করিবেক না, যে ব্যক্তি সূর্য্যোদয়ে হোম করে, তাহার প্রদত্ত আহুতি রাক্ষসের ভোগ্য হয়। এইরূপে বেদে অনেক বাক্যের পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং উন্মত্ত প্রলাপের ন্যায় এক কথার পুনঃ পুনঃ উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়। যখন এই সমস্ত দোষ দেখা যাইতেছে তখন কি প্রকারে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করা যাইতে পারে? অতএব স্বর্গ, অপবর্গ ও পারলৌকিক আত্মা সমস্তই মিথ্যা এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির ব্রহ্মচর্য্যাদির চারি আশ্রমের কর্ত্তব্য কর্ম্মসকল নিষ্ফল। ফলতঃ অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্ম্মসকল অবোধ ও অক্ষম ব্যক্তিদিগের জীবনোপায় মাত্র; ধূর্ত্তেরা কহিয়া থাকে যে, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে যে জীবের ছেদন হইয়া থাকে সে স্বর্গলোকে গমন

করে। যদি ঐ ধূর্ত্তদিগের ইহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকে, তবে তাহারা যজ্ঞেতে আপন আপন পিতা মাতা প্রভৃতির মস্তক ছেদন না করে কেন? তাহা হইলে অনায়াসে পিতা মাতা প্রভৃতির স্বর্গলাভ হইতে পারে এবং তাহাদিগকে আর পিতা মাতার স্বর্গের নিমিত্ত শ্রাদ্ধাদি করিয়া বৃথা কষ্টভোগ করিতে হয় না। আর শ্রাদ্ধ করিলে যদি মৃত ব্যক্তির তৃপ্তি হয়, কোন ব্যক্তি বিদেশে গমন করিলে তাহাকে পাথেয় দিবার প্রয়োজন কি? বাটীতে তাহার উদ্দেশে কোন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেই তাহার তৃপ্তি জন্মিতে পারে। অপিচ এইস্থানে শ্রাদ্ধ করিলে স্বর্গস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি হয়, তবে অঙ্গনে শ্রাদ্ধ করিলে প্রাসাদোপরিস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি না হয় কেন? যাহাতে কিঞ্চিদুচ্চস্থিতের তৃপ্তি না হয় তবে তদ্দ্বারা অত্যুচ্চ স্বর্গস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? অতএব মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে যে সমস্ত প্রেতকৃত্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহা ব্রাহ্মণদিগের উপজীবিকা মাত্র, বস্তুতঃ কোন ফলোপধায়ক নহে।" (সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ—জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন কৃত অনুবাদ)।

সেই সময়ে স্বাধীন চিন্তা কতদূর উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিল তাহা চার্ব্বাক-দর্শন আলোচনা করিলেই বুঝা যায়। তাহার পর বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রচারে সাম্য, মৈত্রী ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব ভারতের সর্ব্বত্র ঘোষিত হইল। তাহার ফলে জ্ঞানোন্নতির পথ সর্ব্বসাধারণের পক্ষে উন্মুক্ত হওয়ায়, সর্ব্বশাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। বিশেষতঃ বৌদ্ধগণ রসায়ন ও চিকিৎসা শাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। একা নাগার্জ্জুনের নাম করিলেই যথেষ্ট হইবে। ইনি সুশ্রুততন্ত্র পরিবর্দ্ধিত ও নূতন আকারে প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে।*

* "History of Hindu Chemistry," Introduction, Vol. I, 2nd. edition, Page XXIV.

বাস্তবিক সুশ্রুতে বৌদ্ধ মতের ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহাতে শবব্যবচ্ছেদের সুন্দর নিয়মাবলী এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত কিছুই গ্রহণ করিবে না, এমন উপদেশ দৃষ্ট হয়। অষ্টাঙ্গ-হৃদয়-প্রণেতা বাগভট ও বৌদ্ধ ছিলেন; পাছে হিন্দুরা তাঁহার মত্ অগ্রাহ্য করেন এই বুঝিয়া এক স্থানে শ্লেষ বা ব্যঙ্গচ্ছলে বলিয়াছেন—

"যদি ঋষি প্রণীত বলিয়াই গ্রন্থবিশেষ শ্রদ্ধেয় হয়, তবে কেবল চরক ও সুশ্রুত অধীত হয় কেন? ভেল প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় তন্ত্র এক প্রকার বর্জ্জিত হইয়াছে কেন? অতএব কেবল গ্রন্থনিবিষ্ট বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সেই গ্রন্থের সারত্ব সম্বন্ধে বিচার করা উচিত।"

পরবর্ত্তী স্থলে আবার বলিতেছেন, "ঔষধের গুণ লইয়াই যখন কথা, ব্রহ্মা স্বয়ং প্রয়োগ করুন বা অপর কেহ প্রয়োগ করুন তাহাতে ক্ষতি নাই।"

মহাত্মা নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক এতদ্দেশে রসায়নী বিদ্যার যে প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। চক্রপাণি বলেন, তিনি যে লৌহ-রসায়ন ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহা নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রথম বিবৃত হইয়াছিল। রসেন্দ্রচিন্তামণিকারের মতে তিনিই রাসায়নিক তির্য্যক্-পাতন প্রক্রিয়ার আবিষ্কর্ত্তা।

প্রাচীন ভারতে কেবল যে দর্শন ও সাহিত্য উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল এমন নহে! আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ, গণিত ও রসায়ন শাস্ত্রেরও বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল। এখন প্রশ্ন হইতেছে, এ সমস্ত বিদ্যা কি প্রকারে লোপ পাইল? কেহ কেহ বলেন মুসলমান আধিপত্যে রাজাগণ শ্রীভ্রষ্ট ও বিধ্বস্ত হওয়াই ইহার প্রধান কারণ, কিন্তু তৎসাময়িক ইতিহাস পাঠে এই যুক্তি সারগর্ভ বলিয়া বোধ হয় না। মুসলমানদিগের আর্য্যাবর্ত্ত জয়ের অনেক পূর্ব্ব হইতেই হিন্দুদিগের এই অনুসন্ধিৎসা বৃত্তির

হ্রাস হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। আর তাহাই যদি হইত, তবে পূর্ব্বোক্ত সমুদয় বিদ্যার আলোচনা দাক্ষিণাত্যে আশ্রয় গ্রহণ করিত। কারণ তথায় মুসলমান আধিপত্য কখনও স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মুসলমানদিগের শাসনকালে বাঙ্গালা দেশে, বিশেষতঃ নবদ্বীপে ও বিক্রমপুরে হিন্দু-শাস্ত্রের যথেষ্ট চর্চ্চা ছিল। এই উভয় স্থানই নবাবের রাজধানীর সন্নিকট ছিল। স্থূলভাবে বলিতে গেলে, উপনিষদ-রচনা কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রৌঢ়াবস্থা পর্য্যন্ত এই সময় মধ্যে, হিন্দুর মস্তিষ্ক চালনা রা মানসিক চিন্তার যাহা যাহা কিছু গৌরব করিবার তাহা সন্নিবেশিত হইয়াছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এই সময় অর্থাৎ খৃষ্ট জন্মের ৬০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে ৭০০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতের জ্ঞানোন্নতি বা স্বাধীন চিন্তার যুগ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এই সময়েই পাণিনি সাহিত্য জগতে অতুলনীয় ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন।

অসামান্যধীশক্তিসম্পন্ন মহাতেজাঃ ঋষিগণ ষড়্‌দর্শন রচনা করেন এবং বুদ্ধদেব "অহিংসা পরমধর্ম্ম" ধ্বজা উত্তোলন করিয়া সাম্য, মৈত্রী এবং সর্ব্বজীবে ভ্রাতৃভাব জগতে ঘোষণা করিয়া, সমগ্র মানব-হৃদয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষার আদর্শ উপস্থিত করেন। আর্য্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত এবং বরাহ মিহির প্রভৃতি মনস্বিগণ জ্যোতিষ ও গণিত শাস্ত্রের উন্নতি ও পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! চিরদিন কখন সমান যায় না। উন্নতি এবং অধোগতির চক্রবৎ পরিবর্ত্তন হইতেছে। বৌদ্ধধর্ম্মের মহত্ত্বের যেরূপ উচ্চ আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহাই কিয়ৎ পরিমাণে উহার অধঃপতনের কারণ বলিয়া বোধ হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দু ধর্ম্ম বা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ এই সময়ে হিন্দু সমাজের উপর আধিপত্য বিস্তারের পূর্ণ মাত্রায় সুযোগ পাইয়াছিলেন। কিন্তু এই ব্রাহ্মণ সেই উপনিষদের ও ষড়্‌দর্শনের প্রণেতা

আর্য্যকুলগৌরব মহাতপা তেজস্বী ব্রাহ্মণ নহেন। তৎপরিবর্ত্তে একদল অযোগ্য স্বার্থপর লোক সমাজে আবির্ভূত হইয়া, পূর্ব্বোক্ত মহাপুরুষগণের পবিত্র নামের দোহাই দিয়া, সমাজের নেতৃত্বভাব গ্রহণ করিয়াছিল এবং স্বকীয় জাতির মহিমা হারাইয়া, কেবল এক গুচ্ছ শ্বেতসূত্র বা যজ্ঞোপবীতের দোহাই দিয়া, সমাজের শাসন বিষয়ক স্মৃতি, পুরাণ ইত্যাদি কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিল। এই সকল গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য কেবল ব্রাহ্মণ জাতির মহিমা কীর্ত্তন অর্থাৎ স্বার্থপর ব্রাহ্মণ-নামধারী প্রভুগণের আধিপত্য বিস্তার ও জীবিকা নির্ব্বাহ।

বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য কুসংস্কারের এক অতি বৃহৎ অধ্যায়। অনুসন্ধান-প্রবৃত্তি একপ্রকার লুপ্তপ্রায় হইল। যাহা কিছু বৈজ্ঞানিক আভাস জাতীয় শিক্ষা ও জ্ঞানের সহিত ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল, যে কিছু প্রাকৃতিক দর্শন ইত্যাদির আলোচনার আভাস সূচিত হইতেছিল, তাহা অত্যল্প কালেই বিনষ্ট হইবার পথে আসিল। এই বিলোপের কারণ শাস্ত্রকারগণের কঠোর আদেশ। মৃতদেহ স্পর্শ করিলে অশৌচ হয়, মনু এই ব্যবস্থা করিয়া বসিলেন, সুতরাং শব-ব্যবচ্ছেদ বিজ্ঞান হইতে তিরোহিত হইল *। কেবল যদি শরীর ব্যবচ্ছেদ নিষেধ করিয়া ক্ষান্ত হইতেন, তাহা হইলেও আমরা আজ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ হইতাম। সমুদ্র-যাত্রা পর্য্যন্ত ধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। হিয়ান্‌সেংএর ভ্রমণ বৃত্তান্তে জানা যায়, তিনি যখন তাম্রলিপ্ত (তম্‌লুক) হইতে সিংহল যাত্রা করেন এবং সিংহল হইতে স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন অনেক ব্রাহ্মণ বণিক তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন। শুধু ইহাই নহে, এক সময়ে হিন্দুদের অর্ণবপোত অগাধ বারিধি অতিক্রম করিয়া বলি ও যাবাদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করে। এই সকল স্থানে ভগ্নাবশেষ

* See "History of Hindu Chemistry", P. 193.

দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি অদ্যাপিও ঐতিহাসিক অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিয়া হিন্দুর পুরাতন কীর্ত্তিকলাপের গাথা যেন নীরব সঙ্গীতে গাহিতেছে। আজ যে ভারতের শিল্প পণ্য বিলোপ প্রাপ্ত হইয়াছে, আজ বিংশ শতাব্দীর স্তরে দাঁড়াইয়াও যে ভারত প্রতীচ্য শিল্প বাণিজ্যের নিকট অবনতমস্তক, অথবা যে ভারতে বাণিজ্য কখনও সূচিত হইয়াছিল কি না তৎসম্বন্ধে সন্দেহ হয়, সেই ভারতই (বৌদ্ধ-সাহিত্য পাঠে জানা যায়) Broach (বরোচ) হইতে Alexandra (আলেকসন্দ্রা) পর্য্যন্ত পণ্যাদি লইয়া যাইতেন। এই বাণিজ্যসংক্রান্ত আদান প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে উপনিষদের বিবৃত মতসকল Neo-Platonistদের নিকট পৌছে। বস্তুতঃ বাণিজ্য দ্বারা সূচিত সম্বন্ধ ক্রমেই জ্ঞান শিক্ষা বিস্তারের হেতু হইয়া থাকে; পরস্পর সংযোগ হওয়াতে কেমন অজ্ঞাতভাবে জাতিগত বৈষম্য ইত্যাদি ক্ষুদ্র প্রবৃত্তি শারদীয় আকাশে মেঘমালার ন্যায় অপসারিত হয়। জ্ঞান জগতেও শিশু-প্রবৃত্তি বর্ত্তমান। উহাই একটু লুক্কায়িত ভাবে ক্রিয়া করে মাত্র। বালক যেমন যাহা দেখিল অমনি শিখিবার জন্য—অন্ততঃ অনুকরণ করিবার জন্য ব্যস্ত হয়, যতক্ষণ না তাহার কৌতূহলনিবৃত্তি হয়, ততক্ষণ যেমন সে পিতামাতার নিকট দৌরাত্ম্য করিতে থাকে, বয়োবৃদ্ধেরাও অল্পাধিক তাহাই করিয়া থাকেন। কোথায় কোন্ জাতির কি ভাল আছে, যেই সেই বিষয় শ্রুতিগোচর হইল, যখনই কোন সত্য আবিষ্কৃত হইল, উহা কাফ্রির দ্বারাই হউক আর চীনের দ্বারাই হউক, সভ্যজগৎ উহার তাৎপর্য্য গ্রহণে ও আয়ত্তীকরণে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। কোথায় কোন্ সুদূর প্রান্তে কোন্ এক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইল, কোথায় এক মহাপুরুষ নূতন ধর্ম্মমত প্রচার করিলেন, অমনি বিদ্যুৎবেগে তাহা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ইউরোপে ইহার জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন

মার্টিন লুথার পোপের পৌরোহিত্য খণ্ডন করিয়া নিজের স্বাধীন চিন্তা-প্রসূত অভিমত Wurtemburgএর গির্জ্জাদ্বারে ঘোষণা করিলেন, তখনই এই সুসমাচার সমগ্র ইউরোপে, এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়া, তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিল। আবার গ্যালিলিও, কোপার্নিকস্ ও নিউটন্ প্রভৃতি যেমন নূতন জ্যোতিষিক তত্ত্ব প্রচার করিলেন, অচিরে উহা সমগ্র ইউরোপের, সমগ্র জগতের সাধারণ সম্পত্তি হইয়া পড়িল।

যাহা হউক, আমাদের শাস্ত্রকারগণ বিদেশ ও সমুদ্রযাত্রা নিষেধ করিয়া ভারতের ভাবী উন্নতির পথ বন্ধ করিলেন। রক্ষণশীলতায়ও যে খানিকটা উপকার আছে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু উহার একটা সীমা আছে যাহা অতিক্রম করিলেই হাস্যাস্পদ হইতে হয়। সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন হইতে নূতনতর ভাব সকল মানব মনে সমাবেশ হয়, তাহা বুঝিতে হইবে। কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, কি আধ্যাত্মিক প্রত্যেক বিভাগেই, অলক্ষ্যভাবে যেন কালের পাখায় ভর করিয়া পরিবর্ত্তন আসিয়া পৌঁছে। তখন অসাড় হইয়া থাকিলে, জগতের সংগ্রামে আহুত হইয়াও নিস্পন্দভাবে অবস্থান করিলে, সে জাতির অধোগতি কি পর্য্যন্ত হইবে তাহা ভাবিলেও আশঙ্কিত হইতে হয়। একটু তলাইয়া দেখিলে উপলব্ধি হয় যে এই হিন্দুরক্ষণশীলতার অভ্যন্তরে একটা অহিতকর প্রবৃত্তি নিহিত আছে। ললিতকলাবিৎ রাস্কিনের একটী কথা এস্থলে বড়ই প্রযোজ্য। তিনি এক সারগর্ভ বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, মানুষের চরম অবনতি তখনই সূচিত হয় যখন তাহার চরিত্র হইতে সম্ভ্রমের ও গুণগ্রাহিতার প্রবৃত্তি তিরোহিত হয়। হিন্দুর যাহা কিছু তাহাই শ্রেষ্ঠ, হিন্দু ভিন্ন সকল জাতি ম্লেচ্ছ ও বর্ব্বর তাহাদের নিকট আমাদের কিছুই শিখিবার নাই, এই প্রকার সংস্কারসকল

যে দিন আমাদের জাতীয় চরিত্রে প্রবল অধিকার স্থাপন করিল, সেই দিন হইতে আমাদের উন্নতির মার্গ কণ্টকিত হইল।* সেই দিন হইতে হিন্দু জাতি কূপমণ্ডুক হইল, অহঙ্কার ও আত্মাদরে স্ফীত হইয়া জগতের শিক্ষা ও জগতের দীক্ষা তৃণজ্ঞান করিয়া অলক্ষিত ভাবে অবনতির গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত হইল। আজ আমরা "হিন্দু" বলিলে কেবল মুষ্টিমেয় কতকগুলি লোকের প্রাধান্য বুঝি মাত্র। এই গণ্ডীর ভিতর ফোঁটা তিলক কাটিয়া শাস্ত্রের ভেল্কী যিনি যত খাটাইবেন, তিনিই তত হিন্দু। সাধারণের নিকট জ্ঞানদ্বার রুদ্ধ। সে চাবি সেই গণ্ডীস্থিত গুটিকতক হিন্দুর হাতে। স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থই বলিয়াছেন :—

"যে ধর্ম্ম গরীবের দুঃখ দেখে না, মানুষকে দেবতা করে না, তা কি আবার ধর্ম্ম? আমাদের কি আর ধর্ম্ম? আমাদের 'ছুৎমার্গ' খালি 'আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না।' হে হরি! যে দেশের বড় বড় মাথা গুলো আজ দু হাজার বৎসর খালি বিচার কচ্ছে, ডান হাতে খাব, কি বাম হাতে খাব, ডান থেকে জল-নেব, কি বাম দিক থেকে, কট্ এট্ ক্রাং ক্রুং বিহি ইত্যাদি যে দেশের মূলমন্ত্র, তাহাদের অধোগতি হবে না ত আর কাদের হবে!"

সমাজ যখন এইপ্রকার হীনাবস্থায় পতিত হয়, তখন পিপীলিকা-শ্রেণীর ন্যায় অনন্ত অকল্যাণকর রীতিনীতি আসিয়া সমাজের হৃদয় ক্ষত বিক্ষত করিতে থাকে। ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যে জর্জ্জরিত বাঙ্গালায় শীঘ্রই তাহার উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষক "বল্লালী কৌলিন্য" আসিয়া জুটিল। শাস্ত্রের

* কিন্তু প্রাচীনকালের হিন্দুরা এ বিষয়ে যথেষ্ট উদারচিত্ত ছিলেন। তাঁহারা ম্লেচ্ছ যবনাচার্য্যদিগের পদতলে বসিয়া শাস্ত্রশিক্ষা করিতে লজ্জাবোধ করিতেন না। বরাহমিহির বলিয়াছেন :—

"ম্লেচ্ছাহি যবনাস্তেষু শাস্ত্রমিদম্ স্থিতম্ ঋষিবত্তেহপি পূজ্যন্তে"—

কঠোর তাড়নায়, জাত্যভিমান কুলমর্য্যাদা ইত্যাদির অসহনীয় কশাঘাতে উন্মত্ত হইয়া বাঙ্গালার বহুসংখ্যক লোক ইস্‌লামধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। অবশ্য কৌলীন্যের প্রতিষ্ঠাতাগণের সংকল্প ভাল হইতে পারে, কিন্তু যে দিন হইতে কুল ব্যক্তিগত গুণগ্রামের পুরস্কার স্বরূপ না হইয়া বংশানুগত হইল সেই দিন বাঙ্গালীর অধঃপতনের চূড়ান্ত হইল। দেবীবর ঘটক আসরে অবতীর্ণ হইলেন। বংশমর্য্যাদা রক্ষার জন্য "কুলজী" প্রভৃতি গভীর গবেষণা পূর্ণ শাস্ত্রের সৃষ্টি হইল। এই প্রকার শৃঙ্খল পরিয়া বাঙ্গালী নবদ্বীপের ব্যবস্থাশাসন দ্বারা নিজের আট ঘাট বাঁধিয়া এমন করিয়া বসিলেন যে, ভাবী উন্নতির আর কোন পন্থা রহিল না। এইপ্রকার কৃত্রিম অনৈসর্গিক বিধান সকল যখন সৃষ্ট হইল, প্রকৃতি দেবী তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘন হেতু ভীষণ প্রতিশোধ লইলেন। কুলমর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য বহুবিবাহরূপ কীট সমাজহৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তিল তিল করিয়া কাটিতে লাগিল। আজ বর্ত্তমান বাঙ্গালা সেই পরিণাম ভোগ করিয়া হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে। কৌলিন্যের সেই বিষময় ফল আজ বাঙ্গালার প্রতি গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া যে সুবৃহৎ বিষতরু সংবর্দ্ধন করিয়াছে, হায়, পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত গৃহস্থ সেই বিষতরুর উৎকট জ্বালাময়ী ছায়ায় দাঁড়াইয়া আজ ত্রাহি ত্রাহি ডাকিতেছে!

এই ভ্রান্ত কৌলিন্য, তৎপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ বিভাগ, উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী, বারেন্দ্র, বঙ্গজ প্রভৃতি সৃষ্ট হইয়া যে দেশের কি ভয়ানক অকল্যাণ সাধন করিয়াছে ও করিতেছে আজ বিংশ শতাব্দীর উন্নত স্তরে দাঁড়াইয়া তাহা পরিষ্কার প্রতীয়মান হইতেছে। আমি তোমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিব না, আমি তোমার অন্ন গ্রহণ করিব না, আমি তোমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইব ইত্যাদিবৎ বৈষম্য যে কি অনিষ্টসাধন করিয়াছে ও করিতেছে তাহা বিজ্ঞ কেন, যে কেহই

অনুমান করিতে পারেন। তোমার ছায়া মাড়াইলে আমাকে নিরয়গামী হইতে হইবে, তোমার স্পৃষ্টজল গ্রহণ করিলে অশৌচ হইবে ইত্যাদিবৎ কুসংস্কার যদি কুসংস্কার বিশেষ হইয়াই ক্ষান্ত হইত, তাহা হইলে হয় ত তেমন ক্ষোভের কারণ হইত না। কিন্তু এই "আমি বড় তুমি ছোট" ইহার ফল কতদূর দাঁড়ায় ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। মনুষ্যহৃদয় সহানুভূতি-বারিতে সিঞ্চিত না হইলে কদাপি এ জগতে কুটীর বাঁধিয়া বাস করিতে পারে না। রোগশয্যায় শায়িত হইয়া কিংবা দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামে নিপীড়িত হইয়া যদি মানুষ একটু করুণার কটাক্ষ, একটু বন্ধুত্বের সুশীতল ছায়া, একটু আত্মীয়তার ভাব, একটু আশার সান্ত্বনা না পায়, পক্ষান্তরে "তুই হীন" "তুই ছোট", "তোকে আমি ছুঁইব না", "তোর প্রতি আমার কর্ত্তব্য কি ?"—ইত্যাদিবৎ কঠোর শ্লেষপূর্ণ ভাব যদি তাহার প্রতি প্রকাশ করা যায়, জানি না ভালবাসা কোথায় কোন্ নিভৃততম প্রদেশে এ সংসার ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। এই ভালবাসা, এই সহানুভূতির অভাবে, যে সকল নিম্ন-শ্রেণীর লোক সমাজের প্রকৃত ভিত্তিস্বরূপ, তাহারা উচ্চশ্রেণীর প্রতি ক্রমেই বিদ্বেষ-ভাব পোষণ করিতে শিখিল ; এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে ভ্রাতৃভাবপূর্ণ মুসলমান ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিল। ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশে ক্ষণিক-সূর্য্যের প্রকাশ যেরূপ মনোরম, এই জাত্যভিমানজর্জ্জরিত অধঃপতিত বঙ্গসমাজে মহাপ্রাণ শ্রীচৈতন্যদেবের সর্ব্বজীবব্যাপী প্রেমের অবতারণা সেইরূপ মনোমুগ্ধকর।

'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ, হরিভক্তিপরায়ণঃ।'—এই মহাবাক্য যদি যথাসময়ে বিঘোষিত না হইত, তাহা হইলে নিম্নশ্রেণীস্থ হিন্দুসমাজে কয়জন লোক বিদ্যমান থাকিত বলিতে পারি না। কিন্তু স্বার্থান্ধ ব্রাহ্মণাদি উচ্চজাতি এই মহান সাম্যভাব উপলব্ধি করিতে পারিল না, জাতিভেদের কঠিন শৃঙ্খলে পূর্ব্বের মতই সমাজকে ব্যথিত করিতে লাগিল।

পক্ষান্তরে যাঁহারা সমাজের নেতা বলিয়া অহঙ্কার করিয়া থাকেন তাঁহারা বৈষম্যের কল্পিত মাত্রাটা গভীরতর রেখায় অঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল ফলিয়াছে। স্বদেশ-প্রেম ও স্বজাতি-প্রেম নামক স্বর্গীয় ভাব তুইটি ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ স্বদেশপ্রেম বলিয়া যে কিছু ভারতবর্ষে কখনও ছিল এমন মনে হয় না, কেন না এই বৈষম্য আজ বহুশত বর্ষ হইতে সমাজ-হৃদয়ের উষ্ণ শোণিত চুষিয়া নিঃশেষ করিতেছে। আপনার ও স্ত্রীপুত্রের জীবিকা সংস্থানই যে জাতির মুখ্য উদ্দেশ্য, যে জাতি প্রতিবেশীর দুঃখ বোঝে না, যে জাতি আপনার গণ্ডীর বহির্ভাগে স্বীয় ভালবাসার আনন্দময় প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, যে জাতির সম্মুখে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ আদর্শ—জিজ্ঞাসু না হইয়া শাস্ত্রোক্ত বচনে আত্মসমর্পণ, সে জাতির হৃদয়ে স্বদেশপ্রেম আসিবে কি প্রকারে? যে দেশের সমাজ হাতে ধরিয়া আশৈশব "তুমি বড়, এ নিকৃষ্ট" ইহাই সযত্নে শেখায়, সে দেশে জাতীয়তার ভাব আসিবে কি প্রকারে? সে দেশ ক্ষুদ্রের প্রাণের আবেগের সহিত আপনার মহৎ প্রাণের উচ্ছ্বাস মিশাইবে কেমন করিয়া?

ধীরে ধীরে কি এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন আসিয়া পৌঁছিল। ইংরাজ-রাজের সমাগমে প্রতীচ্য দেশের এক প্রবল হাওয়া আসিয়া প্রাচ্য জলধি বিচলিত করিল। সেই আবর্ত্তে হাল ধরিতে গিয়া অনেক কর্ণধার ইউরোপীয় সভ্যতার মাদকতায় আপনাদিগের অস্তিত্ব বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সেই আমূল পরিবর্ত্তনের দিনে এক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া বাঙ্গালাদেশ কেন, সমগ্র ভারতকে তুলিয়া ধরিবার প্রয়াস পাইলেন। সেই মহাপুরুষের আবির্ভাব, আমি বলি, পূর্ব্ব মহাদেশের সৌভাগ্যাকাশের সর্ব্বপ্রথম নক্ষত্র।

ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে বাঙ্গালীর এক সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। অল্পসংখ্যক ইংরাজ বণিক স্বীয় বুদ্ধি ও কৌশলবলে যখন বিপুল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিলেন, তখন ঐ সাম্রাজ্য শাসন ও রাজস্ব আদায়ের জন্য দেশীয় কর্ম্মচারীর আবশ্যক হইল। সুচতুর ইংরাজ বুঝিলেন যে, রাজ্য সংস্থাপনের মূলে শাসিত প্রজাবৃন্দের সহানুভূতি লাভ প্রয়োজন। সুতরাং ঝাঁকে ঝাঁকে বাঙ্গালী কর্ম্মচারী দেওয়ানী সংক্রান্ত যাবতীয় কাজে নিযুক্ত হইতে লাগিলেন। কিন্তু বাঙ্গালী এই সুযোগের অপব্যবহার করিল। কোন কোনও স্বার্থান্ধ কর্ম্মচারী এই সুযোগে বিপুল অর্থোপার্জ্জন করিয়া লইলেন বটে, স্বীয় অর্থলিপ্সা নিবৃত্তি করিবার নিমিত্ত পশুবৃত্তির আশ্রয় লইলেন ইহাও সত্য বটে, কিন্তু রাজসরকার বিভাগেই হউক কি সওদাগরি বিভাগেই হউক, কিছুতেই প্রকৃত শিক্ষালাভ করিতে পারিলেন না।

আমাদেরও সর্ব্বনাশের সূচনা সেই দিন হইতে হইল। শিল্প বাণিজ্যের বিপুল বিপ্লব পাশ্চাত্য জগৎকে বিচলিত করিল। বাষ্পীয় শক্তি প্রয়োগের দ্বারা কল চালিত হওয়াতে সাধারণ শ্রমজীবি-দিগের আর্থিক অবস্থার ভীষণ পরিবর্ত্তন আসিয়া উপস্থিত হইল। ইংলণ্ডের এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় শিল্পেও পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। পূর্ব্বে ঢাকা, শান্তিপুর, ফরাসডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানের মিহি সূতার কোটি কোটি টাকার * কাপড় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এজেণ্টগণ বিলাতে পাঠাইতেন ও এই প্রকারে বিলাতের কিয়দংশ অর্থ এদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিত। কিন্তু এই বাষ্পীয় শক্তির আবিষ্কার সে পথ বন্ধ করিয়া দিল—শ্রমজীবিদিগের জীবনে এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। এই পরিবর্ত্তনে অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও শ্রমজীবির

* R. C. Dutt's Statistics.

সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। "দেশের তাঁতি" আর "দেশের জোলা" ইহাদিগকে অন্নাভাবে জাতি-ব্যবসায় ত্যাগ করিতে হইয়াছে সত্য, কিন্তু এই সর্ব্বনাশ স্বাভাবিক বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না—প্রাকৃতিক নিয়মে দুর্ব্বলকে পরাজিত হইতেই হইবে, বলশালীর জয় অবশ্যম্ভাবী।

এই প্রকারে দেশীয় শিল্পের কোমল মূলে সুতীক্ষ্ণ কুঠারাঘাত পড়িল। ভারতীয় শিল্প নির্ম্মূল হইল। বৈদেশিক শিল্প ভারতবর্ষের অভাব মোচনে নিয়োজিত হইতে লাগিল, আর কোটি কোটি টাকা দেশ ছাড়িয়া বৈদেশিক সমৃদ্ধি বর্দ্ধনে ব্যয়িত হইতে লাগিল। ইংলণ্ড হইতে দেখিতে দেখিতে বহুশত ব্যবসায়ী কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরে ব্যবসায়ের কেন্দ্র স্থাপন করিলেন, আর এক দিক হইতে এ দেশজাত কার্পাস, পাট, শস্য প্রভৃতি ইংলণ্ডে চালান করিতে লাগিলেন। আমাদের দুরদৃষ্ট, তাই নিজের কার্পাস অপরের দ্বারা বুনাইয়া শতগুণ মূল্যে কিনিয়া লজ্জা নিবারণ করিতে লাগিলাম। ম্যান্‌চেষ্টার বৈদেশিক লক্ষ্মী আপনার গৃহে আবদ্ধ করিলেন, আর আমরা ভিখারী সাজিয়া রাস্তায় নামিতে বাধ্য হইলাম।

এই সময়ে বাঙ্গালী কেরাণীর সৃষ্টি ইংরাজ বণিক প্রজাপতির কৃপায় আরম্ভ হইল। ইংরাজ বণিক বাঙ্গালীর সহায়তা ভিন্ন ব্যবসায় চালাইতে পারিতেন না; ক্রয় বিক্রয় আদান প্রদান প্রথমতঃ প্রায় সমস্তই বাঙ্গালী কেরাণীর হাত দিয়াই হইত। অনেক নিরক্ষর হৌসের মুৎসুদ্দিরা এই সুযোগে ক্রোড়পতি হইয়া পড়িলেন। কিন্তু অশিক্ষিতের হাতে বিপুল ঐশ্বর্য্যের আগমনে যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিতে লাগিল। ইন্দ্রিয়ের প্রবল প্ররোচনায় ও স্বাচ্ছন্দ্যের বাতাসে বিলাসিতার আগুন দাউ দাউ

করিয়া জ্বলিয়া উঠিল—কর্ম্মক্ষম হইয়াও বাঙ্গালী স্বাধীন ব্যবসার দ্বারা স্বাধীন জীবিকা অর্জ্জন করিতে অক্ষম হইয়া পড়িলেন। ইত্যবসরে গুজরাট, রাজপুতনা (বিকানীর) ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলবাসিগণ ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া সমস্ত ব্যবসা দখল করিতে লাগিলেন, আর বাঙ্গালী ধ্রুবতারার ন্যায় কেরাণীগিরি লক্ষ্য করিয়া ইংরাজী শিখিতে লাগিলেন। সুতরাং উচ্চশিক্ষার অভিমানে জ্বলিয়া পুড়িয়াও ২০৲।২৫৲ টাকার কেরাণী বৃত্তিতেই জীবন যাপন বাঙ্গালী যুবকের চরম পুরস্কার নির্দ্ধারিত হইল। এই প্রকারে ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মীর অনুগামী হইয়া বাঙ্গালী কেরাণী পঞ্জাব হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল, আর কিসে চাকুরী 'বাগাইব', মস্তিষ্কের প্রখরতা উহাতেই ব্যয়িত হইতে লাগিল। বস্তুতঃই উদরের উৎকট চিন্তা বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইয়াছে। সাধারণ সরলতা ও সাহসিকতা পর্য্যন্ত হৃদয় হইতে উৎপাটিত হইয়াছে, এখন বুদ্ধির প্রাখর্য্য ঘৃণিত চাটুকারিতায় ও ততোধিক ঘৃণিত কপটতায় দৃষ্ট হইতেছে। বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি মফঃস্বলে কোন ইংরাজ জজের প্রিয়তমা পত্নীর বিয়োগ হয়। এই নববিবাহিতা পত্নীর বিয়োগ-জনিত নিদারুণ শোক অপনোদন করিবার নিমিত্ত উক্ত জজ মহাশয় প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে মৃত পত্নীর কবর সন্নিহিত হইয়া নির্জ্জনে অশ্রুপাত করিতেন। তদ্দর্শনে একজন সুচতুর উমেদার বুঝিল, এই উপযুক্ত সময় উপস্থিত। সে পরদিবস কিছু অগ্রে যাইয়া ভেউ ভেউ করিয়া কৃত্রিম কান্না কাঁদিতে লাগিল ও সজোরে বক্ষে করাঘাত করত: "মা আমার চলিয়া গিয়াছেন", "আর আমায় কে পালন করিবে" ইত্যাদিবৎ চীৎকার করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, রাজপুরুষ অচিরে এই সহানুভূতির পুরস্কারের ব্যবস্থা করিলেন। বস্তুতঃ চাকুরী যাহাদের উপজীবিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের আত্মসম্মান জ্ঞান আদৌ নাই বলিলেও

অত্যুক্তি হয় না। তখন দাসবৃত্তি গৌরবের বিষয় বলিয়া অনুমিত হয়। এখানে একটী কৌতুকাবহ প্রকৃত ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। হাজারিবাগ অঞ্চলে কোন মুসলমান ভদ্রলোক জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আর্দালীর (orderly) পদপ্রার্থী হন। তাঁহার ৫০০।৬০০ শত টাকা বার্ষিক আয়ের জমাজমি ছিল ও স্বীয় গ্রামে সম্ভ্রান্ত বলিয়া কিছু প্রতিপত্তিও ছিল। লোকে তাঁহার ঈদৃশ আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করাতে তিনি তৎক্ষণাৎ বলিয়াছিলেন, "সরকারী নোকরী, ইস্‌মে ইজ্জৎ বাড়্‌তা হ্যায়।" হায়, যে দেশে আজ ইজ্জতের এই অর্থ, জানি না সে দেশে অপমান কি ?

আর এক দল লোক দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা প্রচলিত হিসাবে ইংরাজী শিক্ষিত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ; কিন্তু অদৃষ্টের দোষ দিয়াই তাঁহারা নিজ নিজ দায়িত্ব ক্ষালন করিয়া থাকেন। এই অর্দ্ধ শতাব্দী ইংরাজী শিক্ষার ফলে দেশে কিছুমাত্র শিল্পবিজ্ঞানের উন্নতি সম্পাদন হইল না, ইহাতেই তাঁহাদের হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়। অবশ্য বলিতেই হইবে এরূপ স্থলে বক্তৃগণ প্রায়ই অন্তঃসারশূন্য, কেন না "হা হতোঽস্মি" করিবার ক্ষমতা বালক এবং স্ত্রীলোকেরও যথেষ্ট বর্ত্তমান। এই শ্রেণীর লোকগণ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার প্রয়াসী নহেন, কেন না উহাতে যথেষ্ট শ্রমের প্রয়োজন। অথচ দেশের কথা কহিতেই হইবে ; কখনও বা সত্য সত্যই তাঁহাদের প্রাণে একটু আধটু লাগে, তাই যেন "স্বদেশ" "স্বদেশের যুবক" ইত্যাদি আশার কথা কহিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট আমার নিবেদন এই যে, শিল্পবিজ্ঞানের উন্নতি এক দিনের কর্ম্ম নহে ; উহাতে আরব্যোপন্যাসে উল্লিখিত আলাদিনের প্রদীপের ন্যায় এমন কিছু ভোজবাজী নাই যে, প্রত্যূষে স্বপ্নময়ী শয্যা-ত্যাগ করিয়া স্বদেশের শিল্পে রাস্তা ঘাট মাঠ থরে বিথরে সজ্জিত

দেখিতে পাইবার কোনও সম্ভাবনা আছে। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান শিল্পের যে সমৃদ্ধি, ইহার বিকাশ যে কি প্রকার ক্রমিক তাহা ভাবিয়া দেখিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায় যে, অর্দ্ধশতাব্দী জাতীয় জীবনের অধ্যায়ে সামান্য পংক্তিমাত্র। প্রায় ৫০০ শত বর্ষ পূর্ব্বে যে শিল্পবাণিজ্যের সূচনা মাত্র হইয়াছিল, আজ তিল তিল করিয়া সেই শিল্পের উন্নতি-সাধন করিয়া ইংলণ্ড তাহারই ফলভোগ করিতেছে। আমরা অদৃষ্টের দোষ দিয়া নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকি, "কি করিয়া হইবে," "কেমন করিয়া হইবে" ইত্যাকার পুরুষত্ববিহীন বাক্যালাপে বহুমূল্য সময় ক্ষেপন করি, কিন্তু পাশ্চাত্যদেশের নিপুণতা, তাহাদের কার্য্যতৎপরতা, তাহাদের একাগ্রতা ও শ্রমশীলতা অর্জ্জন করিবার প্রয়াস একবারও পাই না। এই সব গুণরাশি না থাকিলে যে জগতের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কখনও আপনার স্থান অধিকার করা যায় না তাহা বিস্মৃত হইয়া "সুযোগ পাইলাম না" বলিয়া আলস্যের অঙ্কে আশ্রয় লইয়া থাকি। শুধু ব্যবসায় বাণিজ্যে কেন, জগতের সর্ব্ববিধ ব্যাপারেই একটু সাহস করিয়া ঝাঁপ দিতে না পারিলে উত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। বস্তুতঃ জলে না নামিয়া মৎস্য ধরিবার প্রবৃত্তি ভারতের ন্যায় সুষুপ্ত দেশেই সম্ভব। কিন্তু ইহাই অত্যাশ্চর্য্য যে, এই সুষুপ্তি অধুনা দুর্ভিক্ষের প্রবল সংঘাতে ভাঙ্গা সত্ত্বেও এ ঘুমন্ত অলস জাতিতে আপনার পায়ে দাঁড়াইবার প্রবল ইচ্ছা এখনও জন্মিল না। তন্দ্রা ও আলস্যের সম্মোহন শক্তি এ মৃতপ্রায় জাতির অস্তিত্ব লোপ করিতে বসিয়াছে, বৈদেশিক শক্তির আত্মম্ভরিতাপূর্ণ পদাঘাতে মান, সম্ভ্রম ও ব্যক্তিত্ব বহুকাল ঘুচিয়াছে, কিন্তু জানি না "এ কেমন ঘোর"! যে দেশ শস্যসম্ভার ও ঐশ্বর্য্যে অতুলনীয়, যে দেশের স্বাচ্ছন্দ্য উপমার বিষয়, সেই স্নেহময়ী জননীর আদরের সন্তান আজ কঙ্কালসার হইয়া বৃক্ষপত্রে

ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে বাধ্য, জঠরানলের প্রবল তাড়নায় (হায়, সে মর্ম্মান্তিক দৃশ্য !) জননী নিজে সন্তানের গ্রাস কাড়িয়া খাইয়াছেন ! এই দুর্ভিক্ষের, এই ভীষণ দৈন্যের জন্য দায়ী কে ? আমার মনে হয়, প্রথমতঃ বিশেষ ভাবে আমরা, দ্বিতীয়তঃ বৈদেশিক বাণিজ্য। এই বৈদেশিক বাণিজ্য আমাদেরই অপদার্থতার সুযোগ পাইয়া আমাদিগকে কাঙ্গাল সাজাইয়াছে—ইহাতে বৈদেশিক বণিকের দোষ কি ? কেন বিলাতী পণ্যে বাজার পূর্ণ করিলাম, কেন বিদেশী শিল্পের হাতে আপনার দেহ ঢালিয়া দিলাম। সে ত আমাদেরই দোষ, সে ত আমাদেরই অভিরুচির অবশ্যম্ভাবী ফল। কেন স্বদেশজাত শিল্পের আদর শিখিলাম না, কেন দেশের শিল্পের উন্নতিকল্পে, কল্পনার সুখশয্যা ছাড়িয়া কোমর বাঁধিয়া নামিতে শঙ্কিত হইলাম। আপনার পায়ে আপনি কুঠার মারিয়া প্রতিবেশী অস্ত্রনির্ম্মাতার অপবাদ করিলে কি হইবে ?

আজ সমস্ত ভারতের আমদানী ও রপ্তানি ধরিলে প্রায় ৩৩৪ কোটি টাকা হইবে। এই অন্তঃ ও বহির্বাণিজ্যের কোন ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও কি বাঙ্গালী ব্যবসায়ী বা বণিকের হাত দিয়া যায় ? আমরা পশ্চিম-প্রদেশীয় ভ্রাতাদিগের কার্য্যকুশলতা ও ব্যবসায়-তৎপরতায় হিংসাপরবশ হইয়া, তাঁহাদিগকে অর্দ্ধশিক্ষিত "মেড়ুয়া," "ছাতুখোর" কিংবা ততোধিক কোন প্রীতিকর অভিধানে ঘোষিত করিয়া থাকি, কিন্তু বস্তুতঃ ইঁহারাই আজ বাঙ্গালার ব্যবসায়ী—ইঁহাদেরই নিকট আমাদের শিখিতে হইবে। ব্যবসায় বাণিজ্যে বিদ্যাধ্যায়ীর ন্যায় না শিখিলে কখনও কর্ম্মক্ষেত্রে উন্নতি লাভ কবা যায় না। ইহা এমনই বিষয় যে, হাতে করিয়া না দেখিলে ও না শিখিলে কখনও সম্যক্ উপলব্ধি হয় না। দেশে এক ধুয়া উঠিয়াছে যে চাকুরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্যবসায় আরম্ভ করিতে হইবে। আজ কাল প্রায় সকল যুবকই বলিয়া থাকেন "ভাল চাকরী না পাই দোকান

খুলিব।” ইহা অতি উত্তম চেষ্টা সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার মনে হয়, এ বিষয়ে পাশ্চাত্যদেশের রীতি সুপ্রশস্ত। বাণিজ্য ব্যবসায়েচ্ছু যুবকগণ প্রথমতঃ কোন শিল্পশালা, কি দোকানে শিক্ষানবীশ (apprentice) হইয়া কিছুকাল যাপন করুন। এই সময়ে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও একাগ্রতার সহিত কর্ম্ম করিয়া ব্যবসায় কিংবা শিল্প সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হউন, তৎপরে স্বীয় অর্থেই হউক, কি যুক্তভাণ্ডার খুলিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন। ইহাতে কৃতকার্য্যতা প্রায় এক প্রকার নিশ্চিত হইয়া থাকে। কিন্তু এদেশে নব্যযুবকগণ বহু অর্থ ও চসমা, চুরুট, চা ও চেন লইয়া বাজারে অবতীর্ণ হন। এই সকল যুবক দুগ্ধফেননিভ শয্যায় লালিত পালিত, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধুর, কখনও বা নবপরিণীতা ভার্য্যার স্নেহরসে সিক্ত ও পরিবর্দ্ধিত। এই সুখময় কল্পনার জীবন হইতে সহসা সংসারের কঠিন কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, উহারা চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে থাকে, কৃত্রিম বন্ধু ও ব্যবসায়ীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া শীঘ্রই বাইবেল উক্ত যুবকের ন্যায় (prodigal son) পিতার চরণে উপস্থিত হয়। বস্তুতঃ এতাবৎকালের মধ্যে কতিপয় ভদ্র যুবক ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্পশিক্ষিত কি অশিক্ষিত দোকানদারের প্রতিযোগিতায় তাহাদিগকে দোকানপাট গুটাইতে হইয়াছে। শিক্ষিতের দোকানে ও সাধারণ দোকানে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে।

সাজ সজ্জার চটক, আলো, টেবলক্লথ ইত্যাদির বাহার ছাড়িয়া দিলেও, দোকানের তত্ত্বাবধান সম্যকৃরূপে না হওয়ায় কর্ম্মচারীর উপর বিশ্বাস ন্যস্ত করিয়া, স্বয়ং দোকান পরিত্যাগ করিয়া ময়দানে ক্রিকেট ক্রীড়ায় ব্যস্ত থাকার দরুণই অধিকাংশ যুবক ব্যবসায়ে অকৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। যাহা হউক এক্ষণে আমাদের যুবকগণের বণিক-জীবনের

এই প্রধান কথা কয়েকটি স্মরণ রাখিয়া অবতীর্ণ হইতে হইবে, নচেৎ কৃতকার্য্য হইবার আশা সুদূরপরাহত। *

এই বাণিজ্য-দারিদ্র্যের কথা ভাবিলে সত্যই প্রাণে আঘাত লাগে। বাঙ্গালা দেশে প্রায় ৮২টি পাটের কল কিন্তু ইহার একটিরও মালিক বাঙ্গালী নহে। বাঙ্গালী স্বদেশী হইলেন। কিন্তু এই ভাব সংরক্ষণের জন্য বোম্বাইএর দিকে "হাঁ" করিয়া তাকাইয়া রহিয়াছেন। আজ পঞ্চাশ বৎসর, শত বাধা বিঘ্ন প্রতিযোগিতা অতিক্রম করিয়া বোম্বাই-অধিবাসিগণ কাপড়ের কল স্থাপন করিয়াছেন ও তাহার ফললাভ করিতেছেন। আমাদেরও কি তাহাই কর্ত্তব্য নহে? আজ আমরা এমন অধম হইয়া পড়িয়াছি যে বার্ম্মিংহাম আজ যদি বিরূপ হইয়া বসেন, নিবের অভাবে কালই আমাদের সাধের কলমপেশা ঘুচিবে। এতদিন আমরা ম্যান্‌চেষ্টারের দিকে তাকাইয়া থাকিতাম। ম্যান্‌চেষ্টার আমাদিগকে সাজাইলে সাজিতাম নচেৎ—বস্ত্রহীন, কিন্তু বিধাতার অনুগ্রহে আজ আমরা দেশীয় জিনিষে লজ্জা নিবারণে অনেকটা সমর্থ হইয়া উঠিতেছি। ইহা আশার কথা সন্দেহ নাই। মৃত জাতির প্রাণ আজ যে উৎসাহ-রসে সঞ্জীবিত হইবার সূচনা দেখা যাইতেছে, তাহাতে কাহার হৃদয়

* এই প্রবন্ধটি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে লেখা হয়। তাহার পর এই ১১ বৎসরে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কয়েকজন গ্রাজুয়েট পুরাতন মার্গ ছাড়িয়া ব্যবসা আরম্ভ করিয়া যথেষ্ট কৃতকার্য্যতা দেখাইয়াছেন। বিশেষতঃ বর্ত্তমান যুদ্ধের নানা কুফলের মধ্যে একটা সুফল এই ফলিয়াছে যে বিলাতী মাল বেশী আসিতে না পারায় আমাদের দেশের কল কারখানাগুলি অধিক লাভে জিনিষ বিক্রয় করিতে পারিতেছে। স্বদেশী কারখানার মধ্যে কাপড়ের কল, চর্ম্ম পরিষ্কারের কারখানা, টাটার লৌহ কারখানা, বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের মত রাসায়ণিক কারখানা প্রভৃতি যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং যে সকল জিনিষ পূর্ব্বে এদেশে প্রস্তুত হইত না তাহার মধ্যে কিছু কিছু এক্ষণে এদেশেই প্রস্তুত হইতেছে। ইহা আশা এবং আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই।

পুলকিত না হয়? আজ নূতন দিন আসিয়াছে, পৃথিবীর পুরাতন মুখ মুছিয়া গিয়াছে, নূতন আলো মাখিয়া, নূতন আকাশে আজ নূতন প্রভাকরের আগমন যেন উষার পাখী গাহিয়া গিয়াছে! এই সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার দিন এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ—এই যুগান্তকারী ঘটনানিচয় স্পষ্টই যেন এক নূতন মার্গ পৃথিবীর ঘুমন্ত জাতির নিকট উদ্ঘাটিত করিতেছে।

বাঙ্গালীর শক্তি ও সামর্থ্যের কিরূপ শোচনীয় অপচয় হয় তাহার একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। যাঁহাদের আদালত সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান আছে তাঁহারাই জানেন উকিলগণের কিরূপ দুর্দ্দশা। মকদ্দমার অপেক্ষা উকিলের সংখ্যা অধিক হইয়া পড়িয়াছে—কাজেই অনেক নব্য উকিলের উপার্জ্জন কত তাহা সহজেই অনুমেয়। অথচ, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এখনও আড়াই হাজার গ্রাজুয়েট আইন পড়িতেছে। ইহারা আইন পাশ করিয়া কি উপার্জ্জন করিবে তাহা কি কেহ ভাবিয়া দেখিতেছেন? যে জিনিষের আদৌ কাট্তি নাই—যাহা গুদামে পচিতেছে—তাহাই আবার এত অধিক পরিমাণে তৈয়ার করা কি পাগলামি নয়?

অথচ অপর দিকে দেখ ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতি ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা কত ঐশ্বর্য্য লাভ করিতেছে! শ্রীযুক্ত কেসোরাম পোদ্দার ৬৬৷৷০ লক্ষ টাকার সমরঋণ ক্রয় করিয়াছেন। সেদিন রায় বাহাদুর শিওপ্রসাদ ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা এক লক্ষ টাকার কাপড় বিতরণ করিলেন। বোম্বাইয়ের ধনকুবের সওদাগরগণও নানা সৎকার্য্যে অজস্র দান করেন। তাতা বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ৩০ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। আর কত দৃষ্টান্ত দিব? এই কলিকাতা সহরেই দেখা যাইতেছে ইউরোপীয়ান, মাড়ওয়াড়ী, পার্শি, ভাটিয়া, দিল্লিওয়ালা প্রভৃতি দূর দেশ হইতে আসিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে আর বাঙ্গালী নিশ্চেষ্টভাবে তাহা দাঁড়াইয়া

দেখিতেছে। কলিকাতার অনেক অধিবাসীই ত বাঙ্গালী নহে এবং পেটের জ্বালায় হাহাকার করিতেছে। দশ হাজার ভাটিয়া কলিকাতায় সওদাগরি করিয়া ধনবান হইতেছে আর মসীজীবি বাঙ্গালী আধপেটা খাইয়া কোনমতে বাঁচিয়া আছে।

কিন্তু সর্ব্বদেশব্যাপী শিল্পোন্নতির প্রবল চেষ্টা না থাকিলে কখনও মাতৃভূমির সৌষ্ঠব সম্পন্ন হইতে পারে না। যেমন বোম্বাইএ সেইরূপ বাঙ্গালায়ও দেশবাসী কর্ত্তৃক পরিচালিত কলকারখানার একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এই শিল্পোন্নতির বিষয় বিবেচনা করিতে গেলে একটি প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়—শিল্প শিখিবার ব্যবস্থা কোথায়? জগতের শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে হইলে, পাশ্চাত্য দেশের উন্নত শিল্পশালা সমূহে বহু অর্থ ব্যয় ও ক্লেশ সহ্য করিয়া শিক্ষানবীশ না হইতে পারিলে, উহা কখনও সম্ভবে না। সত্য, বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বৈদেশিক বিদ্যালয় সমূহে শিল্পশিক্ষা, অত্যল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। এ দরিদ্র দেশে সেরূপ ব্যয় বহন শিক্ষার্থীর পক্ষে যথার্থই ক্লেশদায়ক স্বীকার করি। কিন্তু এই বিঘ্ন রাশি সত্ত্বেও অধ্যবসায় ও মস্তিষ্ক চালনা দ্বারা দেশে বসিয়াই শিল্পের আংশিক উন্নতি সাধনে সমর্থ হইতে পারা যায় সন্দেহ নাই। তৎপরে পরিমিত সংখ্যক কর্ম্মঠ যুবকগণকে উক্ত বিষয়সমূহে বিশেষজ্ঞ হইবার জন্য বিদেশে পাঠাইলে শিল্পের উন্নতি সহজসাধ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত যুবকগণ, যাঁহারা যথার্থই কর্ম্মক্ষম হইতে পারিতেন, বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিয়াই তাঁহারা চাকরীর অন্বেষণে ব্যস্ত হইয়া পড়েন, সামান্য ২০।২৫ টাকার মসীব্যবসায়ী হইয়াও অর্দ্ধানশনে স্ত্রী পুত্রাদির সহিত কালযাপন করিতে পারিলে কৃতার্থ হন। বস্তুতঃ এই সকল হতভাগ্য তরুণবয়স্ক যুবকবৃন্দের আজীবনব্যাপী ক্লেশের জন্য সমাজ দায়ী। কিশোর

বয়স অতিক্রম না করিতেই, শিক্ষার ও জ্ঞানোপার্জ্জনের প্রবেশমার্গে উপস্থিত না হইতেই ভাল মন্দ দায়িত্ব ইত্যাদির সম্যক্ উপলব্ধি হইবার পূর্ব্বেই, সমাজ পরিণয়ের কঠোর নিগড়ে বাঁধিয়া, যুবকবৃন্দের ভবিষ্যৎ আকাশ গভীর কৃষ্ণ মেঘরাশিতে আবৃত করিয়া বসেন! আশার ক্ষীণালোক সমুদ্রবক্ষস্থিত আলোক-গৃহের (Light house) ন্যায় সংসার কাননের 'বিহঙ্গ,' তরুণবয়স্ক যুবকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া হৃদয়ে যে মহৎ ভাব সকল শিক্ষার প্রভাবে প্রস্ফুটিত করিতেছিল, যে আলোকমালা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বৃহদায়তন ও সন্নিকটবর্ত্তী হইতেছিল, দারিদ্র্যময় পরিণীত জীবনের বিধ্বংস বাত্যাসংঘাতে হায়, সে আলোক নিবিয়া গেল, সংসারসমুদ্রে দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া হিংসা দ্বেষ, স্বার্থ ও প্রতিযোগিতার প্রবল ঊর্ম্মিমালার তাড়নায়—ততোধিক সমাজের দারুণ ঝঞ্ঝাবাতে যুবকের জীবনতরি ডুবিল! যে দেশের সমাজ, উত্থানপ্রয়াসী যুবকবৃন্দের মস্তকে এইরূপ লগুড়াঘাত করে, সে দেশের যুবক ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া "জীবিকা জীবিকা" করিয়া ছুটিবে, তাহা বিচিত্র কি? সে দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি ব্যাধি হইবে ইহাই ত স্বাভাবিক। তরুণ যুবক যে মুহূর্ত্তে ত্রয়োদশবর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ষণ হইতে বাহির হইল, অমনি হয় আইনের দুয়ারে বটপত্র চর্ব্বণে অথবা ঘৃণ্য কেরাণীগিরিতে নিযুক্ত হইল—সেই দিন বহুশ্রমার্জ্জিত বিদ্যার সমাধি হইল! হায়! যে দেশে অর্থ ক্রিমি-কীট বলিয়া পরিগণিত হইত, যে দেশে নিষ্কাম জ্ঞানার্জ্জনই আজীবনব্যাপী কর্ম্ম ছিল, যে দেশের তপোবনে বিহঙ্গকলকণ্ঠের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচারী শিষ্যবৃন্দের ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তের আবৃত্তির স্বর কাননভূমিকে মুখরিত করিত, সেই দেশেই আজ বিদ্যার্জ্জন মসীবৃত্তি করিয়া জীবিকানির্ব্বাহের উপায় মাত্র! আমরা পাশ্চাত্যদেশীয়দিগকে অর্থোপাসক বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকি, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিব যে, উহা জম্বুকের দ্রাক্ষা

ফলে অনভিরুচির ন্যায়, অথবা দুর্ব্বলের ক্ষমাশীলতার ন্যায় উপহাসের বিষয় মাত্র। বালককাল হইতে যে দেশের যুবক পিতা মাতা গুরুজনের নিকট রৌপ্যখণ্ডের মধুর নিনাদের বার্ত্তা শুনিয়া আইসে, যে দেশের বিবাহ ক্রয় বিক্রয়ের নামান্তর মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যে দেশের ভর্ত্তার ভালবাসা শ্বশুরপ্রদত্ত বিত্তের পরিমাপক স্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, ইহাই যে দেশের সমাজের ছবি—সে দেশের আদর্শ "আধ্যাত্মিক" বলিয়া যদি কোন শাস্ত্রব্যাখ্যাতা পণ্ডিত অথবা সমাজের নেতা বড়াই করেন, জানি না পিশাচবৃত্তি কাহাকে বলে! বাস্তবিক বাঙ্গালীর ন্যায় অর্থোপাসক জাতি আর কুত্রাপি নাই। ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, ফ্রান্স আজ ঐশ্বর্য্য-শালিনী সন্দেহ নাই, বাণিজ্য শত ধারে ঐ সকল দেশে সম্পদরাশি ঢালিতেছে বটে, কিন্তু এই অর্থাগম সত্ত্বেও জ্ঞানস্পৃহার কিঞ্চিৎ মাত্র হ্রাস পরিলক্ষিত হয় না। বস্তুতঃ উহারাই সরস্বতীর প্রকৃত উপাসনা করিতেছেন। অনন্যমনে জ্ঞানান্বেষণই যেন উহাদের অর্থ লাভের হেতু বলিয়া অনুমিত হয়। এই জ্ঞানান্বেষণের ফলে নূতন নূতন তত্ত্ব উদ্ঘাটিত করিয়া, প্রকৃতির শক্তি-সাহায্যে পাশ্চাত্যদেশবাসিগণ পার্থিব জগতে যুগান্তর উপস্থিত করণে সক্ষম হইয়াছেন, আর আমাদের মৃতকল্প স্বাস্থ্যবিহীন যুবকগণ—কেবল একজামিনের পর একজামিন পাশ করিয়া যাইতেছে—বাস্তবিক, একজামিন্ পাশ করিবার নিমিত্ত এমন হাস্যোদ্দীপক উন্মত্ততা পৃথিবীর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। পাশ করিয়া সরস্বতীর নিকট চিরবিদায় গ্রহণ—শিক্ষিতের এরূপ জঘন্য প্রবৃত্তিও আর কোন দেশে নাই। আমরা এদেশে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া জ্ঞানী ও গুণী হইয়াছি বলিয়া আত্মাদরে স্ফীত হই, অপরাপর দেশে সেই সময়েই প্রকৃত জ্ঞানচর্চ্চার কাল আরম্ভ হয়; কারণ সে সকল দেশের লোকের জ্ঞানের প্রতি যথার্থ অনুরাগ আছে;

তাঁহারা একথা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার হইতে বাহির হইয়াই জ্ঞানসমুদ্র মন্থনের প্রশস্ত সময়। আমরা দ্বারকেই গৃহ বলিয়া মনে করিয়াছি, সুতরাং জ্ঞানমন্দিরের দ্বারেই অবস্থান করি, অভ্যন্তরস্থ রত্নরাজি দৃষ্টিগোচর না করিয়াই ক্ষুণ্নমনে প্রত্যাবর্ত্তন করি।

অবশ্য এইরূপ ঘটনার জন্য ছাত্রগণ দায়ী নহে—যে ভ্রমপূর্ণ নিয়মে আমাদের দেশে শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে সেই নিয়মই দায়ী। যে সকল বিষয়ে বালকগণ স্বভাবতঃ অনুরাগ প্রদর্শন করে—যেমন তাহাদের নিজের শরীরের কথা, নিজের গ্রামের কথা প্রভৃতি—সে সকল বিষয়ে তাহাদের কিছুই পড়ান হয় না অথচ এমন সব বিষয় তাহাদের পড়িতে হয় যাহার সহিত তাহাদের কোনও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই—যেমন দূরদেশের ভূগোল ও ইতিহাস। যিনি সাহিত্যের শিক্ষক তিনি কথার প্রতিশব্দ, ব্যাকরণের কচকচি এবং allusion প্রভৃতি দ্বারা ছেলেদের এমনি প্রপীড়িত করিয়া তুলেন যে ছেলেরা ভাবিবার অবসরই পায় না যে সাহিত্যে একটা রস বলিয়া জিনিষ আছে। অনেক স্থলে দেখা যায়, যাঁহার হস্তে গণিত শিক্ষাদানের ভার ন্যস্ত হয় তিনি বোধ হয় ভাবেন গণিত শাস্ত্রের উপর ছেলেদের একটা বিজাতীয় বিভীষিকা জন্মাইয়া দেওয়াই তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য, নহিলে তিনি সাধারণ ছাত্রগণকে অনর্থক জটিল সমস্যা-সমূহ পূরণ করিতে দিয়া তাহাদের জীবন অত্যন্ত দুর্ব্বিসহ করিয়া তুলেন কেন? এইরূপ শিক্ষাদানের ফল যাহা হইবার তাহাই হয়। ছেলেরা যে দিন পরীক্ষাসমুদ্র উত্তীর্ণ হয় সেই দিন হইতেই মা সরস্বতীর নিকট বিদায় গ্রহণ করে। জ্ঞান চর্চ্চার যে কিরূপ অতুলনীয় আনন্দলাভ হইয়া থাকে তাহা ত সে কোনও কালে শিখে নাই।*

* আমাদের শিক্ষা সম্বন্ধে স্থানান্তরে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছি।

স্কুল কলেজে অসার ও নীরস জ্ঞান আহরণের চেষ্টায় যেমন বালক-গণের মস্তিষ্কের অপব্যবহার হয়, তেমনি যুবক ও প্রৌঢ়গণ তাহাদের অবসরকাল বিদ্যানুশীলনে ব্যয় না করিয়া গালগল্প ও নভেল পাঠ দ্বারা নষ্ট করিয়া থাকে। তাহারা বুঝে না একখানা নিকৃষ্ট নভেল পড়িয়া যে টুকু আনন্দ পাওয়া যায় ইতিহাস, জীবন-বৃত্তান্ত বা ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পড়িলে তাহার অপেক্ষা অধিক আনন্দলাভ হয়, অথচ সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট জ্ঞানবৃদ্ধি হয়।

আর কয়েকটী কথা বলিয়া আমি এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, প্রবন্ধের মধ্যে মধ্যে হয় ত আবেগের বশে দুই একটা শক্ত কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। আশা করি পাঠক বিশ্বাস করিবেন, যে সেই সকল কথা আমি বিদ্বেষের বশে লিখি নাই, জাতীয় দারুণ দুরবস্থা জনিত দুঃখই আমাকে ঐরূপ বলাইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় প্রাচীন গৌরবের কথা আমি ভুলি নাই; পূর্ব্বপুরুষ-গণের পবিত্র স্মৃতির প্রতিও আমি কাহাকেও সম্ভ্রমহীন হইতে বলি না। কিন্তু যাঁহারা সেই স্মৃতির প্রতি সম্ভ্রমযুক্ত হইতে গিয়া তাঁহাদিগের ভুলগুলিকেও অলঙ্কার-বিভূষিত করিতে চাহেন—সে গুলির অনুকরণ করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের জন্যই আমার এ প্রবন্ধের অবতারণা।

কুল্লূকভট্ট ও রঘুনন্দনের অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যের প্রশংসা শুনিয়াই যাঁহারা দেশে সেই প্রাচীন টোলের শিক্ষা-প্রণালী সংস্থাপন করিতে চাহেন, নূতনকে একেবারে তাড়াইয়া পুরাতনকে তাহার স্থানে আনিতে চাহেন, তাঁহাদিগের সহিত আমি কখনও একমত হইতে পারি না। নূতন ভারতবর্ষীয় জাতি, নূতন ও পুরাতন উভয়ের সম্মিলনে গঠিত হইবে। অন্ধ বিশ্বাস জাতীয় উন্নতির মূল হইতে পারে না।

প্রাচীন হিন্দু জাতির মহান আদর্শ ভুলিলে আমাদের চলিবে না, কিন্তু সেই সঙ্গে বর্ত্তমান সময়ে উক্ত আদর্শের অনুকরণ কতটা সম্ভব তাহাও আমাদিগকে ভাবিতে হইবে।

জাতিভেদ ও স্মৃতি ও সামাজিক বহু ব্যবস্থার গুণে ভারতবর্ষে যে এক শান্ত, উদ্বেগ বিহীন, প্রতিদ্বন্দ্বিতাবিহীন জীবনযাত্রাপ্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছিল, বৈদেশিক ঐতিহাসিকগণের প্রশংসিত যে সুন্দর পল্লীমণ্ডল-সমূহ সংগঠিত হইয়াছিল—যেরূপ সমাজ সংগঠন পাশ্চাত্য দেশের কাউণ্ট টলষ্টয় প্রভৃতি মনীষিগণের ও সোসিয়ালিষ্টগণের জীবনের চরম স্বপ্ন, ভারতবর্ষীয় যে সমাজশৃঙ্খলার ফলে এখনও হিন্দু জাতির মধ্যে পাপের সংখ্যা অন্য জাতিগণের তুলনায় অনেক কম, ভারতবর্ষের যে প্রাচীন পুণ্য-সমাজের তুলনায় পাশ্চাত্য দেশের দারুণ জীবন সংগ্রামযুক্ত সমাজকে দাবানল বলিয়া বোধ হয়, আমরা যেন সে সকল কথা না ভুলি। কিন্তু তাহার পরেই যে একটা "কিন্তু" আছে আমরা যেন সে "কিন্তু"টাও বাদ না দিই। যত দিন মানুষের স্বাভাবিক দুরাকাঙ্ক্ষা না বিদূরিত হইবে, যতদিন মানুষের মনে তাহার সহচরগণের উপর প্রাধান্য লাভ করিবার ইচ্ছা থাকিবে, যতদিন একজাতি অন্য জাতিকে নিজের স্বার্থের জন্য দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিবে, ততদিনের মধ্যে যে জাতি নিজেদের সমাজকে সোসিয়লিজমএর (socialism) আদর্শে গঠিত করিবে, সে জাতিকে যে শীঘ্রই অন্যের দাসত্বে জীবন কাটাইতে হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থল।

এমার্সন বলেন :—**Universities are, of course, hostile to geniuses; which seeing and using ways of their own discredit routine.**—বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ প্রতিভার বিকাশের সহায়ক নহে—অন্তরায়। ধরাবাঁধা নিয়মের নিগড়ে বদ্ধ থাকিয়া প্রতিভা

বিকশিত হইতে পারে না। বর্ত্তমান যুগের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ সম্বন্ধে এমার্সন যে কথা বলিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় নব্য স্মৃতি ও টোলের শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে সে কথা আরও অনেক বেশী জোরে বলা যাইতে পারে। এমন কি এই শিক্ষা যে জাতীয় প্রতিভা হননের জন্য অত্যুৎকৃষ্ট মুষ্টিযোগের ন্যায় কার্য্য করিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। এখনও গোঁড়া লোকে বলিয়া থাকে, "আমাদের হিন্দুধর্ম্মের কি অপূর্ব্ব মহিমা, প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রত্যেক মুহূর্ত্তের সমস্ত কার্য্যই শাস্ত্র দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে।" এইরূপ অসংখ্য আইন-নিগড়ের ফল যাহা হইবার তাহাই হইয়াছিল। এই শিক্ষার ফলে ভারতবর্ষে মধ্যবিধশক্তিসম্পন্ন লোক উৎপাদনের যেরূপ সুবিধা হইয়াছিল, মহাশক্তিমান পুরুষ জন্মাইবার পক্ষে সেরূপ কার্য্যকরী হয় নাই। কিন্তু জাতীয় উন্নতির জন্য মহাশক্তিশালী পুরুষের—প্রতিভাবান পুরুষের একান্ত প্রয়োজন—"একা সিংহে নাহি পারে অজারসংহতি"।

তাই ফরাসী জাতি যখন বিলাস ও রাজকীয় অত্যাচারের পঙ্কে পড়িয়া ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছিল, তখন রুশোর সাহিত্যিক প্রতিভা তাহাদের মধ্যে নবভাবের প্রচার পূর্ব্বক ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব সৃষ্টি করিয়া স্বজাতিকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিয়াছিল। আবার যখন বৈপ্লবিক সৈন্যগণ রাজপক্ষীয়গণের দ্বারা পুনঃ পুনঃ পর্য্যুদস্ত হইতেছিল তখন ইঞ্জিনিয়র কার্ণো তাঁহার নবব্যূহ রচনা-প্রণালী আবিষ্কার করিয়া বিপক্ষের গতিরোধ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। আবার যখন বিপক্ষগণ ফ্রান্সের বারুদ প্রস্তুত বন্ধ করিবার জন্য বিদেশ হইতে সোরার আমদানী বন্ধ করিল, তখন বৈজ্ঞানিক, গোবর গোমূত্র প্রভৃতি জীব-দেহাবশেষ হইতে, সোরা প্রস্তুত করিয়া ফ্রান্সকে রক্ষা করিলেন।

কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই প্রতিভা ধরাবাঁধা নিয়মের মধ্যে থাকিয়া বিকসিত হইতে পারে না। স্বাধীন চিন্তার অভাবে উহা জন্মিতে পারে না। সাধারণ লোক হইতে বিভিন্ন ভাবে দর্শন করা, চিন্তা করা ও কার্য্য করাই উহার প্রধান লক্ষণ। একজন যে ভাবে চিন্তা করিয়াছে, যে ভাবে কার্য্য করিয়াছে—সে ভাবে কার্য্য করিলে উহার নিজের বিশেষত্ব থাকে কোথায়? প্রতিভার একটি কার্য্য দেখিয়া, উহার একদেশ দেখিয়া, উহাকে বিচার করিলে চলিবে না। উহাকে খণ্ড খণ্ড ভাবে বিচার করা চলে না। উহাকে সমগ্রভাবে দেখিতে হইবে। ইহা ঝঞ্ঝাবাত, স্রোতস্বিনী প্রভৃতির ন্যায় প্রকৃতির এক মহাশক্তি। কয়টা পাখীর বাসা ভাঙ্গিয়াছে, কয়টা লোক মরিয়াছে, কি কয়টা বাগান ভাঙ্গিয়াছে তাহা গণিয়া উহাদের কার্য্যের হিসাব করিলে চলিবে না—সেই সঙ্গে উহারা কত নগরের দূষিত বায়ু বিদূরিত করিয়া, কত জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিয়া, কত জনপদের পানীয় সংস্থান করিয়া—অসংখ্য জীবের জীবন রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহার বিষয়ও ভাবিতে হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অধঃপতন-যুগের ভারতবর্ষ হইতে প্রতিভা বুঝিবার শক্তি অনেকাংশে বিলুপ্ত হইয়াছে; কত শক্তিমান পুরুষকে জীবনের একটা ভুলের জন্য সমাজচ্যুত হইতে হইয়াছে, অনেক সময় বিপক্ষদলেই যোগ দিতে হইয়াছে। শত্রুতার সহায়তায়, একটু পেয়াজের গন্ধ, ভয় বা লোভে পড়িয়া একদিন অখাদ্য ভোজন, কত গৃহস্থের জাতিপাতের কারণ হইয়াছে। বাস্তবিকই হিন্দুগণ যেরূপ কঠোরভাবে সামাজিক নিয়মলঙ্ঘনকারীকে সমাজচ্যুত করিয়াছে তাহা আশ্চর্য্যজনক। হায়, সেকালের নিয়ম কর্ত্তা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ! আপনারা কি চাণক্যপণ্ডিতের মহাবাক্য ভুলিয়া গিয়াছিলেন (সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ) যে আপৎকালে অর্দ্ধেক পরিত্যাগ করিতে হয়! সে কালের দাম্ভিকগণ!

যদি তোমরা কল্পনার চক্ষে দেখিতে পাইতে, যাহাদিগকে তোমরা সামান্য কারণে সমাজচ্যুত করিয়া অশেষ কষ্টে নিপাতিত করিয়াছিলে, তাঁহাদিগের ক্লিষ্ট আত্মা তোমাদিগকে শাপ দিয়াছিল "যেমন আমাদিগকে সামান্য অপরাধে জাতিচ্যুত করিতেছ, তেমনই তোমাদেরই বংশধরগণ রেলে, পুলিসে ও অন্যান্যবিধ দাসত্বে জীবন যাপন করিয়া আমাদিগের অপেক্ষা শত গুণে অধিক পাপী হইয়া তোমাদের কুলে কালি দিবে!" আর বিধাতাও তাহাদের বাক্যে বলিয়াছিলেন, "স্বস্তি"! বাস্তবিকই এই ভীষণ নিয়ম-জাল আর একটা মহা অপকার করিয়াছে। মদ্যপান নিবারণী সভায় "মদ্যপান করিব না" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া লোকে যদি পরে মদ্যপান করিতে আরম্ভ করে, তবে সে শুধু যে মদ্যপানজনিত অপরাধই করে তাহা নহে, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ-জনিত পাপে তাহার চরিত্র আরও বেশী অধোগতি প্রাপ্ত হয়। তাই ঐ সকল নিয়মের ফলে আজকাল বাঙ্গালী সমাজে ভীষণ মিথ্যাচারের প্রবর্ত্তন হইয়াছে এবং এই মিথ্যাচারের দ্বারা কোন জাতিই উন্নতিলাভ করিতে পারে না।

বংশপরম্পরাগত সংস্কার, যাহা আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে তাহা বর্জ্জন করিতে হইলে যথেষ্ট সাহস ও ত্যাগ স্বীকারের আবশ্যক। তুমি যদি সমাজের মতে মত না দিয়া চল তাহা হইলে সমাজ তোমার পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিবে। মধ্যযুগে ইউরোপে যাঁহারা নূতন ধর্ম্মপ্রচার করিতেন তাঁহাদের পোড়াইয়া মারা হইত। কোমল স্বভাবসম্পন্ন হিন্দু অবশ্য সমাজ সংস্কারককে পোড়াইয়া মারে না বটে, কিন্তু বুদ্ধির জোরে নানা কূট উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক তাহাকে যথেষ্ট নিগৃহীত করে। তুমি যদি সমাজের আদেশ অগ্রাহ্য কর (তা সে আদেশ যতই কেন অন্যায় হউক না) তাহা হইলে তোমায় "একঘরে" হইতে হইবে—তোমার ধোপা নাপিত বন্ধ হইবে, তোমার বাড়ী কেহ জলগ্রহণ করিবে না,

তোমার কন্যা কেহ বিবাহ করিবে না ইত্যাদি। কাজেই ফল এই হইয়াছে যে আমরা আর ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করি না, যাহা ধারা-বাহিকভাবে চলিয়া আসিতেছে তাহাই অনুকরণ করি—একবার প্রশ্ন করি না "কেন করিতেছি?" ইহার পর আবার গুরুবাদ আসিয়া সর্ব্বনাশ করিল। গুরু বলিলেন "আমার উপর অচলা আস্থা স্থাপন কর। কোন যুক্তিতর্ক বা প্রশ্ন করিও না। তাহা হইলেই উদ্ধার হইবে, মুক্তিলাভ করিবে।" গুরু তোমার চোখ বাঁধিয়া গলায় রজ্জু দিয়া টানিয়া লইয়া যাইবেন, তুমি তাহাতে কোন আপত্তি করিতে পারিবে না। একজন মানুষকে অভ্রান্ত মনে করিয়া তাহার আজ্ঞা পালনে নিজের যুক্তি বিবেচনা বিসর্জ্জন দিলে, আমাদের কার্য্যসমূহ যে যুক্তিহীনতার সহিত সম্পাদিত হইবে এবং তদ্দ্বারা সমাজের অবনতি সংসাধিত হইবে সে বিষয়ে আর বিচিত্রতা কি আছে?

হিন্দুগণ! তোমরা যে সকল কঠোর নিয়ম পুনরায় সমাজে প্রবর্ত্তনের অভিলাষী হইয়াছ, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, সে নিয়ম সকল যদি তোমাদের পূর্ব্ব-গৌরবের দিনে প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে তোমাদের কিরূপ অবস্থা হইত? ভাব দেখি, যদি সত্যবতী নন্দন ব্যাসদেব ও তৎপুত্র মহাভাগবত শুকদেব গোস্বামীকে ধীবর কুলেই কালযাপন করিতে হইত, যদি চণ্ডালরাজ গুহকের মিত্র চণ্ডালআলিঙ্গন-কারী রঘুকুলপতি রামচন্দ্রকে জাতিচ্যুত হইয়া চণ্ডাল বংশেই বাস করিতে হইত, যদি গোপগৃহপালিত গোপান্নভোজী শ্রীকৃষ্ণকেও জাতিচ্যুত অবস্থায় থাকিতে হইত, তবে তোমরা হিন্দুধর্ম্মের গৌরব করিতে কি লইয়া?

এককালে ভারতবর্ষের উন্নতি হইয়াছিল—স্বাধীনচিন্তা ও স্বাধীন আচারের দ্বারা। আবার যদি ভারতের উন্নতি হয়, তবে তাহাও স্বাধীনচিন্তা ও স্বাধীন আচারের অনুষ্ঠান দ্বারাই হইবে। ভাবের দাসত্ব

ও শারীরিক দাসত্ব উভয়ই জাতীয় উন্নতির সমান অন্তরায়। যাঁহারা এদেশের মনের উপর ইংরাজী ভাবের দাসত্ব আনিতে চাহেন বা যাঁহারা এদেশের মনের উপর সংস্কৃত ভাবের দাসত্ব আনিতে চাহেন, তাঁহারা উভয়েই ভ্রান্ত। হারবার্ট স্পেনসার বা শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন বলিয়াই কোন কথা মানিয়া লইতে হইবে তাহা নহে। নিজের যুক্তি ও বিচারের দ্বারা উহার যাথার্থ্য প্রমাণিত হইলেই তবে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই স্বাধীনচিন্তার মূল সূত্র। ভারতবর্ষে পুনরায় স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন আচার প্রবর্ত্তিত হউক। উহা মাঝে মাঝে ডোবার পঙ্কিল দুর্গন্ধ জল আনিয়া দেয় বটে, কিন্তু মন্দাকিনীর পূত বারিধারাও উহা হইতেই আসিবে,—আর কিছু হইতে নহে।

এই দীর্ঘ প্রবন্ধে নিম্নলিখিত কথা কয়টি স্পষ্ট করিবার প্রয়াস পাইয়াছি, সে বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। মস্তিষ্কের প্রাখর্য্যে বাঙ্গালী জাতি পৃথিবীর আর কোনও জাতির অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। দুর্ভাগ্যক্রমে, যে পথে এই শক্তি নিয়োজিত করিলে নানা সুফল প্রসব করিত সে পথে ইহার নিয়োগ হয় নাই। তাই জগতের সমক্ষে বাঙ্গালী জাতির কীর্ত্তি নিদর্শন স্বরূপ দেখাইবার অতি অল্প বিষয়ই আছে। মুসলমান শাসনকালে এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তি ন্যায়ের নিস্ফল কূটতর্কে ও স্মৃতির জটিল ও স্থানে স্থানে হাস্যোদ্দীপক বিধি ব্যবস্থা প্রণয়নে ও প্রচলনে ব্যয়িত হইয়াছিল, সত্যানুসন্ধানে ব্যবহৃত হয় নাই। আবার ইংরাজি শাসনকালে, কেরাণীর লেখনীচালনে এবং উকিলের অনাবশ্যক বাকবিতণ্ডায় এই দুর্লভ শক্তি নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে। কিন্তু আশা করি, কুসংস্কারাচ্ছন্ন পথভ্রান্ত বঙ্গদেশে স্বাধীনচিন্তার ও সত্যানুরাগের নির্ম্মল স্রোত আসিয়াছে, বঙ্গীয় যুবক জাগ্রত হইতেছে। জঘন্য দাসত্বের পরিবর্ত্তে কোন কোন কর্ম্মকুশল যুবক ব্যবসা ও বাণিজ্যে ধনাগমের

পথ প্রদর্শন করিবে, কল কারখানা স্থাপন করিবে এবং কোনও কোনও তীক্ষ্ণবুদ্ধি যুবক ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিবে। অচিরে বাঙ্গালী জাতি জগতের উন্নত জাতিসমূহের স্থান অধিকার করিয়া বিধাতার মঙ্গলময় আদেশ প্রতিপালন করিবে।

"Indian Business" নামক পত্রিকায় সম্প্রতি যে একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার চুম্বক নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

"একজন পাকা ব্যবসাদারকে শিক্ষিত লোক বলিতে হইবে। সম্ভবতঃ, তিনি সাহিত্যের নামজাদা পুস্তক সম্বন্ধে বা দর্শন শাস্ত্রের কূট-তর্ক সম্বন্ধে কিছুই জানেন না কিন্তু তাঁহার 'সহজ বুদ্ধি' (common sense) আছে সেই বুদ্ধিই বাস্তবিক আসল কার্য্যকরী ন্যায়শাস্ত্রের জ্ঞান। তিনি হিসাব বুঝেন। তিনি যাহাকে হিসাব বলেন তাহাই হইতেছে গণিত-শাস্ত্র। তাঁহার যেটুকু বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আছে তাহাতে দেখা যায় তিনি রসায়ন বিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধে অনেক কথা বুঝেন। তিনি সামান্যভাবে বলেন তাঁহার পাঁচটা বিষয় জানাশুনা আছে, আমরা কিন্তু দেখি নানা লোক ও নানা বিষয় সম্বন্ধে, কৃষি, বাণিজ্য এবং সমাজ সম্বন্ধে তাঁহার কেজো ধরণের বিস্তৃত জ্ঞান আছে। তাঁহাকে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে তাঁহার নিজের দরকারী বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার যেরূপ গভীর, পূর্ণ এবং বিস্তৃত জ্ঞান আছে একজন সাধারণ বি-এ বা এম-এর তাহা নাই। তবে প্রভেদ এই যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিধারীগণ যেমন নামের পিছনে বি-এ প্রভৃতি কতকগুলি বর্ণ যোজনা করিয়া নিজের বিদ্যা জাহির করেন, ব্যবসাদার তাহা না করিয়া নিজের কার্য্য সিদ্ধির জন্য নীরবে বিদ্যার ব্যবহার করেন। সেই জন্য লোকে অনেক ব্যবসাদারকে অশিক্ষিত বলিয়া থাকে।"

"কলেজের শিক্ষাকে নিন্দা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু আমি বলিতে চাই যে সওদাগর ও কারখানাওয়ালাগণ মূর্খ নহেন এবং তাঁহারা যে কেবল অদৃষ্টের জোরে বা অসদুপায়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন এ কথাও ঠিক নয়। একজন কৃতী ব্যবসাদার হইতে হইলে অনেক জ্ঞান, গভীর চিন্তা ও পরিশ্রমের আবশ্যক। আর এক কথা; যদি কাহারও পরে বিজ্ঞান বা সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণা করিবার ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে উচ্চ কলেজী শিক্ষা গ্রহণ কেবল সময়ের অপব্যবহার মাত্র। যদি জীবিকা উপার্জ্জনের জন্যই কাজ করিতে হয়, তাহা হইলে নিজের কাজের সঙ্গে যাহার সম্পর্ক নাই এমন জিনিষ শিখিবার প্রয়োজন নাই।"

"বহুকাল হইতে লোকে বলিয়া আসিতেছে যে কলেজী শিক্ষা পাইলে প্রণালীবদ্ধ ভাবে চিন্তা করা যায়। আমি বলি রীতিমত ব্যবসা শিক্ষা করিলেও সেই ফল লাভ হয়, উপরন্তু ইহাতে এমন সব জিনিষ শিক্ষা করা হয় যাহা প্রতিদিন কাজে লাগে। ব্যবসাদারের পক্ষে বিজ্ঞান জানা আবশ্যক, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও অনেক যে সব বে-দরকারী জিনিষ শিখান হয় তাহার কোনও প্রয়োজন নাই। যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন সব জিনিষ শিখান হয় যাহার ফলে লোকে জীবনসংগ্রামে যোগ্যতা দেখাইতে পারে তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয় মানবজাতির যথার্থ উপকার করিবে এবং দেশের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির সহায়তা করিবে। আজকাল কিন্তু দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যাঁহারা বাহির হন তাঁহাদের মস্তিষ্ক ব্যাকরণ ও অন্যান্য শাস্ত্রের নানা বে-দরকারী বিষয়ে একেবারে বোঝাই হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের বিদ্যার যথেষ্ট ভড়ং থাকে বটে এবং তাঁহাদের কথাবার্ত্তার খুব জলুসও থাকে, কিন্তু নিজের বা পরিবারের সম্যক্ ভরণ পোষণে তাঁহারা একেবারেই অক্ষম। এই নিয়মের ব্যতিক্রম অতি অল্পই দেখা যায়।"

২

অন্নসমস্যা

বাংলাদেশে কোন শিল্প-প্রদর্শনীর কথা শুন্‌লেই বুকের ভিতর কেঁপে ওঠে। আমাদের শিল্পই নাই তার আবার প্রদর্শনী! বঙ্গশিল্পের প্রদর্শন আর বাংলার বিষাদকাহিনীর এক অধ্যায় উন্মোচন, একই কথা। একদিন ছিল, যখন বাংলার সূক্ষ্ম শিল্প সুদূর ভিনিস্‌ নগরের বাণিজ্যকেন্দ্রে আদৃত হ'ত। কিন্তু এখন প্রদর্শনীর আসরে নেমে অন্য সভ্য জাতির তুলনায় আমরা কি দেখাব? এ ত বেদ বেদান্ত উপনিষদ্‌ নয়, এ যে স্থূল-জড়জগতের কথা। প্রদর্শনীতে আমাদের জীবনধারণের উপযোগী নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু যা আমরা আপন হাতে প্রস্তুত করতে পারি— তারই একত্র সমাবেশ কর্‌তে হয়। এখানে কৃতিত্বের পরিচয় দিতে এসে আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝ্‌তে পারি জীবনসংগ্রামে ক্রমাগত পরাজিত হয়ে বাঙালী দুর্দ্দশার কোন্‌ আবর্ত্তে আজ ঘুরপাক খাচ্ছে। বিদেশ থেকে বস্ত্রের আমদানী না হলে আমাদের লজ্জা নিবারণ হয় না, দিয়াশালাই না এলে আমাদের সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলে না। ষ্টীম এঞ্জিন থেকে সূচ সূতা পর্য্যন্ত সকল রকম জিনিষের জন্য আমরা পর-প্রত্যাশী। উঠ্‌তে বস্‌তে খেতে শুতে এমন পরবশ আর কোন জাতি আছে কিনা জানি না। যুদ্ধের সময় আমদানি বন্ধ হল; জার্ম্মাণী, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ থেকে জিনিষপত্র নিয়মিতরূপে না আসায় বিদেশী প্রতিযোগিতা অনেকটা কমে গেল। কিন্তু আমরা এমনই অক্ষম যে সে-সুবিধার কোন ব্যবহারই

করতে পারলাম না। অথচ এদিকে রুচি আমাদের বড় সুমার্জ্জিত! অভাবের দিন হলেও দেশী কারখানা থেকে ভাঁড়ে ওষুধ দিলে আমরা তা স্পর্শ করব না, সলিতা পাকিয়ে দেরকোর উপর রেড়ির তেলের প্রদীপ রেখে পড়তে বসব না। তাই জাপান ফট্‌ফটে চিম্‌নি আর শিশি বোতল জুগিয়ে আমাদের রুচির মান রক্ষা ক'রে লাখ্ লাখ্ টাকা নিয়ে গেল। গত মহাসমরে ইউরোপ যখন নিজের ঘর সাম্‌লাতে ব্যস্ত সেই সুযোগে জাপান পূর্ব্বাপেক্ষা দশ গুণ বেশী জিনিষ ভারতবর্ষে পাঠিয়েছে। এই সব কারণে বলি প্রদর্শনী দেখতে মন উঠে না—আনন্দ হয় না। কিন্তু তবু প্রদর্শনী হওয়া চাই, কারণ তা হলে জানতে পারব রোগ কি এবং তা দেহযন্ত্রের কোন্ স্থান পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়েছে। প্রদর্শনীর আয়োজন করলে এই রোগ কতকটা ধরা পড়বে। তখন ঔষধের ব্যবস্থার কথা ভাববার অবসর হবে।

যুবকবৃন্দ দেশের ভবিষ্যৎ আশাস্থল। তাঁদের ভেবে দেখতে বলি—আমরা আজ দাঁড়িয়েছি কোথায়, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ আজ কি অবস্থায়! শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ; কিন্তু দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে সেই মেরুদণ্ড আজ ভেঙ্গে যাচ্ছে। এর শোচনীয় পরিণাম যে কি তা মনে হলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়! উপার্জ্জনক্ষম মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মাসিক আয় গড়ে ২৫৲ হ'তে ৩০৲ টাকা, কেউ বলেন ৩০৲ হ'তে ৩৫৲ টাকা। কিন্তু তাঁর পোষ্য অন্ততঃ পক্ষে পাঁচটি—স্ত্রী পুত্র আছে, কোথাও বিধবা ভগ্নী এবং তাঁর ছেলেপুলে আছে। সুতরাং এই স্বল্প আয়ে তাঁদের দুর্দ্দশার সীমা নেই। চালের মণ আজ ১০৲। ১২৲ টাকা, তেলের সের ১৲ টাকা, আর ঘি ত জোটেই না। আমরা রাসায়নিক, বাজার চলন ঘির উপাদান যে কি তা আমাদের জানতে বাকী নেই, কিন্তু সে কথা আর নূতন করে বলতে চাই না। আর মাছ, দুধ, বাঙালীর

শরীরপুষ্টির যা প্রধান উপাদান, তা কয়েক বছর পরে দেশে আর পাওয়া যাবে না এমন লক্ষণ দেখা দিয়েছে। খাদ্যদ্রব্য ত এই প্রকার দুর্ম্মূল্য, তার সঙ্গে এই অল্প আয়ের মধ্যে আবার কাপড় জামা জুতা লোকলৌকিকতা এবং ভদ্রয়ানার আর পাঁচরকম উপকরণ আছে, তার উপর যখন পুত্রের উচ্চশিক্ষা ও কন্যার বিবাহের কথা এসে পড়ে তখন বুঝতে পারা যায় আমরা দুর্দ্দশার কোন স্তরে নেমে গেছি। আমাদের পেট ভ'রে খাওয়া হয় না, বাড়ীতেও না, বাহিরেও না। কল্‌কাতা বা মফঃস্বলের কলেজ-মেসে ঘর ভাড়া বাদ ন্যূনকল্পে ১৫৲ টাকা খরচ পড়ে, তা'তে ডাল ভাত আর একটি তরকারী ছাড়া অন্য কিছুর বন্দোবস্ত হয় না। একজন ছাত্রের মোট খরচ ৩৫।৪০ টাকার কমে হয় না। এইরূপে শাকান্ন আহারের ফলে শরীর নিস্তেজ হয়ে গেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সাংঘাতিক ব্যাধি বুকের উপর পাথর হয়ে চেপে বসে। সার শঙ্করন্ নায়ার বলেছেন, গত কয়েক মাসে ভারতবর্ষে ইনফ্লুয়েঞ্জা ৬০ লক্ষ লোককে গ্রাস করেছে। সমগ্র ভারতে প্রতিবর্ষে ১২ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর কাছে বলি হয়। এ সকলের মূলে দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা। ডাঃ বেণ্ট্‌লি বলেন, ম্যালেরিয়া গরীবের রোগ। অনেকদিন ধরে পুষ্টিকর আহারের অভাবে লোক বারবার এই রোগে আক্রান্ত হয়। কল্‌কাতায় যক্ষ্মা রোগ বেড়ে চলেছে। শিশু যতগুলি জন্মায় তার এক তৃতীয়াংশ এক বৎসর বয়স হবার আগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। গত পাঁচ বৎসরে কল্‌কাতায় বাড়ীভাড়া শতকরা ২০০৲ বেড়েছে। এদিকে সাধারণ গৃহস্থের আয় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ। কাজেই এঁদো গলিতে অন্ধকার বাড়ী ভাড়া করে থাকতে হয়; সেঁতসেতে মেজে, অষ্ট প্রহর দরজা বন্ধ পাছে আবরু নষ্ট হয় বা ছেলে গাড়ী চাপা পড়ে। বাতাস রৌদ্র ও আলোক, যা গরীবের প্রতি বিধাতার দান, কল্‌কাতায়

কতজন বাঙ্গালীর ভাগ্যে তা জোটে? এ "যজ্জীবনং তন্মরণম, মরণং সোঽস্য বিশ্রামঃ" মরণ হলেই বিশ্রাম। শিশুকে চাম্‌চেয় করে মেলিন্‌স ফুড খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখা হয়। এরাই ত ভবিষ্যতে বংশবৃদ্ধি করে। কাজেই জাতটা যে ক্রমে স্বাস্থ্যহীন হয়ে পড়ছে তা আর বিচিত্র কি! আমাদের পিতৃপিতামহ ৭০।৮০ বৎসর বেঁচে থাক্‌তেন। এখন আমরা? ইংরেজের আয়ু গড়ে ৪৬ বৎসর, আমাদের মাত্র ২৩। দারিদ্র্য ও মহামারী আমাদের বুকের রক্ত শুষে বার করে নিচ্ছে! এদের তাড়াবে কে?

বিপদ যখন একেবারে সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে; জীবনসংগ্রাম যখন ভয়ঙ্কর কঠিন হয়ে উঠ্‌ছে, চারিদিকে সমস্যাগুলি যখন জটিল থেকে জটিল-তর হয়ে আস্‌ছে, তখন আমরা কি করছি? প্রায় নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে আছি। আমরা ভাবি না, বুঝবার চেষ্টা করি না। উপায় নির্দ্দেশ হলেও কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হবার উৎসাহ বা সাহস আমাদের থাকে না। আমরা সার বুঝেছি চাকরী করা, আর আমাদের ছেলেদের লক্ষ্য হয়েছে এম-এ এম-এস্‌সি পাশ করা, অথবা উকীল হওয়া। এখন একজন গ্রাজুয়েটের বাজার দর কত? এম্‌-এ বা এম্‌-এস্‌সি বড় জোর ১০০৲ পেতে পারেন, বি-এ বি-এস্‌সি ৪০৲ থেকে ৫০৲ টাকা। কিন্তু এর সঙ্গে বিবেচনা কর্‌তে হবে যে একটি পদ খালি হলে তার জন্যে পাঁচশ দর্‌খাস্ত পড়ে। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত হয় যে গড়ে গ্রাজুয়েটের বিশেষ কোন সুবিধা পাবার জো নেই। পাঁচ বৎসর বয়স থেকে A. B. C. D. আরম্ভ করে ২২।২৩ বৎসর পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়া ও নানারোগের অত্যাচারে উৎ-পীড়িত হতে হতে ভগ্নস্বাস্থ্য বাঙালী যুবক যখন স্কুল কলেজ পার হয়ে ডিগ্রী নিয়ে সংসারের সম্মুখে এসে দাঁড়ান তখন দেখেন তাঁর পুঁথিগত বিদ্যা জীবন-সংগ্রামে কোথাও তাঁকে বিশেষ কোন সাহায্য করবে না।

এ কি ভীষণ সমস্যা! আবার যিনি গ্রাজুয়েট্ হয়েছেন তিনি ভাবেন আইন পড়্‌তে না গেলে মহা অপরাধ হবে, আর জিজ্ঞাসা কর্‌লে বল্‌বেন "পাশটা করে রাখি।" আজকাল জেলার সদরে বা মহকুমায় উকিলরা কি রোজ্‌গার করেন, তাঁদের কজন অন্ন পান এবং কজন গাছতলায় কেরোসিনের বাক্সের উপর বসে দিন কাটান এরূপ কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর্‌লে বিজ্ঞ ব্যক্তি উত্তরটা কানে-কানে দেবেন—কারণ সেটা সাধারণের বড় প্রীতিকর হবে না। স্যর্ আশুতোষ প্রতিভাশালী পণ্ডিত, শিক্ষা বিস্তারের জন্য অনেক করেছেন—এ সবই স্বীকার করি। কিন্তু আইন কলেজ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আমার বনল না। আমায় যদি কেউ একদিনের জন্যও কল্‌কাতার সর্ব্বময় কর্ত্তা (Dictator) করে, তবে "ল-কলেজ"টাকে আমি আগে ভূমিসাৎ করি; অন্ততঃ দশবছরের জন্যে আইন পড়া উঠিয়ে দিই। কারণ তা হলে উপোষী উকীলদের অন্ন হ'তে পারে। আর ব্যাধির শেষ কি এইখানে? এদেশের ছাত্র বি-এল্ পার্শ করে ভাবেন এম্-এল্ হবেন। যেন বিধাতা তাঁদের সৃষ্টি করেছেন শরীর ও স্বাস্থ্য নষ্ট ক'রে পরীক্ষা পাশ কর্‌তে এবং যম-সদনে যেতে।

৬০।৭০ বৎসর আগে কল্‌কাতার হৌসের বাঙ্গালী মুৎসুদ্দী ছিলেন। উদাহরণ-স্বরূপ ললিতমোহন দাস, গোরাচাঁদ দত্ত, প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। তাঁরা মাসে আট দশহাজার টাকা উপার্জ্জন কর্‌তেন অর্থাৎ এখনকার প্রায় বিশহাজার টাকা। কিন্তু আজকাল সে-সব উপন্যাসের কথা হয়ে গেছে! ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কল্‌কাতায় প্রথম কার্‌বার করেন বাঙ্গালীর সঙ্গে! বাংলার শিল্পজাত দ্রব্য তাঁরা বাঙ্গালীর নিকট কিন্‌তেন। তখন ব্যবসা ছিল বাঙ্গালীর হাতে। এমন কি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বাঙ্গালীর সাহায্য ব্যতীত ইউরোপীয়

সওদাগরগণ তাঁদের কার্য্যসিদ্ধি করতে পারতেন না। এই জন্যই রামদুলাল দে, মতিলাল শীল প্রভৃতি ক্রোড়পতি হয়েছিলেন! কিন্তু এখন ব্যবসার ক্ষেত্র থেকে বাঙ্গালী হটেছে, বিতাড়িত হয়েছে। বর্ত্তমানে কল্‌কাতার জনসংখ্যা যত তার একতৃতীয়াংশ বাঙালী, অথচ কল্‌কাতা বাংলার প্রধান সহর। এই সহরে যেসব অ-বাঙালী স্থানে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টাকার কার্‌বার হয় সেখানে বাঙালীকে ক্বচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার! ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়! এদেশে ইংরেজী শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল—সহজে চাকুরী জুটবে। পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে বাঙালী যে পরিমাণে ইংরেজী শিক্ষায় অগ্রসর হতে লাগল চাকরীর মোহ তার সেই পরিমাণে বেড়ে গেল। তারপর যখন ডেপুটি-কালেক্টরী মুন্সেফী প্রভৃতি পদের সৃষ্টি হল এবং গবর্ণমেণ্ট আফিসে অল্পাধিক বেতনের কেরানীগিরির দ্বার উন্মুক্ত হল তখন দশ পনের বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার এক চরম উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াল শীঘ্র শীঘ্র পাশ করে এইরূপ একটা পদ লাভ করা। ক্রমে ইংরেজীনবীশ বঙ্গযুবকেরা কেরানী, উকীল, মাষ্টার ডাক্তার হয়ে উত্তর ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ল, মনে ভাবলে এই নূতন শিক্ষা দীক্ষা ও সাহেবিয়ানার চক্‌চকানি নিয়ে তারা না জানি কোন্ দিগ্বিজয়ে বাহির হয়েছে! কিন্তু কেউ তখন বুঝলে না যে বিপদের মেঘ ঘনীভূত হয়ে উঠছে। এদিকে অবসর বুঝে তখন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ বিশেষতঃ মাড়বার থেকে একদল লোক "লোটাকম্বল" মাত্র সম্বল করে কল্‌কাতায় এসে আপন পুরুষকারের বলে, অক্লান্ত চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের সহায়তায় বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য হস্তগত করে নিলে। বাঙালীর মুখে তখন ইংরেজি বুলি আর অন্তরে মাড়োয়ারির প্রতি ঘৃণা,—তারা অসভ্য ছাতুখোর! কিন্তু ইংরেজিশিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী বা ছাপ এ

ক্ষেত্রে বাঙালীকে রক্ষা করতে পার্‌লে না। বাঙালী হটে গেল; ব্যবসা গেল, বাণিজ্য গেল, হৌস্‌ গেল; তারপর চাক্‌রীও আর মেলে না। প্রয়োজনের সঙ্গে আয়োজনের সামঞ্জস্য রইল না—পাশ করা ছেলের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল, কিন্তু সে পরিমাণে অজস্র চাক্‌রী সৃষ্টি হল না। তাই বাঙালী এখন দরিদ্র, রোগগ্রস্ত; মধ্যবিত্তের আজ অন্নসমস্যা, অস্তিত্ব-সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু মোহ ঘুচেছে কি? বাঙালীযুবকের বুদ্ধি, কল্পনা ও কর্ম্মশক্তি আজ এমনই আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে যে কেরাণীগিরি, মাষ্টারী বা ওকালতী ছাড়া দুনিয়ায় যে অন্য পথ আছে এ কথা সে ভাবতে পারে না, ভাবতে গেলে অনিশ্চিতের আশঙ্কায় সে অতিমাত্র ভীত হয়ে উঠে। তাই তারা আজও কলেজে পড়ছে আর পাশই করছে।

শিক্ষা সকলেরই চাই। ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মেনী, জাপান প্রভৃতি দেশে আপামর সাধারণের মধ্যে যে-প্রকার শিক্ষার বিস্তার হয়েছে তার তুলনায় আমরা যে কোথায় পড়ে আছি তার স্থিরতাই হয় নাই। কিন্তু শিক্ষার অর্থ কি শুধু ডিগ্রী নেওয়া? বিলাতের ম্যাট্রিকুলেশান এদেশের ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার প্রায় কাছাকাছি। সেখানে ম্যাট্রিক পাশ ক'রে শতকরা ১০।১৫ জন ছাত্র কলেজে প্রবেশ করে। বাকী কোথা যায়? তারা অবশ্য উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করে না অথবা সমুদ্রে ঝাঁপ দেয় না। তারা ব্যবসা-বাণিজ্যের বিবিধ ক্ষেত্রে নানারূপে শিক্ষানবিশী আরম্ভ করে এবং হাতে-কলমে কাজ শিখে ভবিষ্যতে প্রায় সকলেই কাজের লোক হয়ে উঠে। কিন্তু এদেশে ম্যাট্রিক পাশ ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে না পার্‌লে যুবকগণ ভাবেন জীবনটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। তারপর আই-এ পাশ কর্‌লে বি-এ পড়তে হবে, আই-এস্‌সি পাশ কর্‌লে বি-এস্‌সি; নইলে

উপায় নেই। এমার্সন বলেন "University makes a havoc of originality !" দলে দলে ১ম, ২য় ও ৩য় বিভাগে পাশ করানো যেন কলে থেকে ১, ২, ৩ নং সুরকী বার করা! এখানে ভাল পোড়ের ইঁট আমা-ঝামার সঙ্গে পেষাই হয়ে গিয়ে সুরকীতে পরিণত হয়। যার স্বাভাবিক শক্তি ও প্রবৃত্তি যেমনই হউক না কেন সকলকেই যেতে হবে সেই এক গোল গর্ত্তের মধ্য দিয়ে। এতে মানুষের মৌলিকতা বড় নষ্ট হয়ে যায়। কথাগুলি খুব সত্য; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে এই সহজ সত্যগুলি আমরা এত সহজে অস্বীকার করি যে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে এই একই কথা বার বার বল্‌তে হচ্ছে। স্বচারজন যাঁরা ক্ষণজন্মা তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ধার ধারেননি; যেমন—কেশব সেন, প্রতাপ মজুমদার, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, শিশিরকুমার ঘোষ, নলিনবিহারী সরকার, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথ ডিগ্রী নিয়ে হাইকোর্টে প্রবেশ করলে 'গীতাঞ্জলী' পাওয়া যেত কিনা সন্দেহ! ব্যবসাক্ষেত্রে যে ক'জন বাঙালী কৃতী হয়েছেন স্যর রাজেন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম। তাঁর ডিগ্রী কি? Calendar খুঁজলে পাবেন না। সেটা বড় শুভক্ষণ যে তিনি বি-ই হননি, হলে বড়জোর গবর্ণমেণ্টের অধীনে মোটা মাহিয়ানার একজন ইঞ্জিনিয়ার হয়ে থাকৃতেন। তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও কর্ম্মঠ; তাঁর মধ্যে মানুষ হব এই একটা জিদ্ ছিল! মূলধনের অভাব বা অন্য কোন প্রকার অভাব তাঁকে আট্‌কে রাখ্‌তে পারেনি! এখন একটা Capital এর (মূলধনের) কান্না শোনা যায়। কিন্তু পাশকরা ছেলের পক্ষে এটা শোভা পায় না; কারণ এম্-এ-তে ফার্ষ্টক্লাস পেয়ে রিসার্চ্ করছেন এমন কোন যুবককে দশহাজার টাকার তোড়া দিলে ছ-মাসে তা খরচ ক'রে আর দশহাজার টাকা ধার ক'রে বস্‌বেন। তাই বল্‌ছি ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রধান জিনিষ প্রবল আগ্রহ ও চেষ্টা কোন অসুবিধাতেই দমে না যাওয়া

এবং অল্প বেতনে বা বিনা বেতনে কোন চল্‌তি কারবারে শিক্ষানবিশী করা। মিষ্টার জে, সি, ব্যানার্জ্জি কল্‌কাতার একজন খুব বড় কণ্ট্রাক্টর্‌। তিনি দুবার ওভারসিয়ারি ফেল ক'রে কলেজ থেকে তাড়িত হবার পর শুধু আত্মচেষ্টায় অতি সামান্য অবস্থা থেকে কত বড় হয়েছেন! এমন যুবক নেই যিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলে কৃতকার্য্য হতে না পারেন। এখন আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।"

আমাদের দেশের লোকে শ্রমের মর্য্যাদা (Dignity of Labour) বুঝেন না। একটা ইলিশ মাছ কিনে মুটে খোঁজেন, নহিলে সন্ধ্যার পর এদিক ওদিক চেয়ে মাছটা হাতে ক'রে লুকিয়ে বাড়ী আসেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌ যখন খোলা হয় তখন আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধু আড়ালে ঔষধ তৈরী ক'রে আড়াল থেকে বেচ্‌তে পরামর্শ দেন। যাহোক শ্রমের মর্য্যাদা আমাদের এখন স্বীকার কর্‌তেই হবে। এখন ব্যবসা চাই, অন্নসংস্থানের নূতন নূতন পথ উন্মুক্ত না কর্‌লে আর চল্‌বে না, 'নাস্তি গতিরন্যথা'।

ব্যবসা সম্পর্কে বাংলাদেশে পাটের কথা আগে মনে হয়। পাট জন্মায় শুধু বাংলায়। সিরাজগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে পাটের খুব বড় বড় আড়ত আছে। কিন্তু আমরা সে দিকে তাকাই না। দেশের উৎপন্ন দ্রব্য থেকে সেই দেশের লোকে যে সহজে টাকা রোজগার করতে পারে এ ধারণা আমাদের স্পষ্ট হয় না। আমরা অপদার্থ। ছেলে পাশ হবার পর তার চাকরীর জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে গিয়ে nomination চাই, তাঁকে শত অনুনয় করি, তাঁর পায়ে খাঁটি (তাও আর মেলে না) সরিষার তৈল মর্দ্দন করি। পনেরো টাকার নকলনবীশির জন্য সাহেবের বড়বাবু ও তাঁর অফিসের পেয়াদার খোসামুদি ক'রে ছ মাস কাটাতে আমাদের লজ্জাবোধ হয় না। এদিকে আমাদেরই জমিতে কে এসে

দাদন দিয়ে পাটের কারবার একচেটে করে নেয়? সে মাড়োয়ারী, আর্ম্মিনিয়ান, আর ইংরেজ। ইংরেজ সোজা চাষার বাড়ী যায়, মিষ্টি কথা বলে, তাঁর ছেলেগুলের সঙ্গে খেলে ও তাদের খেলনা দেয় আর স্বকার্য্য সাধন ক'রে আসে। জমিদাররা কি চেষ্টা ক'রে এত বড় ব্যবসাটা আপন হাতে রাখতে পারেন না? একেবারে কিছু রেলিব্রাদার্স হওয়া যায় না; কিন্তু আত্মচেষ্টায় আস্তে আস্তে হতে পারা যায় ত' বটে। পাটের সময় অনেক নিরক্ষর চাষী বিভিন্ন গ্রাম থেকে পাট নিয়ে নিকট-বর্ত্তী আড়তে যোগান্ দিয়ে এসে তিন চার মাসের মধ্যে ১০০০৲।১২০০৲ টাকা রোজগার ক'রে নেয়।

মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের দুরবস্থার কথা আর কি বল্‌ব। যাঁরা পূর্ব্ববাংলার খবর রাখেন তাঁরা জানেন সেখানে মাছ কিন্‌তে গেলে জেলেরা বলে—"বাবু, সন্ধ্যার পর ঝড়তি পড়তি নিয়ে যাবেন।" দুর্দ্দশার একশেষ! ঈর্ষার কথা বলছি না, মাড়োয়ারী যদি লোটা ছাতু সম্বলে লক্ষ টাকা আনেন, বাংলার পাট থেকে রোজগার ক'রে যদি ইংরেজ কলওয়ালা টাকার আণ্ডিলে গড়াগড়ি দেন, তা হ'লে বাংলায় জন্মগ্রহণ করে বাংলার আবহাওয়ায় মানুষ হ'য়ে বাঙালী আমরা কিছু কর্‌তে পারি না?

আর একটা ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করি। পদ্মায় অজস্র ইলিশ মাছ জন্মায়; কিন্তু দাদন দিয়ে জেলেদের নিকট থেকে সেই মাছ সংগ্রহ কর্‌বার এবং বরফ ঢাকা দিয়ে কলকাতায় পাঠাবার ভার বিদেশীর হাতে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হ'য়ে নিদ্রাসুখ ভোগ কর্‌ছি আর লাভের টাকা অপরে লুট্‌ছে। এইরূপে সকল দিকে আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রের পরিসর গুটিয়ে আস্‌ছে। টাকা ত পড়ে আছে, কিন্তু আমাদের নেবার শক্তি নেই। কি দারুণ লজ্জা!

বজ্‌বজ্‌ থেকে আরম্ভ ক'রে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত গঙ্গার দুধারে সর্ব্বশুদ্ধ ৮১টি পাটের কল আছে; কলের মালিক সবাই ইংরেজ। তাঁরা শতকরা ১০০ থেকে ১৫০ টাকা ডিভিডেণ্ড (dividend) দিচ্ছেন। এক-একটা পাটের কলের মূলধন ২৫।৩০ লক্ষ টাকা হবে। তবেই দেখা যাচ্ছে প্রত্যেক পাটের কল ২৫।৩০ লক্ষ টাকা লাভ করেছে। আমাদের বর্দ্ধমানের মহারাজার আয় অধিকাংশ পত্তনী বিলি বলিয়া ১২ লক্ষ টাকার বেশী হবে কি না সন্দেহ। শুনেছি দ্বারভাঙ্গার মহারাজার ২৫।৩০ লক্ষ টাকা আয় হবে, অর্থাৎ এক-একটি পাটকলের আয় আমাদের দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জমিদারের আয়ের সঙ্গে সমান। এই কয় বৎসরের সমস্ত পাটের কলে বৎসরে ১০।১২ কোটি টাকা রোজগার করে কলওয়ালারা বিদেশে নিয়ে গেছেন। এ লাভের কারবারে এদেশীদের কোন হাত নেই,—সব বিদেশীর। ভারতবর্ষের লোকেরা পাটকলের কুলি। পাটকলের আশেপাশে বস্তির মধ্যে তারা কি জঘন্য অবস্থায় দিন কাটায় তা সকলেই জানেন।

কল্‌কাতায় দশহাজার ভাটিয়া আছেন। তাঁদের সকলেরই কারবার আছে। সবাই অবস্থাপন্ন, তাঁদের মধ্যে কেরাণী নাই। কলকাতায় মাড়োয়ারীর সংখ্যা ৯০,০০০ থেকে ১০০,০০০ মধ্যে। সকলেই সঙ্গতি-পন্ন। যাঁর খুবই কম আয় তিনি মাসে ১০০ টাকা রোজগার করেন। আর কল্‌কাতার লক্ষপতিরা যে অনেকেই মাড়োয়ারী, একথা কারও অবিদিত নাই। ছেলে নকুরী (চাকরী) করবে এরূপ ভাবতে মাড়োয়ারী অপমান বোধ করেন। দিল্লীওয়ালাও কল্‌কাতায় অনেক আছেন। মুরগীহাটায় তাঁদের বড় বড় দোকান। আমড়াতলার গলিতে প্রকাণ্ড দ্বিতল ত্রিতল বাড়ী তাঁরা হাজার, দেড়হাজার টাকায় ভাড়া করেছেন। সেখানে বিস্কুট, ওষুধ, দিয়াশালাই প্রভৃতি জিনিষ বোঝাই

করা আছে। এসব বিদেশী মালের এঁরা একমাত্র এজেণ্ট। পূর্ব্ববাংলা, সুদূর দিল্লী ও রেঙ্গুন, প্রভৃতি স্থানে এঁরা পাইকারী হিসাবে মাল পাঠান। এদের আয় যথেষ্ট। দিল্লীওয়ালা মুসলমান ব্যবসা বোঝেন। বাঙ্গালী মুসলমান বোঝেন না। তাঁরা হিন্দুদের চেয়ে এই বিষয়ে নির্জ্জীব ও উপায়বিহীন।

তারপর আমাদের যৌথ কারবার (Joint Stock Company) নেই বল্‌লেই চলে। এরূপ কারবার এদেশে চলে না, কারণ আমরা পরস্পর বিবাদ করি, হিংসা করি, আপনাদের বিশ্বাস করি না। কাজেই আমাদের অর্থ, শক্তি ও কৌশল সম্মিলিত হবার সুবিধা ও অবকাশ পায় না। যৌথ কার্‌বারে ইংরেজ সফল হয়, আমরা হই না।

ব্যবসায়ক্ষেত্র থেকে এম্‌নি ক'রে সবদিকে হটে গেলে আমাদের অন্নসমস্যার মীমাংসা হবে না, অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ইংরেজ, মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, দিল্লীওয়ালা—যাঁরা কলকাতার সকল প্রকারের ব্যবসা একচেটে করেছেন—তাঁদের চরণতলে বসে ব্যবসার প্রথম পাঠ আমাদের শিখতে হবে। তাঁরা যে উপায়ে কৃতী হয়েছেন আমাদেরও সেই উপায় অবলম্বন কর্‌তে হবে। আলস্য ও বিলাস ছাড়তে হবে। প্রথম ব্যবসা আরম্ভ করে মাড়োয়ারী কাপড়ের বস্তা পিঠে নিয়ে ফিরি করেন, গাছতলায় বিশ্রাম করেন। তাঁরা রেলগাড়ীতে তৃতীয় শ্রেণীতে চড়েন, পাঁচলক্ষ টাকা না হ'লে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠেন না। কিন্তু আমরা,—বাবুরা "দেড়া কেরায়াকা" গাড়ীতে উঠি, এদিকে পেটে অন্ন নাই। ব্যবসাক্ষেত্রে দাঁড়াতে হলে উদ্যম অধ্যবসায় ও কষ্টসহিষ্ণুতায় এদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতে হবে—একথা যেন আমাদের শিক্ষাভিমানী পাশকরা ছেলেরা কখনও বিস্মৃত না হন। কারণ সকল ক্ষেত্রেই শিক্ষানবিশীর একটা মূল্য আছে। ভূঁইফোঁড় বা না পড়ে

পণ্ডিত হবার মত ভয়ঙ্কর জিনিষ আর কিছুই নাই। বিশেষতঃ ব্যবসায়ক্ষেত্রে উত্থান পতন অতি ভয়ানক; এরূপ গভীর দায়িত্বপূর্ণ কাজে হাত দেবার আগে একটু শিক্ষার দরকার একথা আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। অনভিজ্ঞ লোকের ব্যবসায়-চেষ্টা অল্পদিনের মধ্যেই নিষ্ফল হয়ে গেছে এমন দৃষ্টান্ত অনেক আছে। সুতরাং এ শিক্ষানবিশীকে আমাদের যুবকগণ যেন কখনও উপেক্ষার ভাবে না দেখেন।

যুবকগণের প্রতি আমার নিবেদন, ফেল হলে তাঁরা যেন জগৎ অন্ধকার না দেখেন এবং ক্ষোভে ও দুঃখে শেষে আত্মহত্যা করে না বসেন। আর তাঁদের অভিভাবকদের হাতজোড় করে বলছি যে ছেলে ফেল্ হলে তাঁরা যেন হা হুতাশ না করেন, পোড়া কপাল দুরদৃষ্ট বলে নিজেকে ও পুত্রকে ধিক্কার না দেন। আমাদের ছেলেরা পরীক্ষা পাশ করতে না পারলে যেন মহাপাতকী দস্যুর চেয়েও বিষণ্ণ হয়ে পড়েন। কি দুর্দ্দশা! যে ক'জন বাঙালী পাটের দালাল আছেন তাঁরা সব ফেলকরা ছেলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার বন্ধ করলে কি টাকা পয়সা বা মনুষ্যত্বের দ্বার বন্ধ হয়? আমি আজীবন ভেবেছি, নব্যবঙ্গের সব ছেলেদের আমি জানি। আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে জীবনে সফলতা লাভ করবার জন্যে গ্রাজুয়েট হবার কোন দরকার নেই। কিন্তু তাই বলে বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা নেই আমি এমন কথা বলছিনা। লেখাপড়া চাই। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে উচ্চশিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা ও লোকশিক্ষার নানাপ্রকার বন্দোবস্ত আছে। তারা লেখা পড়া শিখে শিল্প বাণিজ্য ব্যবসায় প্রভৃতি নানা কাজে লেগে যায়। তারা জানে Knowledge is power জ্ঞানই শক্তির উৎস। রাসায়নিক পরীক্ষাগারে বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলাফল অনেক পরিমাণে নির্দ্ধারিত হয়েছে। প্রকৃত শিক্ষা চাই, কিন্তু

চাইনা কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ, যা জীবনপথে কখনও আমাদের সম্বল হয় না।

আমাদের দেশের প্রদর্শনী উন্মুক্ত হবার পর কান্না পায়, দেখতে পাবেন দেখবার মত যা কিছু আছে তার সবই ইউরোপীয় চালিত কারখানায় প্রস্তুত। তবু প্রদর্শনী চাই। প্রদর্শনীতে গিয়ে আমরা আমাদের দারিদ্র্য ও অভাব আরও স্পষ্ট ক'রে বুঝ্‌তে পার্‌ব। বাঙ্গালী যুবকের মধ্যে মনুষ্যত্বের উপকরণ আছে। এখন পরীক্ষা ফেল্‌ ক'রে জীবনটা বৃথা হল এ কথাটা মন থেকে একেবারে মুছে ফেল্‌তে হবে। আজ এই ভীষণ অন্নসমস্যার দিনে আমাদের যুবকগণ কি শুধু পাশ ফেল্‌ গণনা ক'রে জীবনের শ্রেষ্ঠতম ভাগ নষ্ট ক'রে ফেল্‌বেন! চাকরী হলনা বলে জগৎ অন্ধকার দেখবেন! এ মোহ ছাড়িয়ে উঠ্‌তেই হবে। আমাদের এখন একটা সবল জীবন্ত যুবক-সমাজের দরকার হয়েছে যাঁরা গতানুগতিকের গণ্ডী ভেঙে অনিশ্চিতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে একটুও ভয় পাবেন না, পাশ ফেলের হিসাব না রেখে যাঁরা আপনার তেজে আপনি দীপ্ত হয়ে প্রচণ্ড কর্ম্ম-চেষ্টা প্রকট করে দেখাবেন। যাঁরা রাজ্য গঠন করেছেন—আকবর, শিবাজী, রণজিৎ সিংহ, হায়দার আলি, ক্লাইভ, ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংস প্রভৃতি—তাঁদের কেহই স্কুল-কলেজে প'ড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পান্‌নি। পরহিতব্রত কার্ণেগী ৯০ কোটি টাকা মূল্যে তাঁর লোহার কার্‌খানা বিক্রয় করেছিলেন; তিনি জীবন-সংগ্রামের প্রারম্ভে রাস্তায় খবরের কাগজ বেচ্‌তেন। লর্ড রবার্টস্‌ সামান্য সৈনিক থেকে নিজের চেষ্টায় ক্রমে ফিল্ড্‌মার্শ্যাল হয়েছিলেন। লর্ড কিচ্‌নারও তাই। তাতা, বিটলদাস ঠাকুরসে, ফজল ভাই করিম ভাই, লিপটন, এই কল্‌কাতার গোয়েনকা, ঝুনঝুন্‌ওয়ালা, হর্‌দিৎ রায় চামারিয়া অথবা

আয়রন্‌সাইড, বার্ক্‌মায়ার এঁরা অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধির কোন ধারই ধারেননি। তাই বলে এদের অশিক্ষিতও বলা চলে না, এঁরা সম্পূর্ণ শিক্ষিত; এঁদের শিক্ষার মূলে স্বাবলম্বন। এঁরা পাঠাগারে ব'সে বই পড়েন,—"নোট" পড়েন না। আমাদেরও নিজের চেষ্টায় শিখ্‌তে হবে ও আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যে প্রবেশ কর্‌তে হবে, শিল্পের উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত কর্‌তে হবে, নইলে অস্বাস্থ্য ও অন্নাভাবে অচিরে বাঙালী জাতির অর্দ্ধেক ধ্বংস হয়ে যাবে। বর্ত্তমানে আমরা সামান্যভাবে কলকারখানা স্থাপন কর্‌তে ও নানাপ্রকার ব্যবসার কাজে প্রবৃত্ত হতে আরম্ভ করেছি। কিন্তু কোথাও এখনও রীতিমত সফলতার মুখ দেখ্‌তে পাইনি। এই কারণে অনেকে একটা আত্মঘাতী চীৎকার আরম্ভ করেছেন, বাঙ্গালীর দ্বারা কিছু হবে না। কিন্তু আজ ইউরোপ যে ব্যবসায়-ক্ষেত্রে একাধিপত্য লাভ করেছে তা পাঁচশ বছর বা ততোধিক কালের বংশপরম্পরালব্ধ অভিজ্ঞতার ফল এই কথাটা মনে রাখ্‌লে আমরা কা'রও গঞ্জনাবাক্যে নিরুৎসাহ হয়ে পড়্‌ব না। আর আপনাদের চেষ্টায় কল কারখানা স্থাপন কর্‌তে না পার্‌লে ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি স্থান হতে অনেক বাঙালী যুবক শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধে যে জ্ঞান নিয়ে দেশে ফিরে আসছেন সে জ্ঞান কর্ম্মক্ষেত্রের অভাবে সম্পূর্ণ নিরর্থক হবে। বিদেশ থেকে কোন একটা শিল্পে পারদর্শিতা লাভ ক'রে ফিরে এলেই ত হবে না—তাকে কাজে লাগাবার জন্য ক্ষেত্র রচনা কর্‌তে হবে। অতএব বিশেষ অনুধাবন ক'রে দেখুন; আজ আমাদের জীবন-মরণের সমস্যা উপস্থিত। চাক্‌রী চাক্‌রী করলে আর চলবে না; এ পথ ছেড়ে দিয়ে ভিন্নপথ, স্বাবলম্বনের আত্মনির্ভরতার পথ ধর্‌তেই হবে। আমি বাঙলার তথা ভারতবর্ষের নানাস্থানে ভ্রমণ করেছি। দেশে যাতে বিজ্ঞানচর্চ্চা হয় এবং

নব্য যুবক চাকুরীর উমেদারী না ক'রে শিল্পোন্নতির কাজে এবং ব্যবসা বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হন সর্ব্বত্রই আমার এই নিশান।

'অন্নচিন্তা চমৎকারা'—তাই আজ আমাদের জাতি বুদ্ধিহারা হয়েছে। কঠিন অন্নসমস্যার মীমাংসা করবার উদ্দেশ্যে বাঙ্গালী পিতামাতা পুত্রকে মাট্রিকুলেশন পাশের পর ছুটিয়ে দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে মুখ করে; এল্-এ, বি-এ পাশ ক'রে ডিগ্রী নিয়ে ছেলে আঁচলা বেঁধে টাকা আন্‌বে, এই একটা মোহের ঘোরে। আশায় আনন্দে সুখের স্বপন দেখ্‌তে দেখ্‌তে ৭।৮ বৎসর কাল এই আলেয়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটে খুব জাঁকালরকম ডিগ্রী নিয়ে বাঙালী যুবক যখন কলেজ, অধ্যাপক, আর্টস্, সায়ান্স প্রভৃতির হাওয়া থেকে এসে একেবারে শক্ত মাটির পৃথিবীতে দাঁড়ান্ তখনই বুঝ্‌তে পারেন যে, এই বস্তুর হাটে তিনি নিতান্তই নিঃসম্বল—এ বাজারে কেনাবেচা করতে হলে যে যোগ্যতার দরকার, মল্লীনাথের টীকায় বা এম্-এ ক্লাসের অধ্যাপকের পাশকরানো নোটে কোথায়ও তার সঙ্গে পরিচয় হয়নি। জীবনপথে পা দিয়েই এই যে একটা ধাক্কা লাগে, সারা জীবনে অনেকেই তা সাম্‌লে উঠ্‌তে পারেন না। একটা নৈরাশ্যের ছায়া এইখানেই ঘনীভূত হয় তারপর কেরাণী মাষ্টার বা উকিল হয়ে গড্ডলিকা-প্রবাহে ভাসতে ভাসতে অভাবের পেষণে স্বভাব নষ্ট হয়, আর জীবনটা ক্রমে নৈরাশ্যপূরিত অন্তঃসারশূন্য অকাল বার্দ্ধক্যে মুষড়ে পড়ে। কিন্তু আমাদের ভুল কোথায়? কি উপায়েই বা ভ্রান্তির অপনোদন হতে পারে?

আজ এই জীবন-সন্ধ্যায় রসায়নের পরীক্ষাগার থেকে বাইরে এসে উৎকট অন্নসমস্যা সম্বন্ধে যদি আলোচনা আরম্ভ ক'রে থাকি তবে আপনারা জানবেন সে নিতান্তই প্রাণের দায়ে। বাঙালীর আজ পেটের দায়। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "আগে পেট ভ'রে খাও, তবে ধর্ম্ম কর্ম্ম

হবে।" হিন্দু আমরা—খুব আধ্যাত্মিক—সর্ব্বদাই ধর্ম্মের অনুশীলন করতে চাই। কিন্তু বাতাস খেয়ে ধর্ম্মপালন হয় কি? স্বাস্থ্য, প্রাণশক্তি, উৎসাহ, অধ্যবসায় অক্ষুন্ন রাখতে হলে যথেষ্ট আহার চাই। কিন্তু আমরা অভাবে, অস্বাস্থ্যে, রোগে—দিন দিন নিস্তেজ হয়ে পড়ছি, কর্ম্মশক্তি তিল তিল ক'রে ক্ষয় পাচ্ছে, অন্নসমস্যার সঙ্গে অস্তিত্ব-সঙ্কট এগিয়ে আসছে। আজ তাই দেশের ছাত্রদের গলা ছেড়ে ডেকে বিমর্ষ ভাবে আমায় বলতে হচ্ছে—"সাবধান!" বিপদ সন্নিকট! ছাত্র তোমরা, দেশের ভবিষ্যত আশাস্থল। তাই এই সকল অপ্রিয় সত্য তোমাদের কাছে খুব স্পষ্ট করেই বলছি। "ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্"—ঠিক কথা নয়। রোগ ঢাকলে চলবে না। রোগ নির্ণয় ক'রে বিধিমত ঔষধের ব্যবস্থা করলে তবেই আমরা বাঁচতে পারব।

আপনারা সকলেই জানেন সেই পুরাতন হিন্দু কলেজের কথা—যেখানে বাঙালীর ছেলে সর্ব্বপ্রথম ইংরেজীচর্চ্চা আরম্ভ করে। তারপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি থেকে বরাবর আজ পর্য্যন্ত আমরা চলেছি—একভাবে একই বাঁধাপথে। এই উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলবার কালে এখন একবার উচ্চৈস্বরে বলে উঠতে হবে "থামো! থামো!" সকলকেই কি সরলরেখাক্রমে একই নির্দ্দিষ্ট পথে যেতে হবে? রেখামাত্র বিচ্যুতি হলে চলে না কি? বাস্তবিক একবার স্থিরচিত্তে বিবেচনা ক'রে দেখতে হবে ডিগ্রী ও চাকরীর মোহে আমরা যে পথে ছুটেছি তার শেষ-সীমায় সফলতার আলোক প্রস্ফুট হয়ে আছে অথবা বিরাট ব্যর্থতার অন্ধকূপ আমাদের ডুবিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অপেক্ষা করছে!

বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী ও জীবিকার্জ্জন—এই দুয়ের মধ্যে এখন কিরূপ সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে তার আলোচনা করবার আগে একটা কথা আমি ব'লে রাখি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের "ছাপের" মূল্য যাই হোক না কেন,

তার বিরুদ্ধে আমি যত কথাই বলি না কেন, প্রকৃত উচ্চশিক্ষা লাভ ক'রে চিত্তোৎকর্ষ সাধন করা চাই। লেখাপড়া চাই, গণ্ডমূর্খ হলে কিছুতেই চল্‌বে না। কিন্তু অকর্ম্মণ্য ডিগ্রীধারী হয়ে কোন লাভও নেই, গৌরবও নেই। আমাদের পোড়া কপাল যে, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের "ছাপ"কে অন্নসংস্থানের একমাত্র উপায়—"নান্যদস্তি" ব'লে জ্ঞান কর্‌চি। এই ধারণাটা ভূতের মত আমাদের ঘাড়ে চেপে আছে—কিছুতেই নাম্‌তে চায় না।

এই ধরুন বি-এল পাশ ক'রে ওকালতি করা। ছেলেদের ও-একটা বাঁধা গৎ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেখানে যাই—জেলা মহকুমা, জজ বা মাজিষ্টরের সকল রকমের আদালত—সব জায়গাতেই উকিলের সংখ্যা মক্কেলের দশগুণ, কোথাও বা বিশগুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই উকীল হলেও পয়সা রোজগার হচ্ছে না। কিন্তু তবুও বি-এ পাশ ক'রেই বাঙালী যুবক আইন পড়তে ছুট্‌চেন। পালে পালে, দলে দলে, সকালে বিকালে আইন পড়া চলেছে। "পাশটা ক'রে রাখা যাক্"—আইন পড়্‌বার এই একমাত্র নজীর আছে। কিন্তু যেখানে প্রয়োজনের চেয়ে আয়োজনের আড়ম্বরটা অধিক, সেখানে আয়োজন যে অনেক পরিমাণে ব্যর্থ হবে এ ত স্বতঃসিদ্ধ কথা। "সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম্।" আইন পড়ো না—আর দরকার নেই—এমন কথা বলি না। কিন্তু এই কথা বলি—যার কাট্‌তি নেই, আদর নেই, গুমোর নেই, যা গুদামজাত হয়ে প'ড়ে থেকে পচে, সে জিনিষের আবাদ যেমন বন্ধ রাখা ভাল, আইন পড়াও সেই যুক্তিরই বলে স্থগিত রাখা বা বহুল পরিমাণে কমিয়ে দেওয়া দরকার নয় কি? আইনজ্ঞেরা আমার শত্রু এমন উৎকট অদ্ভূত কথা আমি বলিনি। বাঙালার ব্যবহারজীবিদের নিকট আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য। মনোমোহন ঘোষ, লালমোহন

ঘোষ, ডবলিউ সি ব্যানার্জ্জি, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি রাজনৈতিক নেতৃগণ, কলিকাতা সায়ান্স কলেজের প্রাণস্বরূপ স্যর তারকনাথ ও স্যর রাসবিহারী এবং মনস্বী জষ্টিস্ চৌধুরী, স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, ও সি, আর, দাস প্রভৃতি ব্যবহারজীবিগণ বাঙলার সকল শুভকার্য্যে অগ্রণীস্বরূপ। রাজনৈতিক আন্দোলনে বিজ্ঞ ব্যবহারাজীবির স্থান কোথায়—মহামতি বার্ক তা অতি সুনিশ্চিতরূপে নির্দ্দেশ ক'রে গেছেন। কিন্তু ছোট বড় সকল প্রকার আদালতের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়িয়েও যাঁরা উপোষ ক'রে থাক্‌তে বাধ্য হন, বার-লাইব্রেরীর চাঁদার পয়সাটা যাঁরা দিয়ে উঠতে পারেন না এবং স্থল বিশেষে এক ছিলিম তামাক পেলে যাঁরা কয়েক পাতা নকল ক'রে দিতে পারেন, এমন সব উকীল কি ওকালতী ব্যাপারটার মর্য্যাদাহানি কর্‌ছেন না? বল্‌ছিলাম উকীল তৈরী করবার কলটা যদি বেশ কয়েক বৎসর বন্ধ থাকে তবে গোবেচারী উপোষকারীর দল বেঁচে যেতে পারে। প্রয়োজন ও আয়োজনের মধ্যে অসামঞ্জস্য কত বেশী হয়ে পড়ছে বিবেচনা ক'রে দেখা উচিত। তা হলে আর দফে দফে উকীল তৈরী ক'রে তাদের দফা রফা কর্‌বার প্রবৃত্তি হবে না।

মধ্যবিত্ত বাঙালীর সন্তান ডিগ্রী পেলেই জীবিকা সংস্থান কর্‌তে পার্‌বে আর ডিগ্রীর অভাবে চারিদিক অন্ধকার দেখবে এটা কত বড় ভুল আজ তা নিঃসংশয়ে বুঝে নিতে হবে। বৎসর বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কল্‌মা নিয়ে গ্রাজুয়েটের দল জয়পতাকা উড়িয়ে বেড়িয়ে আস্‌চেন। তাঁদের বাজার-দর আজকাল কত? একটা কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন দেখলে এক ঝুড়ি দরখাস্ত পড়ে—তারপর তার মধ্যে একজন মনোনীত হন। কাজেই বি, এ ৪০৲ টাকা আর এম-এ ৭০৲ টাকা পেলেও ঐ মাহিয়ানার চাকুরী পাবার সম্ভাবনা গ্রাজুয়েট-সাধারণের পক্ষে কত অল্প

বুঝিয়ে বল্‌বার দরকার নেই—শুধু একটু ভেবে দেখার ওয়াস্তা। সকলেই হা অন্ন! হা অন্ন! ক'রে বেড়াচ্ছেন। এম্-এ পাশ কর্‌বার পর যখন কাজকর্ম্ম জোটে না তখন মনের দুঃখে বাঙালী যুবককে বল্‌তে শুনেছি—ফেল হ'লে ভাল হ'ত—তবু আর এক বৎসর দুশ্চিন্তার হাত হোতে নিষ্কৃতি পেতাম। চাকরীর বাজার আগে ছিল ভাল বটে। ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভ থেকে ইংরেজী শিখে বাঙালী চাকরীই কর্‌ছে। শিক্ষিত যুবক আগে মুন্সেফী ডিপুটী হ'তে পার্‌তেন—গভর্ণমেণ্ট ও সওদাগরী আফিসে নানাপ্রকার কর্ম্ম জুট্‌ত। ইংরেজ যখন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ পাঞ্জাব ও বর্ম্মায় রাজ্যবিস্তার কর্‌লেন তখন বাঙালী সেখানেও গেল চাকরী কর্‌তে, আর মাড়োয়ারী, বোম্বেওয়ালা প্রভৃতি গেলেন ব্যবসা কর্‌তে। ডিগ্রী থাক্‌লে চাকরীর বড় সুবিধা হ'ত; তাই তখন ডিগ্রীর একটা অকৃত্রিম মূল্য হয়েছিল। আর সেই কারণেই শিক্ষিত বাঙালীর চাকরীই একধ্যান একজ্ঞান হ'য়ে উঠলো। কিন্তু এখন শিক্ষিতের সংখ্যা অনেক গুণ বেড়ে গেছে। এত চাকরী জুটবে কোথা থেকে? অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ব্যবস্থার সামঞ্জস্য করতে না পার্‌লে ঘটনাচক্রের পেষণে মর্‌তে হবে আমাদেরই। সুতরাং চাকরীর পথ ছেড়ে অন্য পথ ধর্‌তে হবে।

এইস্থানে আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর একটু আলোচনা ক'রে দেখতে হবে। আমি বলেছি যে, আমরা চাকরীর জন্য ডিগ্রীর চেষ্টা করি, আবার ডিগ্রীর জন্য এক টাকা মূল্যের পুস্তকের পাঁচ টাকা মূল্যের নানারকম নোট কিনে থাকি। এই যেন সেই বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি। কেবল্ নোট মুখস্থ আর গৎ আওড়ান। কাজেই বিদ্যা আমাদের পুঁথিগত। ডিগ্রীলাভের এইরূপ চেষ্টায় মৌলিকতা নষ্ট হয় এবং প্রতিভার স্ফুরণ হয় না। পাশকরা ছেলে কার্য্যক্ষেত্রে নেমে

হাতড়ে বেড়ায়—কোথাও কূল পায়না। ইউনিভারসিটি কমিশন রিপোর্টে অনেক বিশেষজ্ঞের মত আছে। সেই সকল মতের সমালোচনা ক'রে তাঁরা সিদ্ধান্ত ক'রেছেন—

"The present system is like a soul-destroying machine. If the young Indian of ability passes through it, he will lose all his soul and half of his reasoning capacity in the process......Our University system instead of encouraging the love of learning, kills it. The universities of India are but factories where a few are manufactured into graduates and a good many more wrecked in the voyage of their intellectual life. The education that is imparted in the colleges, gives a very narrow outlook to their alumni and fails to stimulate any healthy intellectual curiosity in the majority or to develop the powers of initiative when thrown on their own resources of accurate observation and independent thinking and of applying the knowledge gained."

বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী মানুষের অন্তরকে পিষে ফেলবার যন্ত্রবিশেষ। এতে জ্ঞানলিপ্সা উদ্দীপ্ত হওয়া দূরে থাক একবারে বিনষ্ট হ'য়ে যায়; ছাত্রের মন সঙ্কুচিত হ'য়ে অসাড় ও কৌতূহলশূন্য হয়; কোন কাজ আরম্ভ করবার অথবা লব্ধজ্ঞান কার্য্যে প্রয়োগ করবার সাহস বা ইচ্ছা থাকে না। ঐ রিপোর্ট থেকে আর দুই একটি স্থান উদ্ধৃত করচি—

"Matriculation is the key which unlocks the door to all the colleges attractive to the respectable classes of Bengal and at that door the crowd grows larger every year."

"Pupils at present look upon their school or college life as nothing but a preparation for university examinations", writes Mr. Jogendranath Bhattacharya. "Their horizon is circumscribed as they have no higher aim than to pass examinations. When a certificate is the chief aim and end, any subject that does not lend itself to the test, becomes neglected. This oppressive system also affected the method of instruction. Teachers are only too careful to teach those things that will be set at the final examination. The number of passes being the goal, the spirit of enquiry in the pupil is smothered, cram lessons and 'keys' receive encouragement."

"Teaching is being unduly subordinated to examination," writes Mr. Akshoy Kumar Sarcar of Chittagong. "The teacher's success depends upon the number of students he has made to pass. Some school authorities have taken teachers to task for failing to pass a high percentage of students. Students themselves say that they come not to learn but to pass the examination. Teachers also give way to this view very often. The guardians of students generally endorse this view."

"The very large majority of the schools I have seen in East Bengal," writes Mr. J. W. Gunn, "are cram establishment pure and simple, where everything is subordinated to the immediate requirements of the Matriculation Examination."

মাট্রিকুলেশন পাশ করলে সকল কলেজেরই দ্বার উন্মুক্ত হয়। এই

মাট্রিকুলেশনে ছাত্রের সংখ্যা প্রত্যেক বৎসরেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বৃদ্ধিমাত্রেই কি স্বাস্থ্যের লক্ষণ? দেশে জ্ঞানতৃষ্ণা বাড়্‌ছে এই ভেবে অনেকেই আশ্বস্ত হন। কিন্তু এ কি স্বাস্থ্যকর তৃষ্ণা? অথবা বিসূচিকার তৃষ্ণার মত ভয়ঙ্কর! আমি অনেক সময় পাড়াগাঁয়ে গিয়ে থাকি। বাগেরহাট অঞ্চলে গিয়ে দেখেছি সেখানে শুধু কায়স্থ ব্রাহ্মণ বৈদ্য নয়, নমঃশূদ্র মাহিষ্য বারুইদের মধ্যে লেখাপড়া শিখবার আগ্রহ বেড়ে চলেছে। বেশ কথা। কিন্তু এই জ্ঞানতৃষ্ণাই, অস্বাস্থ্যের লক্ষণ হ'য়ে দাঁড়ায়, যখন প্রত্যেক মাট্রিকুলেট্ কলেজে প্রবেশ লাভ কর্‌বার জন্যে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় ছুটাছুটি কর্‌তে থাকে। কলেজে স্থানাভাব। অথচ মাট্রিকুলেশন পাশ ক'রে প্রত্যেককে কলেজে পড়তেই হবে—কেন না আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ছাপটা'কে জীবিকার্জ্জনের একমাত্র উপায় ব'লে ধ'রে নিয়েছি। অন্য কোন উপায়ে যে অন্নসংস্থান হ'তে পারে এ ধারণা আমাদের নেই বল্‌লেই চলে। কাজেই কোন রকমে পয়সা-কড়ির যোগাড় ক'রে (দরিদ্রা বিধবা মা-মাসীর গহনা বাঁধা দিয়ে) ছুটে চল ঐ কলেজের দিকে। সেখানে ঠেসাঠেসি ঘেঁসাঘেসি; তবু ছেলেরা ছুটে চলেছে—সম্মুখে গিয়ে বস্‌বে; ধাক্কা-ধাক্কিতে প'ড়ে কেউ মারাই বা যায়! ৪০ মিনিটে পিরিয়ড্ দলে দলে ছেলেরা সকালে বিকালে উপরে নীচে পাতালে, সব জায়গাতে পড়াশোনা কর্‌ছে। ছাত্রদের জ্ঞানলাভে তেমন কোন আগ্রহ নেই—কোনরকমে নোট মুখস্থ ও পার্সেণ্টেজ্ রক্ষা ক'রে ডিগ্রী পেলেই বস খুসী। তারা কলেজের পাঠ্যপুস্তকের অতিরিক্ত কোন বই পড়্‌বে না, কারণ পাশ কর্‌বার জন্যে সে সকল পাঠ কর্‌বার কোন আবশ্যক নেই। কোন নূতন কথা নয়, কোন অবান্তর কথা নয়—শুধু নোট দাও আর লাল নীল সবুজ পেন্সিলে সব দাগ দিয়ে নিতে বল। পরীক্ষা

পাশ করাটাই একমাত্র লক্ষ্য হওয়ায় শিক্ষাপ্রণালীর এই শোচনীয় দুর্দ্দশা হয়েছে। আবার পল্লীগ্রামের স্কুলে বেশী ছেলে পাশ না হলে বেচারী হেডমাষ্টারকে কর্ত্তৃপক্ষ তাড়া দেন—সে এক বিষম মুস্কিল। কেউ বা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেন আমার স্কুলে এতগুলি ছাত্র পাশ হয়েছে, অতএব চ'লে এস; ইত্যাদি। কলেজের দ্বারে এই যে শত শত ছাত্র আঘাত করছে, মাথা খুঁড়ছে, এরা কি প্রকৃত জ্ঞানপিপাসু বিদ্যার্থী অথবা ডিগ্রী পার্থী মাত্র—উদ্দেশ্য গলাধঃকরণ, উদ্গীরণ ও ডিগ্রীগ্রহণ। আমাদের ছেলে হলে চার বৎসর বয়স হতে বি-এল্-এ রে আরম্ভ হয় আর চব্বিশে চর্ব্বণ শেষ। কিন্তু এতে যে পরিমাণ যোগ্যতা লাভ হয় সঙ্কটপূর্ণ সংসার পথে চল্‌বার পক্ষে তা একেবারেই যথেষ্ট নয়। যে-কোন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেই জান্‌তে পারা যায় যে, সে চায় পাশ কর্‌তে, জ্ঞানলাভ করতে নয়। শিক্ষককে ছাত্ররূপ মনিবের মন জুগিয়ে চল্‌তে হয়, কারণ পাশ কর্‌বার যা উপযোগী তাই তিনি পড়বেন, অন্য কিছু দেখবেন না অন্য কথা কানে তুল্‌বেন না। পঠিত বিষয় আত্মসাৎ ক'রে তা থেকে রসরক্ত সঞ্চিত হলে চিত্তোৎকর্ষ সাধিত হতে পারে। কিন্তু ছাত্র তা চায় না—সে চায় গ্রামোফোনের মত মুখস্থ বুলি উদ্গীরণ ক'রে ডিগ্রী নিতে। কিন্তু অন্নসংস্থানের জন্যে একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপের উপর নির্ভর করা ব্যতীত উপায়ান্তর নেই, এই ভয়ঙ্কর ভ্রান্তির হাত থেকে মুক্তিলাভ ক'রে ব্যবসা বাণিজ্য কৃষি শিল্পের দিকে মনোনিবেশ কর্‌লে ছাত্রও বাঁচতে পারে বিশ্ববিদ্যালয়ও ভারমুক্ত হতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ-ফেলের অঙ্কপাতে ভবিষ্যৎ জীবনের শুভাশুভের গণনা না ক'রে যদি আমাদের যুবকগণের আশা উৎসাহ ও বুদ্ধি অন্য ক্ষেত্রে নিয়োজিত হয় তবে শুভ ফল হবে—সফলতা লাভ হবে—সন্দেহ নেই। অভাব ও অস্বাস্থ্যের তাড়নায় আমাদের জাতীয় জীবনের এমন

একটা সঙ্কটকাল উপস্থিত হয়েছে যে ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবক—সকলেরই এই কথাগুলি বিশেষ ক'রে অনুধাবন করে দেখা উচিত।

স্বদেশী আন্দোলনের ফলে এ দেশে কতকগুলি কলকারখানা স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু সে ক্ষেত্রে ডিগ্রীধারীগণ পশ্চাতে ছিলেন; কোন কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। তাঁরা কলের মত কলুর চোখঢাকা বলদের মত। বিদ্যাশিক্ষার ফলে তাঁরা কেরানীগিরির যোগ্যতা লাভ করেন—নিজের চেষ্টা উৎসাহ ও বুদ্ধির বলে কিছু কর্‌বার সাহস বা শক্তি ছাত্র-জীবনেই তাঁরা হারিয়ে বসেন। বর্ত্তমানে ব্যবসায়-ক্ষেত্রে যে সকল বাঙালী সফলতা লাভ করেছেন তাঁদের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ধারই ধারেন না। স্যর্ রাজেন্দ্রনাথ, জে সি ব্যানার্জ্জি, কয়লাখনির স্বত্বাধিকারী এন্ সি সরকার, রেলওয়ে ট্রাফিকের এস্ সি ঘোষ—এ'রা উপাধির ধার ধারেন না। জে সি ব্যানার্জ্জির কৃতিত্ব বাঙলাদেশ ছাড়িয়ে বোম্বাই-পুনা প্রভৃতি স্থানে পৌঁছেছে। সেখানে এখন এককোটি টাকার কণ্ট্রাক্ট তাঁর হাতে। বাঙ্গালীর বোম্বাই-প্রদেশে এই প্রথম প্রতিষ্ঠা; আমাদের পক্ষে এ বড় গৌরবের কথা! গতানুগতিকের গণ্ডী ভেঙে বাঁধা পথ ছেড়ে নূতন পথে পা ফেলে এবং উদ্যম ও অধ্যবসায়ের বলে সফলতায় মণ্ডিত হয়ে এঁরা আমাদের যুবকের সম্মুখে অন্নসংস্থান ও দারিদ্র্যনিবারণের একটা নূতন পথ উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছেন। আমাদের ছেলেরা পাশ না করতে পার্‌লেই মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়ে—বলে, হায় হায় জীবনটা মাটি হয়ে গেল! আরে, জীবন মাটী হয় তো ঐখানেই ঐ একটানা এক-বাঁধাপথে, যা বৈচিত্র্যে সুন্দর নয়, যেখানে আশার আলোকপাত হয় না, যেখানে শুধু দারিদ্র্যের অশ্রু—ভাবনা বেদনা ও কর্ম্ম-পঙ্গুত্ব। ৩০ বৎসরের বাঙালী যুবক সংসারজ্বালায় জর্জ্জরিত, চক্ষু নিষ্প্রভ, মুখে আনন্দচিহ্ন

নেই ; দুশ্চিন্তাগ্রস্ত—মেয়ে সেয়ানা হচ্চে বিয়ে দিতে হবে—বরের 'বাজার আগুন !' কিন্তু জীবনের প্রারম্ভে যাঁরা সফলতার মুখ দেখেছেন সেই ইংরেজ ও মাড়োয়ারীকে দেখ—কত স্ফূর্ত্তি, কত আশা। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে এসে পাঁচ বছরে আমাদের যুবকের ডিগ্রী ও চাকরীর মোহ ঘুচে যায়, ব্যর্থতা ও বিফলতা তাকে ঘিরে ধরে, অবসাদহিমে ডুব্‌তে ডুব্‌তে যৌবনেই তার জীবনগ্রন্থি শিথিল হয়ে পড়ে, অকালবার্দ্ধক্যের চিহ্ন দেখা যায়। তাই বলি, প্রথম বয়সে আশা উৎসাহ ডিগ্রী নেবার চেষ্টায় নিঃশেষ ক'রে না দিয়ে আত্মচেষ্টার উপর নির্ভর ক'রে বেরিয়ে পড় দ্রব্যসম্ভারপূর্ণ প্রকাণ্ড এই দেশে, যেখানে ছয়শো-কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্য প্রত্যেক বৎসরে আম্‌দানী-রপ্তানি হচ্ছে। এই প্রকাণ্ড ব্যবসায়-ব্যাপারের সব মুনাফা ইংরেজ, জর্ম্মান্, জাপানী প্রভৃতি বিদেশীরা এবং ভারতের ভাটিয়া, দিল্লীওয়ালা, মাড়োয়ারী প্রভৃতি বণিকগণ নিজেদের মধ্যে বণ্টন ক'রে নেয়।

বাঙলা দেশের প্রধান সহর কল্‌কাতার বাসিন্দাদের শতকরা ৩৫ জন বাঙালী নয়। ইংরেজ, জাপানী, চীনা এবং হিন্দুস্থানী মাড়োয়ারী প্রভৃতি কল্‌কাতার সর্ব্বত্র বসতি বিস্তার করেছেন। ছোটখাট শ্রমসাধ্য কার্য্যগুলি পর্য্যন্ত বাঙালীর হাতছাড়া হয়ে গেছে। যুদ্ধের সময় মাড়োয়ারী অজস্র টাকা লাভ করেছেন। কল্‌কাতার ব্যবসায়ে তাঁদের কোটী কোটী টাকা খাট্‌ছে। উদ্বৃত্ত টাকায় তাঁরা বড় বড় জমিদারী কিন্‌তে আরম্ভ করেছেন ; শীঘ্রই মাড়োয়ারী বণিক্ কল্‌কাতার সব বাড়ীর মালিক হবেন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আর বাঙলাদেশে বাঙালী আমরা হতাশ হয়ে, নিরুপায় হয়ে বসে আছি। আমাদের এখন উঠে প'ড়ে লাগতে হবে, এই ভয়ঙ্কর অন্নসমস্যার মীমাংসা কর্‌তে হবে। যে শিক্ষায় শুধু মেরুদণ্ডহীন গ্রাজুয়েট তৈরী হয়, মনুষ্যত্বের সঙ্গে পরিচয় হয়

না, যে-শিক্ষা আমাদের 'ক'রে খেতে' শেখায় না, দুর্ব্বল অসহায় শিশুর মত সংসারপথে ছেড়ে দেয়, সে-শিক্ষার প্রয়োজন কি ? তাই আমি জীবনে কঠোরতার আশ্রয় ক'রে বাঙালী যুবককে ব্যবসায় বাণিজ্য ও শিল্প শিক্ষা করতে আহ্বান করছি; কারণ, বাঁচতে হলে বাঙালীকে আগে অন্নসমস্যার মীমাংসা করতে হবে। এতে যদি কেউ দোষ দেন যে আমি বাঙলার যুবককে মাড়োয়ারী হতে উৎসাহিত করছি তবে সে দোষে আমি দোষী সন্দেহ নেই। যাদের দেশে লক্ষ লক্ষ মণ ধান ও পাট উৎপন্ন হয় ও সেই উৎপন্ন দ্রব্য একহাত থেকে আর একহাতে তুলে দিয়ে মাড়োয়ারী প্রভৃতি বণিক্‌গণ মাঝে থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন আর সেই দেশের যুবকেরা 'হা অন্ন' 'হা অন্ন' ক'রে কেঁদে বেড়ান, ধিক্ তাদের লেখাপড়াকে! ধিক্ তাদের ইউনিভারসিটির ডিগ্রীকে! লেখাপড়া কর, মহামনীষীগণ যে-সকল তত্ত্ব লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন তার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচয় লাভ কর, চিন্তা কর, মানসিক শক্তি ও মৌলিকতাকে বিকশিত কর, কিন্তু অন্য শত পথ পরিত্যাগ ক'রে জীবিকা-অর্জ্জনের জন্যে জ্ঞানশূন্য হয়ে ডিগ্রীর লোভে ঐ ইউনিভারসিটির মুখে ছুটো না।

ইংলণ্ডে যে-সকল বিশ্ববিদ্যালয় আছে তার মধ্যে কতকগুলির নাম করা যেতে পারে যা শিল্পবাণিজ্যের কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত হয়েছে। যথা ম্যাঞ্চেষ্টার, বার্ম্মিংহাম, লিডস্, শেফিল্ড, লিবারপুল প্রভৃতি শিল্পকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ। এক-একটি ইউনিভারসিটি এক-একটি কলেজের মত, হাজার দেড় হাজার ছাত্র সেখানে অতি যত্নে শিক্ষা লাভ ক'রে থাকে; এখানকার মত স্থানাভাবে ঠেলাঠেলি বা মারামারি করতে হয় না। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৯০ লক্ষ অথবা ১ কোটি টাকা দেওয়া (Endowment) আছে। সেই অর্থ

থেকে ছাত্রেরা নানারকমের বৃত্তি পায় এবং সাহিত্য, ধর্ম্মতত্ত্ব, বিজ্ঞান, ফলিত-বিজ্ঞান, এঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি নানাবিষয়ে প্রকৃত শিক্ষা দান করা হয়। বড় বড় কারখানার সন্নিকটে স্থাপিত হ'লে এই-সকল শিক্ষাকেন্দ্রে হাতেকলমে শিল্পশিক্ষা হয়—যে-শিক্ষা ক্রমশঃ ছাত্রকে জীবনসংগ্রামের উপযুক্ত ক'রে সংসার পথে পাঠিয়ে দেয়। এই সকল ইউনিভারসিটিতে শিল্পশিক্ষাই প্রধান স্থান অধিকার ক'রে আছে, সাহিত্য দর্শন প্রভৃতি কতকটা পিছনে পড়ে গেছে। আমাদের দেশে কল্‌কাতার বাণিজ্যবিদ্যালয় (Commercial College) স্থাপন কর্‌বার কল্পনা চলেছে। কিন্তু কল্‌কাতায় সেরূপ কলেজ স্থাপিত হলে বড় বেশী লাভ হবে না। কারণ সেখানকার বাঙালী গ্রাজুয়েটরা চাকুরীই খুঁজবে আমার এরূপ মনে হয়। বোম্বাই প্রদেশে বড় বড় কার্‌খানার নিকটে শিল্পবাণিজ্য শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপিত হলে দেশের উপকার হবে আশা করা যায়।

অন্নসমস্যার সঙ্গে আমাদের দেশে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমস্যা জড়িত আছে। একের কথা আলোচনা কর্‌বার সঙ্গে সঙ্গে অন্যগুলির কথা আপনা হতেই এসে পড়ে। কারণ ঐগুলি একই সমাজের ভিন্ন ভিন্ন দিক্ ছাড়া ত আর পৃথক কিছু নয়। আমাদের সমাজের জাতিভেদ ব্যাপারটি দেশীয় শিল্পের বিনাশ সাধনে বড় কম সহায়তা করেনি। এ সম্বন্ধে স্যর গুরুদাসের উক্তি বিশেষরূপে প্রণিধান-যোগ্য। তিনি বলেন—"The caste system which has done some good has done this harm that notwithstanding its relaxation at the present day, it has created in the higher castes with all their poverty, a prejudice against agricultural, technological and even commercial pursuits."—

যাঁরা উঁচু জাত, দরিদ্র হলেও তাঁরা কৃষিশিল্প বা বাণিজ্যের দিকে ঘেস্‌তে চান না; সমাজে আভিজাত্য নষ্ট হবে এই কথাটা কুসংস্কার; আজ জাতি-ভেদের কঠোরতা কতকটা শিথিল হলেও, এখনও তাঁদের ঘাড়ে চেপে আছে। আপনারা সকলেই জানেন হিন্দুদের মধ্যে যাঁরা উচ্চ জাতি তাঁরাই অপরের চেয়ে লেখাপড়ায় অধিক অগ্রসর হয়েছেন। বাঙ্‌লাদেশে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যেরাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শিক্ষিত। মান্দ্রাজে আয়ার ও আয়েঙ্গারগণ এবং মহারাষ্ট্রে তিলক, গোখলে, পরঞ্জপে, ভাণ্ডারকর, চন্দাভরকর, এবং চিৎপাবন ব্রাহ্মণগণ বিদ্যাশিক্ষার আলোক অনেক পরিমাণে লাভ করেছেন। কিন্তু এঁরা সকলেই কেরাণী বা শিক্ষক অথবা উকীল এবং ডাক্তার। চাকুরীর ক্ষেত্রে উচুঁজাতের বাঙালী ও মান্দ্রাজীর মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে। বাঙালী গ্রাজুয়েট্‌ যদি বা ৩৫৲ টাকা চান, মান্দ্রাজী গ্রাজুয়েট্‌ ৩০৲ টাকায় খুসী। বাঙালী শাকের সঙ্গে দুটো চিংড়ী মাছ ফেলে ঘণ্ট করেন, আর মান্দ্রাজী ভাতের সঙ্গে একটু তেঁতুলের জল পেলেই তুষ্ট। আজ চালের মণ ১১৲ টাকা, মাছের সের ১৲ টাকা। কাজেই উপবাসে আমরা মারা যাচ্ছি। আমাদের যে স্কুলকলেজের লেখাপড়া শেখা, সে শুধু চাকুরীর জন্যে। উচ্চজাতীয় শিক্ষিত লোকেরা ব্যবসায়ে যেতে অনিচ্ছুক—দ্বিধাবোধ করেন। বহুকাল পূর্ব্বে জাপান ও ফ্রান্সের অবস্থা কতকটা এইরূপ ছিল। অভিজাত বংশের কেউ ব্যবসা বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হতে চাইতেন না। সেদিন তাদের কেটে গেছে—আমাদের কিন্তু কাটেনি। আজ য়ুরোপ ও জাপানের বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহে ছাত্রসংখ্যা বেড়ে চলেছে, তার কারণ শিল্প ও বাণিজ্য প্রসার লাভ কর্‌ছে এবং ছাত্রেরা সেই সকল বিষয়ে শিক্ষালাভ কর্‌বার জন্যে উত্তরোত্তর আগ্রহ প্রকাশ কর্‌ছে! আর আমাদের দেশেও ছাত্রসংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু কারণটা কি? বলা শক্ত। চাকুরীর ক্ষেত্র

ত প্রসারিত হয়নি, আর আমাদের উদ্দেশ্য শিল্প বা বাণিজ্যশিক্ষা এরূপও ত মনে হয় না। কাজেই শিক্ষালাভের এই আগ্রহকে ঠিক পথে পরিচালিত করলে দেশের উপকার হবে, শুধু চাক্‌রীপ্রিয় গ্রাজুয়েট্‌ তৈরী করলে কোন কাজে লাগবে না।

আত্মাভিমানের বশে বাঙ্‌লার উচ্চজাতি শ্রমের মর্য্যাদা ক্রমশঃ ভুলে গিয়ে ব্যবসা বাণিজ্যাদি কাজ থেকে অবসর নিলেন। এদিকে লেখাপড়া তাঁদেরই একচেটিয়া ছিল। কাজেই সমাজে এক ভীষণ অনিষ্ট সাধিত হ'ল। শিক্ষাদীক্ষার সহিত ব্যবসা বা শিল্পের আর কোন সম্পর্কই রইল না। আমাদের সমাজে বিদ্যাবুদ্ধি সব উঁচু জাতের। সমাজের নিম্নস্তরে দলিত জনসঙ্ঘের মধ্যে তাই প্রতিভার বিকাশ হ'ল না। ইংলণ্ডে ষ্টিম্‌ এঞ্জিন্‌ উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পব্যাপারে একটা ওলটপালট—একটা যুগ পরিবর্ত্তন হয়ে গেল। হাতে যারা তাঁত চালাত সেই সব তাঁতীরা প্রথমে কলের তাঁত ভেঙে দিলে। কারণ কলে অল্প পরিশ্রমে অনেক কাজ হতে লাগ্‌ল। কিন্তু ইংলণ্ড শীঘ্রই সে ধাক্কা সাম্‌লে নিতে সমর্থ হল। গোলমাল ক্রমে থেমে গেল। ইংলণ্ডে জাতিভেদ ছিল না—লক্ষ লক্ষ লোককে সেখানে নীচ জাত ব'লে অসুবিধা ও নির্য্যাতন ভোগ করতে হত না। তাই সেখানে সমাজের সকল স্তরেই প্রতিভার বিকাশ হয়েছে। তাই ক্রমে দেখা গেল শিল্পজগতের সেই পরিবর্ত্তনের যুগে নাপিত আর্করাইট—যিনি এক পেনি পারিশ্রমিক নিয়ে ক্ষৌরকার্য্য করতেন—তিনি হোলেন আবিষ্কারক। আর তাঁতি (Hargreaves) হারগ্রিভ্‌সও তাঁর নব আবিষ্কারের দ্বারা এই কার্য্যের সহায়তা করলেন। সে দেশে সকলেরই প্রতিভা সকল ক্ষেত্রে স্ফুরিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের এই জাতিভেদের দেশে? এখানে উঁচু জাত যেদিন জাত বাঁচাবার জন্যে ৬৪ কলাবিদ্যা একে একে পরিত্যাগ করলেন, সেদিন

সার্জ্জন হলেন পরামাণিক, আর বেদেরা হলেন বোটানিষ্ট। তারপর এসব ক্ষেত্রে আমরা যেমন উন্নতির পরিচয় দিয়েছি তার কথায় আর কাজ নেই! বংশগতভাবে চর্চ্চা হওয়ায় হাতের কৌশল খুব নিপুণ হয়েছিল স্বীকার করি এবং শিল্পও সূক্ষ্ম হয়েছিল। ঢাকাই মস্‌লিন শিশিরসিক্ত হয়ে থাক্‌লে কাপড় ব'লে কেউ বুঝ্‌তে পার্‌ত না। শিল্পও সূক্ষ্ম হয়েছিল। কিন্তু বংশগত হওয়ায় প্রধান ক্ষতি হ'ল এই যে,—আমাদের দেশের আবেষ্টনের মধ্যে দেকার্ৎ বা নিউটনের উদ্ভব ভাবে ও কাজে অসম্ভব হয়ে উঠল—এই জাতিভেদের আওতায় সমাজে স্বাধীনচিন্তা বা প্রতিভার বিকাশ অসম্ভব হয়ে উঠ্‌ল। কাজেই কলকব্জার রথে চ'ড়ে পাশ্চাত্য দেশে শিল্প যখন আশ্চর্য্য গতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হতে লাগ্‌ল তখন বাঙ্‌লার ফরাসডাঙ্গা ঢাকা প্রভৃতি স্থানের ও অন্যান্য তাঁতীরা শুধু অবাক্‌ বিস্ময়ে অসহায় শিশুর মত সেই দিকে চেয়ে রইল—তাদের সঙ্গে সমান গতিতে অগ্রসর হবার কল্পনাও তাদের মনে উদিত হ'ল না। অথচ এই ভারতের তাঁতী কিছুকাল পূর্ব্বে য়ুরোপের বাজারে উৎকৃষ্ট জিনিষ পাঠিয়ে প্রচুর লাভ কর্‌ত। যাহোক, এই বাণিজ্যযুদ্ধে ভীষণ পরাজয় হ'ল বাঙ্‌লা দেশের। বোম্বাই আত্মচেষ্টায় ধাক্কা সাম্‌লে নিয়ে এখন আবার মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে পেরেছে। খুব স্পর্দ্ধা ও গৌরবের কথা। বোম্বাই প্রদেশের বণিক দেখ্‌লেন সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে তুলা উৎপন্ন হয়; তখন ভাব্‌লেন—বোম্বাইএ কাপড়ের কল হবে না কেন? তারা ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে বা ঐ সময়েই কাপড়-কলে কৌশলাদির শিক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লেন। তারপর কল স্থাপন ক'রে প্রথম প্রথম অনেক লোক্‌সান দিলেন। এ সব কথা ওয়াচার লিখিত তাতা'র জীবনীতে প'ড়ে দেখ্‌বেন। তারপর একবার সফলতার মুখ দেখ্‌তেই তাঁদের আশা ও সাহস খুব

বেড়ে গেল। শেষে বাঙ্‌লার স্বদেশী আন্দোলনের সময় ত তাঁদের একেবারে পৌষমাস! তাঁরা শতকরা ৭০।৭৫ টাকা লাভ পেলেন। কিন্তু স্বদেশীর উত্তেজনার সময়েও বাঙ্‌লা দেশ কিছু কর্‌তে পার্‌লে না। বাঙালী কল কিনে বসল ৬ লাখের স্থানে ১২ লাখ দিয়ে। কিন্তু কল চালাতে হয় কি ক'রে তার খবর সর্ব্বাগ্রে না রাখায় সুফল হল না। 'বঙ্গলক্ষ্মী'র কি দশা সে সময় হয়েছিল সে কথা কারো অবিদিত নেই। আমাদের তখন শিক্ষালাভ হ'ল যে শুধু বক্তৃতার উত্তেজনা বা ভাবোচ্ছ্বাসের উপর নির্ভর ক'রে শিল্পোন্নতি হয় না। যাহোক, এখন সুখের বিষয় এই যে যুদ্ধের বাজারে তবু 'বঙ্গলক্ষ্মী' একটু মাথা খাড়া ক'রে দাঁড়িয়েছেন।

এখন বম্বে ও কল্‌কাতা একবার তুলনা ক'রে দেখুন। বম্বের ধন বোম্বাইবাসীর; কিন্তু কল্‌কাতার অর্থসম্পত্তি বাঙালীর নয়—ইংরেজ, মাড়োয়ারী, ভাটিয়া বা দিল্লীওয়ালা মুসলমানের। মান্দ্রাজের Black Town, কল্‌কাতার Native quarter—এ সব কাল আদ্‌মীর পাড়া—বঙ্ক, অন্ধকার, স্যাঁৎস্তেতে,—গলির গলি তস্য গলি এঁদো গলি। আর শ্বেতাঙ্গ যেখানে থাকেন সে একেবারে ইন্দ্রপুরী। কিন্তু বোম্বাইএ তা নয়। সেখানে বড় বড় প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় বোম্বাইবাসী ধনকুবের, ক্রোড়পতি বণিক, কাপড় কলের মালিক প্রভৃতি মহাধনী বাস করেন। মোরারজি গোকুলদাস, স্যর্ বিটলদাস্ ঠাকর্‌সে, স্যর দোরাব তাতা—এঁরা সব বোম্বাইএর তথা ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করেছেন—য়ুরোপীয় প্রতিযোগিতার সম্মুখে ব্যবসায়-বাণিজ্যে উচ্চশির হয়ে দাঁড়াবার শক্তি এঁদের আছে—বাহাদুরী সেইখানে। ইংলণ্ড থেকে ফিরে আসবার সময়—পি এণ্ড ও ষ্টীমারে একজন বম্বের মুসলমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। পরস্পরের মুখের দিকে কয়েকবার চেয়ে দেখবার পর

আলাপের সূত্রপাত হল। আমি ইংরেজীতে কথা বল্‌লাম। তিনি বল্‌লেন "নেই সম্‌ঝেতে" ইংরেজী তিনি জানেন না। বোম্বাইএ তাঁর টুপীর দোকান—টুপী আম্‌দানী করেন জার্ম্মনী, ইটালী প্রভৃতি স্থান থেকে। কথাবার্ত্তায় বুঝলাম য়ূরোপে যখনই যে বন্দরে নেমে ছিলেন তখন, যাঁদের এজেণ্ট তিনি—তাঁদের লোক আপনি এসে তাঁকে আগ বাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ভাঙ্গা হিন্দীতে কথা বলে কার্য্যনির্ব্বাহ করেছে—কারণ গরজ তাদের। মস্ত বড় ব্যবসায়ী—তাই এত খাতির—য়ূরোপের লোক হিন্দীতে কথা বলে! বাঙলা দেশে এমন কোথাও আছে কি?

বাঙালী যে ব্যবসায়-বাণিজ্যে পশ্চাৎপদ তার অন্য কারণও আছে। আমাদের সুজলা সুফলা বাঙ্‌লা দেশ—তারপর আবার আমাদের ছেলেরা পাখীর ডাকে ঘুমোয় আর পাখীর ডাকে উঠে। বাঙ্‌লার স্যাঁৎস্তেতে হাওয়ার জন্যে মেকলে বলেছিলেন এদেশে ভাঁপ্‌রা তাপের (Vapour bath) মধ্যে থাক্‌তে হয়। দেশের হাওয়ার দোষ। মিঃ চার্চ্চিল—এখন যিনি একজন প্রধান রাজমন্ত্রী, তাঁর পিতা ভারতসচিব ছিলেন। ভারত ভ্রমণ করে তিনি বলেছিলেন—এদেশে মানুষগুলো জড়ভরত হয়ে আছে—**Lulled by the languor of the land of lotus**—উলিসিসের বর্ণিত কমলবিলাসী দেশের ঘুমপাড়ানী হাওয়ায় এলিয়ে প'ড়ে। আমাদের দৌড়ানতে হাঁটা, হাঁটায় বসা, বসায় শোওয়া, আর শোওয়ায় ঘুমোনো। বাঙ্‌লা উর্ব্বরা—একটু চষে বীজ ছড়িয়ে দিলেই অঙ্কুরোদ্গম হয়। এই নদীমাতৃক দেশে আবালবৃদ্ধবনিতাকে রৌদ্রে পুড়্‌তে পুড়্‌তে শস্য উৎপাদন কর্‌তে হয় না! তারপর ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলে যখন দেশের ভয়ানক দুর্দ্দশা হ'ল, লোকাভাব হ'ল, জমি বিনা-আবাদে পতিত রইল, তখন নানাবিধ অসুবিধা দেখে লর্ড কর্ণওয়ালিস বল্‌লেন—রাজস্বের পরিমাণ বাঁধাধরা হোক।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়ে গেল। সকলেই কিছু কিছু জমিজমা যোগাড় ক'রে পায়ের ওপর পা দিয়ে ব'সে খাবার বন্দোবস্ত করতে লাগল। এই 'পায়ের ওপর পা দিয়ে ব'সে খাওয়া' কথাটি এখনও দেশে চরম সুখের পরিচায়ক। কিন্তু সবাই মিলে ব'সে খেতে চাইলে চল্‌বে কেন? যেমন য়ূরোপের কল্‌কারখানা এসে আমাদের জোরে ধাক্কা দিল, অমনই ব'সে খাবার সুখ ঘুচে গেল, আর ব'সে খাওয়ার প্রবৃত্তিজনিত অলসতা আমাদের সর্ব্বনাশ করলে। আবার যাঁদের টাকা জমেছে তাঁরা হয় কোম্পানীর কাগজ বা মহাজনী করবেন, নয় জমিদারী কিন্‌বেন এবং বংশানুক্রমে তা ভোগ করবেন; এছাড়া টাকা খাটাবার অন্য কোন মৎলব নেই। কাজেই বাঙালীর ব্যবসায়ে প্রবৃত্তি হয়নি। বরং এই সকল কারণে আমাদের মধ্যে অলসতা, শ্রমবিমুখতা ও বিলাস-পরায়ণতা প্রভৃতি দোষ প্রবেশ করেছে। বাঙ্‌লার বারভূইয়া জমিদার ছিলেন। জমিদারী ও চাক্‌রী নবাবী আমল থেকে বাঙালীর রক্তে ও ধমনীতে। কিন্তু এখন আর ওপথে গেলে চল্‌বে না। ডিগ্রী ও চাক্‌রীর মোহ, জলহাওয়া ও অভ্যাসের দোষ, অধ্যবসায় ও আত্ম-বিশ্বাসের বলে ছাড়িয়ে উঠ্‌তে হবে। অনেকে অভিযোগ করছেন—আমি লেখাপড়া ঘুচিয়ে দিয়ে বাঙালীর ছেলেকে মাড়োয়ারী হ'তে বলছি। বড় বড় য়ুরোপীয়ান বণিক—তাঁরা কি গণ্ডমূর্খ? তাতা, বিঠলদাস, ইব্রাহিম করিমভাই—এঁরা কি গণ্ডমূর্খ? লেখাপড়ার অভাবে মাড়োয়ারী এদের মত হতে পারেনি, মাড়োয়ারী ব্যবসা শিখলেও শিল্পপ্রতিষ্ঠায় কোন কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি। লেখাপড়া ও ব্যবসা বাণিজ্য পরস্পর-বিরোধী নয়। আমি মাড়োয়ারীকে বল্‌ব—ব্যবসার সঙ্গে লেখাপড়া শেখো; আর বাঙালীকে বল্‌ব—ব্যবসা কর চাক্‌রীর মায়া ছাড়।

দেশে অন্নসমস্যা দিন দিন কঠিন হতে কঠিনতর হয়ে উঠ্‌ছে, অথচ যার বলে 'ক'রে-খেতে' পারা যায় এমন কোন শিক্ষার বন্দোবস্ত শীঘ্র হয়ে উঠবে এমন কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ইউনিভারসিটি-ডিগ্রীর প্রসাদে কায়ক্লেশে ৪০।৫০ বা ৬০৲ আস্‌তে পারে; কিন্তু তার ফলে মধ্যবিত্ত বাঙালীর দারিদ্র্য-দুঃখ ঘুচে যাবার কোন আশা কারো মনে উদিত হচ্ছে না। চাক্‌রীর দুর্দ্দশার কথা অনেকবার বলেছি—সেই সম্পর্কে আর-একটা কথা বলি। বাজারে চাক্‌রী এখনও মেলে জানি—১৫।২০ বা ২৫৲ মাহিনা, কিন্তু এও মেলা বড় ভার হয়ে উঠ্‌ছে। আগে পাশ কর্‌লে চাক্‌রী হ'ত। এখন অবস্থা এমনি দাঁড়িয়েছে যে চাকরীর উমেদারী ক'রে হার মেনে গিয়ে একজন গ্রাজুয়েট রেল-কোম্পানীর স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে কুলী-লাইসেন্স পাবার আশায় দরখাস্ত লিখেচেন। সে দরখাস্ত আমার কাছে এসেছিল। ব্যাপার ত এই! এর উপর আর কিছু বল্‌তে হবে কি? আজ অন্নসমস্যার মীমাংসা সম্বন্ধে দুচারটি কথা বল্‌ব। কোন্ পথ অবলম্বন কর্‌লে—আমরা এই পেটের দায় থেকে নিস্তার পাব তা আমি ইতিপূর্ব্বে কতকটা নির্দ্দেশ কর্‌বার চেষ্টা করেছি আজ সেই কথাই আরও স্পষ্ট ক'রে বল্‌ব। তাই বলে কেউ মনে কর্‌বেন না যে আমি এখন একটা সোজা এবং বাঁধাপথ দেখিয়ে দেব যা অবলম্বন কর্‌লে সহজে এই মরাবাঁচার কথার মীমাংসা হয়ে যাবে। তা নয়! সমস্যা যেমন জটিল, আমাদের চেষ্টা ও অধ্যবসায় তেমনই প্রচণ্ড হওয়া চাই।

আমাদের দেশের অনেক যুবক বিদেশ থেকে ইলেক্‌ট্রিক্যাল্ ইঞ্জিনিয়ারিং, রং করা, চামড়া-কষ-করা প্রভৃতি শিখে আস্‌ছেন। কিন্তু আমরা তাঁদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পার্‌চি কৈ? শুধু রঙ বা চামড়া বা অন্য কিছুর কার্য্য শিক্ষা কর্‌লেই ত চল্‌বে না। শিক্ষালব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ কর্‌বার জন্যে উপযুক্ত ক্ষেত্র চাই। তাই বল্‌ছি আমাদের

বড় বড় কারখানা খুল্‌তে হবে। কার্‌খানা থেকে একদিকে যেমন উৎপন্ন দ্রব্য আমরা দেশ-বিদেশে পাঠাতে পারব, অন্যদিকে তেমনি শিল্পশিক্ষার দ্বার যথার্থভাবে উন্মুক্ত হবে। কল্পনা অনেক দূর ছুটেছে বটে, কিন্তু এই সব কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত কর্‌তেই হবে যদি আমাদের এই পৃথিবীতে বেঁচে থাক্‌বার সাধ থাকে। এই দেখুন, মিঃ জি সি সেন—ইংলণ্ড থেকে ইনি Dyeing বা রং-করা শিখে এসেছেন। কিছু-দিন ইনি বঙ্গলক্ষ্মী মিলে কাজ কর্‌লেন। কিন্তু বঙ্গলক্ষ্মীতে কাজের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ। সেখানকার কাজ এত বড় নয় যে ঐরূপ একজন বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয়। একজন চলনসই লোক থাক্‌লেই সেখানে চ'লে যায়। কাজেই তাঁকে ঘুরে ফিরে গবর্ণমেণ্টের চাক্‌রী নিতে হোলো। এত কষ্ট স্বীকার ক'রে শিল্প সম্বন্ধে যে বিদ্যাটুকু তিনি বিদেশ থেকে নিয়ে এলেন উপযুক্ত ক্ষেত্রের অভাবে সে বিদ্যার কোন ব্যবহারই হলো না। সেইরূপ এ সি সেন, এস কে দত্ত প্রভৃতি। শরৎকুমার দত্ত জার্ম্মানিতে ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিখে এসে দেশে কোন কাজ যোগাড় কর্‌তে না পেরে শেষে জার্ম্মানির যে কার্‌খানায় কাজ শিখেছিলেন সেইখানেই ফিরে গেলেন। তিনি এখন সেইস্থানে খুব একটা উচ্চপদ অধিকার ক'রে আছেন। এদেশে বড় কার্‌খানা থাক্‌লে তিনি শক্তির পরিচয় দিতে পার্‌তেন সন্দেহ নেই। এখানেও অনেক ছাত্র রসায়নে এম-এ বা এম-এস-সি পাশ ক'রে য়ুরোপীয়ানদের কার্‌খানায় চাক্‌রী নিতে বাধ্য হচ্ছেন। আফিসে যেমন বাবু কুলী থাকে, এঁরাও তেমনি কেমিক্যাল-কুলী—দেশ থেকে অর্থ শোষণ ক'রে নিতে য়ুরোপীয়ানদের সাহায্য কর্‌ছেন। তাই বল্‌ছিলাম—আমাদের কার্‌খানা খুল্‌তে হবে। ফলিত বিজ্ঞানের (Applied Science) সাহায্যে আমাদের বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খাড়া ক'রে তুল্‌তে হবে।

কিন্তু শিল্পোন্নতির আগে চাই সাধারণ কেনাবেচার মধ্য দিয়ে ব্যবসা করা। ব্যবসা আরম্ভ ক'রেই কিছু সফল হওয়া যায় না। চেষ্টা চাই, ধৈর্য্য চাই। কেমিষ্ট্রী বা রসায়ন শিখ্‌তে হলে যেমন পরীক্ষাগার (Laboratory) চাই, ব্যবসা শিখ্‌তে হলেও পরীক্ষাগারের তেম্‌নি দরকার। ক্লাইব ষ্ট্রীট, ক্যানিং ষ্ট্রীট, বড়বাজার, এজরা ষ্ট্রীট—এইসব স্থান হচ্চে ব্যবসা-শিক্ষার পরীক্ষাগার। এইসব রাস্তায় চোখ চেয়ে ঘুরে ফিরে বাজারের হালচাল বুঝতে হবে। কোন মাড়োয়ারী বা য়ুরোপীয়ান দোকানে সুবিধা গেলেই কাজ শেখবার জন্যে ভর্ত্তি হতে হবে। কারণ ব্যবসায় কার্য্যে শিক্ষানবিশীর বড় প্রয়োজন। এসব ক্ষেত্রে ভূঁইফোড়ের স্থান নেই, হাতেকলমে কাজ শিখতে হবে, একথা আমি পূর্ব্বেই বলেছি।

আমাদের দেশে ৬০০ কোটি টাকার মাল আমদানী রপ্তানি হয়। এই আমদানি রপ্তানির কাজ এগিয়ে দিয়ে কল্‌কাতায় কত য়ুরোপীয়ান ও মাড়োয়ারী মাঝে থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করে নেয়। আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে পাট হয়। কিন্তু ক্ষেতে থেকে পাটকলে পৌঁছবার আগে এই পাট অনেক হাত ঘোরে। এই সব middleman হচ্ছেন য়ুরোপীয়ান বা মাড়োয়ারী বা আর্‌মিনি, পূর্ব্বেই বলেছি। এক হাত থেকে জিনিষ নিয়ে অন্য হাতে তুলে দিয়ে এঁরা মাঝথেকে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন ক'রে থাকেন। কিন্তু যে জমিদার মহাশয়ের জমিতে পাট জন্মায় তিনি ছেলের একটা বড় চাক্‌রীর জন্যে ম্যাজিষ্টর-সাহেবের দ্বারে ধন্না দিয়ে প'ড়ে থাকেন—একবার ভুলেও চেয়ে দেখেন না যে এরূপে দালালগিরি কর্‌লে তাঁর পুত্র কয়েকটা বড় চাকুরে অপেক্ষা বেশী টাকা আন্‌তে পারেন। এরূপ শুধু পাট নয়—ধান, সরিষা, তিসি, ছোলা, গম, যব, প্রভৃতি নানাবিধ ফসল মাড়োয়ারী ও য়ুরোপীয়ানদের হাত দিয়ে চ'লে

যায়। এই সব কাজ যদি বাঙালীর নিজের হাতে থাক্‌ত তবে অন্নসমস্যা আজ এত কঠিন ও জটিল হয়ে উঠ্‌ত না।

তারপর চামড়া, কেরোসিন তৈল প্রভৃতি জিনিষের আমদানী-রপ্তানি আছে। কল্‌কাতায় ১০।১৫ কোটী টাকার রপ্তানি হয়। ক্যানিং ষ্ট্রীট দিয়ে নাক বন্ধ ক'রে চল্‌বার সময় চামড়ার কথা খুব ভালরকমই বোঝা যায়। বাঙালীর কিন্তু যেন প্রতিজ্ঞা—ওসব ছুঁতে নেই। তাই ইংরেজ ও মুসলমান চামড়ার ব্যবসা একচেটে করেচেন। আর ২৫৲ মাহিয়ানায় নৈকষ্যকুলীনের সন্তান মুসলমান প্রভুর আদেশমত কোথায় কত চামড়া পাঠাতে হবে নাকে কাপড় দিয়ে কুলীর দ্বারা গণিয়ে দিচ্ছেন। এইসব চামড়া ব্যবসায়ীরা ক্রোড়পতি! আর এই চামড়া ধান সরিষার মত পল্লীগ্রাম থেকেই আসে,—আমরা কেউ সন্ধান লই না। কাষ্টম্‌স্ হাউসের (Customs house) ত্রৈমাসিক রিপোর্ট ভারতের আম্‌দানী ও রপ্তানি দ্রব্যের কথা প'ড়ে দেখলে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। কিন্তু আমরা তা চাই না—উপন্যাস আমাদের বড় ভাল লাগে।

আবার ইলিশ ও অন্যান্য মাছের ব্যবসাও খুব লাভজনক। নদীর ধার থেকে বরফ ঢাকা দিয়ে মাছ চালান করা হয়। অনেক হাত ঘুরে মাছ যখন কল্‌কাতায় পৌছায় তখন ৸৶০ বা ১৲ সের। এরূপ চালানের কাজে বেশ লাভ আছে। তারপর পুকুরে পোনা মাছ ছাড়্‌তে হয়—নোনা জলে নদীর নোনা মাছ জন্মাবার চেষ্টা কর্‌তে হয়। এই সব মাছ বড় হ'লে অর্থাগমের বেশ একটা উপায় হয়। চম্‌কে উঠো না—আমি তোমাদের মুর্গী ও শূওরের চাষ কর্‌তে বলি—যাকে বলে Poultry Farm। নিজে দাঁড়িয়ে লোকের দ্বারা কাজ করাবে। একাজেও অর্থোপার্জ্জন বেশ হয়। আর কত নাম আমি কর্‌ব? তোমরা স্কুলকলেজের ছাত্র। বৎসরে ছয়-সাত মাস ছুটি পাও। ছুটিতে

ছেলেরা সবাই দেশে যায়। আমিও আমার দেশে যাই। দেশে গিয়ে দেখি ছুটি পেয়ে ছেলেরা এলিয়ে পড়ে। রাত্রে ৮।১০ ঘণ্টা ঘুম দেবার পর আবার মধ্যাহ্নে বারোটা থেকে তিনটা পর্য্যন্ত নিদ্রা। আর বাকী সময়টা তাসপাশা ও আড্ডায় কেটে যায়। অলস হলে লক্ষ্মীছাড়া হতে হয়। এই নিদ্রা ও চপলতায় যে সময়টা নষ্ট হয় সেই সময়টার সদ্ব্যবহার করিবার দায়িত্ববোধ জন্মান দরকার। নিদ্রা ও আলস্য ত্যাগ ক'রে ছাত্রেরা দেশের নানাস্থান দেখে শুনে সময়টা কাজে লাগাতে পারে। এরূপে দেশের সকল স্থান ও সকল প্রকার লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ হয়। আর কোথায় কি ভাবে কত বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য উৎপন্ন হয় এবং কত লোকের হাত দিয়ে কত প্রকারে ঐসকল উৎপন্ন দ্রব্য নানা-স্থানে চ'লে যায় তার সন্ধান পাওয়া যায়। বেশ সুনিপুণভাবে এই সকলের সংবাদ রাখলে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ হবে এবং চাকুরী ছাড়া 'নান্যঃপন্থা' এই ভ্রম ঘুচে গিয়ে অন্নসংস্থানের অনেক নূতন পথ চোখের সুমুখে খুলে যাবে। এই সব অনুসন্ধানের ফলে দেশের কোথায় কোন্ বিদেশী বণিক টাকা দাদন দিয়ে উৎপন্ন দ্রব্য কৌশলে আপন হাতে এনে ফেল্‌চেন তারও যথার্থ খবর নিশ্চয়ই আস্‌বে।

আমার অনেক ছাত্র রসায়ন-শাস্ত্রে এম্‌এ, বা এম্-এস্‌সি পাশ করেছেন। তাঁদের মধ্যে চার পাঁচ জনে মিলে চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি কোম্পানী নাম দিয়ে একখানা পুস্তকের দোকান খুলেছেন। সে দোকান আজ বেশ চলেছে। এঁরা কয়েক শত টাকা মাত্র মূলধন নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করেন। এঁরা বাধা কি পাচ্ছেন না? খুবই পাচ্ছেন। কিন্তু এদের জিদ্ আছে—প্রতিজ্ঞা খুব দৃঢ়। এঁরা বলেন, "আমরা কৃতকার্য্য হবই হব।" তাই আজ শুধু বই নয় অন্যান্য অনেক বিষয়ে এঁদের লোক নূতন নূতন ব্যবসার পত্তন করছেন। এ সকল স্বপ্নের

কথা নয়—অনেকেই উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সহিত চেষ্টা ক'রে এইরূপ কৃতকার্য্য হয়েছেন'।

ব্যবসায়ে চাই কি? চাই ধৈর্য্য, চাই সাধুতা। আরম্ভ সামান্যভাবে হবে বটে, কিন্তু এই সামান্যের মধ্যে সফলতার বীজ নিহিত আছে। একেবারেই কেহ খুব বড় হয়ে উঠ্‌তে পারে না; আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হওয়া সম্ভব নয়। কার্ণেগী বাল্যকালে সর্ব্বপ্রথম রাস্তায় খবরের কাগজ বেচ্‌তেন। স্যর দোরাবজী তাতা—যাঁর লোহার কারখানায় আজ লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ হচ্ছে—তিনি একবার বলেছিলেন যে তাঁর ম্যানেজার মিঃ তুৎউইলার সংসারপথে প্রবেশ ক'রে প্রথমে নিগ্রো জুড়ীদারের সঙ্গে এঞ্জিনে কয়লা ঢালতেন। আর ধৈর্য্য অধ্যবসায়ের বলে আজ তিনি কত টাকা উপার্জ্জন কর্‌ছেন। মাড়োয়ারী এক পয়সার ছাতু খেয়ে পিঠে কাপড়ের বস্তা ফেলে ব্যবসায়ে প্রথম চেষ্টা আরম্ভ করে। পরে তারাই লক্ষপতি হয়ে দাঁড়ায়। আর একটা দোকান কর্‌তে গেলেই তোমাদের প্রথমে চাই বড় বড় আল্‌মারি টেবিল। ২৭।২৮ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' আরম্ভ করি তখন কুলীর মত খেটেছিলাম। কয়েক বৎসরের মাহিনা থেকে ৮০০্ টাকা জমিয়ে 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' আরম্ভ করি—আজ তার মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা।

তারপর বাঙালী কখনও অংশীদারীতে কাজ কর্‌তে পারে না। বাঙালীর দুর্ভাগ্য যে, যদি সে অংশীদার নিয়ে কাজ আরম্ভ করে তবে অনেক সময় হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়—কাজ শিখে নিয়ে অংশীদার পালায়। পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের অভাবে যৌথ কারবারেও বাঙালীর চেষ্টা সফল হয় না। এটা হচ্ছে আমাদের জাতীয় দোষ। কোন গ্রাজুয়েটকে অংশীদার হবার জন্যে অনুরোধ কর্‌লে তিনি আগে বলেন—'কত মাহিনা দিতে পার?' বাঁধা মাহিনা আমাদের চাইই। কাউকেও

যদি বলা যায়—'তোমায় ৫০৲ মাহিনা দেব আর সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত খাটতে হবে'—সে একেবারে মহাখুসী হয়ে যায়। ঘড়ি ধ'রে ১২ ঘণ্টা কলের মত কাজ ক'রে যায়। কিন্তু এম্‌নি ক'রে চাক্‌রীকে আঁকৃড়ে না ধ'রে যদি সে প্রথম কয়টা বৎসর কোন ইংরেজ মাড়োয়ারী বা বাঙালীর দোকানে শিক্ষানবিশী করে এবং বাজার ঘুরে নানা তথ্য সংগ্রহ করে তবে ভবিষ্যতে সে ব্যবসায় ক্ষেত্রে বেশ কাজের লোক হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম প্রথম পয়সা-কড়ি হয়ত আস্‌বে না, কিন্তু বি-এ বা এম-এ ও তৎপরে বি-এল পাশ করতে যে ৬।৭ বৎসর সময় লাগে সে সময়েও ত ছেলে বাড়ীর খায় আর বাড়ীর টাকা খরচ ক'রে পড়াশোনা করে। এখন ডিগ্রির প্রভাবে যখন অতি সামান্য চাকরী ছাড়া আর কিছু মেলে না তখন ম্যাট্রিকুলেশনের পর বাড়ীর খেয়ে ছেলে ত ২।৩ বৎসর ইউনিভার্‌সিটিতে না হোক কল্‌কাতার ক্যানিং ষ্ট্রীট, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, বড়-বাজার প্রভৃতি স্থানে একটা নূতন শিক্ষা লাভ করতে পারে। তবে এই শিক্ষা পাবার সুবিধা করতে হ'লে কোনো দোকানে শিক্ষানবীশ হয়ে প্রবেশ কর্‌তে হয়। এইরূপ প্রবেশলাভের সুবিধার জন্যে নানাভাবে চেষ্টা করা উচিত। ভবিষ্যতে এসব চেষ্টার সার্থকতা আছেই।

আমরা একে ত মিলেমিশে কোন কাজ কর্‌তে পারি না, তার উপর আমাদের অনেকে প্রথম উদ্যমে ব্যবসায়ে প্রবেশ ক'রে অল্পদিনের মধ্যে সফলতা লাভের জন্য অধীর হয়ে উঠেন। আর যদি প্রথমে কিছু লোকসান হয় ত অমনি ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে হা চাকরী হা চাকরী ক'রে বেড়ান! কিন্তু স্থিরভাবে লেগে থাকতে না পারলে ব্যবসায় ক্ষেত্রে সফলতা লাভের আশা দুরাশা মাত্র। তাঁরা বোঝেন না যে লোকসান দিয়ে তাঁরা বরং দক্ষ হলেন। আসল মাঝি সেই, যে পদ্মা পার হয়েছে, মাথার উপর দিয়ে যার অনেক ঝড়ঝাপ্টা গেছে। ঝড়ঝাপ্টা না

পোহালে কোন্ কাজই হয় না। কাজ আরম্ভ করবে, আর 'আপ্‌সে অবাধে সহজে সিদ্ধিলাভ হবে, এসব মূর্খের সুখস্বপ্নমাত্র। হতাশ হওয়া একেবারেই ঠিক নয়। তোমরা হতাশ হ'য়ো না—তা হলেই লোক্‌সান যাকে বল্‌ছ তার মধ্যে লাভ দেখ্‌তে পাবে। পাঁচবার ধাক্কা খেয়ে তবেই শিক্ষালাভ হয়। আবার আমরা যদি একবার শুনি অমুক ব্যবসায়ে অমুক খুব লাভবান্ হয়েছে অমনি যে যেখানে আছি সকলেই ছুট্ দি সেইদিকে।—যেন সেই ব্যবসাটা না কর্‌লে আর লাভ হবে না। আবার অনেকে এক জায়গায় কিছুদিন কাজ শিখে বলেন ভাল লাগে না—অম্‌নি আর একটা ধর্‌তে যান। এম্‌নি ক'রে এটা নয় ওটা কর্‌তে কর্‌তে শেষে বাঁধা পড়্‌তে হয় সেই চাকরীর খোঁটায়। তাই বলি বিবেচনা ক'রে একটা দিক্ ঠিক ক'রে ধর, আর সেইখানেই লেগে থাক। অনেক অসুবিধা হবে, অনেক আশাভঙ্গ হবে! কিন্তু আন্তরিক চেষ্টার ফলে শেষে সব শ্রম সার্থক হয়ে উঠ্‌বে।

শিক্ষানবীশির কথা অনেক বারই বলেছি। আর একটা কথা সেই সঙ্গে বল্‌তে চাই—সেটা হচ্ছে শ্রমের মর্য্যাদা। এই জ্ঞানটা আমাদের বড় কম। 'পরিশ্রম কর্‌লেই ছোটলোক হ'ল' এরূপ একটা ধারণা আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে আছে। আমি সেই যুবকটিকে ধন্যবাদ দিই যিনি বলেন কুলীগিরি কর্‌'ব ;—এঁর বাহাদুরী আছে। 'ব'সে খাব বা কারও স্কন্ধে চেপে খাব,' এ বড় লজ্জার কথা—বড় জঘন্য কথা! এরূপ লোককে কিছু কর্‌তে ব'লে রাগ কর্‌বেন, কারণ কাজ কর্‌তে হ'লে এঁদের মানের লাঘব হয়। কিন্তু 'ব'সে খাব',—এই চিন্তার স্থানে 'ক'রে খাব'—এই চিন্তাই ভাল। য়ুরোপ শ্রমের মর্য্যাদা বোঝে। বাইবেলে আছে—"you shall not eat except by the sweat of your brow" মাথার ঘাম পায় ফেলে যে পরিশ্রম

করে ভোগে অধিকার তারই আছে। যে অলস যে পরভাগ্যোপজীবী—তার বেঁচে থাক্‌বার অর্থ নেই। যে কেউ সৎপথে থেকে আপন পরিশ্রমে আপনি উপার্জ্জন করে সেই আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র—সে ছোটলোক নয়—ভদ্রশ্রেষ্ঠ—এই কথা আমাদের মনে রাখ্‌তেই হবে।

আমাদের ব্যবসার ক্ষেত্রে টাকার অভাব তত নয় যত উপযুক্ত মানুষের অভাব। কোনো সভাসমিতিতে ভলান্টীয়ারের অভাব হয় না—কিন্তু যথার্থ কষ্টস্বীকার ক'রে যেখানে কাজ করতে হয় সেইখানেই আমরা লোকাভাব দেখি। আমাদের উৎসাহ খড়ের আগুনের মত দপ্‌ ক'রে জ্বলে ওঠে, কিন্তু আবার খপ্‌ ক'রে নিভে যায়। এরূপ ভাবোচ্ছ্বাস কর্ম্মপঙ্গুত্ব আনয়ন করে। স্বদেশীর সময় গোলদীঘির ধারে অনেক ভাবোচ্ছ্বাস হয়েছিল। কিন্তু ব্যবসার কার্য্যে শিক্ষানবীশি চাই, অক্লান্ত চেষ্টা চাই—ভাবোচ্ছ্বাস কি ব্যবসা-বাণিজ্যের ভিত্তি হতে পারে? ভাবপ্রবণ হও, খুব বড় কল্পনা কর, ভাবুকতার বলে গতানুগতিকের গণ্ডী ভেঙে ফেল, নূতন পথে এগিয়ে চল, কিন্তু দেখো পঙ্গু ভাবুক হয়ো না;—ভাবকে কর্ম্মে আকার দাও—কর্ম্মে ভাবের প্রতিষ্ঠা কর। চরিত্রবান্‌ হও। বাঙালী বড় অলস; সুখ চায়। কিন্তু সুখ খুঁজলেও সুখ কি আর মিল্‌বে? অলসতা ও সুখপ্রবণতাই হচ্চে আমাদের জাতীয় দুর্ব্বলতা। এসব ত্যাগ ক'রে আমাদের এখন একনিষ্ঠ সাধনা করতে হবে—তবেই এ অস্তিত্ব-সঙ্কট থেকে রক্ষার উপায় হবে। আমাদের এখন আত্মবিশ্বাস চাই, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস চাই, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের উপযুক্ত হওয়া চাই। আমাদের চরিত্রে গলদ কোথায় খুঁজে বার করতে হবে; সঙ্গে সঙ্গে একটি দোষ পরিহার ক'রে তার স্থলে গুণের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমাদের এখন শ্রমশীল হওয়া চাই, অদম্য উৎসাহ চাই, সাহস ও

ধৈর্য্য চাই—মোটের উপর খাঁটি ও শক্ত মানুষ হওয়া চাই। নচেৎ ফিন্‌ফিনে ধুতিপরা, পাঞ্জাবী আস্তিন গায়ে, থল্‌থলে গোলগাল ন্যাদুসমুদুস নন্দদুলাল—এই ধরণের অকেজো পুতুল নিয়ে এই সঙ্কট-কালে আমরা কি করব? কঠিন সমস্যা সকলের মীমাংসা করবার ভার আমাদের হাতে—আমাদের কি দুর্ব্বলচিত্ত, চাকরীপ্রিয়, বিলাসী বাবু হওয়া সাজে? শক্ত হতে হবে, দৃঢ়ব্রত হতে হবে, মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট মানুষ হতে হবে। অন্নসমস্যার মীমাংসা করতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রশ্নের সমাধান হয়ে যাবে। তাই ব্যবসা বাণিজ্য ছাড়া আজ আমার অন্য কিছু বলবার নেই। এসব কাজে আমাদের স্পৃহা নেই—প্রবৃত্তি নেই। এই প্রবৃত্তি আগে জাগিয়ে তুলতে হবে, এই স্পৃহা মনে তীব্র হলে নূতন পথে চলবার সাহস হবে। তাই এত কথা বলছি।

ছাত্র যাঁরা তাঁদের বিশেষ ক'রে বলছি। প্রতিকারের উপায় তাঁদেরই করতে হবে। লেখাপড়া শিখতে বারণ করছি না—লেখাপড়া চাই। লেখাপড়ার অভাবে মাড়োয়ারীর টাকা অন্নছত্র বা পিঞ্জরাপোল ছাড়া দেশের অন্য কাজে লাগ্‌চে না। কিন্তু দেশের অভাব আজ কত বেশী তা কি ব'লে জানাতে হবে? রবীন্দ্রনাথের ভাষ

> "বড় দুঃখ বড় ব্যথা—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার—
> বড়ই দরিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র বদ্ধ অন্ধকার!—
> অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
> চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু
> সাহসবিস্তৃত বক্ষপট!....................."

আমার সাধের রসায়ন-শাস্ত্রচর্চ্চা ফেলে কেন আমি এসব কথা তোমাদের কাছে বলতে এসেছি? আমার বিশ্বাস অদূর ভবিষ্যতে

ভারতবর্ষ সকল বিষয়ে প্রাধান্য লাভ করবে। যে দেশে রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ—প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেছেন, গোখ্‌লে ও গান্ধীর মত আদর্শ ত্যাগী যে দেশের সন্তান, যে দেশে জগদীশচন্দ্র, রামানুজম্‌. পরাঞ্জপ্যের প্রতিভায় আজ পাশ্চাত্য জগত মুগ্ধ, সে দেশের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল আমি বিশ্বাস করি। বাঙ্‌লা দেশে আমরা আমাদের অনেক দোষ ও দুর্ব্বলতা পরিহার ক'রে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক ও শিক্ষাসম্বন্ধীয় নানা বিষয়ে নানাপ্রকারের আলোচনা ও কার্য্য আরম্ভ করেছি—কিন্তু এই অন্ন-সমস্যাই বাঙালীর আশা, উৎসাহ ও স্বাস্থ্যনাশ ক'রে, সর্ব্বনাশ করতে বসেছে। তাই তোমাদের বল্‌ছি—তোমরা ভাব, বোঝ এবং কাজে লেগে যাও। পৃথিবীতে আমাদের দাঁড়াতে হবে—মানুষের মত উচ্চশির হয়ে দাঁড়াতে হবে।

৩

অন্ন-সমস্যা ও তাহার সমাধান*

ম্যালেরিয়ায় দেশ শ্মশান হইয়াছে। দুই-একটি জেলা ছাড়া সমগ্র দেশে জন্ম হইতে মৃত্যুর আধিক্য। ম্যালেরিয়ার অন্যতম কারণ অন্নাভাব। উদর পূর্ত্তি করিয়া দুবেলা আহার করিবার সৌভাগ্য শতকরা ক'জনের আছে, তাহা তো সকলেই জানেন। আজ দেশের যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সর্ব্বত্র অন্নাভাব ও হাহাকার।

এই দুরবস্থা হইল কেন? আজ যে হঠাৎ হইয়াছে, এমন নয়। আজ শত বর্ষ ধরিয়া তিল তিল করিয়া আমরা এই দুঃখ অর্জ্জন করিয়াছি। আমাদের কার্য্যক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ—ক্ষুদ্র গণ্ডীর আবেষ্টনে সীমাবদ্ধ। ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভ হইতে ইংরেজী লেখাপড়া শিখিয়া আমরা কেবল উকীল, মোক্তার, ডাক্তার ও কেরাণী হইতেছি। এ রকম করিয়া জাতি কতদিন টিকে? দেশে মাম্‌লা মোকদ্দমা যখন আছে, তখন উকীলদের দরকার। ব্যামো পীড়ার প্রকোপ নিবারণকল্পে ডাক্তারও একটা আবশ্যকীয় আপদ্‌। প্রয়োজনের প্রায় বিশগুণ অধিক উকীল সৃষ্ট হইয়াছে এবং প্রবলবেগে আরো সৃষ্ট হইতেছে। আশু-বাবু হোমিওপ্যাথিক বিষে বিষক্ষয় নীতির অনুসরণ করিয়া আরো উকীল তৈরী করিতেছেন।

মুসলমান রাজত্বের অবসানে বাঙ্গালী হিন্দু বুঝিয়া লইলেন যে, পার্শী পড়িয়া মুন্সী হইলে আর চলিবে না। তখন উদরান্নের সংস্থান ও মানসিক

---

* টাঙ্গাইল জনসাধারণের নিকট প্রদত্ত মৌখিক বক্তৃতার সারাংশ। শ্রীমান জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, এম্‌-এস-সি কর্ত্তৃক অনুদিত।

উৎকর্ষ সাধনের জন্য অনেকেই পার্শী পড়িতেন। আমার পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যেও কেহ কেহ পার্শীতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে ও পরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সৃষ্টি হইলে সকলে ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করায় ইংরেজ দেখিলেন যে, ইহাদের দ্বারা রাজকার্য্য পরিচালনের বড়ই সুবিধা হয়। তাই তখন ইংরেজী জানিলেই চাকরী। কেহ ওকালতী পাশ করিলেই সরকারী উকীল, বি-এ পাশ করিলেই হাকিম। এইরূপ সরকারী চাকরী অনায়াসলভ্য হওয়ায় ও তাহার সম্মানের সম্বন্ধে একটু মিথ্যা মোহ থাকায় বাঙালীগণ আরামপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া ইংরেজী চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিলেন। তখনকার দিনে রামদুলাল দে, মতিলাল শীল প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যবসায়িগণ কিরূপে প্রভূত অর্থ উপায় করিয়া ক্রোড়পতি হইয়াছিলেন, তাহা এখন আখ্যান বিশেষ। এই সমস্ত ব্যবসায়িগণের অনেকেই জমিদার হইয়া পড়েন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কৃপায় তাঁহাদের পুত্রপৌত্রাদি সেই-সমস্ত বিষয় সুখে ভোগ-দখল করিলেন। হৌসের মুৎসুদ্দি ও বেনিয়ানের পদ ক্রমে ক্রমে মাড়োয়ারীরা করতলস্থ করিলেন। অচিরাৎ উদ্যমস্পৃহার অভাবে বাঙ্গালীর ব্যবসা বাণিজ্য প্রায় লুপ্ত হইল।

বাঙ্গালী জাতিকে অধঃপতিত করিবার জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বহুলপরিমাণে দায়ী। এই প্রথায় যেমন কল্যাণ হইয়াছে কিছু, অপকার ও অকল্যাণ হইয়াছে অনেক বেশী। গবর্ণমেণ্ট ও জমিদার এবং প্রজার মাঝামাঝি নানা প্রকার লোকের স্বত্ব আছে। যেমন, তালুকদার, পত্তনিদার, ইত্যাদি। এ-সমস্ত উপস্বত্ব ভোগীরা শুধু আলস্যে বসিয়া বসিয়া দিন গুজরান করে। ইহাদের দ্বারা দেশের কল্যাণকর অর্থোৎপাদক (productive of wealth) কোন কার্য্য হয় না। এই ময়মনসিংহ জেলার ৪৫ লক্ষ লোকের মধ্যে যদি ৪৫০০০ হাজার ভদ্রলোক চাকরী

আদি করেন, তবে শতকরা একজন এবং ২২॥০ হাজার হইলে শতকরা আধ জন উপার্জ্জক, আর বাদ বাকী ভদ্রলোক সকলে জমির সঙ্গে কোন না কোন প্রকারে সংসৃষ্ট হইয়া আলস্যে দিন কাটান। এই উদ্যমবিহীনতাই জাতির দুর্গতির অন্যতম কারণ, সর্ব্বপ্রকার সর্ব্বনাশের প্রধানতম হেতু।

কার্য্যক্ষেত্রের সঙ্কীর্ণতা ধনাগমের পথকে রুদ্ধ করিয়াছে। ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় কত লোক কত প্রকারে অর্থোপার্জ্জন করে। সেখানে চাকুরীজীবী হীন বলিয়া গণ্য হয়। সে-দেশে জাহাজে কত দেশ-বিদেশের পণ্য পারাপার হয়। এই ব্যবসায়ে কত লোকের উদরান্নের সংস্থান হয়। সাগরে ঝড়-ঝঞ্ঝা অবহেলা করিয়া কত লোক নৌবৃত্তি অবলম্বন করে। এলিজাবেথের পর হইতে বম্বেটিয়ার দস্যুতাবৃত্তি (piracy) বন্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু বিপৎসঙ্কুল-কার্য্য-প্রিয় ইংরেজ পৃথিবীকে তাহার জাহাজ দিয়াই করায়ত্ত করিয়াছে। বাণিজ্যজীবী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এ-দেশের মালিক হইয়াছিলেন। তাই আজও আমরা বলি "কোম্পানীর মূলুক।"

আগে জাহাজ পালে চলিত। বাল্যকালে গঙ্গার ঘাটে পাল-উড়ান জাহাজ দেখিতে পাইতাম। এখনত কলকব্জার দিন। এক-একখানি বাণিজ্যপোত করিতে কত লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। তা ছাড়া এক-একখানি নূতন ধরণের রণপোত নির্ম্মাণ করিতে ৩।৪ কোটি টাকার কমে হয় না। কত সরঞ্জাম, কত ইঞ্জিনিয়ার, কত নক্‌সাদার প্রথমেই দরকার। তারপর হাজার হাজার টন লোহার প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন সরবরাহ করিতে কত লোহার কারখানা। যাঁহারা তাতার লোহার কারখানা দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, একটি লোহার কারখানা কি! কত সহস্র লোক সেখানে খাটে। দানবীর এণ্ড্রু কার্ণেগীর লোহার কারখানা বিক্রি হইল ৯০ কোটি টাকা দামে! তারপর সেই লোহা পেটা ও

ঢালাইয়ে কত লোক খাটে। হাতুড়ির ঘায়ে আর অবশ্য এখন পেটাই হয় না, কিন্তু বাতাস-ঠেলা হাতুড়ি (pneumatic hammer) চালাইতেও কম লোক লাগে না। তারপর জাহাজ চালাইতে কয়লার দরকার। খনিতে কত লোক খাটে তাহা আপনারা জানেন। এইরূপে একটি ব্যবসায় আরো কত ব্যবসায়কে জীবিত রাখে।

টাঙ্গাইল, ঢাকা, ফরাসডাঙ্গা অঞ্চলে যে-সমস্ত উৎকৃষ্ট বস্ত্র নির্ম্মিত হইত, লাঙ্কাসায়ার এদের স্থান কাড়িয়া লইয়া খুব উন্নত হইয়াছে এ-কথা সকলেই জানি। কিন্তু তাহাদের উন্নতি সম্বন্ধে বিবরণ পড়িয়া কোন স্পষ্ট ধারণা হওয়া সম্ভব নয়। সেদিন বিলাতে ম্যাঞ্চেষ্টারের পাইকারী সমবায় ভাণ্ডার (Co-operative Wholesale Stores) দেখিতে গিয়াছিলাম। আমি ও কয়েকটি ভারতীয় ছাত্র কর্ম্মকর্ত্তার সঙ্গে দেখিতে যাই! মোটর কারে কার্য্যস্থলে আমাদিগকে লইয়া গেলে দেখিলাম তাঁহাদের বাৎসরিক বিক্রি প্রায় ১৫০ কোটী টাকা। আর আমাদের ভারত-সাম্রাজ্যের সমগ্র রাজস্ব হচ্ছে ১৩২ কোটী টাকা। ব্যাপার কি বুঝুন! তাদের বিক্রি তো বাইরে নয়, শুধু নিজেদের অংশীদারদের মধ্যে। আট দশটি বিস্কুটের ও সাবানের কারখানা। নিজেদের গো-চারণের সুবিস্তীর্ণ মাঠে শত সহস্র গাভী। সেই-সমস্ত গাভীর দুগ্ধে নিজেদের জন্য জমাট্ দুধ তৈরি হয়। নিজেদের জাহাজে সুদূর সিংহল হইতে নিজেদের বাগানে উৎপন্ন চা আনা হয়।

এই ল্যাঙ্কাসায়ারে যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রতিবৎসরে ৩০০ কোটী টাকার কাপড় তৈরি হইত। তন্মধ্যে প্রায় ৭৫ কোটী টাকার উপর ভারতবর্ষে আসিত। যে-সমস্ত কারখানায় ৩০০ কোটী টাকার কাপড় তৈরি হয়, তাহাতে কত কল-কারখানা, কত যন্ত্রপাতি, কত ম্যানেজার, সহকারী ম্যানেজার ও কত লক্ষ শ্রমজীবীর প্রয়োজন তাহা চিন্তা করুন।

চাকরী-জীবী বাঙ্গালীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বপ্ন হাইকোর্টের জজিয়তি। তাহাও তো মোটে ৫।৬ জন হইতে পারেন। আর আয়ও মাসে ৫০০০৲ টাকা। কিন্তু একজন ব্যবসাদার যার ৫০০০৲ টাকা আয়, তার কয়টা গদি বা 'মোকাম' থাকে, এবং সেখানে কত লোক অন্নসংস্থান করে, চিন্তা করুন।

বেঙ্গল কেমিক্যালে ১৩০০ লোক খাটে। ১৫০-২০০ ভদ্র সন্তান নিযুক্ত আছেন। এটি তো সামান্য ব্যবসায়। উকীল মোক্তারেরা অনেকে খুব রোজগার করেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা productive labour (ধনোৎপাদক পরিশ্রম) নহে। পদ্মানদীর চরের মতো এক পাড় ভাঙ্গিয়া আর-এক জায়গায় চর পড়া। দেশের অর্থ দেশেই রহিল।

ইংরেজ প্রয়োজন হইলে সমস্ত কাজই করিতে প্রস্তুত। ঘরে অন্ন না মিলিলে দেশ-বিদেশে অর্থোপার্জ্জনে যাইতে তাহার কোন বাধা নাই। অন্ধ সংস্কার তার কর্ম্মচেষ্টাকে সঙ্কুচিত করে না। ইংরেজের যত সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছে, তা অনেক স্থলে দেশের সব ডানপিটে ও বদমায়েস (Criminal) এবং তথাকথিত লর্ড ক্লাইবের মতো 'বাপেখেদানো' 'অকর্ম্মণ্য' ছেলেদের দ্বারা। কুমোরের কাদার ঢিপির মতো ত্রিভঙ্গমুরারী ভালছেলে দেশে অনেক হইয়াছে, এখন কিছু ডানপিটে বেপরোয়া ছেলের দরকার। বাল্যে মাতা, যৌবনে স্ত্রীর বসনাঞ্চলের অন্তরালের সুরক্ষিত আশ্রয়ে বাস করিয়াই তো এই দুর্গতি হইয়াছে: আমাদের কোন অসমসাহসিকতা (spirit of adventure) নাই। পুল হইবার আগে গঙ্গা পার হইতে হইলে অনেকে কাঁদিয়া আকুল হইত। এ-অঞ্চলের মুসলমান ভ্রাতাগণ এ-বিষয়ে অনেক অগ্রসর। এখানে আর এখন জমি মেলা দায়। তাই প্রতিদিন ষ্টীমারে ময়মনসিংহ হইতে অনেক চাষীরা আসামে গিয়া জমির ইজারা নিতেছেন। বাড়ীর

তিন ছেলের একজন দেশে থাকিতেছেন আর দুইজন বাহির হইয়া পড়িতেছেন, হয় জমির তল্লাসে নয় ষ্টীমার জাহাজে সারেঙ্গ কিম্বা মাঝি মাল্লা হইতে। হয়ত পদ্মায় চর উঠিয়াছে, তখনও মালিকের কোন ঠিকানা নাই। এরা গিয়ে দু'চার বছর বিনা খাজনায় চাষ আবাদ করিল। তারপর মালিকী সাব্যস্ত হইলে সেখানে থাকিয়া গেল, নয় ত ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিল। আমাদের হিন্দু ভ্রাতাদের ন্যায় বাড়ীর চার ছেলে পৈতৃক দুই বিঘা জমি চুলচেরা ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া নিঃস্ব না হইয়া এই-রকম করিয়া এঁরা সচ্ছল অবস্থায় আছেন। এ অতি প্রশংসনীয়।

কেউ যদি কলিকাতায় গঙ্গার জেটি, Custom House, ক্লাইব ষ্ট্রীট্, এজ্‌রা ষ্ট্রীট্, পোলক ষ্ট্রীট্ অঞ্চলে যান, দেখিতে পাইবেন কত হাজার মণ মাল নিয়ত আসা-যাওয়া করিতেছে। এ সমস্ত কারা আনে ও নেয়? এর মুনফা কার পকেটে যায়? ভারতবর্ষে অন্যূন ৬০০ কোটী টাকার মাল আমদানী ও রপ্তানী হয়। এই ৬০০ কোটীর কত অংশ দালাল ও (middleman) ফ'ড়েদিগের রোজগার হয়? তার পর মফঃস্বলে দাদন দিয়া উৎপন্ন শস্যাদি কাহারা নাম-মাত্র মূল্যে চালান দিতেছেন? তারপর আমাদেরই ক্ষেত্রজাত পাট যখন পাটকলে যায়, তখনই বা কি দাম দেওয়া হয়, আর যখন কল হইতে বাহির হয় তখনই বা ইহার দাম কত হয়? বাঙ্‌লা দেশের শ্রেষ্ঠ জমিদার বর্দ্ধমানাধিপের আদায় ৪০।৫০ লাখ টাকা; কিন্তু দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের সঙ্গে অসদ্ভাবের জন্য সদর খাজনা বেশী হয়। তার পর, কাশিমবাজার, মুক্তাগাছা প্রভৃতি ভূম্যধিকারীদের আয়। বজবজ হইতে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত গঙ্গার দুধারে যে সমস্ত পাটের কল এদের অনেকেরই মূলধন ২৫।৫০ লাখ টাকা। ক্লাইব, কামারহাটি ইত্যাদি কোম্পানীরা শতকরা ১০০, ২০০, ২৫০ টাকা dividend (মুনাফা) দেয়। তাহা হইলে, ৫০ লাখ মূলধনে বৎসর ৫০ লাখ

অংশীদারদের আয়ের উপর ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌দের কমিশন ইত্যাদি আছে। কাজেই এক একটি পাটের কল অনায়াসে যে কোন একটি বিশাল জমিদারীকে কিনিতে পারে।

আমরা ভাবি, সিবিলিয়নগণ এ দেশের কত অর্থই না শোষণ করিয়া লইতেছেন। কিন্তু ২।৪টি ইংরেজ কোম্পানী যাহা লয়, সমস্ত ভারতবর্ষের সিবিলিয়ানগণ তাহা লন না। অথচ এ দিকে আমাদের লক্ষ্য নাই। ইহা অনায়াসেই প্রতিকারযোগ্য, অথচ কোন চেষ্টাই নাই।

আমরা আমাদের যুগে যুগে সঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি। মনু মহাশয় ব্যবস্থা দিলেন, সমুদ্রযাত্রা করিলে পতিত হইতে হইবে। কাজেই বাড়ী থেকে বাহির হওয়া আমাদের ঘটিয়া উঠিল না। কিন্তু আমরাই সিংহল, জাভা, বলিদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছি। তারপর, হাঁচি টিকৃটিকি প্রভৃতির উপদ্রবে যেমন মন আমাদের সঙ্কুচিত হইল, অমনি কর্ম্মচেষ্টা,উদ্যম, উদ্যোগ প্রভৃতি হারাইয়া বসিলাম। ব্রাহ্মণের আধিপত্য বজায় রাখিতে নিজেদের অল্প-সল্প যাহা কিছু কাজ কর্ম্ম, তাহাও বেশ নিজেদের মধ্যে বিলি বন্দোবস্তের গণ্ডী আঁকিয়া সীমাবদ্ধ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলাম। তাই সায়েস্তা খাঁর সময় টাকায় ৮ মণ চাউল। ইহা দেশের ধনহীনতারই পরিচায়ক। পলাসীর যুদ্ধের পরের একটা কথা বলিতেছি। একটি পুরানো পুঁথির শেষ পৃষ্ঠায় দুর্গোৎসবের হিসাব পাওয়া গিয়াছে। আট আনায় একমণ দই, একমণ চাল আটআনা, সমস্ত ব্যাপার পঁচিশ টাকায় নির্ব্বাহ হইত। কামার হয়ত দা, কুড়াল, লাঙ্গলের ফা'ল প্রভৃতি তৈরি করিয়া দিয়াছে, গৃহস্থ তার দাম আট আনার ধান গোলা থেকে দিতে চাহিলেন। কামার কুলীর মজুরির ভয়ে অত ধান লইতে রাজি হইল না।

আমরা তাঁতীর কাজ তাঁতীকে, কামারের কাজ কামারকে ও

কুমোরের কাজ কুমোরকে সঁপিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ইংরেজ আমলে বিদ্যাচর্চ্চায় লাগিয়া গেলাম। আমরা senior, junior scholar হইলাম। যখন প্রথম প্রথম বি-এ পাশ করিলাম সাত গাঁয়ের লোক ছুটিয়া আসিল আমাদের দেখিতে। আর যদি এম্-এ পাশ করিলাম তো হইয়া পড়িলাম ছোট-খাট এক দেবতা। এই করিয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা যাঁহারা সব দেশে এবং সব জাতির সর্ব্ববিধ উন্নতির মূল তাঁহারা ইংরেজী ডিগ্রির নিকট দাসখত লিখিয়া দিয়াছেন। আর বোম্বাই অঞ্চলে লোকে ব্যবসা-বাণিজ্যে লাগিয়া গেল। ওদেরও যে প্রথম বারেই সফলতা হইল, তা নয়। প্রথম প্রথম লোকসান দিয়া যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জিত হইল তারই ফলে আজ ওরা এত উন্নত। দিন্‌শা ওয়াচার প্রণীত সার্ জম্‌শেদ্‌জি তাতার জীবন-চরিত পাঠ করিলে জানা যায় যে, ব্যবসা বাণিজ্য অমনি ধরিলেই হয় না। কত যে একাগ্র সাধনার প্রয়োজন তা এই সমস্ত ধনকুবেরদের জীবন শিক্ষা দেয়।

আজকাল আমাদের দেশে চায়ের ব্যবসায় খুব লাভজনক। কিন্তু এই ব্যবসায়ের ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় সমগ্র সভ্যজগৎ ও জীবন হইতে দূরে একান্তে যখন দলে দলে শ্বেতাঙ্গ চা-করেরা (planter) গিয়া আবাদ আরম্ভ করিল তখন শতকরা কতজন কালাজ্বর ম্যালেরিয়াতে মারা গেল। ও অঞ্চলে গেলে কতশত ইংরেজের কবর দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উদ্যম, ওদের এত অল্প বাধাতেই নষ্ট হয় না। তারা কুইনাইন খাইয়া মশা তাড়াইবার জন্য বাড়ীঘর লোহার জাল দিয়া ঘিরিয়া কাজ সুরু করিল। সেই লর্ড ডালহৌসির সময় হইতে চেষ্টা করিয়া আজ এতদিনে এর সুফল ফলিয়াছে। ইহার ফলভোগ করিবার তাদের নিশ্চয়ই একটা দাবী দাঁড়াইয়াছে। এইরূপে নিয়তই বিরুদ্ধপ্রকৃতির ও প্রতিকূল বাধার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ইংরেজ লক্ষ্মীকে অঙ্কশায়িনী করিয়াছে।

ঢাকা ও টাঙ্গাইল অঞ্চলে যে মাড়োয়ারী আমল পায় নাই তাহার কারণ এ অঞ্চলের সাহা, তিলি ও তাম্লি শ্রেণী ইতিপূর্ব্বে ইংরেজী শিক্ষার মোহে আকৃষ্ট হইয়া জাতীয় ব্যবসায় ত্যাগ করেন নাই। ইঁহাদের মধ্যে প্রকৃত ব্যবসায়বুদ্ধি আছে; "অন্ন সমস্যা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া এক বিপদ্ হইয়াছে যে, দলে দলে ছাত্র আমার কাছে আসিয়া ব্যবসা করা সম্বন্ধে উপদেশ নিতে চান। ইঁহারা ভাবেন যে, আমি ডাক্তারের মতো তাঁহাদের নাড়ী টিপিয়া বলিয়া দিব তাঁহাদের কোন্ দিকে রুচি। তাঁহাদের ব্যবসা ফাঁদিবার যা-কিছু আয়োজন ও সরঞ্জাম সমস্তই "প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন্" করিয়া দিতে হইবে—ইঁহারা নিজেরা কিছু ভাবিবেন না বা দেখিবেনও না। তাঁহাদের অনেক সময় বলি এই সমস্ত সাহা মহাজনদের ওখানে গিয়া দেখিতে, কি করিয়া তাঁহারা একটা ব্যবসায়কে দাঁড় করান। মাড়োয়ারীরা হয় ত বাঙ্গালীকে আমল দেয় না, কিন্তু ইঁহারা তো আমাদের স্বজাতীয়।

ব্যবসায় করিতে হইলে যে বিপুল মূলধন প্রয়োজন, তাহা এই লোটা-কম্বল-সম্বলধারী মাড়োয়ারীদের ক্রমে ক্রমে বাংলা দেশ বিজয়ের ইতিহাস স্মরণ করিলে, অস্বীকার করিতে হয়। সুদূর পল্লীপ্রান্তে কয়েক গণ্ডা টাকামাত্র সম্বল লইয়া অনেক মাড়োয়ারী ব্যবসার পত্তন করিয়া কোটী-পতি হইতেছেন। এখন আর শুধু ব্যবসায় নয়, তাঁহারা এবার জমিদারীর আস্বাদ গ্রহণ করিতেছেন। আশঙ্কা হয় আর বিশ বৎসরের মধ্যে বাংলা দেশের অর্দ্ধেক জমিদারী তাঁহাদের আয়ত্তাধীন হইবে, কলিকাতার বিপুল বিভবের শতকরা ৯৫ ভাগ অ-বাঙালীর হইবে। অনেকে বলেন, মূলধনের অভাবই তাঁহাদের ব্যবসাক্ষেত্রে নামিবার প্রধান অন্তরায়। তাঁহারা ভাবেন হাজার কয়েক টাকার তোড়া পাইয়া চৌরঙ্গীতে আফিস, বৈদ্যুতিক পাখা, দরোয়ান্ ইত্যাদি লইয়া বসিতে পারিলেই ব্যবসায়ে কৃতী হইতে পারিবেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যবসায়ের কোন খবরই তাঁহারা রাখেন না।

হাওড়া ও শিয়ালদহ ষ্টেশনে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় প্রতিদিন কত হাজার হাজার কেরাণী ডেলি প্যাসেঞ্জার রূপে সকাল সন্ধ্যা আসা যাওয়া করেন। ইঁহাদের কেহই ৩০।৪০ বা ৫০্ টাকার অধিক বড় রোজ্‌গার করেন না। তন্মধ্যে ৫।৭্ টাকা মাসিক টিকেট ক্রয় করিতেই ব্যয়িত হয়। এই তো রোজ্‌গার। ইহারই তাড়নায় সকালবেলা ৮ টার সময় নাকে মুখে কোন প্রকারে ভাত গুঁজিয়া হাজিরা দিতে হয়। কি শোচনীয় দৃশ্য !

অনেকে বলেন, আপনি কেবল প্রশ্নই উত্থাপন করেন, তাহার সমাধানের এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন না। এই সমস্ত প্রশ্নের সমাধান নিজের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেই পাইবেন। এই যে এখানকার খেয়াঘাট ইহা হইতে কত আয় হইতে পারে? কিন্তু ইহাও খোট্টারা আসিয়া ক্রমে ক্রমে অধিকার করিয়াছে কেন? বাগেরহাট—খুলনা ও বসিরহাট অঞ্চলে একজন ১৬টা খেয়াঘাট জমা লইয়াছে। আমরা পারি না কেন? ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের কর্ত্তা তো আমরাই। প্রকাশ্য ডাকে এগুলো বিলি করা হয়, বিদেশীরা এসে সুবিধা করিয়া নেয়, আমরা পারি না কেন? একজন খোট্টা নিজে তার ঘাটে নৌকা বাওয়া, পয়সা আদায় করা ইত্যাদি সব নিজে তদারক করে, অপচয় হইবার কোন উপায় রাখে না। আর আমরা পারি না, কেবল আমাদের একজন ১৫্ টাকা দিয়া সরকার রাখিতে হয়, নতুবা দিনে দুইবার তাস খেলা, ঘণ্টা-কয়েক সুনিদ্রা, ইত্যাদির ব্যাঘাত হয়। ১৫্ টাকার সরকার নিজেকে ভাতে কাপড়ে বাঁচাইবার জন্য চুরি করিতে বাধ্য হয়। কাজেই ইজারা লইয়া আমাদের লাভ হয় না; কেননা আমরা বাবু।

সমস্ত কলিকাতা সহর খুঁজিলে কয়টা বাঙ্গালী পানওয়ালা বাহির হয়? সবই তো খোট্টা। রোজ যখন গড়ের মাঠে বিকালে বেড়াইতে যাই

দেখি হ্যারিসন্ রোড ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট যে-স্থানে মিশিয়াছে সেইখানে এক পানওয়ালার দোকানে লেমনেড, সরবৎ ও বিড়ী সমেত কত বিক্রী। মাসে তার লাভ থাকে ২০০।২৫০ টাকা। একটা পানের দোকান করিতে কত টাকা মূলধনের প্রয়োজন? আজকাল তো কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় সহরে হাজার হাজার মোটর গাড়ীর আম্‌দানী হইয়াছে। এর সমস্ত চালক কোন্ জাতীয়? লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখা যায় পাঞ্জাবীরা প্রায় একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে। একজন ড্রাইভার যত বেতন পায় একজন কেরানীর বেতন তত? কলিকাতায় চাকর-বামুন হয় উড়ে নয় খোট্টা। বাঙলা দেশের চক্রবর্ত্তীমহাশয়ের দিন গুজরান করা অসাধ্য হইলে আটআনা বার্ষিকের জন্য রৌদ্রে পাঁচ ক্রোশ হাঁটিয়া উপস্থিত হইবেন, কিন্তু ইঁহাদের কাহারো কাছে কোথায়ও রসুই করার কথা বলিয়া দেখিতে পারেন কি উত্তর এঁরা দেন। এই রকম করায় বাঙলা দেশ হইতে কত অর্থ অ-বাঙালীরা উপার্জ্জন করিয়া নিয়া এ দেশকে নিঃস্ব করিয়া ফেলিতেছে। এই-সমস্ত উড়ে খোট্টা কত টাকা মনিঅর্ডার করে তাহা হিসাব করিলে ঐ কথার সত্যতা সম্যক্ উপলব্ধি হইবে।

ডায়মণ্ড-হারবার লাইনে মগরাহাট প্রভৃতি স্থানে অনেক বিপুল চালের কারবার আছে। সেখানকার বহু আড়তদারের মধ্যে কয়টা দেশীয় লোক? তাঁহারা আমাদেরই ক্ষেতে ফলা ধান কিনিয়া লক্ষপতি হইতেছেন, আর আমরা ছেলেদের "নমিনেশন" জোগাড় করিবার জন্য নিজেদের সর্ব্বস্ব পরের হাতে সঁপিয়া দিয়া বেড়াইতেছি ম্যাজিষ্ট্রেট জজ সাহেবের কুঠীতে ঘুরিয়া। ইহার প্রধান কারণই শ্রমবিমুখতা। স্বল্পায়াসে কোন প্রকারে দিনাতিপাত করিতে পারিলেই হইল। আমাদের অঞ্চলে কৃষকরা খুব পরিশ্রম করিয়া ধান রোপে। তার পর যখন ধান

একবার লাগিয়া যায় তখন 'পশ্চিমে' আনিবে ধান কাটাইবার ও মলাই-বার জন্য। নিজেরা আর কিছুই করিবে না। তারা কি এতই ধনী? গিরিডি অঞ্চলে দেখিয়াছি নেহাৎ যখন ক্ষুধার তাড়না অসহ্য হইয়া উঠে তখন দেশী সাঁওতালরা কাজ করে। অন্য সময়, কাজ করে না কেন জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেয় "কাজ কর্ব্ব কেন?" উপোস কর্তে কি জানি না?"

তারপর কলিকাতা সহরে কত ছুতোর মিস্ত্রি কাজ পাইতে পারে, কিন্তু চীনে আসিয়া অধিকার করিয়াছে। কেন না, দেশী মিস্ত্রিরা চোখের আড়াল হলেই ফাঁকি দিবে। তাদের উপর কোন কাজ দিয়া নির্ভর করা যায় না। কিন্তু একজন চীনে মিস্ত্রি কি প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করে!' পূর্ব্বে চীনেপট্টির খানিকটায় চীনেরা থাকিত। এখন বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট্ অঞ্চল ছাইয়া ফেলিয়াছে। কেন? এ দেশে কি মুচি পাওয়া যায় না? নিম্নশ্রেণী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী আমাদের সকলেরই মধ্যে অকর্ম্মণ্যতা ও কুড়েমি। এই করিয়া দেশের প্রায় সকল বিভাগই বিদেশী দ্বারা বিজিত হইতেছে। কলিকাতা পটারী ওয়ার্কসের নিকট দু'এক বছর আগে একজন চীনা মিস্ত্রির সামান্য একখানি দোকান দেখিয়াছি, কিন্তু অধ্যবসায় ও সততা দ্বারা এখন সে দোকান একটি বিরাট কারবারে পরিণত হইয়াছে।

অতএব এখন আমাদের কি করা কর্ত্তব্য? সহযোগ-বর্জ্জন আন্দোলন দেশের একটি কল্যাণ করিয়াছে। দেশের লোকের দৃষ্টি অন্তর্মুখী হইয়াছে। দেশের মা-বাপেরা বুঝিয়াছেন, চল্‌তি রকম লেখাপড়ার অসারতা। এতদিন এই শিক্ষা ছেলেকে দিবার জন্য হইতে হইয়াছে খরচান্ত। ছেলে গ্রাজুয়েট হইয়া কি পরিমাণ অর্থ রোজগার করিতেছেন তাহা তো আমরা সকলেই দেখিতে পাইতেছি। পাঠ্যাবস্থা কাটে ভাল। কিন্তু অনেকের

পাস করিলেই বিপদ্; কেন না তখন রোজগার করার প্রয়োজন হয়। কাজেই দেশের লোক অর্থকরী শিক্ষার জন্য আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। সহযোগ-বর্জ্জন আন্দোলন হওয়াতে যে আমরা ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছি ইহাই পরম সুখের বিষয়।

দেশের যুবকদের জীবনের নানা ক্ষেত্রে কৃতকার্য্য হইবার পক্ষে ভগ্ন স্বাস্থ্য একটি প্রধান অন্তরায়। প্রতিদিন রৌদ্র বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া কোন প্রকারে এক রাশি অখাদ্য বা কুখাদ্য গলাধঃকরণ করিয়া এই বিদ্যা আহরণ করিতে ৪।৫ মাইল হাঁটিয়া স্বাস্থ্য ও উদ্যম একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। তারপর যখন প্রকৃত প্রস্তাবে জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হয় তখন জীবন্মৃত অবস্থা লইয়া কোন্ কৃতকার্য্যতা আশা করা যায়? তাই বলিতেছিলাম, সকলকেই কি এই শিক্ষা লাভ করিতে হইবে? বিলাতে ৪৷৷০ কোটি লোকের মধ্যে ২৫০০০ হাজার ছাত্র কলেজে পড়ে আর আমাদের দেশেও ৪৷৷০ কোটি লোকের মধ্যে প্রায় ২৩০০০ হাজার ছাত্র কলেজে পড়ে। তাই বলিয়া কি জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধের মত আমরা ইংরেজদিগের সমান? বিলাতে শতকরা ৯৫ জন প্রাথমিক শিক্ষালাভ করে। মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তে শতকরা দশ-পনেরো জন মাত্র বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে যায়। আমাদের দেশেও সেইরূপ হওয়া উচিত। পিতামাতা সব ছেলেকে উচ্চ শিক্ষা দিবার প্রয়াস করিয়া অযথা সর্ব্বস্বান্ত হন। তিনজন ছেলের মধ্যে প্রতিভাশালী একটিকে উচ্চশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়া বাকী কয়জনকে মাধ্যমিক শিক্ষার মান অবধি পড়াইয়া রুচি অনুযায়ী কোন কাজের মধ্যে দিলে এরূপ দুরবস্থা হইবে না। ল' কলেজে তো তিন বছর পড়িতে হয়। তার পর যাত্রার জুড়ি সাজিয়া বটগাছের তলায় কয়েক বছর ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। সেই কয় বছর যদি কেউ কোন ব্যবসায়ে শিক্ষানবিশ হইয়া প্রবেশ করেন

তবে ওকালতির দুর্ভোগ ভুগিতে হয় না। অনেক সময় প্রশ্ন হয় যে, কোথায় শিক্ষানবীশি করা যাইবে? গ্রামে গ্রামে গিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় অনেক সাহা প্রভৃতি ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোক ব্যবসা করিয়া কৃতী হইতেছেন। ইঁহাদের নিকট গিয়া বিনা মাহিনায় নিজ হাতে কাজ শিখিতে গেলে অবশ্য ইঁহারা আপত্তি করিবেন না। শুনিয়া থাকি, মাড়োয়ারীরা নাকি বাঙালীদের ব্যবসাতে লইতে আপত্তি করেন। কিন্তু অনেক বাঙালী দেশে গ্রামে আছেন যাঁহারা চাউল, ডাল, কেরোসিন ইত্যাদির ব্যবসা করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন। ইঁহাদের নিকট যাইয়া চাকরের মত খাটিতে হইবে। তুচ্ছ আত্মসম্মানের মিথ্যা মোহে শিক্ষাকে বিড়ম্বিত করিলে চলিবে না।

অনেকে ব্যবসায় শিখিবেন বলিয়া School of Commerce ইত্যাদিতে ভর্ত্তি হইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। ব্লাকবোর্ডে ও খড়িমাটির সাহায্যে ব্যবসা শিক্ষা হয় না। তূলো, পাট কোথায় জন্মে, Commercial History ও Geography ইত্যাদি না পড়িয়াও মাড়োয়ারী ও ভাটিয়াদের তাহা জানিতে ও ব্যবসা চালাইতে কোন কষ্ট হয় না। ইংরেজীতে হিসাব রাখা কিম্বা নির্ভুল পত্রলিখন-পদ্ধতি জানা কৃতকার্য্য হইবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন নয়।

ছেলে পরীক্ষায় কৃতকার্য্য না হইলে তাহাকে বৃথা চোখ রাঙাইবার কোন প্রয়োজন নাই। এখনো তার কোন "মিথ্যা আত্মসম্মান বোধ" (false sense of dignity) হয় নাই, তাহাকে কোন ছোট দোকান করিয়া দিন। কিম্বা কোন দোকানে বেচাকেনা শিখিতে দিন। "বাইরে কোঁচার পত্তন ভিতরে ছুঁচোর কীর্ত্তন" করিয়া কি হইবে?

যাহা হউক, দেশের হাওয়া ফিরিয়াছে—ইহা খুব শুভলক্ষণ সন্দেহ [illegible] জীবনসংগ্রামের মহা-আবর্ত্তে ধীর ভাবে অকুতোভয় হইয়া

আমাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে। নিজেদের সমগ্র চেষ্টা ও শক্তি জাতীয় দুর্গতি অপনয়ন করিতে নিয়োজিত করিতে হইবে। মিথ্যা আত্মসম্মান-বোধ আমাদের কর্ম্মকুশলতাকে যেন খর্ব্ব না করে। যাহারা আজ জগতে শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছে, তাহারা কোন যাদুবলে সিদ্ধিলাভ করে নাই। চেষ্টাদ্বারাই সমস্ত সাধিত হইয়াছে ও হইবে, ইহাই স্মরণ করিয়া আমরা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব।

৪

সমাজ-সংস্কার সমস্যা*

আজ আমাদের দেশে এক নবযুগের উন্মেষ হইতেছে। সমস্ত জগতে যে সাম্যবাদের বাণী প্রচারিত হইতেছে তাহা ভারতবর্ষের কর্ণেও আসিয়া পৌঁছিয়াছে। নূতন আকাঙ্ক্ষার আবেগে আমাদের হৃদয় আলোড়িত হইতেছে।

কিন্তু যদি কেহ নিরপেক্ষভাবে বিচার করেন তিনি দেখিবেন আমাদের জাতীয় জীবনে কয়েকটি দুর্ব্বলতা রহিয়াছে। যে-সময়ে স্বরাজ ও হোমরুলের ধ্বনিতে দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত, যে-সময় প্রত্যেক সম্প্রদায় শাসনপ্রণালীর যথোচিত সংস্কারের জন্য আন্দোলনে নিযুক্ত, যে-সময়ে আমরা কল্পনার চক্ষে একতাবদ্ধ ভারতের মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছি—ঠিক সেই সময়ে নিজেদের মধ্যে কয়েকটি শ্রেণীর উচ্চ আর্ত্তনাদ আমাদের কর্ণে পৌঁছিতেছে। যেখানে শান্তি ও সহৃদয়তা বিরাজ করিবার কথা সেখানে এ বিরোধের সুর বাজে কেন?

*Presidential Address at the Indian National Social Conference held at Calcutta, December 1918.

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ কর্ত্তৃক অনূদিত এবং পরিবর্দ্ধিতাকারে প্রকাশিত।

ইহার উত্তর এক কথায় পাওয়া যায়। রাজনৈতিক সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজন—একটি ছাড়িয়া অন্যটি অসম্ভব। কোনও জাতিই নিজের কর্ম্মফল এড়াইতে পারে না। পূর্ব্বে আমরা সমাজ-সংস্কার বিষয়ে যে অবহেলা করিয়াছি এখন তাহারই বিষময় ফল ভোগ করিতেছি। ইহার জন্য রাজনৈতিক উন্নতির পথে আমরা বাধা পাইতেছি। এই সমস্যাটির বিশদ আলোচনা করিবার চেষ্টা করা যাক। আমি প্রধানতঃ বাংলাদেশের কথাই বলিতেছি, তথাপি কথা গুলি সমস্ত ভারতবর্ষের সম্বন্ধেই খাটে।

মুসলমান ভ্রাতাদের বাদ দিলে বঙ্গে ২১০ লক্ষ হিন্দুর মধ্যে ১২॥ লক্ষ ব্রাহ্মণ, ১১ লক্ষ কায়স্থ এবং ৮৯ হাজার মাত্র বৈদ্য। আপনারা জানেন কেবল ইহারাই উচ্চজাতিভুক্ত বলিয়া বিবেচিত; তৎপরে নবশাক, যাহারা ব্রাহ্মণের জলস্পর্শ করিতে পারেন এবং 'স্পর্শ' বলিয়া পরিগণিত, যেমন তাঁতি, তিলি, কৈবর্ত্ত, সদ্গোপ, গন্ধবণিক প্রভৃতি; তৎপর প্রায় সমুদয় লোকই সমাজের অতি নিম্নশ্রেণীভুক্ত এবং অল্পাধিক অস্পৃশ্য বলিয়া বিবেচিত। এই অস্পৃশ্যরাই প্রধানতঃ আপনাদের সাহসী ও বলিষ্ঠ কৃষক সম্প্রদায়।

একবার বঙ্গদেশের সমাজের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতে একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের অল্পবিস্তর প্রাদুর্ভাব ছিল। সম্প্রতি পূর্ব্ববঙ্গের একটী তাম্রমূর্ত্তি হইতে জানা গিয়াছে যে সমতটের (গঙ্গার ব দ্বীপ) রাণী প্রভাবতী নিজে বৌদ্ধ হইলেও শর্ব্বাণী দেবীর অর্থাৎ দুর্গার পূজা করিতেন। আর একখানি তাম্রফলক হইতে ইহাও জানা গিয়াছে যে পালবংশীয় মদনপালের মহিষী মহাভারতের শ্লোকসমূহ আবৃত্তির জন্য কয়েকজন ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। চীন পরিব্রাজক হুয়েনসাংও লিখিয়াছেন যে কান্ত-

কুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধন শৈব হইলেও বৌদ্ধভাবাপন্ন ছিলেন। বস্তুতঃ তখন কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তের সমুদায় অংশেই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ছিল। কাজেই তখন জাতিপ্রথা একেবারে উঠিয়া না গেলেও ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহাদি চলিত তাহা বলাই বাহুল্য।

তৎপরে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের পুনরাবির্ভাব ঘটে। তখন পুনরায় জাতিপ্রথার উন্নতি হইতে দেখা যায়। কৌলিন্য-প্রথার প্রবর্ত্তক রাজা বল্লাল সেন জাতিপ্রথার মস্ত পৃষ্ঠপোষক হইয়া উঠিলেন, সময় বুঝিয়া অনেকেই বুদ্ধিমানের মত তাঁহাকে সমর্থন করিয়া সমাজে উন্নতিলাভ করিতে লাগিলেন এবং সুবর্ণবণিক, শুঁড়ী প্রভৃতি, যাঁহারা তাহা না পারিলেন, তাঁহারা নীচশ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইলেন।

পরবর্ত্তীকালে একটি কিম্বদন্তীর প্রচার হয় যে যখন বৌদ্ধযুগে বঙ্গদেশে বেদবিহিত ক্রিয়াকলাপের লোপ ঘটিল, তখন রাজা আদিশূর সনাতন ধর্ম্মের পুনঃ প্রচারের জন্য কান্যকুব্জ হইতে পাঁচটি বিদ্বান ব্রাহ্মণ আমদানী করেন।

ধরিয়া লওয়া যাক যে উপরোক্ত কিম্বদন্তীর মূলে কিছু সত্য আছে, তবুও একথা নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে বর্ত্তমান বাঙ্গালায় ১৩ লক্ষ ব্রাহ্মণের মধ্যে কয়জন সেই পাঁচজন মাত্র পূর্ব্বপুরুষের বংশধর বলিয়া দাবী করিতে পারেন। আরও মজার কথা এই যে সেই পূর্ব্বপুরুষগণ তাঁহাদের স্ত্রী সঙ্গে লইয়া আসেন নাই। বারেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির একনিষ্ঠ সভ্য শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন —"রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের কুলশাস্ত্রে বিশ্বাস করিবার আর একটি বাধা এই যে ইহাতে ধরিয়া লইতে হয় যে ৩০ হইতে ৩৫ পুরুষ পূর্ব্বে অর্থাৎ ৮ হইতে ১০ শতাব্দী পূর্ব্বে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ ছিল না বলিলেই হয়। রাঢ়ীগণের কুলশাস্ত্রে লিখে যে, যে-সময়ে কনৌজ হইতে পঞ্চ

ব্রাহ্মণ আসেন, তখন বাঙ্গালায় ৭০০ ঘর ব্রাহ্মণ ছিল। কিন্তু আজ কাল সেই ৭০০ ঘরের কোন বংশধর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না, অথচ ৫ জন আগন্তুক ব্রাহ্মণের বংশধররাই সমস্ত দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে।”

সকলেই জানেন যে যখন কোনও নিম্নজাতির মধ্যে কোনও দূরদেশীয় মুষ্টিমেয় উচ্চজাতীয় পুরুষ আসিয়া বাস করে, তখন স্বভাবতঃই তাহারা নিম্ন জাতিতেই বিবাহ করিতে বাধ্য হয়। অনেকে আবার বিশ্বাস করেন যে অন্যান্য প্রদেশের কয়েক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ মূলতঃ বিদেশীয়। ইতিহাস এবং সমাজ-বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে যে কয়েকটি জায়গা ছাড়া বাংলা ও অপরাপর প্রদেশের ব্রাহ্মণগণ বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে; মানব-বিজ্ঞানেও তাহাই বলে। নাসিকা ও মস্তকের মাপ লইয়া দেখা গিয়াছে যে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণের মধ্যে বিশেষ কোনও প্রভেদ নাই। চন্দ মহাশয় তাঁহার নিজের গবেষণার ফলস্বরূপ লিখিয়াছেন :—“বহির্দেশীয় ব্রাহ্মণের মস্তকের আকৃতি দেখিয়া তাঁহাকে অন্তর্দেশীয় বৈদিক ঋষির বিশুদ্ধ বংশধর বলিয়া মনে হয় না, বরং শূদ্র এবং অন্ত্যজ শ্রেণীভুক্ত অব্রাহ্মণ প্রতিবেশীগণের সহিত তাঁহাদের আকৃতিগত যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। একদিকে যুক্ত প্রদেশের কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ এবং বিহারের মৈথিল ব্রাহ্মণের মস্তকের গঠন এবং অপরদিকে গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণ এবং বাংলার রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক ব্রাহ্মণের মস্তকের গঠন এই উভয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ রহিয়াছে। কেবল মাত্র বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে রক্তের মিশ্রণ ইহার কারণ নহে, কিন্তু মনে হয় প্রান্ত-প্রদেশীয় ব্রাহ্মণগণ মূলতঃ প্রান্ত-প্রদেশবাসী জাতি, তাহাদের অব্রাহ্মণ যজমানগণ যে পরিমাণে অন্তর্দ্দেশীয় জাতিগণের রক্ত লাভ করিয়াছে, ইহারাও সেই পরিমাণে পাইয়াছে।” সার হার্বার্ট রিস্‌লী

মানব-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা আমাদের অনেকের ভাল না লাগিতে পারে, কিন্তু চন্দ মহাশয়ের গবেষণায় অন্ততঃ ইহা প্রমাণ হয় যে বিভিন্ন জাতি এবং উপজাতিগণ মূলতঃ অভিন্ন! এইত গেল ব্রাহ্মণগণের কথা। কায়স্থগণের সম্বন্ধে ত প্রবাদই প্রচলিত রহিয়াছে যে "জাত হারালে কায়স্থ"। কুলীন এবং মৌলিক ভিন্ন তাহাদের মধ্যে ৭২ উপবিভাগ আছে। ইঁহাদের মধ্যে যদি কোনও যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করে, কিম্বা যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিতে পারে, তাহা হইলে শুদ্ধ কুলীন কায়স্থগণের মধ্যে তাহাকে জামাতা করিবার জন্য হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়; এইরূপে অনবরত কতলোক বাহাত্তুরে ঘর হইতে মৌলিক শ্রেণীতে প্রমোশন পাইতেছে। আবার মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মত একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ গবেষণাকারীর মতে, মৌলিকগণ অধিকাংশই প্রাচীনকালে বৌদ্ধ ছিলেন।

রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা যেরূপ ঘিয়ের ভেজাল কতখানি জানিতে পারা যায়, দুঃখের বিষয়, সেইরূপ রাসায়নিক কোন বিশ্লেষণ দ্বারা ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের রক্তে কি পরিমাণ ভেজাল আসিয়াছে তাহা জানিবার উপায় নাই। যতদূর জানিতে পারা যায় তাহাতে বল্লাল সেনের সময় হইতেই জাতি সম্বন্ধে এখনকার নিয়মগুলির সৃষ্টি হয়। তৎপরে রঘুনন্দন তাহাতে তাঁহার নিজের কিছু কৃতিত্ব ফলাইয়াছেন। তিনি কায়স্থদিগকে "সচ্ছূদ্র" অর্থাৎ উচ্চদরের শূদ্র এই আখ্যা দিয়া কায়স্থদিগের প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখাইয়াছেন। পাল সাম্রাজ্যের উত্তরাংশে তিব্বত হইতে একদল অসভ্য লোক আসিয়া একটি রাজ্য স্থাপন করিয়া বসিয়াছিল, এই রাজ্যটি অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া বর্ত্তমান থাকিবার পর মহীপাল কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হয়। এই সমস্ত তিব্বত-হইতে-আগত

অধিবাসীরা ক্রমে ক্রমে যে এদেশের লোকের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে লাগিল, তাহা তাহাদের মন্দিরগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। কুচবিহার রাজ্য একসময়ে উত্তর বঙ্গের অনেক অংশ ব্যাপিয়া ছিল; ইহা হইতেও মনে হয় যে বারেন্দ্রভূমিতে কোন কোন শ্রেণীর সহিত মঙ্গোলিয়ান্‌দের রক্তের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। টড সাহেবের অনুমান যে কোন কোন্ রাজপুত এবং জাঠের পূর্ব্বপুরুষ হূণ এবং শক। আজকাল গবেষণা দ্বারা এই অনুমানটি সত্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এই রক্ত সংমিশ্রণের অকাট্য প্রমাণ প্রতিনিয়ত আমাদের চোখের সামনে রহিয়াছে—মণিপুর, ত্রিপুরা প্রভৃতি করদ রাজ্যে উচ্চবংশীয়দের অঙ্গসৌষ্ঠব বিশেষতঃ মুখের গঠন (Facial Contour) দেখিলে মঙ্গোলীয় রক্ত-সংমিশ্রণ স্পষ্ট বুঝা যায়—অর্থাৎ রাজপুতানায় যেখানে শক, যবন, হূণ, Scythianদের সহিত মিশ্রণ হইয়া "ক্ষত্রিয়" সৃষ্টি হইয়াছে বাংলার পূর্ব্ব প্রান্তেও সেইরূপ। এই প্রসঙ্গে মহামতি রানাড়ের "শতবর্ষ পূর্ব্বে দক্ষিণ ভারতবর্ষ"-শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে পশ্চাল্লিখিত কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"দক্ষিণ ভারতে যে সকল আদিম জাতি বাস করিত তাহাদের সংখ্যা এত অধিক ছিল যে, যে-অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ কয়েকজন যোদ্ধা ও বণিক সঙ্গে লইয়া সে প্রদেশে বাস করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা দেশবাসীর উপর স্থায়ী প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন নাই। উত্তর ভারতে আর্য্য-জাতির প্রভাব বিশেষরূপে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল, কিন্তু খৃষ্টীয় অব্দের প্রারম্ভকালে শক, হূণ এবং জাঠ বা গথ (যাহারা রোমসাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিল) প্রভৃতি নূতন জাতির আক্রমণে তাঁহারা পর্য্যুদস্ত হইয়াছিলেন। উত্তর ভারতে বৈদেশিক আক্রমণে যাহা ঘটিয়াছিল, দক্ষিণ ভারতে আদিম অধিবাসী দ্রাবিড় জাতিগণের উত্থানদ্বারা তাহাই

ঘটিয়াছিল। সেই জন্যই এই সময়ের লিখিত পুরাণগুলির মধ্যে একটা হতাশার এবং ভয়ের সুর শুনিতে পাই। যাহা হউক অন্ততঃ ইহা নিশ্চিত যে বৌদ্ধধর্ম্মের উত্থানের জন্য হিন্দুধর্ম্মের যে পতন হয়, সেই পতন হইতে ইহা আবার যখন পুনরুত্থান করে তখন ইহা আর তাহার প্রাচীন বিশুদ্ধি রক্ষা করিতে পারে নাই—আজকাল হিন্দুধর্ম্মকে আমরা যেরূপ ভেজাল-মিশ্রিত অবস্থায় দেখিতেছি, সেই অবস্থাই প্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মকে এবং পরে জৈনধর্ম্মকে বিনষ্ট করিবার জন্য ব্রাহ্মণগণ প্রথম যে সকল বর্ব্বর জাতিকে শূদ্র বলিয়া ঘৃণা করিতেন, পরে তাহাদিগেরই সহিত মিলিত হন। যে সকল ব্রাহ্মণ প্রথমে ঋষি এবং ধর্ম্মপ্রচারক, কবি এবং দার্শনিক ছিলেন, তাঁহারা পুরোহিত-শ্রেণীতে অবনত হইলেন এবং এইরূপে ক্ষমতা এবং লাভের জন্য তাঁহাদের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিলেন। দস্যু এবং রাক্ষসগণের দেব দেবীগণকে প্রাচীন বৈদিক দেবতাগণের রূপান্তররূপে গ্রহণ করা হইল; পূর্ব্বে আর্য্য ও অনার্য্যদিগের মধ্যে যে বিভাগ ছিল, পরে তাহা ব্যবসাগত নানা জাতিতে পরিণত হইল এবং এই জাতিগণের মধ্যে কোন সম্পর্কই রহিল না। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম অসভ্য জাতিগণকে সভ্য করিতে পারিল না, বরং তাহাদিগের দ্বারা নিজেই হীনতা প্রাপ্ত হইল।"

তবে কেন এত বংশমর্য্যাদার বড়াই? তবে কেন কেহ আপনাকে সূর্য্য ও চন্দ্রের বংশধর বলিয়া কেহ বা আপনাকে বৈদিক ঋষিগণের সন্তান বলিয়া প্রমাণ করিতে এত ব্যস্ত?

বর্ত্তমান কালে হিন্দুসমাজে লোকাচারই ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। মনুসংহিতা, পরাশরসংহিতা ও মহাভারতাদি পাঠে দেখা যায় যে, প্রাচীন ঋষিগণ, রঘুনন্দন প্রভৃতি নব্য স্মার্ত্তগণের অপেক্ষা

জাতিভেদ ও বিবাহ সম্বন্ধে অনেক উদার মতাবলম্বী ছিলেন। এস্থলে আমি কেবল দুই একটি উদাহরণ দিতেছি।

"যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন 'হে রাজন্ জন্ম বা চরিত্র, অধ্যয়ন বা বিদ্যা কিসের প্রভাবে এক ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইয়া থাকেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলুন।'

"যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন 'যক্ষ শ্রবণ করুন। জন্ম বা অধ্যয়ন বা বিদ্যা কিছুই ব্রাহ্মণত্বের কারণ নহে—চরিত্রই ইহার কারণ। ব্রাহ্মণ যত্নের সহিত নিজের চরিত্র রক্ষা করিবেন। যিনি চরিত্র রক্ষা করিতে পারেন, তাঁহার কোনও ক্ষতি হয় না কিন্তু যিনি চরিত্র হারান তিনি বিনষ্ট হন।" (মহাভারত, বনপর্ব্ব, ৩১২ অধ্যায়)

"বেদাঃ বিভিন্নাঃ স্মৃতয়োর্বিভিন্নাঃ
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা॥ (ঐ)

"শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ইতর লোকের নিকট হইতেও শ্রেয়স্করী বিদ্যা গ্রহণ করিবে। অন্ত্যজের নিকট হইতেও পরম ধর্ম্ম লাভ করিবে এবং স্ত্রীরত্ন দুষ্কুল হইতেও গ্রহণ করিবে।"

"স্ত্রী, রত্ন, বিদ্যা, ধর্ম্ম, শৌচ, হিতকথা এবং বিবিধ শিল্পকার্য্য—সকলের নিকট হইতে সকলে লাভ করিতে পারে।"

(মনুসংহিতা, ২য় অধ্যায়, শ্লোক ২৩৮, ২৪০)

"ঋতুমতী হইয়াও কন্যা বরং যাবজ্জীবন গৃহে থাকিবে ইহাও শ্রেয়ঃ তথাপি গুণহীন পাত্রে সমর্পণ করিবে না।"

(মনু, ৯ম অধ্যায়, শ্লোক ৮৯)

"দ্বিজাতিগণের প্রথম বিবাহের স্ত্রীই প্রশস্তা। স্বেচ্ছাকৃত পুনর্ব্বিবাহে

নিম্নলিখিত স্ত্রীলোকই পর পর শ্রেষ্ঠ হয়। শূদ্রাই কেবল শূদ্রের ভার্য্যা হইবে, শূদ্রা ও বৈশ্য, বৈশ্যের বিবাহযোগ্যা। এবং শূদ্রা, বৈশ্যা, ক্ষত্রিয়া এবং ব্রাহ্মণী—ব্রাহ্মণের বিবাহযোগ্যা হইবে।"

(মনু ৩য় অধ্যায়, শ্লোক ১২-১৩)

"বেশ্যাগর্ভে বশিষ্ঠ, দাসীগর্ভে নারদমুনি, শূদ্রাগর্ভে দুই পিতার ঔরসে ভরদ্বাজ মুনি, ধীবর কন্যাতে বেদব্যাস, ক্ষত্রিয়াগর্ভে বিশ্বামিত্র জন্মগ্রহণ করিয়াও ব্রাহ্মণ হইলেন কিরূপে? আবার ব্যাসদেবের ঔরসে জন্মলাভ করিয়াও ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু প্রভৃতি ক্ষত্রিয় হইলেন কেমন করিয়া?"

"ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ২।১৯ শ্লোকে কবষ ঋষির কথা উল্লেখ আছে। তিনি একজন দাসীপুত্র সুতরাং শূদ্র। কিন্তু তিনি ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলের অন্তর্গত ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ও ৩৪ সূত্র রচনা করেন। কক্ষীবান ঋষি ঋগ্বেদ সংহিতার কতকগুলি সূক্ত রচনা করেন, তিনিও দাসীপুত্র, কারণ—'কক্ষীবন্তং য ঔশিজঃ।' ১।১৮।১ এই উশিজ দাসবর্ণীয়া ছিলেন। আবার বিশ্ববারা, রোমনা, যমী, উর্ব্বশী প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরাও বেদ মন্ত্রের রচয়িত্রী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। ইঁহারা সকলে ঋগ্বেদ মন্ত্র রচনা করেন।"

ভাণ্ডারকরের ন্যায় প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ বলেন যে, গুপ্তবংশের রাজ্যকালে যখন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় হয়, তখন পুরোহিতগণের প্রাধান্য স্থাপন করিবার জন্য পুরাণ এবং অন্যান্য শাস্ত্রে অনেক অংশ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায়, উচ্চ জাতিগণ যে বংশমর্য্যাদার দাবী করেন তাহার মূলে ঐতিহাসিক প্রমাণ অল্পই আছে। এইবার আমি আপনাদের আর একটি বিষয় আলোচনা করিতে অনুরোধ করিতেছি। কি করিলে আমাদের সমাজের উন্নতি হইবে তাহা দেখিতে হইবে। অদৃষ্টক্রমে উচ্চবংশে জন্মিয়াছেন বলিয়া মুষ্টিমেয় কয়েকজন

সমস্ত সুবিধা একচেটিয়া করিয়া লইবেন আর লক্ষ লক্ষ দেশবাসীকে ছোট লোক বলিয়া ঘৃণা করিবেন ইহা কি ধর্ম্মানুমোদিত না ইহাতে দেশের উন্নতি হইবে ? নিজেদের মধ্যে অনৈক্য থাকিলে আমাদের পতন অনিবার্য্য। নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাও আমাদের ভাই, তাহাদের বর্ত্তমান হীন অবস্থা হইতে উন্নতির পথে তুলিয়া লইবার জন্য প্রত্যেক দেশ-হিতৈষীরই আন্তরিক চেষ্টা করা উচিত। দেশের অধিকাংশ লোক দাসের মত থাকিবেন এবং কয়েকজন লোক তাহাদের উপর প্রভুত্ব ফলাইবেন, এরূপ অন্যায় ব্যাপার আর কত দিন চলিবে ? দেশের এতগুলি লোক মূঢ় জড়ের ন্যায় পড়িয়া থাকিলে দেশ কি উন্নত হইবে ? না শক্তিশালী হইবে ? সমুদায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রজাগণের সঙ্গে সমান রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য আমরা নিয়ত আন্দোলন করি কিন্তু আমাদের নিজের দেশবাসিগণকে তাহাদের জন্মগত অধিকার দিতে রাজী নই—সে কথা উঠিলেই যেন আমাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয় !

রবীন্দ্রনাথ অনেক দুঃখে বলিয়াছেন—

"যারা নীচে পড়ে আছে সংখ্যায় তারাই বেশি—তাহাদের জীবন-যাত্রার আদর্শ সকল বিষয়েই হীন হলেও উপরের লোককে সেটা বাজে না। বরঞ্চ তাদের চাল-চলন যদি উপরের আদর্শ অবলম্বন করতে যায় তাহলে সেটাতে বিরক্তি বোধ হয়।

তার পরে এই-সব চির-অপমানে-দীক্ষিত মানুষগুলো যখন মানব-সভায় স্বভাবতঃই জোর-গলায় সম্মান দাবী করতে না পারে, যখন তারা এত সঙ্কুচিত হয়ে থাকে যে বিদেশী উদ্ধতভাবে তাদের অবজ্ঞা কর্ত্তে অন্তরে বাহিরে বাধা বোধ না করে, তখন সেটাকে কি আমাদের নিজেরই কৃতকর্ম্ম বলে গ্রহণ করব না ?

আমরা নিজেরা সমাজে যে অন্যায়কে আটেঘাটে বিধিবিধানে বেঁধে চিরস্থায়ী করে রেখেছি সেই অন্যায় যখন পলিটিক্সের ক্ষেত্রে অন্যের হাত দিয়ে আমাদের উপর ফিরে আসে তখন সেটা সম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবে আপত্তি কর্‌বার জোর আমাদের কোথায়?

জোর করি সেই বিদেশীরই ধর্ম্মবুদ্ধির দোহাই দিয়ে। সে দোহাইয়ে কি লজ্জা বেড়ে ওঠে না! এ কথা বল্‌তে কি মাথা হেঁট হয়ে যায় না, যে, সমাজে আমাদের আদর্শকে আমরা ছোট করে রাখব, আর পলিটিক্সে তোমাদের আদর্শকে তোমরা উঁচু করে রাখ? আমরা দাসত্বের সমস্ত বিধি সমাজের মধ্যে বিচিত্র আকারে প্রবল করে রাখব, আর তোমরা তোমাদের ঔদার্য্যের দ্বারা প্রভুত্বের সমান অধিকার আমাদের হাতে নিজে তুলে দেবে? যেখানে আমাদের এলেকা সেখানে ধর্ম্মের নামে আমরা অতি কঠোর কৃপণতা কর্‌ব, কিন্তু যেখানে তোমাদের এলেকা সেখানে সেই ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে অপর্য্যাপ্ত বদান্যতার জন্যে তোমাদের কাছে দর্‌বার কর্‌তে থাক্‌ব এমন কথা বলি কোন্‌ মুখে? আর যদি আমাদের দর্‌বার মঞ্জুর হয়? যদি, আমরা আমাদের দেশের লোককে প্রত্যহ অপমান কর্‌তে কুণ্ঠিত না হই, অথচ বিদেশের লোক এসে আপন ধর্ম্মবুদ্ধিতে সেই অপমানিতদের সম্মানিত করে তাহলে ভিতরে বাহিরেই কি আমাদের পরাভব সম্পূর্ণ হয় না?

সেখানেও কি আমরা বল্‌ব, ধর্ম্মবুদ্ধিতে তোমরা আমাদের চেয়ে বড় হয়ে থাক; নিজেদের সম্বন্ধে আমরা যে-রকম ব্যবহার কর্‌বার আশা করিনে আমাদের সম্বন্ধে তোমরা সেই রকম ব্যবহারই কর? অর্থাৎ চিরদিনই নিজের ব্যবস্থায় আমরা নিজেদের খাটো করে রাখি, আর চিরদিনই তোমরা নিজগুণে আমাদের বড় করে তোলো। সমস্ত বরাৎই অন্যের উপরে, আর নিজের উপরে একটুও নয়? এত অশ্রদ্ধা নিজেকে

আর এতই শ্রদ্ধা অন্যকে? বাহুবলগত অধমতার চেয়ে এই ধর্ম্মবুদ্ধিগত অধমতা কি আরো বেশি নিকৃষ্ট নয়?

অল্পকাল হল একটা আলোচনা আমি স্বকর্ণে শুনেছি, তার সিদ্ধান্ত এই যে, পরস্পরের মধ্যে পাকা দেওয়ালের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও এক চালের নীচে হিন্দু মুসলমান আহার করতে পারবে না, এমন কি সেই আহারে হিন্দুমুসলমানের নিষিদ্ধ কোনো আহার্য্য যদি নাও থাকে। যাঁরা এ কথা বলতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন না, হিন্দুমুসলমানের বিরোধের সময় তাঁরাই সন্দেহ করেন যে বিদেশী কর্ত্তৃপক্ষেরা এই বিরোধ ঘটাবার মূলে; এই সন্দেহ যখন করেন তখন ধর্ম্মবিচারে তাঁরা বিদেশীকে দণ্ডনীয় মনে করেন। এর একমাত্র কারণ ধর্ম্মের দাবী নিজের উপরে তাঁহাদের যতটা, বিদেশীর উপরে তার চেয়ে অনেক বেশি। স্বদেশে মানুষে মানুষে ব্যবধানকে আমরা দুঃসহরূপে পাকা করে রাখব সেইটেই ধর্ম্ম, কিন্তু বিদেশী সেই ব্যবধানকে কোনো কারণেই কোনো মতেই নিজের ব্যবহারে লাগালে সেটা অধর্ম্ম। আত্মপক্ষে দুর্ব্বলতাকে সৃষ্টি করব ধর্ম্মের নামে, বিরুদ্ধ পক্ষে সেই দুর্ব্বলতাকে ব্যবহার করলেই সেটাকে অন্যায় বলব।

যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, পাকা দেওয়ালের অপর পারে যেখানে মুসলমান খাচ্চে দেওয়ালের এপারে সেখানে হিন্দু কেন খেতে পারে না, তা হলে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়াই আবশ্যক হবে না। হিন্দুর পক্ষে এ প্রশ্নে বুদ্ধি খাটানো নিষেধ এবং সেই নিষেধটা বুদ্ধিমান জীবের পক্ষে কত অদ্ভুত ও লজ্জাকর তা মনে উদয় হবার শক্তি পর্য্যন্ত চলে গেছে। সমাজের বিধানে নিজের বারো আনা ব্যবহারের কোনোপ্রকার সঙ্গত কারণ নির্দ্দেশ করতে আমরা বাধ্য নই; যেমন বাধ্য নয় গাছপালা কীটপতঙ্গ পশুপক্ষী। পলিটিক্সে বিদেশীর সঙ্গে কারবারে আমরা প্রশ্ন

জিজ্ঞাসা করতে শিখেচি,—সে-ক্ষেত্রে সকল রকম বিধিবিধানের একটা বুদ্ধিগত জবাবদিহি আছে বলে মানতে অভ্যাস করচি; কিন্তু সমাজে পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহার, যার উপরে পরস্পর গুরুতর সুখ দুঃখ শুভাশুভ প্রত্যহ নির্ভর করে সে সম্বন্ধে বুদ্ধির কোনো কৈফিয়ৎ নেওয়া চলে একথা আমরা ভাবতেও একেবারে ভুলে গেছি।"

এসিয়াবাসী জাতিও রাজনৈতিক উন্নতি লাভ করিতে পারে এই প্রমাণ করিবার জন্য আমরা অনবরত জাপানের দৃষ্টান্ত দিয়া থাকি। কিন্তু জাপান সমাজ-সংস্কারের জন্য কি কি করিয়াছে তাহা আমরা ইচ্ছা করিয়া বিস্মৃত হই। বিগত শতাব্দীর সত্তরের কোটা পর্য্যন্ত আমাদের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের ন্যায় সে দেশের সামুরাই জাতি সমস্ত সুবিধা একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিল। এতা এবং হিনিন নামে দুইটি অস্পৃশ্য অতিঘৃণিত জাতি ছিল, গ্রামের বাহিরে তাহাদিগকে বাস করিতে হইত। মাদ্রাজ প্রদেশে আজিও কয়েকটি নীচ জাতি এইরূপে ঘৃণিত হইতেছে। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর জাপানের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় থাকিবে। কারণ ঐ দিনে সামুরাইগণ নিজেদের দেশভক্তি ও উন্নত হৃদয়ের প্রভাবে স্বেচ্ছায় আপনাদের সর্ব্ববিধ বিশেষ সুবিধা ত্যাগ করিলেন এবং ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যে সকল অন্যায় প্রভেদ ছিল তাহা উঠাইয়া দিলেন। এইরূপে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতির প্রতিষ্ঠা হইল।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে জাপানে যাহা সম্ভব হইয়াছিল, ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে এতদিন পরেও ভারতবর্ষে তাহা সম্ভব হইল কৈ? এখনও আমাদের দেশে "বার রাজপুতের তের হাঁড়ি" আর ৫০০ কংগ্রেস প্রতিনিধির জন্য ৫০০টি রাঁধিবার স্থান চাই! এততেও কুলায় না, এর উপর আবার মাদ্রাজে দৃষ্টি দোষ' ঘটিয়া থাকে! যদি কোনও 'পঞ্চম' শ্রেণীভুক্ত (অর্থাৎ

নীচজাতীয়) লোক কোনও ব্রাহ্মণের অগ্নিপক্ক খাদ্যের প্রতি, এমন কি দূর হইতেও দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাহা হইলে সেই খাদ্য অপবিত্র হইয়া যায়! যদি অতি দূর হইতে দূরবীক্ষণের সাহায্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাহা হইলে খাদ্য অপবিত্র হইবে কি না তাহা মান্দ্রাজের স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ কি আমাদিগকে বলিয়া দিবেন? কুসংস্কার মানুষকে কতদূর হীন করিতে পারে তাহার একটি জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত মালাবারের নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণসমাজ। একসময়ে এই নাম্বুদ্রি সমাজেই শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় অসাধারণ পণ্ডিত ও ধর্ম্মপ্রচারকের উদ্ভব হইয়াছিল, কিন্তু আজ নাম্বুদ্রিগণ ভারতবর্ষের একটি অখ্যাত ও নগণ্য সম্প্রদায়। এই অধঃপতনের মূলে তাহাদের অদ্ভুত বিবাহপ্রথা। পরিবারের মধ্যে কেবল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিবাহ করিবার অধিকারী, অন্যান্য ভ্রাতাগণ বিবাহ করিতে পায় না। ফলে তাহাদের চরিত্র কলুষিত হইয়া পড়ে। এদিকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অনেক স্থলে বহু বিবাহ করিয়া থাকে। এই প্রাচীন প্রথার দাস হইয়া নাম্বুদ্রি-গণ নিজেদের উন্নতির পথ নিজেরাই রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে।

সৌভাগ্যক্রমে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় এই জাতিসমস্যা এতদূর গুরুতর আকার ধারণ করে নাই। প্রকৃতপক্ষে বাংলার কায়স্থ ও বৈদ্যগণ বিদ্যায় ব্রাহ্মণগণের সমান এবং সমাজের সম্মানে ব্রাহ্মণগণের প্রায় সমতুল্য। ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অন্য কয়টি জাতির মধ্যে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা অধিক। বাংলাদেশে বিভিন্ন জাতির একহাজার লোকের মধ্যে কয়জন লোক লিখিতে ও পড়িতে পারে তাহার গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে, বৈদ্যগণের মধ্যে ৫৩২ জন, সুবর্ণ বণিকের মধ্যে ৪৫১ জন, ব্রাহ্মণের মধ্যে ৩৯৯ এবং কায়স্থের মধ্যে ৩৪৬ জন; বিহার ও উড়িষ্যার কায়স্থগণের মধ্যে ৩৩২ এবং ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ১৬৮ জন; অর্থাৎ সমসংখ্যক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের মধ্যে লেখাপড়া জানা কায়স্থের

সংখ্যা লেখাপড়া জানা ব্রাহ্মণের সংখ্যার দ্বিগুণ। আর একটি কথা, বাংলায় বহুকাল হইতে কৈবর্ত্ত, নাপিত, সদ্গোপ এবং তিলি প্রভৃতি জাতি জলাচরণীয় বলিয়া পরিগণিত হওয়ায় অনেকটা সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে লেখাপড়ায় ব্রাহ্মণগণ অন্যান্য জাতির অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ, ফলে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণের মধ্যে বিষম ব্যবধান রহিয়া গিয়াছে। এই ব্যবধানই ঐ দুই প্রদেশে জাতিবিদ্বেষের প্রধান হেতু। অথচ ৪ কোটী ১৫ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে, মাত্র ১৫ লক্ষ ব্রাহ্মণ।

সাত আট বৎসর পূর্ব্বে আমি বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের অপব্যবহার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি তাহা সমগ্র ভারতবর্ষ সম্বন্ধেই খাটে! সেই জন্য কথাগুলি আমি এখানেও উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—"নবদ্বীপের নব্যন্যায় ও স্মৃতির সূক্ষ্ম তর্কে বাঙ্গালীর যে বুদ্ধির প্রাখর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে আমরা গর্ব্ব অনুভব করি সত্য, কিন্তু আমাদের ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে যে-সময়ে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশরের পুঁথি ঘাঁটিয়া নিয়ম বাহির করিতেছিলেন যে নয় বৎসর বয়সের বালিকা বিধবাকে কিরূপ কঠোর উপবাস করানো আবশ্যক এবং তাহা না করিলে তাহার পিতৃ পুরুষগণ নরকভোগ করিবেন ; যে সময়ে রঘুনাথ, গদাধর ও জগদীশ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িকগণ প্রাচীন ন্যায়ের টীকা টিপ্পনী লিখিয়া টোলের ছাত্রগণের ভীতি উৎপাদন করিতেছিলেন, যে-সময়ে আমাদের জ্যোতিষীগণ, গণনা করিতেছিলেন নৈঋত কোণে কোন্ কোন্ মুহূর্ত্তে কাক ডাকিলে তাহার ফলাফল কি ; যে-সময়ে আমাদের দেশের পণ্ডিতগণ তাল ঢিপ্ করিয়া পড়ে কি পড়িয়া ঢিপ্ করে এই গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে প্রচণ্ড তর্কের দ্বারা সভ্যসমূহের শান্তি ভঙ্গ করিতেছিলেন ; যে-সময়ে নবদ্বীপের বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ অমূল্য সময়ের

এইরূপ ব্যবহার করিতেছিলেন, সেই সময়ে ইউরোপে গ্যালিলিও, কেপ্‌লার, নিউটন ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণ প্রকৃতির রহস্য উদ্ভেদ করিতেছিলেন এবং এক নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়া মানববুদ্ধির মহিমা প্রচার করিতেছিলেন।"

স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থই বলিয়াছেন—"যে ধর্ম্মে গরীবের দুঃখ বোঝে না, মানুষকে উন্নত করে না, তাহা ধর্ম্মনামের যোগ্য নহে। আমাদের ধর্ম্ম এক্ষণে কেবল 'ছুৎমার্গে' পরিণত হইয়াছে—কাহাকে ছুঁইতে পারা যায়, কাহাকে ছুঁইতে পারা যায় না; তাহারই বিচারে পরিণত হইয়াছে। হা ঈশ্বর! যে দেশের সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিতগণ ডান হাতে খাইব না বাঁ হাতে খাইব এইরূপ কঠিন সমস্যার মীমাংসায় শত দুহাজার বৎসর ব্যস্ত আছেন, সে দেশের অধঃপতন হইবে না ত হইবে কাহার?"

বাংলার স্বামী বিবেকানন্দের মত পাঞ্জাবের স্বামী রামতীর্থও ভারতবর্ষে এবং আমেরিকায় একজন অসাধারণ ক্ষমতাশালী ধর্ম্ম-প্রচারক বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনিও বিবেকানন্দের মত ওজস্বিনী ভাষায় বর্ত্তমান জাতিভেদ প্রথার অসারতা ও অনিষ্টকারিতা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন:—"হিন্দুসমাজের অন্তর্গত নীচ জাতীয় লোকেরাই কঠোর পরিশ্রম দ্বারা সমাজের সেবা করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে উচ্চজাতীয় লোকেরা তাহাদিগকে নিজের ভুক্তাবশিষ্ট মাত্র দিয়া বাঁচাইয়া রাখেন। দরিদ্র নিম্নশ্রেণীস্থ লোকেরাই সমাজের চরণস্বরূপ বা ভিত্তিস্বরূপ। যে অহঙ্কারী সমাজ এই নিম্নশ্রেণীস্থ লোকেদের উপর অত্যাচার করে এবং তাহাদিগকে শিক্ষা ও সুবিধা লইতে বঞ্চিত করিয়া রাখে সে-সমাজ নিজের পা নিজেই কাটিয়া ফেলে, সে-সমাজ ভূমিশায়ী হইবেই হইবে।"

আজকাল 'অস্পৃশ্যতা' ব্যাপারটি আবার একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে পরিণত হইয়াছে! একজন পারিয়া যদি একবারটি তোমার ঘরের চৌকাঠ ডিঙায় তাহা হইলেই অমনি ঘরের খাবার জল অপবিত্র বলিয়া সব ফেলিয়া দিতে হয়, কিন্তু বরফ লেমনেডের বেলায় তাহাদের তৈয়ারী হইলেও দিব্য আরামে পান করা চলে। সমাজের কেহ কোন বিশেষ সম্মান লাভ করিলে ভোজের আয়োজন হয়, পেলেটীর বাড়ী খানার বন্দোবস্ত হয়, সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা তাহাতে যোগদান করেন, তাহাদের নাম খবরের কাগজে বাহির হয়; তবুও কিন্তু বাবুদের জাত যায় না। কিন্তু যদি বিবাহে কি শ্রাদ্ধে কেউ মুসলমান কি তথাকথিত নীচ জাতি হিন্দুর সহিত একত্রে খাইল, অমনি সমাজ খড়্গহস্ত; তাহাকে জাতিচ্যুত করিয়া তবে নিশ্চিন্ত হয়। ইহার মধ্যে "যুক্তি, তর্ক কিম্বা সহজ বুদ্ধি" কোথাও আছে কি?

জাতিপ্রথা একেবারে উঠাইয়া দেওয়া যদি আপাততঃ অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়, তবে অন্ততঃ ইহার বাঁধাবাঁধি একটু শিথিল করিলে ক্ষতি কি? সমাজে যদি এত অমিল থাকে, সামান্য সামান্য চুলচেরা প্রভেদ লইয়া কেবল দলাদলি ও ঝগড়া লইয়াই যদি নিয়ত ব্যস্ত থাকি, তাহা হইলে দেশ কি আপনা আপনি স্বাধীন ও শক্তিমান হইয়া উঠিবে? জাতিভেদ-প্রথাই যে আমাদের দুর্দ্দশার একটি প্রধান কারণ তাহা 'প্রবাসী' যথার্থই নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"আমাদের হীনতার কারণ সম্বন্ধে সকলের স্পষ্ট ধারণা নাই। অনেকে এ বিষয়ে কিছু জানেন না, চিন্তাও করেন না। অনেকে পরিষ্কার করিয়া এরূপ না ভাবিলেও তাঁহাদের মনের মধ্যে যেন এই রকম একটা ধারণা আছে, যে আমাদের হীনতাটা বাহিরের কতকগুলি লোক বিদেশ হইতে আসিয়া আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছে, আমাদের ইহাতে

কোন দোষ নাই। এই ধারণা ভ্রান্ত! বিদেশীদেরও দোষ আছে; কিন্তু প্রথম দোষ ও প্রধান দোষ আমাদের নিজের।

দেশের সমুদয় পুরুষ নারী, সমুদয় বালক বালিকা লইয়া জাতি। এই-সব মানুষ বা ইহাদের অধিকাংশ হীন হইলেই জাতি হীন হইল।

আগে হীনতার ধারণাটাই পরিষ্কার হউক। আমাদের দেশে কতকগুলি জা'তকে বলা হয় ভাল জা'ত, উঁচু জা'ত, শ্রেষ্ঠ জা'ত, ইত্যাদি; এবং অপর কতকগুলি জা'তকে বলা হয় নীচ জা'ত, ছোট জা'ত, ছোট লোক, হীন জা'ত প্রভৃতি। শিক্ষিত লোকেরা মোটামুটি জানেন যে এই তথাকথিত হীন জা'তের লোকদের সংখ্যাই বেশী, তথাকথিত উঁচু জাতের লোকদের সংখ্যা কম। সেন্সস্ রিপোর্ট দেখিলে বুঝা যায় যে এই ধারণা সত্য। আচ্ছা, যদি আমরা নিজেই আমাদের জাতির অধিকাংশ জাতের অধিকাংশ লোককে হীন মনে করি, তাহা হইলে আর-সমস্ত জাতিটা হীন হইতে বাকি থাকিল কি? অন্য জাতির লোকেরা, বিদেশী লোকেরা, আমাদিগকে হেয় মনে করিয়া অবজ্ঞা করিলে, আমাদিগের জাতিকে অপমান করিলে, আমরা চটিয়া যাই, এবং চটিয়া যাওয়া কতকটা স্বাভাবিকও বটে; কিন্তু আমরা নিজেই যে আমাদের দেশের কোটি কোটি লোককে "ছোট লোক" নাম দিয়া রাখিয়াছি, তাহাতে দোষ হয় না? তাহাতে আমাদের জাতির অপমান হয় না? 'হীন' জাতের লোকদিগকে কেবল যে নামেই হীন বলা হয়, তাহা নয়, সামাজিক ব্যবস্থা তাহাদিগকে, অর্থাৎ দেশের অধিকাংশ লোককে বাস্তবিকই হীন করিয়া রাখিয়াছে।"

জাতীয় ঐক্যের প্রচারক কি বলিয়াছেন শুনুন :—ভারতবাসীরা বাস্তবিক বিশ্বাস করিতেন যে কেহ কেহ ব্রহ্মার মুখ হইতে, কেহ কেহ বা তাঁহার হাত হইতে এবং কেহ কেহ বা তাঁহার পা হইতে উৎপন্ন;

তদনুসারে তাঁহারা আপনাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে ভাগ করিয়া কাহারও উপর লেখাপড়ার, কাহারও উপর যুদ্ধ বিদ্যার, কাহারও উপর ব্যবসার এবং বাকিদের উপর সেবার ভার দেন ; ইহাতে যে একটি 'অচলায়তনের' সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং যতদিন ঐরূপ ধর্ম্ম বিশ্বাস থাকিবে, ততদিন উহা বর্ত্তমান রহিবে।"

ম্যাট্‌সিনি আশি বৎসর আগে যে কথাগুলি বলিয়া গিয়াছেন আজও তাহা সভ্যজগতের কাণে বাজিতেছে।

ভারতের ভবিষ্যৎ এই প্রশ্নের সমাধানের উপর নির্ভর করিতেছে। এই বিষয়ে কিন্তু প্রাচীন ভারত যথেষ্ট উদার ও বিজ্ঞ ছিল। ছান্দোগ্য উপনিষদে সত্যকাম জাবালের সুন্দর উপাখ্যান হইতে আমরা জানিতে পারি যে তৎকালে সত্য-প্রিয়তা ও বিদ্যার বলে লোকে সমাজের সর্ব্বোচ্চ সম্মান এবং শীর্ষস্থান (ব্রাহ্মণত্ব) লাভ করিতে পারিতেন।

কেহ কেহ বলেন আমাদের বেদান্তের মতে সমুদয় জগতই ব্রহ্মের অংশ—উচ্চ জাতি, নীচ জাতি এইরূপ জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন। বেশ কথা, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি দেশের মধ্যে কয়জন এই উচ্চ দার্শনিক তর্ক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে এবং সেই অনুসারে কাজ করিয়া থাকে? আমরা ত দেখি ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতি নমঃশূদ্রাদিকে কুকুর শিয়ালের মত জ্ঞান করেন।

অনেকে বলেন যে, অবনত জাতিরা এতদিন ধরিয়া সমাজে তাহাদের হীন অবস্থার জন্য আদৌ দুঃখিত ছিল না, কেবল হালেই তাহাদের সম্মান জ্ঞান জাগিয়া উঠিয়াছে এবং তাহারা ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে! আমাদের দেশের যুবকদের সম্বন্ধেও 'এংলো ইণ্ডিয়ান্‌রা' ঠিক এই কথাই বলিয়া থাকেন। ইউরোপীয়ান্‌দের আগমনের বহুপূর্ব্বে

এমন কি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতেও আমরা জাতিচ্যুতদের ভীষণ আর্ত্তনাদ শুনিতে পাই। সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ 'শূন্য পুরাণ' বা 'ধর্ম্মপুরাণ' নামে একটি প্রাচীন কাব্যগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে; তাহাতে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম যখন একটু একটু করিয়া হিন্দুধর্ম্মের সহিত মিশিয়া যাইতেছিল, সেই সময়কার অবস্থা বেশ জানিতে পারা যায়। এখানে তাহার একটি জায়গা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না—

দক্ষিন্যা মাগিতে যাএ জার ঘরে নাঞি পাএ
সাঁপ দিয়া পুড়াএ ভুবন।

* * *

ধর্ম্ম হইল যবনরূপী মাথা অত কাল টুপী
হাতে সোভে তিরুচ কামান।
চাপিয়া উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদাঅ বলিয়া একনাম॥
নিরঞ্জন নিরাকার, হৈল্য ভেস্ত অবতার,
মুখেতে বলেত দম্বদার।
যত্তেক দেবতাগণ সভে হয়্যা একমন,
আনন্দেতে পরিল ইজার॥
ব্রহ্মা হৈল মহামদ, বিষ্ণু হৈল্যা পেকাম্বর,
আদম্ফ হৈল্যা শূলপানি।
গনেশ হৈল্যা গাজী কার্ত্তিক হইল্যা কাজী
ফকির হইল্যা মহামুনি॥
তেজিআ আপন ভেক, নারদ হৈল্যা সেখ
পুরন্দর হইল মৌলানা।

চন্দ স্বজ্জ আদি দেবে, পদাতিক হয়্যা সেবে,
সভে মিলি বাজান বাজনা ॥
আপনি চণ্ডিকা দেবী, তিহ হৈল্যা হায়া বিবি,
পদ্মাবতী হইল বিবিনূর।
যত্তেক দেবতাগণ, হয়্যা সবে একমন,
প্রবেশ করিল জাজপুর ॥

ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে ৬।৭ শত বৎসর পূর্ব্বেও ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষ কিরূপ প্রবল ছিল।

মধ্যে মধ্যে বিশেষতঃ গত তিন শতাব্দীতে, গুরু নানক, কবীর, চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মা এদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া সকলেই "ভাই ভাই" এই সাম্যবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। যদি তাঁহারা এই শিক্ষা প্রচার না করিতেন, তাহা হইলে উত্তর ভারতে আরও অনেক লোকে নিশ্চয় মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিত।

আর্য্যগণ যেমন অনার্য্যদিগকে ঘৃণা করিতেন, প্রাচীনকালের ইহুদীরাও অন্যান্য জাতিকে সেইরূপ ঘৃণা করিত। তাহারা ভাবিত তাহারা ঈশ্বরের বিশেষ অনুগৃহীত ও অন্যান্য জাতিরা নীচ তাহাদের সঙ্গে আহার করিলে অশুচি হইতে হয়। যীশুখৃষ্ট প্রথমে ইহুদীদের শিক্ষা দিলেন মানুষ মাত্রেই ঈশ্বরের পুত্র—সকলেই ভাই ভাই। পরে সেণ্টপলও এই মহতী বাণীর ব্যাখ্যা করিয়া প্রচার করিলেন—"ঈশ্বর কেবল ইহুদীদেরই ঈশ্বর নহেন তিনি অন্যান্য জাতিরও ঈশ্বর।" কাজেই কাহাকেও নীচ বলিয়া অবজ্ঞা করা মূঢ়তার পরিচায়ক। মোক্ষ লাভের পথ সকলেরই পক্ষে মুক্ত। কিন্তু গর্ব্বান্ধ ইহুদী এই সনাতন সত্যের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিল না। ইহার ফল কি হইল? ইহুদী জাতি এখন স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া পৃথিবীময়

অত্যাচারিত ও ঘৃণিত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পৃথিবীর দুইটি প্রাচীন সভ্যজাতি হিন্দু ও ইহুদী নিজের গর্ব্বান্ধতার ফলে আজ এত দীনহীন হইয়া পড়িয়াছে।

তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর হিন্দু একথা যেন কখন না ভোলেন যে যদি তাঁহারা তাঁদের অশিক্ষিত দেশভ্রাতাগণকে চণ্ডাল, অন্ত্যজ, পঞ্চমা প্রভৃতি অবজ্ঞাসূচক অভিধানে অভিহিত করিয়া তাহাদের নিকট হইতে দূরে থাকেন তাহা হইলে তাঁহারা সমগ্র হিন্দুজাতির উন্নতির আশা সমূলে নাশ করিবেন। বাংলা দেশের আমরা ২৫ লক্ষ তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর হিন্দু সাড়ে চার কোটী অবশিষ্ট হিন্দু ও মুসলমান হইতে পৃথক থাকিয়া নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়াল মারিয়াছি। যাহাদিগকে আজ অবজ্ঞা করিতেছি কে বলিতে পারে উপযুক্ত শিক্ষা ও সুযোগ পাইলে তাহাদের মধ্যে অনেক বীর বা জ্ঞানী হইতে পারিত না? শাস্ত্রবিশ্বাসী হিন্দু কি বিস্মৃত হইয়াছেন যে দেবর্ষি নারদ ও ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ দাসীপুত্র ছিলেন এবং মহর্ষি ব্যাস ধীবরের কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আর এত দিনের কথায়ই বা কাজ কি? মুসলমান-অধিকারের সময়েও ভারতবর্ষে শূদ্র তুকারাম, জোলা কবির, মুচি রুহীদাস, এবং মান্দ্রাজের ঘৃণিত ও অত্যাচারিত পঞ্চমা শ্রেণীভুক্ত সাধুগণের কাহিনী পড়িলে বুঝা যায় জ্ঞান বা ভক্তি কোনো শ্রেণীবিশেষের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়! জাতিধর্ম্ম নির্বিশেষে সমস্ত লোকই যে দেশে শিক্ষার অধিকার ও উন্নতির সুযোগ লাভ করিয়া থাকে সেই দেশই অচিরে সর্ব্বসৌভাগ্যশালী হইয়া উঠে।

এই সম্বন্ধে 'প্রবাসী'র উক্তি প্রণিধানযোগ্য :—"জ্ঞানে, ধর্ম্মে, চরিত্রাংশে, সাহসে, স্বার্থত্যাগে, ধনশালিতায়, দৈহিক বলে, শিল্প-নৈপুণ্যে,—নানাদিকে হীন হইলে, জাতিকে হীন বলে। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর ও অজ্ঞ; পুরুষদের চেয়ে নারীদের

মধ্যে অজ্ঞতা খুব বেশী; আমরা সাত্ত্বিকতার বড়াই যতই করি না, সাত্ত্বিকতার প্রকৃত অর্থ অনেকেই বুঝি না; সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক আমাদের মধ্যে কম। যিনি শ্রেয়কে বরণ করেন, এবং যিনি নিজের ও লোকের শ্রেয়ের জন্য সর্ব্বপ্রকার ক্ষতি ও দুঃখ সহ্য করিয়া সৎকর্ম্ম করেন, তিনি সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক। দেশের অধিকাংশ লোক দারিদ্র্যবশতঃ ভাল করিয়া খাইতে পায় না; তজ্জন্য তাহারা দুর্ব্বল। তাহার উপর নানা রোগে তাহাদিগকে আরো দুর্ব্বল করিয়া রাখে। বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় এবং শিক্ষার অভাবে শিল্পনৈপুণ্য দেশে না থাকারই মধ্যে। তাহাতে আমাদিগকে আরো দরিদ্র, দুর্ব্বল ও ভীরু করিতেছে।

আমাদের হীনতার কারণ একটি নয়, অনেক। তাহারই দুই-একটির উল্লেখ করিতেছি।

দেশের প্রত্যেক পুরুষ ও প্রত্যেক নারীর সমান-মনুষ্যত্ব অস্বীকার আমাদের হীনতার একটি প্রধান কারণ। জন্মতঃ কেহই বড় নয়, কেহ ছোটও নয়। সেই সামাজিক ব্যবস্থাই সুব্যবস্থা, যাহা জন্মনির্বিশেষে প্রত্যেক নারী ও পুরুষকে তাহার শক্তি ও চেষ্টা অনুসারে যে কোন দিকে ভাল ও বড় হইবার, সমাজসেবক হইবার, সমান সুযোগ দেয়। এ পর্য্যন্ত কোন দেশের সমাজব্যবস্থাই এরূপ নিখুঁত হয় নাই; কিন্তু পাশ্চাত্য কোন কোন দেশের সমাজনীতি এই আদর্শের দিকে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। আমাদের দেশের সমাজব্যবস্থায় এই সাম্যনীতি যে ভাবে অস্বীকৃত হইয়া আসিতেছে, এখন তাহা আর কোন দেশে সেভাবে কার্য্যতঃ অস্বীকৃত হইতেছে না। এজন্য আমরা হীন হইয়া আছি, অন্য কোন জাতি শক্তিশালী ও অগ্রসর হইতেছে। অনেকে সামাজিক সাম্যের মানে না বুঝিয়া বা উহার কদর্থ করিয়া সাম্যনীতিকে

উপহাস করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন। সামাজিক সাম্যের মানে ইহা নয় যে প্রত্যেক মানুষেরই বুদ্ধিবৃত্তি বা অন্যবিধ শক্তি সমান, এবং সব মানুষ সব বিষয়ে সমান। ইহার মানে এই, যে জন্মনির্বিশেষে সকল মানুষের কোন না কোন দিকে ভাল, শক্তিশালী ও গুণশালী হইবার সমান সম্ভাবনা থাকায়, সকলেরই ব্যক্তিত্ব ও গুণ বিকাশের, শক্তি অর্জ্জনের, সমান সুযোগ পাওয়া উচিত। জা'তবিশেষে, পরিবারবিশেষে কেহ জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই ধরিয়া লইবার কোন কারণ নাই যে সে বুদ্ধিতে, জ্ঞানে, শক্তিতে, চরিত্রে, বীরত্বে, বা অন্য কোন বিষয়ে হীন হইবেই। পক্ষান্তরে ইহাও ধরিয়া লওয়া উচিত নহে যে কেহ কোন জা'তে, বংশে, বা পরিবারে জন্মিয়াছে বলিয়াই তাহার একটা গুণশালী মানুষ হইবার সম্ভাবনা বেশী। পৃথিবীর সব দেশের ইতিহাসেও দেখা যায় যে, অধিকাংশ সুপ্রসিদ্ধ লোক তাঁহাদের বংশকে ধন্য করিয়াছেন, কিন্তু বিখ্যাত বংশে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা ধন্য ও কীর্ত্তিমান হন নাই।"

স্বর্গীয় ডি, এল, রায় বলিয়াছিলেন—"জাতির সমস্ত বিদ্যা, যশ, ক্ষমতা আত্মসাৎ করে' নিজে বাড়বে? শরীরকে অনশনে রেখে মস্তিষ্ক বড় হবে? তা কি সয়? সয় না। তাই এই অধঃপতন।"

তারপর আমাদের সমাজে মেয়েদের অবস্থাটা একবার ভাবুন; ইহার আমূল পরিবর্ত্তন কি একান্ত বাঞ্ছনীয় নয়? অমর কবি সেক্সপিয়র লিখিয়া গিয়াছেন যে অজ্ঞতা ভগবানের অভিসম্পাত। যদি তাহাই হয় তবে স্ত্রীলোকের অজ্ঞতা কি আরও দশগুণ অধিক অভিসম্পাত নহে? পুরুষেরা সদাসর্ব্বদাই বাহিরে রহিয়াছে, নানান্ রকম লোকের সহিত ব্যবহার করিতেছে, তাহাদের আচার, শিক্ষা, নীতি প্রভৃতি দেখিতেছে ও নিজেদের দোষগুলি বুঝিয়া লইয়া সংশোধন করিয়া লইতেছে। কিন্তু

কি দুঃখের বিষয় যে আমাদের দেশের মেয়েরা অস্বাস্থ্যকর অন্দরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া বহির্জগতের কোনও সম্পর্কে আসিতে পায় না, কূপমণ্ডুকের ন্যায় জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয়। ইহার ফলে তাহারা ছেলেবেলায় মাতার নিকট হইতে যে সমস্ত ভ্রান্ত শিক্ষা ও কুসংস্কারগুলি শিখে, সেগুলি তাহাদের মনে ধ্রুব সত্য বলিয়া গাঁথিয়া যায়, বড় হইয়াও আর সেগুলি ভুল বলিয়া বুঝিতে পারে না; কাজেই আবার নিজেদের ছেলেদের সেইমত শিক্ষা দিয়া থাকে; এইরূপে ভুল শিক্ষাগুলি তাহাদের অস্থিমজ্জাগত হইয়া উঠে।

বাস্তবিক আমাদের বালিকা বধূদের চরিত্র ঠাকুরমাদের দ্বারাই গঠিত হইয়া থাকে। আমরা 'হোমরুল' সম্বন্ধে অনেক কথা কাটাকাটি করিয়া থাকি কিন্তু অন্দরের ভিতর যে ঠাকুরমারূপী একজন যথেচ্ছাচারী সম্রাট রহিয়াছেন, এবং তিনি বালিকা বধূদের অনুমাত্র ব্যক্তিত্ববিকাশের সুযোগ না দিয়া যথেচ্ছ ছাঁচে ঢালাই করিতেছেন, একথা একেবারেই ভুলিয়া যাই। এইরূপে শিক্ষিত যুবকদিগের জীবনে দুটি ভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার একটির সহিত আর একটির কোন সম্পর্ক নাই। বৈঠকখানায় তাঁহারা উপনিবেশগুলির ন্যায় 'হোমরুল' পাইবার জন্য বিস্তর বাক্‌বিতণ্ডার পর অন্দরে প্রবেশ করিয়া খেলাঘরের পুতুল খেলা আরম্ভ করেন। তাঁদের জীবন-সঙ্গিনীগণ জ্যান্ত পুতুল ছাড়া আর কি?

এই সব জ্যান্ত পুতুলের নিখুঁত ছবি রবীন্দ্রনাথের নিপুণ তুলিকায় চমৎকার ফুটিয়াছে :—

(বাসর শয়নে)

বর। জীবনে জীবনে প্রথম মিলন

সে সুখের কোথা তুলনা নাই।

এস, সব ভুলে'   আজি আঁখি তুলে'
শুধু দুঁহুঁ দোঁহা মুখ চাই।

*   *   *

বল একবার,   "আমিও তোমার,
তোমা ছাড়া কারে নাহি চাই!"
ওঠ কেন, ওকি,   কোথা যাও সখি?
কনে। (সরোদনে)   "আইমার কাছে শুতে যাই!"

(অন্দরের বাগানে)

বর।   কি করিছ বনে   শ্যামল শয়নে
আলো করে' বসে' তরুমূল?
কোমল কপোলে   যেন নানা ছলে
উড়ে এসে পড়ে এলোচুল!
পদতল দিয়া   কাঁদিয়া কাঁদিয়া
বহে' যায় নদী কুলকুল।

*   *   *

কানন নিরালা   আঁখি হাসি-ঢালা,
মন সুখস্মৃতি-সমাকুল!
কি করিছ বনে   কুঞ্জ ভবনে?
কনে।   খেতেছি বসিয়া টোপাকুল!   (মানসী)

আপনাদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী অনেকেই হয়ত বিবাহের সময় যেখানে সব চেয়ে বেশী টাকা পাওয়া যাইবে, সেই খানেই আপনাকে বিক্রয় করিতে কুণ্ঠা বোধ করিবেন না। আপনাদের মধ্যেই আবার কেহ কেহ বা জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ স্নেহলতার ন্যায় অনেক কন্যার আত্ম বিসর্জ্জনের জন্য দায়ী আছেন বা দায়ী

হইবেন। আমাদের সমাজের অনেক নেতাই বরপনের বিরুদ্ধে বক্তৃতায় পঞ্চমুখ, কিন্তু আপনাদের ছেলের বিবাহের বেলায়, তাঁহারা সে সব কথা ভুলিয়া যান ও বেশ পীড়ন করিয়া টাকা লইয়া থাকেন। কিছু বলিতে গেলে তখন মায়ের বা স্ত্রীর ঘাড়ে অম্লান-বদনে দোষ চাপাইয়া আপনি সাধু সাজিয়া বসেন। দেশের আশা-ভরসা-স্থল হে যুবকবৃন্দ! অন্যায়ের বিরোধী হইবার সাহস কি আপনাদের নাই? আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান কি একেবারে লোপ পাইয়াছে?

প্রাচীনকালে ভারতে গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি বিদুষী জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন বলিয়া আমরা অহরহ গর্ব্ব করিয়া থাকি। বেদের অনেক স্তোত্র যে মেয়েরা লিখিয়া গিয়াছেন তাহাও আমরা জানি এবং সুবিধামত উল্লেখ করি। বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়কালে মেয়েরাও যে ধর্ম্মসম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া লোক মাতাইতে পারিতেন, তাহাও আমরা পড়িয়াছি। তবে আজকাল স্ত্রীশিক্ষার প্রতি আমরা এত উদাসীন কেন?

উচ্চ জাতির মেয়েরাও যে কোন কোন বিষয়ে ঠিক অবনত জাতিদের ন্যায়ই কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। আমরা তাঁহাদিগকে খাইতে পরিতে দিই এবং মোটের উপর ভাল ব্যবহার করিয়া থাকি সত্য, কিন্তু দুর্লভ মানব-জীবনে খাওয়া পরাই কি সার হইল? আর কিছুই কি করণীয় নাই? তাঁহাদিগকে লেখাপড়া শিখাইতে এবং যাহাতে তাঁহাদের মানসিক বৃত্তিগুলি যথোচিত মার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতে কি আমরা ধর্ম্মতঃ এবং ন্যায়তঃ বাধ্য নহি? সমাজের অর্দ্ধাঙ্গই যদি ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত রহিল, তবে তাহার উন্নতি কিরূপে সম্ভব হইবে?

যাঁহারা মনে করেন যে সমাজের ও ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি ব্যতিরেকেও রাজনৈতিক উন্নতি সাধন সম্ভবপর তাঁহারা নিতান্তই ভ্রান্ত। দেহের সকল অঙ্গ পরিপুষ্ট না হইলে দেহ সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হয় না। জাতীয় সমস্যার কেবল একদিক হইতে আলোচনা না করিয়া সকল দিক হইতেই আলোচনা করিতে হইবে। এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া দেশের কাজ করিলে আমরা অবশ্যই কৃতার্থ হইব।

পরিশেষে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের কেবলমাত্র উল্লেখ করিয়া এই সব বিষয়ের আলোচনার ভার যোগ্যতর ব্যক্তিদিগের হস্তে অর্পণ করিতেছি—

(১) হিন্দু সমাজে বালকবালিকাদের বিবাহের বয়স বৃদ্ধি।

(২) সহবাস-সম্মতির বয়স ষোড়শ বৎসর ধার্য্য করা।

(৩) ১৮৭২ সালের ৩ নম্বর আইনের ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মতানুযায়ী সংশোধন।*

(৪) সমুদ্র যাত্রার বিরুদ্ধে সামাজিক বাধা বিপত্তির দূরীকরণ।

একসময়ে ভারতবর্ষ জ্ঞান-ধর্ম্ম-সভ্যতায় জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। ভারতবর্ষ হইতে সভ্যতার আলোক দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। মানবেতিহাসের জন্মলগ্নে সমগ্র জগত ভারতের নিকট জ্ঞান বিজ্ঞান শিখিত, সমাজিক রীতিনীতি শিখিত, স্বার্থত্যাগ ও পবিত্রতা শিখিত। কিন্তু পরে কয়েক শতাব্দীব্যাপী সামাজিক অবিচার ও অত্যাচারের ফলে ভারত এক্ষণে অন্যান্য জাতির পদতলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহার শরীরে বল নাই, মনে স্ফূর্ত্তি নাই। জাতীয়

---

* এখন পেটেল বিল।

শরীরের হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে যে রক্ত সঞ্চরণ করে তাহা তাহার নিম্ন অঙ্গে পৌঁছায় না। ইহার ফলে নিম্ন অঙ্গগুলি পক্ষাঘাতগ্রস্ত পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে। যতদিন না আবার এই অসাড় অঙ্গগুলির মধ্যে রক্ত-সঞ্চার আরম্ভ হয়, যতদিন না সমাজের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে এবং নারীজাতির মধ্যে জ্ঞানের আলোচনা আরম্ভ হয়, ততদিন পর্য্যন্ত ভারতের জাতীয় উন্নতি লাভ দুরাশা মাত্র। ধনী ও দরিদ্র, উচ্চপদস্থ, ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ আমার দেশবাসী সকলের নিকট আমি যুক্তকরে প্রার্থনা করিতেছি যে তাঁহারা নিজ নিজ বংশমর্য্যাদা ও পদগৌরব বিস্মৃত হইয়া সকলের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করুন। সমাজের অবিচারের ফলে আমরা সভ্য জগতের নিকট ঘৃণিত হইতেছি। শিক্ষিত জগৎ আমাদিগকে কি চক্ষে দেখে তাহার নিদর্শনস্বরূপ সিনেটার রিড আমেরিকায় সম্প্রতি (May 26, 1919) যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ এইখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

I can give you a picture of India in a word. She has a population of 294, 301, 056.........Such a people mark and brand themselves at once as not only unfit for the government of others, but as almost unfit for their own government; yet I would not deny that right to the lowest of God's creatures if he lived off with others like himself and wanted a government of his own. Amongst those 294, 000,000, people there is no excess of superstition to which they have not gone; there is no shadow of intellectual night so black that they have not wrapped their souls in its sable folds; there is no species of caste by which men have sought to divide themselves and keep oppressed by power

and priestcraft their fellowmen that has not been rife in India for centuries of time.

ভারতবাসী নিদ্রা ত্যাগ করুন, জড়তা দূর করুন, সকলের হৃদয়ে আশা উৎসাহ জাগাইয়া তুলুন, নারীসমাজের ও অবনত জাতি-গণের অবস্থার উন্নতি করুন, সামাজিক অনৈক্য ও অবিচারের প্রতিবিধান করুন। তাহা হইলেই আমাদের জন্মভূমি আবার জগদ্বরেণ্যা হইয়া উঠিবেন, আবার আমরা তাঁহাকে তাঁহার প্রাচীন রত্নসিংহাসনে অধিষ্ঠিতা দেখিতে পাইব। এই আশা ও আকাঙ্ক্ষা আমাদের বাহুতে শক্তিপ্রদান করুক, আমাদের হৃদয়ে সাহস প্রদান করুক। ভগবান আমাদের সহায় হউন।

---

১০৫ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে যে বর্ত্তমান রাজপুতদের পূর্ব্বপুরুষগণ শক ও হূণ ছিল। ইদানিন্তন কালেও অনেক পাহাড়িয়া মঙ্গোলীয় জাতি হিন্দু কায়স্থ ও বৈশ্য বলিয়া পরিগণিত হইতেছে :—

"The same was doubtless the case in the Surma Valley which must once have been dominated by Bodo tribes allied to the Tipperas on the south and the Garos and Koches on the north. At the present day, there are very few traces of a recent aboriginal element, but this is due largely to the absorbent power of Hinduism ; as lately as 1835 Pemberton found that members of Jaintia royal family were able in course of time to gain admission to the Kayastha and Vaidya castes, and if these castes opened their portals to aborigines of high social position other less exalted communities doubtless did the same to those of a humbler origin. The Kaibarttas and Chandals or Namasudras, probably include in their ranks large number of Bodo proselytes."

Gait's "Assam"

৫

জাতিভেদ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রশান্ত মহলানবিশের কথা ইউনিভার্সিটি কমিশন রিপোর্টে আগ্রহাতিশয্যে উদ্ধৃত হয়েছে। অন্য কথা অবতারণা করবার আগে আপনাদের সম্মুখে তা থেকে দুই এক ছত্র পাঠ করছি,—

"In Bengal while our mind is highly imaginative and our intellect peculiarly subtle, our actual social life is wholly circumscribed by conventional custom and completely fettered by artificial rules. This divorce of our actual life from the life of our ideas has made us a race of neurasthenics. In addition it is destroying our intellectual power. At present we are too often content merely to imagine and almost never really to achieve. Our only hope lies in true university education. It must awaken in us a real sense of independence in both thought and action."

কমিশন বলেন বাঙালীর ছেলে দোটানায় পড়েছে; তার ঘরে একরকম, বাহিরে ঠিক তার উল্টা। বাস্তবিক শিক্ষিত বাঙালী যুবকের ঘরে এবং বাহিরে এত তফাৎ, তার চিন্তা ও কার্য্যে এত পার্থক্য, ভাবরাজ্যে ও কর্ম্মরাজ্যের ব্যবধান এরূপ সুপ্রশস্ত ও সুগভীর

যে এই অসামঞ্জস্যের ফলে তার বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্ম্মশক্তি ক্রমে ক্ষয় পাচ্ছে। কলেজে জ্যোতির্ব্বিদ্যা অধ্যয়নকালে বাঙালী যুবক বুঝেন চন্দ্রের ছায়া-সম্পাতে সূর্য্যগ্রহণ ঘটে; এদিকে বাড়ীর ভিতর এসে দেখেন আয়ীমা, ঠাকুরমা, দিদিমা, হাঁড়ি ফেলে দিয়ে গঙ্গায় স্নান ক'রে এসেছেন—কেন না সূর্য্যদেব রাহুগ্রস্ত হয়েছিলেন! আমাদের পুঁথিতে বিদ্যা একরূপ, আর সমাজগত ব্যবহার ভিন্নপ্রকার। এরূপ কপটতায় আমরা অতি অল্প বয়স থেকে অভ্যস্ত হয়ে আসছি ব'লে অন্তরকে ফাঁকি দিয়ে বাহিরের ঠাট বজায় রাখতে আমাদের 'তেমন' ঠেকে না—দ্বিধাবোধ হয় না। বুদ্ধি দিয়ে আমরা যা গ্রহণ করি, সামাজিক ব্যাপারে তার প্রায় বিরুদ্ধাচরণই ক'রে থাকি। কিন্তু এরূপ বিরোধ আমাদের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির পরিপন্থী। যুক্তি যা স্বীকার করে হৃদয় যা গ্রহণ করতে চায়, চিরাচরিত ও গতানুগতিকের চাপে সেই চিন্তা ও ভাবকে যদি আমরা জীবনযাত্রাকালে বধ ক'রে চলি তবে বাহিরের চলাফেরা বজায় থাকলেও অন্তরে আত্মহত্যাই ঘটে! আমি অন্যত্র এই একই কথা বলেছি যে মানসিক, আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতির চেষ্টা একসঙ্গে হওয়া চাই! এর মধ্যে একটিকে চেপে অন্যগুলির কথা প্রচার করবার প্রয়াস বিফল হবে, তাতে জাতির কল্যাণ হবে না। কারণ জাতীয় উন্নতি অর্থে একটা বাঁধা-ধরা কিছু বুঝায় না,—বুঝায় সকল দিকে সর্ব্বপ্রকারে জাতীয় জীবনের অবাধ বিকাশ ও প্রসার।

স্বীকার করতেই হবে যে জাতিভেদ প্রথার ভীষণ বন্ধনে আমরা আড়ষ্ট হয়ে আছি, অধঃপাতে গেছি; এতই অধঃপাতে গেছি যে আবার ধর্ম্মের অজুহাতে, আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়ে আমরা এই প্রথাকে—বিশেষতঃ এই ছোঁয়াছুঁয়ি ব্যাপারটাকে—বিধিসঙ্গত ও বিজ্ঞানসম্মত

ব'লে প্রমাণ না ক'রে আর ছাড়্ছি না। আমরা বলি "আমরা হিন্দু—আধ্যাত্মিক জাতি, ঘোরতর spiritual ; আর য়ুরোপীয়েরা জড়বাদী, বড় material ;—তবু caste কোথায় নেই মশাই—এই জাত মেনে চলা? ইংলণ্ড ও আমেরিকার ধনী কি দীন দরিদ্র প্লিবিয়ানের মেয়ে বিয়ে করেন, না তার সঙ্গে একসঙ্গে আহারাদি কর্‌তে সম্মত হন? তা যখন চলে না তখন আর আমাদের সঙ্গে তফাৎ রইল কোথায়?" Things which are equal to the same thing are equal to one another যুক্তি এমনই চমৎকার! বংশগত জাত আর অবস্থাগত জাত যে এক নয় তা এইটুকু বল্‌লেই স্পষ্ট বোঝা যাবে যে—বিশেষ বংশে জন্মগ্রহণের উপর কারো হাত নেই, কিন্তু অবস্থার পরিবর্ত্তন মানুষ চেষ্টার দ্বারা কর্‌তে পারে। দরিদ্র ধনী ও গুণী হয়ে উঠ্‌লেই য়ুরোপ-আমেরিকায় তারা কুলীন হয়ে পড়ে; দরিদ্র অবস্থা থেকে ধনী হয়ে সার্ বা লর্ড উপাধি অনেকেই পেয়েছেন এবং তাঁরা সমাজে অভিজাতদের সমকক্ষ হতে পেরেছেন। কিন্তু আমাদের দেশের নীচু জাত হাজার তপস্যা কর্‌লেও এখন আর পূর্ব্বকালের মত উচ্চজাত ব'লে গণ্য হতে পারে কি?

যাহোক এসব কথা ছেড়ে সমস্যাটিকে একটু তলিয়ে দেখ্‌তে হবে; তুলনা ক'রে দেখ্‌তে হবে য়ুরোপের জাতিভেদ ও আমাদের দেশের জাতিভেদের মধ্যে বাস্তবিক কোন মূলগত পার্থক্য আছে কি না, এদেশের মত য়ুরোপে জাতিভেদ মানুষকে বংশের পর বংশ ধ'রে ক্রমাগত ঘৃণা ক'রে, পেষণ ক'রে, তাকে চেপে কোণঠাসা ক'রে, চিরকালের জন্য হীন ক'রে রেখেছে কি না, তার আত্মসম্মান জ্ঞান প্রায় লুপ্ত ক'রে দিয়ে সর্ব্বপ্রকারে তাকে খর্ব্ব করেছে কি না, হৃদয়হীন ভাবে তার মনুষ্যত্বের অবমাননা করেছে কি না।

একটু সবিস্তারে আলোচনা করা যাক্। মনে রাখ্বেন আজ-কালকার এই "জাতিভেদ" কথাটা আমরা সৃষ্টি করেছি, এটা পুরাতন নয়, পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থে এর উল্লেখ মাত্র নেই। সে সকল পুস্তকে বর্ণভেদ বর্ণাশ্রম প্রভৃতির কথা দেখা যায়। গীতায় আছে—"চাতুর্ব্বর্ণ্যম্ ময়া সৃষ্টম্ গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।" আমাদের দেশে বহুপূর্ব্বে আর্য্য ও অনার্য্য এই দুই শ্রেণীর লোক ছিল। ঋগ্বেদসংহিতা পড়্লে তাদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি তখন আর্য্যদের দেবতা ছিলেন। আর্য্যেরা প্রার্থনা কর্তেন,—"হে ইন্দ্র, হে বরুণ, তোমাদের প্রচুর সোমরস প্রদান করেছি, পান ক'রে প্রসন্ন হও—এবং কৃষ্ণকায় অনার্য্য দস্যু বধ কর।" অনার্য্যেরা কৃষ্ণকায় ও কদাচারী ছিল। আর্য্যেরা ছিল সভ্য এবং গৌরবর্ণ। এদেশে তখন জাতিভেদের মূলে ছিল বর্ণভেদ। আর্য্যেরা যখন পাঞ্জাব প্রদেশ থেকে উত্তর-ভারতের নদীবহুল সমতলক্ষেত্রে ক্রমে বসতি-বিস্তার কর্তে লাগ্ল, তখন কৃষ্ণকায় আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ বাধ্ল এবং পরাজিত হ'য়ে তারা একে একে পর্ব্বতে জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ কর্লে। ভীল, কোল, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতিরা তাদের বংশধর। আমেরিকা দেশেও এইরূপ ঘটনা ঘটেছে। পরাক্রান্ত য়ূরোপীয় জাতির সংঘর্ষণে ও আওতায় রেড ইণ্ডিয়ান প্রভৃতি হীনজাতি টিক্‌তে না পেরে, বনে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা কর্বার চেষ্টা করেছে।

যে দেশে বর্ণভেদ ছাড়া জাতিভেদের অন্য কোন ভিত্তি ছিল না, সে দেশে এই হাজার রকম জন্মগত জাতির উৎপত্তি কিরূপে হ'ল? নানা জাতিতে বিভক্ত বর্ত্তমান হিন্দু সমাজটিকে বিধাতা ঠিক এইরূপে তৈরী ক'রে শৃঙ্খল দিয়ে বেঁধে দ্যুলোক থেকে ভূলোকে নামিয়ে দিয়েছেন, অথবা এই ভূলোকেই এইরূপ জাতিভেদের সৃষ্টি হয়েছে?

যে হিন্দু সমাজে আদৌ জাতিভেদ ছিল না সেই সমাজ ক্রমে "স্পৃশ্য" "অস্পৃশ্য" নানাজাতিতে বিভক্ত হ'য়ে পড়েছে! জাতিভেদের এই অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশ একটু আলোচনা কর্‌তে হবে।

ম্যাক্‌সমুলার প্রথম সমগ্র ঋক্‌বেদ প্রকাশিত করেন। তারপর রমেশ দত্ত বেদের বাংলা অনুবাদ করেছেন। সুতরাং সংস্কৃতবিশারদ না হলেও বেদের কথা এখন অনায়াসেই জান্‌তে পারা যায়। বেবঁর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বেদের নানাপ্রকার আলোচনা করেছেন। তাঁদের মতে— "Caste is not a Vedic institution" ঋগ্বেদের যুগে জাতিভেদ ছিল না। আবার বৈদিক যুগের খাওয়া-ছোঁওয়ার বাছবিচার সম্বন্ধে একটা কথা শুনুন,—অতিথি সৎকারের জন্য তখন গৃহস্থের বাড়ীতে গরু মারা হ'ত, এই জন্যে অতিথির আর একটি নাম ছিল "গোঘ্ন"। স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র অনেক পুরাতন কথা সংগ্রহ ক'রে "Beef-eating in Ancient India" নামক এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এখনকার খাদ্যাখাদ্য বিচার, স্পর্শদোষে খাদ্যদ্রব্য অপবিত্র হবার ব্যবস্থা, এসব বেদে শ্রুতিতে কোথাও দেখা যায় না। এমন কি ভবভূতির সময়ও গোমাংস ভক্ষণ বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল। মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে মহর্ষি বশিষ্ঠ অতিথি হ'লে 'জেন আঅদেষু বসিঠ্‌ ঠমিস্‌সেসু বচ্ছদরী বিসসিদা'—বাছুর নিহত হ'ল এবং 'তেন পরাবড়িদেণ জেব সা বরাইআ কল্লাণিআ মড়মড়াইদা'—তিনি এসেই সেই হতভাগ্য বাছুরের অস্থিমাংস মড়মড় শব্দে চর্ব্বণ ক'রে ফেল্‌লেন; কেননা 'সমাংসো মধুপর্ক ইতি আম্নায়ং বহুমন্যমানাঃ শ্রোত্রিয়ায়াভ্যাগতায় বৎসতরীংমহোক্ষং বা মহাজং বা নির্বপন্তি গৃহমেধিনঃ, তং হি ধর্ম্মসূত্রকারাঃ সমামনন্তি'— মাংস সহিত মধুপর্ক দান করবে এই বেদবাক্যের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন ক'রে গৃহস্থগণ অতিথিরূপে সমাগত বেদাধ্যায়ী বিপ্র বা রাজন্যের

অভ্যর্থনার জন্য বাছুর ষাঁড় বা রামছাগল প্রদান ক'রে থাকেন—ধর্ম্মসূত্র-কারগণ এই রীতিকে ধর্ম্ম ব'লে বিধান দিয়েছেন।—(ভবভূতির উত্তররামচরিত, ৪র্থ অঙ্ক)।

আমরা বলি হিন্দু হ'য়ে বেদের মত অগ্রাহ্য করে এমন কেউ নেই। কিন্তু বেদবিরোধী বিধিব্যবস্থার চাপে ধর্ম্ম যে দেশ ছেড়ে পালাবার উপক্রম করেছেন তা আমরা বুঝেও বুঝ্তে পারি না। শ্রুতি ও স্মৃতি যেখানে পরস্পর বিসম্বাদী সেখানে বিরোধ মীমাংসায় স্মৃতি ছেড়ে দিয়ে শ্রুতির কথাই গ্রাহ্য। কিন্তু আমাদেব এমনি দশা হ'য়ে পড়েছে যে আমরা বরং সত্য ও শ্রুতি পরিত্যাগ কর্‌ব তবুও স্মৃতির অদ্ভুত বিধান ও লোকাচারের কঙ্কালরাশি কিছুতেই ছাড়্‌তে পার্‌ব না। বিচার ও যুক্তির বশবর্ত্তী হ'য়ে কোন হৃদয়বান্ ব্যক্তি যদি অর্থহীন নির্ম্মম বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন তবে সমাজ অমনি রক্ত আঁখি হ'য়ে তার কড়া শাসনের জন্যে "একঘরের মস্ত বন্দোবস্ত" কর্‌তে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠবেন। বড় দুঃখেই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—"ওই যে পশুবৎ হাড়ি ডোম প্রভৃতি বাড়ীর চারিদিকে ঘুর্‌ছে, ওদের জন্যে,—ওই অধঃপতিত, দরিদ্র পদদলিত গরীবদের জন্যে—তোমরা হাজার হাজার সাধু ব্রাহ্মণ কি করেছ? খালি বল্‌ছ ছুঁয়োনা আমায় ছুঁয়োনা! এমন সনাতন ধর্ম্মকে কি ক'রে ফেলেছ? এখন ধর্ম্ম কোথায়? খালি ছুঁৎমার্গ—আমায় ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা!"—কিন্তু বৈদিকযুগে এই ছুঁৎমার্গের অস্তিত্বই ছিল না; তখন ছিল শুধু বর্ণভেদ।

অনার্য্যেরা ছিল কৃষ্ণকায়, কিম্ভূতকিমাকার। তাহাদের ধনসম্পত্তি কেঁড়ে নিয়ে সুজলা সুফলা দেশে বাস কর্‌ল গৌরবর্ণ আর্য্যেরা। অনার্য্যের সহিত সংমিশ্রণ যাতে না হয় তার জন্য আর্য্যেরা সাবধানতা রেছিল;—উভয়ের মধ্যে বৈবাহিক ক্রিয়া তাই তখন প্রায়ই

প্রচলিত ছিল না। আর্য্যেরা ছিল শ্রেষ্ঠ,—অনার্য্যেরা নিকৃষ্ট ব'লে বিবেচিত হ'ত। প্রাচীনকালে অন্য অনেক দেশেই এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। পুরাতন বাইবেল অনুসারে ইহুদীরা ছিল ভগবানের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় জাতি; আর জেন্‌টাইলারা ছিল নিকৃষ্ট, অধম, অস্পৃশ্য—শিয়াল কুকুরের সামিল। মিশর দেশের পুরাতন জাতির মধ্যেও এরূপ ভেদ ছিল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের আগে জাপান দেশের সামুরাই বা ক্ষত্রিয়গণ অন্যান্য জাতিকে হীন ব'লে ঘৃণা কর্‌ত—শিল্পী বা ব্যবসায়ীর সংস্পর্শে আসা লজ্জাকর ব'লে বিবেচনা কর্‌ত। জাপানের চিন্তাশীল নেতৃবর্গ ইচ্ছা ক'রে চেষ্টা ক'রে ব'লে বুঝিয়ে, ব্যষ্টির বিকাশের প্রধান অন্তরায় এই জাতিভেদ প্রথাকে সমাজ থেকে রহিত ক'রে দিয়েছেন। কিন্তু যে দেশের যেরূপ আকারেই থাক না কেন, আমাদের দেশের মত এমন সর্ব্বনাশকারী জাতিভেদ পৃথিবীর কোথাও নেই, কখনও ছিল কি না সন্দেহ! আমাদের দেশে জাতিভেদের পাষাণ-স্তূপে নির্ম্মমতা এমন উগ্র হ'য়ে প্রকট হয়েছে যে তার নিঃশ্বাসে উৎকট ঘৃণার গরল অহরহ বাহির হচ্ছে, তার চাপে পতিত জনসঙ্ঘ দলিত ও মথিত হ'য়ে নিতান্ত অসহায়ের মত একপাশে প'ড়ে রয়েছে।

সর্ব্বপ্রকার বিভেদ ভুলে গিয়ে আপামর সাধারণের কল্যাণকামনায় বুদ্ধ যখন নূতন সত্যের প্রচার আরম্ভ কর্‌লেন—সেই প্লাবনের যুগে ব্রাহ্মণাধিকার তিরোহিত হ'য়ে ভারতবর্ষে সব একাকার হ'য়ে গেল। সেই ভাববন্যা হতে যে যুগের উদ্ভব হ'ল ভারতবর্ষের সে এক শ্রেষ্ঠ যুগ। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন বিদ্যা ও বিজ্ঞান সর্ব্বসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত হ'ল; মগধ সাম্রাজ্য ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে মহারাজ অশোকের সময় দেশবাসীকে এক নূতন জীবনের আস্বাদ প্রদান কর্‌লে। সে জীবনে জাতিভেদ একপ্রকার বিলুপ্ত হ'য়ে গেল; বিবাহাদির

স্বচ্ছন্দ আদানপ্রদানে বিভিন্ন জাতি মিলে মিশে এক হ'য়ে গেল। বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণের আরও কতকগুলি স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বাঙ্গালীর মুখাবয়ব ও শরীরগঠন দেখে তাকে কোনমতে খাঁটি আর্য্যসন্তান ব'লে মেনে নিতে পারা যায় না। মণিপুর, কোচবিহার, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজবংশ খাঁটি আর্য্যবংশ ব'লে পরিচিত হ'তে চান। শুধু তাই নয়, ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা দিয়ে কুলজী তৈয়ারী ক'রে আপন আপন বংশের ধারাকে টেনে টেনে কেউ সূর্য্য কেউ চন্দ্র কেউ বা শুক্র কেউ বা শিব পর্য্যন্ত নিয়ে যান। কিন্তু মুখের উপর যে ছাপটা স্পষ্ট হ'য়ে আছে—তাতে তাঁদের চেহারায় মঙ্গোলীয় সংমিশ্রণ বেমালুম ধরা প'ড়ে যায়। তারপর শক ও হিন্দু মিলে যে রাজপুত ও জাঠ প্রভৃতি ক্ষত্রিয় বংশের উদ্ভব হয়েছে এ কথা ইতিহাসসম্মত।

বাংলাদেশে ১১০০।১২০০ বৎসর ধ'রে বৌদ্ধাধিকার ছিল। বিক্রমপুরে ও তার নিকট স্থানে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে বৌদ্ধযুগের বাংলার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই সুদীর্ঘকাল ধ'রে নানাজাতির যখন অবাধ সংমিশ্রণ হ'য়ে এসেছে, যখন জাত আর আছে কোথায়? খাঁটি আর্য্যরক্ত অনেক অনুসন্ধান করলেও মিলবে না। এ সম্বন্ধে কতকগুলি কথা "সমাজসংস্কার সমস্যায়" বলেছি, এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন ("সমাজসংস্কার সমস্যা" ১০২—৬ পৃঃ)। বৌদ্ধপ্লাবনে বাংলাদেশ থেকে হিন্দুধর্ম্ম এমন আশ্চর্য্যভাবে নিঃশেষ ও লোপপ্রাপ্ত হয়েছিল যে আদিশূরের সময় বেদবিধি অনুসারে যজ্ঞ সম্পন্ন করবার উপযুক্ত ব্রাহ্মণ চেষ্টা ক'রেও একজনও পাওয়া যায়নি। তাই রাজা কান্যকুব্জ থেকে মাত্র পাঁচজন সুব্রাহ্মণ নিয়ে এসে বাংলায় বসবাস করিয়েছিলেন। এঁরা পাঁচজনে বঙ্গদেশী কন্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং বাংলার নব্যব্রাহ্মণের খাঁটিত্ব কোথায়? আর এক আশ্চর্য্য কথা এই

যে মাত্র পাঁচজনের বংশ বরাবর সোজাসুজি চ'লে এসে নব্যবাংলায় এই ১৩ লক্ষ ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হ'ল! নানা জাতির মেলামেশা অনেকদিন ধরেই হয়েছে—এই আমাদের প্রতিপাদ্য,—তাই এসব ঘটনার উল্লেখ কর্‌ছি। রিস্‌লি প্রভৃতি নৃতত্ত্ববিদের মতে অনেক নূতন নূতন অনার্য্যজাতি হিন্দুসমাজের পার্শ্বে বসবাস কর্‌তে কর্‌তে ক্রমে হিন্দু হ'য়ে গেছে। পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে আসামে অহোম নামে এক রাজবংশ ছিল। তাঁরা প্রথমে ছিলেন মঙ্গোলীয়; তাঁদের আদিবাসভূমি ছিল শ্যামদেশ। কিন্তু ক্রমে ক্রমে হিন্দুর আচার ব্যবহার গ্রহণ ক'রে তাঁরা অবশেষে হিন্দু এবং ক্ষত্রিয় ব'লে পরিচিত হলেন। সুতরাং দেখুন আমরা যে জাতি জাতি বলে চীৎকার ক'রে থাকি এবং কারও স্পর্শে কারও বা জলগ্রহণে জাত গেল ভেবে প্রমাদ গণি, তার মূলে প্রকৃত সত্যপদার্থ কিছু আছে অথবা তার ভিত্তি একটা প্রকাণ্ড কুসংস্কারের উপর—যা কোন কালেই যুক্তি বা বিচারসহ নহে?

তারপর আমাদের এই বাংলাদেশের কৌলিন্য প্রথার কথা ধরা যাক। বল্লালসেনের সময় এই প্রথার প্রচার হয়। নবধা কুললক্ষণম্—কুলীন হ'তে হ'লে আচার বিনয় বিদ্যা প্রভৃতি নয়টি সৎগুণের অধিকারী হ'তে হয়। গুণের উপর কৌলিন্যের প্রতিষ্ঠা হ'লেও এই মর্য্যাদার অধিকারী হলেন একমাত্র ব্রাহ্মণেরা; যেন গুণরাশি ব্রাহ্মণেরই একচেটে, আর ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিই একবারে নির্গুণ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, গুণ কি বাস্তবিকই বংশপরম্পরাগত হয় অথবা বিদ্যাশিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলির উপর গুণের বিকাশ যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করে? কথাটা এতই সোজা যে স্কুলের ছোট ছেলেও অনায়াসে বুঝ্‌তে পারে। প্রতিভাশালী ব্যক্তির পুত্র হ'লেই কি প্রতিভার

অধিকারী হ'তে হবে? সেক্ষপীয়রের বা মিল্টনের বংশে তাঁদের মত প্রতিভাশালী ব্যক্তি আর জন্মগ্রহণ করেছেন কি? পৃথিবীতে বরং ঠিক এর উল্টাই দেখা যায়। প্রকৃতির কেমন আশ্চর্য্য খেয়াল যে প্রতিভাশালী ব্যক্তির বংশে সেরূপ গুণান্বিত পুরুষ আর প্রায় জন্মায় না। আর প্রতিভার কথা ছেড়ে দিলেও যিনি প্রকৃত প্রস্তাবে গুণী কুলীন, তাঁর সন্তান যে মাতৃগর্ভ থেকে নয়টি গুণ নিয়ে ভূমিষ্ঠ হবে এমন সম্ভাবনা একটুও নেই। কুলীনের ছেলে নামে "কুলীন" হ'তে পারে, কিন্তু মনে রাখ্‌তে হবে কাঁটাগাছ উর্ব্বরক্ষেত্রেও জন্মায়। সুতরাং অপরকে হীন ও অবনত ক'রে রেখে আর এরকম একটা অন্যায় গণ্ডী টেনে আপনার জাত বাঁচিয়ে চল্‌বার মূলে কি যে সৎ উদ্দেশ্য বর্ত্তমান আছে তা দেবতা হয়ত বুঝ্‌লেও বুঝ্‌তে পারেন, কিন্তু মানুষের বুদ্ধির তা অগম্য! আবার শুনুন আশ্চর্য্য ব্যাপার! ঘটকপ্রবর দেবীবর বামুনদের মধ্যে মেল বাঁধ্‌লেন—বংশের দোষ দেখে দেখে একরকম দোষীদের একত্র ক'রে ক'রে; ফলে একই জাতি থেকে আবার বহু প্র-পরা-উপজাতির সৃষ্টি হ'ল। সমাজবিধি হ'ল এই যে মেলে মেলে বিবাহ দিতে হবে, মেলান্তরে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন কর্‌লে একবারে কৌলিন্য-বিচ্যুতি,—অর্থাৎ মেলগত দোষকে বংশে কায়েমি করে না তুল্‌লে সমাজে হীন হ'তে হবে। "অঘরে" মেয়ে দিলে কুল যাবে। সুতরাং কন্যাকে "সঘরে" অর্থাৎ নিজের গণ্ডীবদ্ধ মেলের ভিতর পাত্রস্থ করাটাই কুলীন পিতার বাঞ্ছিত হ'য়ে দাঁড়াল। কিন্তু ফল হ'ল বড় বিষময়। পাত্রের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় "কুলীনের কুলরক্ষা করাই কুলীনের ধর্ম্ম" হ'য়ে উঠ্‌ল। আর ব্রাহ্মণের ছেলে কদাপি ধর্ম্মপালনে পরাঙ্মুখ নন! তাই পূর্ণ উদ্যমে কেউ ৬০, কেউ ৭০, কেউবা ৮০টি পর্য্যন্ত বিবাহ ক'রে বস্‌লেন এবং পাকা খাতায় বিবাহের 'লিষ্টি'

ক'রে রেখে দিলেন। এসব "নিশার স্বপন সম ভাবিছ অলীক?" কিন্তু তা নয়, অনেক ভুক্তভোগী বৃদ্ধ এখনও বেঁচে আছেন। এসকল কথা বল্‌বার একমাত্র কারণ এই যে, গুণ কখন বংশগত হয় না এবং অন্যান্য অবিচারের গণ্ডী টেনে যারা আপনার দেশবাসীকে নির্ম্মমভাবে পরস্পর থেকে তফাৎ ক'রে দেয় তাদের জীবন সকলদিকেই সঙ্কুচিত হ'য়ে আসে উচ্চ আদর্শ বা সৎসঙ্কল্পের কথা তারা প্রায় ভুলে যায়।

অপরকে হীন অন্ত্যজ নীচ ছোটলোক ব'লে ঘৃণা কর্‌বার অধিকার আমাদের কোথায়? আভিজাত্যহীন তথাকথিত নীচজাতির গৃহে কি পৃথিবীর অনেক শ্রেষ্ঠ পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন নি? পৃথিবীতে যাঁরা ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা, ধর্ম্মজগতে যাঁরা একটা মহাপ্লাবন বহিয়ে দিয়েছিলেন, সেইসব মহাত্মাদের অনেকেই আভিজাত্যমণ্ডিত ছিলেন না। যীশু ছুতোরের ছেলে! ভক্তবীর কবীরের জন্ম নীচ জোলার ঘরে। "ভক্তমালে রুহিদাস প্রভৃতি অনেক সাধুর বর্ণনা আছে যাঁরা হীন বংশে জন্মলাভ করেছেন। মান্দ্রাজে হীনবংশোদ্ভব অনেক তামিল সাধু ছিলেন এবং মুসলমানদের মধ্যে অনেক পীর ছিলেন যাঁদের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে মন্দির ও দর্‌গা নির্ম্মিত হয়েছে এবং উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণগণ যাঁদের দেবজ্ঞানে পূজা করেছেন। বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বামুনের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন নি। বশিষ্ঠ, নারদ, ব্যাস প্রভৃতি দেবর্ষি ও মহর্ষিগণ উচ্চবংশোদ্ভূত নন—কেউ বা দাসীপুত্র, কেউ বা বেশ্যাপুত্র। সকল দেশেই এরূপ হয়েছে, মহাপুরুষগণ সকল দেশেই সমাজের সকল রকম স্তরে আবির্ভূত হয়েছেন। সুতরাং কেন এই কপটাচার? কেন এই ঘৃণা ও নির্ম্মমতা? কেন মানুষের মুখদর্শনে পাপ, তার ছায়াস্পর্শে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা?

অত্যাচারী রাজা প্রথম চার্ল্‌সের রাজত্বকালে ইংলণ্ডের প্রজাশক্তি রাজার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করে। এই অন্তর্বিপ্লবের ইতিহাস (Buckle's

History of Civilization) পাঠ কর্‌লে তৎকালীন ইংলণ্ডীয় সমাজের নীচ ও উচ্চজাতি সম্বন্ধে একটা বড় কথা জানা যায়। কথাটা এই যে যতদিন প্রজাশক্তিকে চালিত কর্‌বার জন্যে উচ্চবংশজাত ব্যক্তিকে সেনাপতি নির্ব্বাচিত করা হয়েছিল ততদিন প্রজাপক্ষ জয় লাভ করেনি। তারপর যখন জনসাধারণের মধ্য থেকে যুদ্ধনেতার আবির্ভাব হ'ল, তখন রাজার দল পরাজিত হ'ল জনসাধারণের চেষ্টা জয়শ্রীমণ্ডিত হ'য়ে উঠল। নেপোলিয়ন তাঁর ভগ্নী কারোলিনাকে মুরা নামক যোদ্ধার হাতে সম্প্রদান করেন; তিনি সরাইওয়ালার (inn-keeper) পুত্র ছিলেন। নেপোলিয়নের নিকট পুরুষকার আভিজাত্যের একমাত্র নিদর্শন ছিল। তিনি কি সৈনিক বিভাগে, কি শাসন বিভাগে যোগ্যতা ও গুণ অনুসন্ধান ক'রে সমাজের যে কোন স্তর হতে লোকদের উন্নীত করতেন।

নেপোলিয়নের কার্য্যনীতির একটা বিশেষ অঙ্গ এই ছিল যে তিনি বরাবর গুণেরই আদর কর্‌তেন; যথার্থ গুণী, তা সে সমাজের যে স্তর থেকেই আসুক না কেন, তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে সামরিক রাজনৈতিক প্রভৃতি সকল বিভাগে দায়িত্বপূর্ণ পদ প্রাপ্ত হ'ত। কর্ম্মতৎপরতার ফলস্বরূপ লোকের পদোন্নতি লাভ হ'ত! তার কোন্ কুলে জন্ম সে পরিচয় কেউ নিত না। ক্রম্‌ওয়েল মদ প্রস্তুত করতেন। তিনি যে সকল সেনানায়ক নিযুক্ত করতেন তার মধ্যে অনেকেই "নীচ" বংশোদ্ভূত। কেউ বা মুদি, কেউ বা ফেরিওয়ালা, কেউ বা পরিচারক, কেউ বা ভিক্ষান্নপালিত, কেউ বা চামার, কেউ বা মুচি, কেউ বা "জুতি সেলাই"! বাক্‌ল্ বল্‌ছেন "the highest prizes being open to all men, provided they displayed the requisite capacity" এই "জুতি-সেলাই" বল্‌তে আর একটি কথা মনে পড়্‌ল। শ্রীরামপুরের মিশনারীদের অগ্রণী বিখ্যাত উইলিয়ম কেরীও এই ব্যবসায়ী

ছিলেন। অর্থাৎ আমার প্রতিপাদ্য এই যে জাতিভেদরূপ বিষময় প্রথার এই ফল দাঁড়িয়েছে যে আমাদের দেশে যারা হীন শ্রেণীর তারা এমন পদদলিত, অবমানিত, ঘৃণিত, লাঞ্ছিত, অবজ্ঞাত, যে কোন সুযোগে তাদের প্রতিভা বিকশিত হবার ও ভদ্রশ্রেণীস্থ হবার উপায় নেই।

সুতরাং বর্ত্তমান য়ুরোপ বা আমেরিকায় জাতিভেদ আছে, অতএব আমাদের দেশেও জাতিভেদ কোন ক্ষতির কারণ হ'তে পারে না—এই ব'লে চীৎকার ক'রে যাঁরা পুরাতনের কঙ্কাল এখনও আঁকড়ে ধ'রে রাখতে চান, তাঁরা একবার যুক্তিসহকারে বিবেচনা ক'রে বুঝে দেখ্‌বেন যে পাশ্চাত্য দেশে আভিজাত্যের সম্মান এদেশের মত একটা নিছক পাগলামি নয়। তাঁতি, জোলা, গাড়োয়ানের ঘর থেকে এদেশে কজন বড়লোক হবার সুযোগ পেয়েছে? এদেশে যদি তেলির ঘরে জন্ম হ'ল ত মানুষ চিরকাল তেলিই রয়ে গেল,—সে যত গুণের গুণী হোক না কেন সমাজে খানিকটা হেঁট হ'য়ে থাকতেই হবে, গুণ থাক্‌লেও সমুচিত আদর সে কখন পাবে না। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ আজ লর্ড হয়েছেন বিলাতী আভিজাত্যের নিয়মে, কিন্তু আমাদের দেশে যিনি কুলীন বামুন হ'য়ে না জন্মেছেন তিনি আর তা হ'তে পারবেন না। লর্ড রবার্ট্‌স্ জীবনের প্রারম্ভে ছিলেন সামান্য সৈনিক; কিন্তু সামরিক বিভাগে অসাধারণ গুণপনার পরিচয় দিয়ে শেষে সমাজে শ্রেষ্ঠ আভিজাত্য লাভ করিয়াছিলেন। লর্ড কিচ্‌নারও তাই। এরূপ আরও অনেকের নাম করা যেতে পারে যাঁরা বিদ্যাবিজ্ঞানে, ব্যবসাবাণিজ্যে, কৃষিশিল্পে সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মক্ষেত্রে গুণের পরিচয় দিয়ে, অসাধারণত্ব দেখিয়ে, সামান্য থেকে বড় হয়ে উঠেছেন এবং পাশ্চাত্য সমাজ তাঁদের বড় ব'লে, শ্রেষ্ঠ ব'লে, গুণান্বিত ব'লে আদর ক'রে বরণ ক'রে নিয়েছে। ইংলণ্ডে চাষার ছেলে, মুদীর ছেলে, অক্‌স্‌ফোর্ড বা কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক

বৎসর অধ্যয়ন ক'রে অভিজাত শ্রেণীর সকলপ্রকার রীতিনীতি আচার ব্যবহারের সহিত পরিচিত হয়। এইরূপ লেখাপড়া শিখে গুণী হ'য়ে সে পুরাদস্তুর Gentleman হয়। আমেরিকায় প্রজাশক্তির চূড়ান্ত উন্মেষ হয়েছে; তাই সেখানে দেখা যায় সামান্য কুটীরে জন্মগ্রহণ ক'রে সমাজের সর্ব্বনিম্নস্তর থেকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠস্তরে উঠেছিলেন রাষ্ট্রনায়ক মহামতি গারফিল্ড। সে দেশে আজ যে মুটে মজুর খান্সামার কাজ করছে, কাল সে বিদ্যার্জ্জনের জন্যে স্কুল-কলেজে যাচ্ছে। কেউ বা যে-কলেজে চিম্নী পরিষ্কারের কাজ করে সেই কলেজেই আবার পড়ছে। তার সহপাঠী ক্রোড়পতির সন্তান যদি তাকে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করে তবে সেই ধনী সন্তানকে নানাপ্রকার লজ্জা ও গঞ্জনা সহ্য করতে হয়। সেখানে আজ যে কাঠ কাটে আর একদিন সে দেশের রাষ্ট্রনায়ক (President) হবার আশা রাখতে পারে। স্থতরাং এমন বড় কুলীন সেখানে কে আছে যে তাঁকে কন্যাদান করবে না? আমি এখানে পাশ্চাত্য সমাজ-নীতির বিচার করছি না, আমার প্রতিপাদ্য এই যে পাশ্চাত্যদেশের জাতিভেদ ও ভারতবর্ষের জাতিভেদের মধ্যে তফাৎ অনেক। আমাদের দেশে জাতিভেদপ্রথা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে মানুষকে মানুষ ব'লে স্বীকার করেনি; আপন ভাইকে পর ক'রে দিয়েছে; তার মনুষ্যত্বের অবমাননা করেছে; সে তুচ্ছ ঘৃণ্য, সে অযোগ্য ও জঘন্য, এই কথাই প্রচার ক'রে এসেছে। কিন্তু পাশ্চাত্যদেশের জাতিভেদ মানুষে মানুষে ব্যবধানের এমন অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর তুলে দেয়নি, মানুষের উন্নতি ও বিকাশের পথে এমন অন্তরায় হয়নি।

বাংলাদেশের লোকসংখ্যা এখন সাড়ে চার কোটী। তার মধ্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য মিলে মোট ২৩ লক্ষ মাত্র। সমস্ত লোকসংখ্যার তুলনায় এঁরা কজন? সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র। কিন্তু লেখাপড়া জ্ঞানের

অনুশীলন এবং সামাজিক রাজনৈতিক প্রভৃতি নানাবিষয়ের আলোচনা এ দের মধ্যেই অনেক পরিমাণে সীমাবদ্ধ। অন্যান্য সকল জাতি প্রায় এসব বিষয়ে এঁদের বহু পশ্চাতে প'ড়ে আছেন। এক্ষণে আপন শিক্ষা দীক্ষা, অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান ও জ্ঞানান্বেষণের ধারাকে দিন দিন পুষ্ট ও প্রবল ক'রে তুলে যদি সমগ্র জাতিকে বেঁচে থাক্‌তে হয় তবে প্রকৃত কর্ম্মীর আবির্ভাব ২৩ লক্ষ উঁচু জাতের মধ্য হ'তে অধিক সংখ্যক হবে অথবা যাদের আমরা নীচজাত আখ্যা দিয়ে দূরে ঠেলে রেখে দিয়েছি সেই চার কোটিরও অধিক জনসংখ্য অধিক সংখ্যক কাজের লোক উৎপন্ন ক'রে সমাজকে পুষ্ট কর্‌বে? সকল দেশে সমাজের সর্ব্বপ্রকার স্তর হতে প্রতিভার বিকাশ হয়েছে। সুতরাং এই দুর্দ্দিনে আজ একবার আমাদের ভেবে দেখা উচিত যে এই বিরাট জনসঙ্ঘকে নিকৃষ্ট ব'লে অবজ্ঞা ক'রে আমরা কত উৎকৃষ্ট জিনিষের অপচয় কর্‌ছি, সামাজিক অত্যাচারে ও শিক্ষাদীক্ষার অভাবে আমাদের কতটা শক্তি বিকাশলাভ না ক'রে লোকচক্ষুর আড়ালে মুস্‌ড়ে পড়ছে। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে হচ্ছে। বাঙালীর আজ সামরিক বিভাগে প্রবেশের পথ কতকটা উন্মুক্ত হয়েছে; ক্রমে আরও উন্মুক্ত হবে। বাঙ্গালী সেনা নিয়ে যে সৈন্যদল গঠিত হবে তাতে কি শুধু উচ্চজাতিরই লোক থাক্‌বে অথবা সমাজের সকল স্তর থেকে সুস্থ ও সবলদেহ লোক সংগ্রহ ক'রে সেই সৈন্যদলকে পরিপুষ্ট কর্‌তে হবে? বাংলায় মুসলমানের সংখ্যা অর্দ্ধেক; তাদের মধ্যে জাতিভেদ নেই, সুতরাং তাদের কথা এখন বাদ দিলাম। কিন্তু বিভিন্নজাতির হিন্দুসেনা যখন কোন অভিযানে বাহির হবে তখন বামুন রাঁধুনীর অভাব হ'লে কি তারা যে-যার হাঁড়ি মাথায় ক'রে কুচ-কাওয়াজ কর্‌বে? আজকাল ট্রেঞ্চ অর্থাৎ খাদের মধ্যে আত্মগোপন ক'রে যুদ্ধ কর্‌তে হয়; সেখান থেকে উঠে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক চেয়ে

দেখ্‌লেই শত্রুর গুলিতে বিদ্ধ হ'তে হবে। সুতরাং শাণ্ডিল্য, বাৎসায়ন বা ভরদ্বাজ—এঁদের মধ্যে কার বংশধর ট্রেঞ্চে খাবার জুগিয়ে দিয়ে গেল তার আবিষ্কার কর্‌বার চেষ্টা কর্‌লে সে খাবার কখনও মুখে তুল্‌তে হবে না। আজ এই বিজ্ঞানপ্লাবনের যুগে সকল দেশে সকল সমাজের অবস্থা এরূপ পরিবর্ত্তিত হয়েছে যে পৃথিবীতে বেঁচে থাক্‌তে হ'লে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন ক'রে ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনও আমাদের পক্ষে অনিবার্য্য হয়ে পড়েছে। এই সামঞ্জস্যস্থাপনের চেষ্টায় যে যে পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাদ দিতে হবে তার মধ্যে জাতিভেদের কঠোর নির্ম্মমতা প্রথম এবং প্রধান!

জাতিভেদের বজ্রকঠোর বন্ধন বাংলা দেশে তবু ত অনেকটা শিথিল হয়েছে। বাংলায় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যের পরই নবশাখজাতি সমাজে স্থান পেয়েছেন এবং তাঁদের জল "চল্" হয়েছে। সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে ও শিক্ষাদীক্ষার গুণে অন্য অন্য অনেক জাতি বাংলাদেশে ক্রমে ক্রমে মুখ তুলে দাঁড়াচ্ছেন এবং এক "অচলায়তনে"র নিতান্ত গোঁড়া বামুন ছাড়া আর কেউই তাঁদের ঘৃণা ক'রে দূরে ঠেলে দিচ্ছে না। কিন্তু মান্দ্রাজে জাতিভেদের শাসন এখনও বড় ভয়ানক। সেখানে আয়ার ও আয়েঙ্গারগণ ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিই নীচ ও অস্পৃশ্য। নবশাখ প্রভৃতি যেসব জাতি বাঙালী হিন্দুসমাজে একটা মাঝামাঝি স্থান অধিকার ক'রে আছেন মান্দ্রাজী হিন্দুসমাজে সেরূপ কিছু নেই। মান্দ্রাজে পেরিয়া নামে এক সম্প্রদায় আছে, তাদের অবস্থা বড়ই হীন। তারা বংশের পর বংশ ধরে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত মাথা হেঁট ক'রেই থাকে, তাদের ছায়া স্পর্শ কর্‌লে ব্রাহ্মণকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, এতই তারা অভিশপ্ত ও অপবিত্র! স্বর্গগত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তামিল দেশ ভ্রমণকালে এক সম্প্রদায় লোক দেখেছিলেন; তারা দূর থেকে চীৎকার কর্‌তে কর্‌তে আসে—"মহাশয় স'রে যান্ আমি অধম যাচ্ছি।"

পাছে তার ছায়াস্পর্শে ব্রাহ্মণের পবিত্রতা উড়ে যায়—তাই এই ব্যবস্থা। আবার কোন হতভাগ্যের গলায় ঘণ্টা বাঁধা আছে, চল্‌তে গেলেই ঘণ্টা বাজে আর সেই শব্দ শুনে শুচি ব্রাহ্মণ অশুচিতার আগমন-বার্ত্তা জান্‌তে পেরে ছুটে পালান। আবার এইসকল নীচজাতের নাম শুন্‌লে আশ্চর্য্য হ'য়ে যেতে হয়। সেখানে বামুনদের নাম রামস্বামী, কুমার-স্বামী; কিন্তু এইসব অন্ত্যজবংশীয়দের নাম হবে সাপ, ব্যাঙ, পিপ্‌ড়ে কেঁচো, ছুঁচো! কি ভয়ানক ব্যাপার! বাংলার হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল, মুদ্দফরাস ওদের চেয়ে খুব ভালো আছে—তাদের আরো ভালো, আরো বড় ক'রে তুল্‌তে হবে—গুণবান্ শীলবান্ হলে তাঁরাও ব্রাহ্মণের সম্মান পাবার অধিকারী এ কথা মনে রাখ্‌তে হবে।

আমরা যে কারণে ইংরেজের নিকট রাজনৈতিক অধিকারের দাবী কর্‌ছি, নীচজাতি ব'লে যাদের ঘৃণা করি তারাও ঠিক সেই কারণেই সামাজিক অধিকার দাবী কর্‌ছে। বাংলা দেশে জাতিভেদের কঠোরতা কম; তবুও এখানে নমঃশূদ্র ও পোদ প্রভৃতি জাতি লেখাপড়া শিখে সামাজিক অত্যাচারের কারণে উঁচুজাতের উপর খড়্গহস্ত হ'য়ে উঠ্‌ছেন। মান্দ্রাজের ডাক্তার নায়ার অব্রাহ্মণ সমাজের মুখপাত্র স্বরূপে একটি দল বেঁধে গেছেন। সেই দল এংগ্লো-ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে কতকটা এক হ'য়ে আমাদের রাজনৈতিক অধিকারের পথে বাধা দিচ্ছেন। বাংলা দেশে নমঃশূদ্রের মধ্যেও এরূপ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে। এঁরা বল্‌ছেন—নূতন শাসন সংস্কারে অব্রাহ্মণদের স্বত্ব রক্ষার জন্য যদি গোড়া থেকে সাবধানতা অবলম্বন করা না হয়—তবে নিজেদের প্রতিনিধি পাঠিয়ে নূতন সুখ সুবিধার সব অধিকারই ক্রমে ব্রাহ্মণগণ একচেটে ক'রে নেবে। তা ছাড়া আমাদের মুসলমান ভ্রাতারা লোকসংখ্যা হিসাবে অর্দ্ধেক ব'লে **communal representation** সাম্প্রদায়িক

প্রতিনিধি বাগিয়ে নিচ্ছেন। এই সকল মতামতের ভালমন্দ আলোচনা কর্‌বার জন্য আমি একটা কথাও বল্‌ছি না। আমি বল্‌তে চাই, এই যে এদিকেও আমাদের সামাজিক সঙ্কীর্ণতা ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে। যে অধিকারটুকু ইংরেজ আমাদের দিতে চায় আমাদেরই দেশবাসী আজ তাতে আপত্তি তুল্‌ছে,—কেন না আমরা অনেক কাল ধ'রে তাদের ঘৃণা করেছি এবং এখনও কর্‌ছি; তাই তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের উপর বিশ্বাস হারিয়েছে।

জাতির গঠন ও বিকাশে এই জাতিভেদ অনেক পরিমাণে বাধা দিয়েছে। পরস্পরের মধ্যে বিবাহের আদানপ্রদান নেই; তার উপর "ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা" এই রব কর্‌তে কর্‌তে সকলেই এক-একটা গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে পড়েছে। হিন্দুমুসলমান ত বরাবরই আলাদা হ'য়ে আছে। এ অবস্থায় কবি ভাবের আবেগে ব'লে থাক্‌তে পারেন "একবার তোরা জাতিভেদ ভুলে' ইত্যাদি। কিন্তু এতদিনের বন্ধন এককথায় খ'সে পড়্‌বে কি? আমার লিখিত "হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস" (History of Hindu Chemistry) নামক পুস্তকের "বিজ্ঞান ও শিল্পের অবনতি" (Decline of Science) শীর্ষক অধ্যায়ে আমি জাতি সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলেছি। চরক ও সুশ্রুত দেশীয় চিকিৎসা প্রণালীর দুখানি মহাগ্রন্থ। এতে অবস্থা-বিশেষে এমন কি গোমাংস খাবারও কথা আছে। সুশ্রুতে শবব্যবচ্ছেদের রীতিমত ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু মনু মহাশয় বলেন শবস্পর্শ হ'লে জাতিচ্যুত হ'তে হবে। সুতরাং ব্যবস্থা হ'য়ে গেল শবব্যবচ্ছেদের স্থানে অতঃপর লাউ ব্যবচ্ছেদ হবে; অর্থাৎ লাউ কেটে মনুষ্য-শরীরের শিরা-উপশিরা প্রভৃতির সংস্থান জান্‌তে হবে। ব্যবস্থাটা কতকটা সেই কলাগাছ বিয়ে কর্‌বার মত নয় কি? জাতিচ্যুতির ভয় দেখিয়ে এমনি ক'রে

যখন স্বাধীন চিন্তার গলা টিপে মারা হ'ল, তখন ৬৪ কলাবিদ্যা লোককে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন ক'রে অন্তর্হিত হ'য়ে গেল। বিজ্ঞানের যা কিছু রইল—তা Surgeon পরামাণিক, Botanist বেদে আর Metallurgist ভীল কোল সাঁওতালের হাতে। আঙুলের নৈপুণ্যে ঢাকাই মস্‌লিন অতি সূক্ষ্ম হ'ল বটে, কিন্তু মস্তিষ্কের দৌড় ওই "পাত্রাধার তৈল" বা "তৈলাধার পাত্রের" বেশী আর গেল না। বুদ্ধি জড় ও আড়ষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ল। তাই পর্য্যবেক্ষণ বা পরীক্ষণের দ্বারা বস্তুর অস্তিত্ব বিচার ক'রে ঘটনাপরম্পরার কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টা লুপ্ত হ'ল। সামাজিক অত্যাচারের ফলে সাধারণ লোক অস্পৃশ্য ও মূর্খ হ'য়ে পশুত্বে নেমে গেল। ওদিকে আর্করাইট (Arkwright) নাপিত ছিলেন, ক্ষৌরকর্ম্মের দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতেন—কিন্তু স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে আবিষ্কার ক'রে বস্ত্রবয়ন-কলে যুগান্তর উপস্থিত করেন। আমি আবার জিজ্ঞাসা করি আমাদের দেশে কোন্ নাপিত এ প্রকার কৃতিত্ব দেখাতে সক্ষম? তাই এদের মধ্য থেকে জেমস্‌ওয়াট বা আর্করাইটের উদ্ভব অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশে স্বাধীন চিন্তা ও কর্ম্মশক্তি লুপ্ত হ'য়ে গিয়ে বিদ্যা ও বিজ্ঞানচর্চ্চার যে শোচনীয় অবস্থা হয়েছে তার জন্য জাতিভেদ বড় কম দায়ী নয়।

প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সন তাঁর New Freedom নামক পুস্তকের এক স্থানে আমেরিকার বিশেষত্ব সম্বন্ধে বল্‌ছেন যে সে দেশের রাস্তার মুটে পর্য্যন্ত রাষ্ট্রনায়ক হবার আশা পোষণ করতে পারে; কে দেশের নেতা হবে এবং কোন্ কুলে তার জন্ম হবে যুক্তরাজ্যে একথা কেউ নিশ্চিত ক'রে বলতে পারে না। সুবিধা ও সুযোগ জনসাধারণের সকলের কাছে সমানভাবে উন্মুক্ত; সুতরাং সমাজের যে কোন স্তর থেকে সেখানে দেশনায়কের উদ্ভব হ'তে পারে। প্রেসিডেণ্ট উইলসন আরও বলেন

যে সমাজের চিন্তা ও কর্ম্মশক্তি পুষ্ট হয় নিম্নস্তরের লোকের দ্বারা। জনসাধারণের মধ্য হইতেই যথার্থ শিক্ষিত ও গুণসম্পন্ন লোক উদ্ভূত হ'য়ে দেশের ভাব ও কর্ম্মের ধারাকে নানা অবদান পরম্পরায় বিচিত্র ক'রে তোলে। এই ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে সমাজের উচ্চস্তরের মুষ্টিমেয় লোকের সামর্থ্য যথেষ্ট নয়। সমাজদেহের শারীরিক মানসিক ও নৈতিক—সকল প্রকার পুষ্টির উপাদান জনসাধারণের মধ্যে যেরূপ প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান আছে, উচ্চস্তরের অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে সেরূপ থাকা কখনও সম্ভব নয়। সুতরাং "জাতির" দোহাই দিয়ে সেই বিপুল জনসঙ্ঘকে পদদলিত ক'রে আমরা জাতিগঠনে যে কত বাধার সৃষ্টি করেছি তা বর্ণনা অপেক্ষা কল্পনারই অধিগম্য। বর্ত্তমানে আমাদের শাসন-সংস্কারের দাবীকে ইংরেজ মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের চীৎকার ব'লে উড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু জনসাধারণ যখন একবার এই দাবী করবে তখন কেউ তাকে আট্‌কাতে পারে কি? পৃথিবী জুড়ে জনসাধারণের যুগ এসেছে। আমাদেরও এই যুগকে আনন্দ ও উৎসাহের সহিত বরণ ক'রে নিতে হবে। আপনার দেশভাইকে অস্পৃশ্য ব'লে আর দূরে রাখলে চলবে না।

এখন আমরা সভ্যজগতে সকল জাতির সঙ্গে এক আসরে বসতে চাই; পৃথিবীর জাতিসঙ্ঘে (League of Nations) স্থান পেতে চাই। কিন্তু অন্যে আমাদের কি চক্ষে দেখে আজ তা তোমাদের ভেবে দেখতে হবে। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র আমেরিকা প্রভৃতি সভ্যদেশে ভারতবর্ষের যোগ্য প্রতিনিধি ব'লে পরিচয় দিয়ে এসেছেন। কিন্তু সে আরম্ভ মাত্র—কোকিলের প্রথম গান বসন্তের আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করে মাত্র। দারিদ্র্য ও সামাজিক অত্যাচার প্রভৃতি নানা দোষের জন্য আজও আমরা অন্য জাতির অশ্রদ্ধার পাত্র হ'য়ে আছি। আমাদের

অন্তর সমৃদ্ধ হ'য়ে অদূর ভবিষ্যতে নানাকর্ম্মে বৈচিত্র্যে বিকাশলাভ করবে না কি? দেশীয় রাজ্যের একজন সুপ্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ স্যর টি মাধব রাও হিন্দু সমাজের বৈষম্যকে লক্ষ্য ক'রে বড় দুঃখে বলেছেন—এই সব বৈষম্য ও তজ্জনিত ক্লেশ আমরা আপন হাতে সৃষ্টি ক'রে আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছি। সুতরাং সভ্যভাবে চেষ্টা করলে এর প্রতিবিধানও আমাদের আপনারই হাতে!—আমাদের যুক্তি নেই, বিচার নেই, কুফলপ্রসূ অতি তুচ্ছ লোকাচারকে আমরা মনু, রঘুনন্দন প্রভৃতি দোহাই দিয়ে সাগ্রহে আঁকড়ে থাকি। "কেন" ব'লে কেউ যদি প্রশ্ন তুলে প্রতিবাদ করে, তাহলে তৎক্ষণাৎ জবাব দিই—"কি আশ্চর্য্য! ও যে চিরকাল হ'য়ে আস্‌ছে গো!" আমরা বিলাতী বিস্কুট খাবো, বরফ দিয়ে সোডা লেমনেড খাবো, কিন্তু জাতিবিশেষের কেউ যদি হাতে ক'রে এক গ্লাস জল দেয় অথবা আমাদের চৌকাঠ মাড়ায় তাহলে অমনি চীৎকার—"জাত্‌ গেল, হাঁড়ি ফেল, স্নান কর!" অদ্ভুত ব্যাপার! তারই ফলে আমরা ব্রাহ্মণ-শূদ্র মিলে সকল জাতিটাই বিদেশের অগ্রসর জাতিদের কাছে হেয় অস্পৃশ্য অপাংক্তেয় হয়ে আছি। যতকাল নিজেদের স্বভাব শোধন না করব, ততকাল এমনি থাকৃতে হবে। সুতরাং সাধু সাবধান!

——*——

৬

পাতিত্য সমস্যা*

বাঙ্গালী বড় ভাবপ্রবণ। বক্তৃতায় তার গত অর্দ্ধশতাব্দী কেটেছে। এখন কাজে নাব্‌তে হবে।

আজ আমার মহা আনন্দের দিন! হাওয়া ফিরেছে। নবজাগরণের দিন এসেছে। এই মহাপ্রলয়ে তিনটি সাম্রাজ্য ফুৎকারে উড়ে গেল। সেই সময়ে যে-সব আইডিয়া ব্যক্ত হয়েছে তার ধাক্কা এখানে এসেছে। সেদিন বর্দ্ধমানের মহারাজা একটা পাকা কথা বলেছেন—এখন চারিদিকে বড় অশান্তি দেখা দিয়েছে। তাকে বাধা দিলে চল্‌বে না। একে বাধা দিলে কি হয় জানি না। এর আঘাত-প্রতিঘাতের কথা আজ আমি বল্‌তে চাই। প্রথমে মনে পড়ে পতিত জাতিদের সঙ্গে তথাকথিত উচ্চ জাতির লোকদের সম্পর্কের কথা।

আমি খুলনা জেলার লোক। এই খুলনার ৭ লক্ষ হিন্দুর মধ্যে ৪ লক্ষ অস্পৃশ্য! ইহারা কৃষিজীবী। ইহারা ধনধান্যে সমৃদ্ধ। এই ৪ লক্ষ বলীয়ানের সঙ্গে ৩ লক্ষের সংঘর্ষ উপস্থিত হলে ব্যাপার কিরূপ দাঁড়ায় তা প্রণিধানযোগ্য। আমি দ্বেষজনক কোন কথা বল্‌ব না। যাতে কোন জাতিতে জাতিতে বিরোধ বাধে এখানে তেমন কোন রাগের কথা নেই। এখন ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকেরই বিসদৃশ অবস্থার দিকে নজর পড়েছে।

আমরা ছেলেবেলা গল্প পড়েছিলাম—উদর ও দেহের অবয়ব সম্বন্ধে হিন্দু সমাজের তেমনি সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে। লর্ড ডাফ্‌রীন্‌ আমাদের বিদ্রূপ করেছিলেন—এরা মুষ্টিমেয় (microscopic minority)—এরা

*২১শে মার্চ্চ, খুলনা পৌণ্ড্রক-ক্ষত্রিয় সামাজিক সভার সভাপতির অভিভাষণ

আন্দোলন করে—এদের কে চেনে? কায়স্থ ব্রাহ্মণ প্রভৃতির সংখ্যা ২৩ লক্ষ। আর তথাকথিত নিম্নশ্রেণী কত? একা নমঃশূদ্র ২৫ লক্ষ; ব্রাত্যক্ষত্রিয় ৫২ লক্ষ। বাঙ্গালার অধিবাসী ৪২ কোটী। এই ৪২ কোটীর মধ্যে কায়স্থ ব্রাহ্মণ শতকরা ৬২ কি ৭ জন। কিন্তু আমরা অপর সবাইকে বাদ দিয়ে ঘরকন্না করতে চাই। এ একটা আত্মঘাতী ব্যাপার। সমাজের যাঁরা বলিষ্ঠ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, যাঁরা শিক্ষা পেলে সমাজের নেতা মুখপাত্র হবেন, তাঁদের না টেনে তুলে তাঁদের বাদ দিয়ে ঘর করতে চাই এ ত বাতুলতা; এ ত মহাপাপ। কোন কারণে হয়ত আমাদের অবস্থা ভাল, আমাদের গোলায় ধান আছে। দেশে যদি দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় তাহলে কি আমরা ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে বিলাসিতা করব, আর আমাদের প্রতিবাসীরা মারা যাবে? আমাদের কর্ত্তব্য, যারা পশ্চাৎপদ তাদের সকলকে টেনে তুলি। আমরা দেশকে মা বলি। যাঁরা লম্বা লম্বা বক্তৃতা করেন আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করি তাঁরা যদি বাঙ্গালাকে মা বলেন তবে কি সকলকে ভাই বলে আলিঙ্গন করবেন না—মায়ের সন্তানকে পদাঘাত ক'রে দূরে ঠেলে কি তাঁরা অগ্রসর হবেন?—তবে তাঁদের কিসের মা বলা?

ব্যাপার কি—একটা বিড়াল ঘরে ঢুকলে—হয়ত আস্তাকুড় ঘেঁটে, মরা ইঁদুর চট্‌কে—দুধ খেলে; আমরা কি তা ফেলে দিই? কিন্তু যদি একজন তথাকথিত ব্রাত্যক্ষত্রিয় বা নমঃশূদ্র ঘরের চৌকাটের উপর আসে, আমরা জল ফেলে দিই। বরফ্ লেমনেড্ খাও না? তা কে তৈরী করে? সম্প্রতি আমার স্বগ্রামের নিকট এক শ্রাদ্ধে উপস্থিত ছিলাম। কলিকাতা থেকে বরফ এসেছে—ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের অভ্যর্থনার জন্য। যেই বরফ, সেই ত জল—H_2O—অর্থাৎ অম্লজান ও উদজানের যৌগিক। জল খাবে না, বরফ খাবে। কারণ,—ভণ্ডামি, প্রতারণা, ইচ্ছাকৃত

অবজ্ঞা। কেবল দেখান—তুই নীচ জাতি, আমি উচ্চ জাতি। সবাই মায়ের সন্তান—সকলকে কোলে টেনে নিতে হবে। যে পেছনে আছে তাকে তুল্‌তে হবে। যিনি শিক্ষিত তিনি অশিক্ষিতকে টেনে নেবেন। বিবেকানন্দ বলেছেন—"হিন্দুধর্ম্ম দেশাচারে, লোকাচারে পরিণত। ধর্ম্ম এখন আশ্রয় নিয়েছেন—জলের কলসী ও ভাতের হাঁড়ির ভিতর।"

এই কি হিন্দুধর্ম্ম? হিন্দুধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক ছিল। জন্মগত গরিমা সর্ব্বনাশের মূল হয়েছে। কুলীন ব্রাহ্মণের বিদ্যাশিক্ষার দরকার নেই। যিনি কুলীন, তিনি বিয়ে ক'রে ৩।৪ হাজার টাকা রোজগার করেন। এতে অনেক স্থলে অবনতি হয়েছে। জগতের ইতিহাস দেখুন। যীশুখৃষ্ট ছুতোর, কবীর জোলা। জগৎ নত মস্তকে তাঁদের ধর্ম্ম গ্রহণ করেছে। মান্দ্রাজেও পারিয়া পীর দেখা যায়। ভারতে এক সময়ে চরিত্র দেখে সাধুদের পূজা হত। এখন সম্মান জন্মগত হয়েছে। এ আর বেশী দিন টিক্‌বে না। এখন হচ্ছে from log cabin to white house, অর্থাৎ পুরুষকার ও গুণের আদরের দিন। লয়েড জর্জ্জ "জুতিসেলাই"এর পালিত পুত্র। উইলিয়াম কেরি—যিনি এক হিসাবে বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনিও—জুতিসেলাই। এইখানে একটা কথা মনে পড়্‌ল। একবার লর্ড ওয়েলস্‌লি অনেক গণ্যমান্য সাহেবকে নিমন্ত্রণ করেন। সে ভোজের সভায় কাউন্সিলের অনেক মেম্বরও উপস্থিত ছিলেন। কেরিকে দেখে একজন পার্শ্বের বন্ধুকে কাণে কাণে বল্‌লেন—"Hallo, Carey is here. Is he not a shoemaker? ওহে, কেরি এসেছে যে! ও জুতা গড়ে না?" কেরি তা শুন্‌তে পেয়ে বলে উঠ্‌লেন—"Beg your pardon, sir, I was not a shoemaker but a cobbler মাপ করবেন মশাই, আমি জুতা গড়ি না, ছেঁড়া জুতা মেরামত করি।" ইংলণ্ডে জাতিভেদ আছে

বটে, কিন্তু তা অন্য প্রকার।' আজ যিনি log cabinএ অর্থাৎ কুঁড়ে ঘরে থাকেন, কাল তিনি দেশনায়ক। আমাদের দেশে অন্যপ্রকার দেখ্‌তে পাই। মহেন্দ্রলাল সরকার, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, কৃষ্ণদাস পাল,—এঁদের মধ্যে একজন সদ্গোপ, একজন তন্তুবায়, একজন তিলি। এঁরা সমাজের গৌরবস্থল। কিন্তু একজন কুলীন ব্রাহ্মণ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের পুত্রকে কন্যা দিতে রাজি হবেন না। বল্‌বেন—ও যে তাঁতির ছেলে। এতে সমাজের কত অবনতি, কত লোক্‌সান হয়েছে। চিকিৎসাশাস্ত্রকার বাগভট বৌদ্ধ ছিলেন। তিনি বলেছিলেন—"আমার গ্রন্থ হয়ত লোকে উপেক্ষা কর্‌বে। কারণ আমি চরক বা সুশ্রুতের ন্যায় ঋষি নই। কিন্তু ঔষধের যদি গুণ থাকে তাতে রোগ যাবেই—তা ব্রহ্মাই প্রয়োগ করুন বা আমিই করি।" এই ধরুন বিষ—ব্রাহ্মণ প্রয়োগ করুন বা ব্রাত্যক্ষত্রিয় প্রয়োগ করুন—তার ফল ভিন্ন হবে কি না আমি জিজ্ঞাসা করি। আমি বাড়ী গেলে চাষা-ভূষাদের নিয়ে থাকি। তারা বলে—"বাবু, আপনারা কি জাত জাত করেন? এই মোটা ভেটেলের চাল, আমি রাঁধি আর আপনি রাঁধুন। একসঙ্গে মিশিয়ে দিলে কি বল্‌তে পারেন কোন্‌টা কার ভাত? দুইজনের একই রকম ভাত হয়।" অথচ আমরা বড় বড় বই থেকে জাতিভেদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিই। হোটেলে সবাই একসঙ্গে খান, তাতে কারও বেশী উদর পীড়া হয় বলে জানি না। সবাই রেলগাড়ীতে চড়েন—সেখানে কি সকলে নৈকষ্য কুলীন? মেথর দিব্য বাবু হ'য়ে ট্রামগাড়ীতে যাচ্ছে, আপনি তার পাশে বসেন; ষ্টীমারে একদিন, দু'দিন, তিনদিন চলেছেন—তাতেই থাকা, খাওয়া-দাওয়া;—জাত বাঁচে কি ক'রে? তখন জাত্‌ থাকে কোথায়? ঢাকা অঞ্চলের একজন লোক কলিকাতা থেকে ফিরে গিয়ে বলেছিলেন—উইলসেন, ইষ্টেসেন, আর কেশবসেন,

এই তিন সেনে মিলে জাতের সর্ব্বনাশ করেছে। যদি পাকস্থলী কেটে বের ক'রে রাসায়নিক বিশ্লেষণ (chemical analysis) করেন, তবে বুঝা যাবে কার কতটুকু জাতি আছে। তবে কেন আমরা জাত্ জাত্ ক'রে মারা যাই ?

আমি এখন যোগী, মাহিষ্য, ব্রাত্যক্ষত্রিয় প্রভৃতি সমাজের মুখপত্রগুলি যতদূর সম্ভব পড়্বার চেষ্টা করি। যেখানে দেখি—সেইখানে আর্ত্তনাদ। তাঁরা প্রকাশ্যে বলেন না কে তাঁদের প্রপীড়িত কর্‌ছেন, কিন্তু তাঁরা ভাবেন তাঁরা অত্যাচারিত। সেদিন যোগীসখায় লেখা দেখলাম—"আমরাও কালের কুটিলাবর্ত্তে পড়িয়া অধঃপতিত ও লাঞ্ছিত হইয়া আছি।" সকল পত্রিকাতেই এক কথা। কে কর্‌ছে—তাঁরা কারো নাম করেন না। এ বড় দুঃখের কথা। তাঁরা নিজেরা নিজেদের হীন অধঃপতিত মনেই বা করেন কেন, আর সত্যই কেউ অত্যাচার কর্‌ছে বুঝে তা সহই বা করেন কেন ? কাল এক জায়গায় পেলাম—লেখক লিখছেন—"তথাকথিত উচ্চজাতির অবস্থা দেখি—তাঁহাদের নিকট যোগী প্রভৃতি জাতি অনাচরণীয়। কিন্তু পশ্চিমা-কুর্ম্মী পরিচয় দিলেই তার জল আচরণীয়।" আমরা কি পশ্চিম দেশে C. I. D. পাঠিয়ে তার জাতের খবর নিই ! আবার কলিকাতায় ঝি নামক এক জাতীয় জীবের জলও চলে। যাঁরা ছুৎমার্গ অবলম্বন ক'রে চলেন তাঁরা কলিকাতায় গিয়ে অনেক সময়ে মেসে উঠেন। তাঁরা কি অনুসন্ধান করে দেখেন পাচক ব্রাহ্মণ প্রকৃত পক্ষে কি জাতি ? প্রিন্সিপ্যাল গিরিশচন্দ্র বসু একদিন তাঁর ঝির সঙ্গে আলাপ কর্‌ছিলেন। ঝি বল্‌লে, "বাবু, লোক দেখলেই ধর্ম্ম গেল—না দেখলে আর কিছু নয়। ছোঁয়াছুঁয়িটা কেবল লোক দেখাদেখি।" এই ঝি হিন্দুসমাজের প্রচলিত ধর্ম্মের সার বুঝেছে।

আপনাদের আত্মমর্য্যাদা যে দিন দিন জেগে উঠ্‌ছে এ বড় শুভচিহ্ন। আপনারা যদি বোঝেন—আমরা অধঃপতিত নই, আমরাও বিদ্যাবুদ্ধি বলে উচ্চস্থান পাব তবে উন্নতি নিশ্চয়। রাতদিন অভিযোগ কর্‌লে উন্নতি হবে না। আপনাদের শক্তি যথেষ্ট। আপনারা নিজের পায়ের উপর দাঁড়ান। আপনারা আজকালকার "উচ্চ" শ্রেণীস্থ মধ্যবিত্তের অবস্থা জানেন—তাদের বাইরে কোঁচার পত্তন, ভিতরে ছুঁচোর কীর্ত্তন। আপনারা কিন্তু কৃষিজীবি, আপনারা সেই "পোদবৃত্তি" করেন। আমার এই খুলনার সন্নিকটস্থ আপনাদের হরিমোহন বাছাড় রাসে ৪০ হাজার টাকা ব্যয় করেছিলেন। সে আজ ৪০ বছরের কথা। আপনাদের মধ্যে অনেকে মোকর্দ্দমায় হাজার হাজার টাকা ব্যয় করেন। অর্থের অভাব নাই—চেষ্টার অভাব। গ্রামে গ্রামে চাঁদা তুলুন। ক্রিয়া কর্ম্মে কম ব্যয় করুন। যিনি ক্রিয়া কর্ম্মে দশ হাজার টাকা ব্যয় করেন তিনি ২॥০ হাজার ব্যয় ক'রে বাকী ৭॥০ হাজার সমাজের কাজে ব্যয় করুন। চাই শিক্ষা। উন্নতির জন্য কি দরকার? আমি বল্‌ব—১ম শিক্ষা, ২য় শিক্ষা, ৩য় শিক্ষা। শিক্ষা ভিন্ন পশুত্বে ও মনুষ্যত্বে কোন প্রভেদ নেই। আপনাদের সর্ব্বনাশের কারণ বাড়ী বসে সকলে অন্নসংস্থান করেন। আপনারা শিক্ষালাভ করুন—শিক্ষার দিকে মতি ফেরান—আপনাদের শক্তির প্রতিরোধ কর্‌তে কেউ পার্‌বে না; আপনারা যা ভাববেন তাই হবে। Nations by themselves are made, জাতি স্বতঃ গঠিত হয়। বর্দ্ধমান প্রাদেশিক সমিতিতে জষ্টিস্ চৌধুরী বলেছেন—mendicant policy ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করলে চলবে না। আপনারাও mendicant policy ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করুন। ভিক্ষাবৃত্তিতে কিছু হবে না। মহাশয় অনুগ্রহ ক'রে আমার জল ছোঁন—ও বল্‌লে চল্‌বে না। আপনাদের উন্নতি আপনাদের উপর নির্ভর করে। আমি কোন

বিরোধের ভাব উপস্থিত করতে চাইনে। মান্দ্রাজে পারিয়া ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে মহা বিবাদ উপস্থিত। বাঙ্গালা দেশে এসব বড় একটা নেই। কর্নেল উপেন্দ্র মুখুজ্জে মশাই জানেন বাঙ্গালাতে প্রায় ৯০০ ম্যাট্রিকিউলেসান বিদ্যালয়। আপনারা যদি হিসাব করে দেখেন গভর্ণমেণ্ট স্কুল প্রায় ৪৭টি হবে। বাকী ৮৫৩টির ভিতর ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্যের চেষ্টাতে হয়েছে এমন স্কুল বাদ দিলে আর কয়টি থাকে? অধিকাংশ স্কুলই প্রধানতঃ তাঁদের চেষ্টাতেই হয়েছে। কিন্তু এমন কোন বিদ্যালয় আছে কি যেখানে তাঁরা তথাকথিত নিম্ন জাতিকে পাশে বসে বিদ্যাশিক্ষা করতে বারণ করেন? এই বাগেরহাট কলেজ হয়েছে। তাঁরা কি কোন দিন বলেছেন যে বারুইজাতি কায়স্থ ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কাউকে পড়তে দেবেন না? এ কথা বলা যায় না যে তাঁরা সব নিজেদেরই সুবিধা করে নিয়েছেন। কেউ দীঘি কেটে বলেন না—একলা আমি এই দীঘির জল পান করব। সুতরাং এটাও ভাববেন ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি স্কুল কলেজ ক'রে সকলের উপকার করেছেন। যদি তাঁরা বলেন আমরা এখানে আর কাউকে পড়তে দেব না তা হ'লে তাতে ক্ষতি হবে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীদের। মোটামুটি আমি বলতে চাই যে বাঙ্গালা দেশ মান্দ্রাজ অপেক্ষা এইরূপ বিষয়ে অনেকটা উদার।

আমি কোন সমাজভুক্ত নই। আমি হিন্দুর হিন্দুত্ব, মুসলমানের মুসলমানত্ব, ব্রাত্যক্ষত্রিয়ের ব্রাত্যক্ষত্রিয়ত্ব গ্রহণ করি। আমি রাসায়নিক, আমি নিক্তির ওজন ক'রে সকলের ভালমন্দ ওজন ক'রে বিচার করতে চাই; আমাদের সামাজিক ব্যাধি দূর করতে হলে আগে diagnosis রোগ নির্ণয় করতে হবে। সার সৈয়দ আহমদ বলেছিলেন—হিন্দু ও মুসলমান—জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা। যাঁরা জ্যেষ্ঠ তাঁদের উচিত হস্ত-

প্রসারণ করে টেনে নেওয়া। উচ্চশ্রেণী সুবিধা পেয়েছেন – তাঁদের সুবিধা আছে—তাঁদের উচিত নিম্নকে টেনে আনা ও সুবিধার ও সুযোগের ভুক্তভোগী করা।

আর এক কথা। আপনাদের উন্নতির পথ পরিষ্কার হয়ে এসেছে। Reform Scheme নূতন রাষ্ট্রব্যবস্থায় আপনারা ভোটদাতা হবেন। অনেকে ভোট নিতে আপনাদের দ্বারে উপস্থিত হবেন। আপনারা তাঁদের প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেবেন তাঁরা আপনাদের জন্য কি করবেন। যিনি আপনাদের মঙ্গল করবেন—তাঁকে ভোট দেবেন। তাঁরা আপনাদের শিক্ষা, রাস্তাঘাট, সর্ব্ববিষয়ে উন্নতি করবেন, এমন অঙ্গীকার করিয়ে নেবেন। উদ্ধারের পথ আপনাদের নিজেদের হাতে।

আপনারা উন্নতির পথে অগ্রসর হোন। আপনারা কায়স্থ ব্রাহ্মণের সমান শিক্ষিত হোন। আপনাদের বলেই আমরা বলীয়ান। আজ ভাই ভাই ব'লে সকলকে আলিঙ্গন করতে হবে। জয়চাঁদ থেকে আরম্ভ ক'রে ৮০০ বৎসর কেবল গৃহবিবাদে কেটেছে। আর বিবাদের দিন নেই। 'সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে।' কে বড়, কে ছোট ঈশ্বরের রাজ্যে? যে আপনাকে বড় মনে করে সে বড়; যে ছোট মনে করে সে ছোট। এমার্সন বলেছেন—you cannot make a slave of Washington ওয়াশিংটনকে দাস করবার শক্তি তোমার নেই। যাতে শক্তি জাগে তার উপায় করুন। তার উপায় শিক্ষা। আপনারা লক্ষ লক্ষ টাকা তুলতে পারেন। বরং আমাদের দুর্দ্দশা বেশী। আপনারা শতাংশের একাংশ চেষ্টা করলেও অনেক বেশী কাজ করতে পারেন। যাঁরা India as a nation অথবা Bengalee as a nation ভাবতে চান তাঁরা কাউকে বাদ দিয়ে পারেন না। তাঁরা কি দু'চার জনে জাতি গঠন করতে পারেন? যদি নৌকার এক জায়গায় একটু

ফুটো থাকে তবে সবটা জলে ডুবে যায়। দুর্য্যোধনের উরুতে যেমন একটু দুর্ব্বলতা ছিল ব'লে তার পরাজয় ঘটেছিল, তেম্‌নি যতদিন শতকরা ৯৯ জন নিরক্ষর থাক্‌বে ততদিন আমরা বড় হব না।

বিদেশে আমাদের কি অবস্থা? যদি স্যর দোরাব তাতাও Capeএ যান তাঁকে কুলী বল্‌বে। ভারতবাসী হলেই কুলী নামে অভিহিত। তাকে রাস্তা দিয়ে যেতে দেয় না, ট্রামে রেলে তার আলাদা বন্দোবস্ত। জগতের দরবারে এই ত আমাদের মান। কিন্তু আফিসে সাহেবের তাড়া খেয়ে যেমন বাড়ীতে এসে নিরীহ সহধর্ম্মিণীর উপর আমাদের চোট্‌টা বেশী পড়ে, এখানেও আমাদের সেই ভাবটা বেশী। League of Nations হয়েছে। সেখানে লর্ড সিংহকে ভারতের পক্ষ থেকে ভোট দিতে খাড়া করবার কথা হয়। তাতে একজন American Senator কি ব্‌লেছেন শুনুন—

I can give you a picture of India in a word. She has a population of 294,301,056 ···· Such a people mark and brand themselves at once as not only unfit for the Government of others, but as almost unfit for their own Government; yet I would not deny that right to the lowest of God's creatures if he lived off with others like himself and wanted a Government of his own.

Amongst those 294,000,000 people there is no excess of superstition to which they have not gone; there is no shadow of intellectual right so black that they have not wrapped their souls in its sable folds; there is no species of caste by which men have sought to divide themselves and keep oppressed by power and priest-craft their fellowmen that has not been rife in India for centuries of time.

এই ত আমাদের মান! এই মানে মানী হয়ে আমরা বলি জল নষ্ট করিস্‌নে। এখন আর পৃথক থাকলে চল্‌বে না। আমি inter-marriage সার্ব্বজাতিক বিবাহের কথা বল্‌ছি না। আপনারা একটু এগুন্, তাঁরাও আপনাদের দিকে একটু আসুন। কিন্তু আমি বলি যাঁরা কুলীন তাঁদেরই আগে এগুতে হবে। আপনারা জাত্ জাত্ কর্‌ছেন। আমার ওসব আসে না। এখানে চেহারা দেখে কে বড় কে ছোট তা ঠিক করতে পারেন?

আপনারা অবনত বল্‌লে কে? ও যেন ঠাকুর ঘরে কে—না আমি ত কলা খাইনি। আপনারা ব্রাহ্মণ কায়স্থ অপেক্ষা কোন অংশে ছোট নন। আপনারা বড় বড় পদ লাভ করুন—কাউন্সিলে নিজেদের মধ্য থেকে মেম্বর পাঠান। আপনারা অনেকেই লক্ষ্মীমন্ত। আমি করজোড়ে প্রার্থনা করি আপনারা প্রতিজ্ঞা করুন শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রাণপণ কর্‌বেন। আপনাদের আয়ের অন্ততঃ একদশমাংশ স্বজাতির শিক্ষার জন্য ব্যয় করুন। যেমন কালীপূজার বারোয়ারির জন্য এক পয়সা ক'রে বৃত্তি রাখা হয়, তেমনি ক'রে আপনারা যে ধান পান তার যদি দশমাংশ এমন কি শতাংশও আপনাদের উন্নতির জন্য রেখে দেন, আপনাদের উন্নতি আট্‌কে রাখে কে? আপনারা নিজেরাই নিজেদের উন্নতি আট্‌কে রেখেছেন। শিক্ষার বিস্তার করুন। উন্নতি ধ্রুব নিশ্চয়।

আমি আজ বুঝ্‌তে পার্‌লাম—জাতীয় জাগরণের প্রকৃত স্ফুরণ হয়েছে। প্রকৃত জাতীয় জাগরণের স্পন্দন দেশের সর্ব্বত্র পৌঁচেছে।

কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য—হিন্দু মুসলমান সকল শ্রেণীর সকলস্তরের সহৃদয় লোক বহু প্রকারে জ্ঞাপন করছেন যে সকলেরই আপনাদের সঙ্গে আন্তরিক সহানুভূতি আছে ও তাঁরা আপনাদের উন্নতি কামনা

করেন। এখন যদি আপনারা পুরুষকারের দ্বারা বিদ্যা যশ মান লাভ ক'রে প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রকাশ করতে পারেন তবেই সব আয়োজন ও চেষ্টা সার্থক হবে।

৭

জাতিগঠনে বাধা—ভিতরের ও বাহিরের

আজ এ নব-জাগরণের দিনে বাঙালীর হৃদয়তন্ত্রী কি এক অপূর্ব্ব-স্বরে বেজে উঠেছে। আশায়, আনন্দে, উৎসাহে বাঙালী এখন একটা জাতি ব'লে পরিগণিত হ'য়ে জগতের সমক্ষে দাঁড়াতে চায়। শুধু বঙ্গে নয়, একটা প্রাণ-মাতানো নতুন হাওয়া সারা ভারতবর্ষের উপর দিয়ে প্রবাহিত হ'য়ে যাচ্ছে। ভারত দিনে দিনে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠ্‌ছে। কিন্তু এই উদ্বোধনে কি কি উপকরণ চাই? জাতিগঠনের উপাদান কি? সমষ্টির দেহে কোন্ শক্তি সঞ্চারিত হ'লে জাতি সুপুষ্ট ও মেরুদণ্ডবিশিষ্ট হ'য়ে গর্ব্বোন্নত-শিরে আপন দেশে দাঁড়াতে পারবে? আমাদের এখন চাই কি? অভাব কোথায়?

আপনারা মান্দ্রাজের স্যর টি মাধব রাওএর নাম শুনেছেন। তিনি ত্রিবাঙ্কুর, বরোদা প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যে প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই বিজ্ঞ দূরদর্শী পুরুষপ্রবর স্যর সালার জঙ্গের পর ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিক। ইনি উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে এঁর খেদোক্তি ভারতবাসীমাত্রেরই প্রণিধানযোগ্য। আমরা নিম্নে তার কিয়দংশ উদ্ধৃত কর্‌ছি;—

"The longer one lives, observes and thinks, the more does one feel that there is no community on the face of the earth that suffers less from political evils

and more from self-inflicted or self-accepted or self-created and therefore avoidable evils than the Hindu."

'যত মানুষ বেশী দিন বাঁচে, দেখে, ভাবে, ততই সে অনুভব করে যে ধরণীপৃষ্ঠে হিন্দুজাতি ছাড়া আর এমন কোনো জাতি নেই যারা পলিটিক্যাল বা রাষ্ট্রনীতিক দুঃখের চেয়ে আত্ম-অর্জ্জিত বা আত্ম-সৃষ্ট সুতরাং প্রতিকারসম্ভব দুঃখ বেশী ভোগ করে।'

ভারতবাসী "স্বখাদ সলিলে" ডুবে মর্ছে, আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মার্ছে। কোথায় তার অভাব, কোথায় তার দোষ, সমাজের নিষ্ঠুর মুষ্টি কোথায় তার গলা টিপে ধ'রে শ্বাসরোধ ক'রে দিচ্ছে,—এ-সকল কথা বিচার ক'রে বুঝে আপনার উদ্ধারের পথ আপনিই নির্দ্ধারণ করতে হবে। অন্তরের দেবতা না জাগলে শুধু উত্তেজনার জ্বালায় এ দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে পারা যাবে কি? ছট্‌ফটানির একটা গতি আছে, কিন্তু তার দৌড় বেশীদূর নয়।

মানুষের উন্নতির পথে যে বাধা—তা হয় ভিতরের, নয় বাহিরের। আমাদের জাতীয় প্রতিভা বিকাশের পক্ষে ভিতর ও বাহির দুই দিকের বাধাই প্রবল-শক্তিতে পথ আগ্‌লে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু অন্তর যার বাধানির্ম্মুক্ত তার কাছে বাহিরের বাধা কখনও সাংঘাতিক হয় না। বাহির যে অন্তরেরই প্রতিচ্ছবি। অন্তরে সত্যের আলোকে যা গ'ড়ে ওঠে, বাহিরে তার প্রতিষ্ঠা হবেই,—সে কোন বাধা মান্‌বে না। তাই আজ কঠোর আত্ম-পরীক্ষার প্রয়োজন হয়েছে। অন্তরে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হ'লে বাহিরের অধীনতা ঘুচবেই।

ভারত আজ দুঃখের অতলস্পর্শ সাগরে ডুবে আছে, উঠ্‌তে পার্‌ছে না। আমি রাজনৈতিক আন্দোলনের সপক্ষে বা বিপক্ষে কোন কথা বল্‌বার উদ্যোগ কর্‌ছি না; নরম বা গরম কোন দলেরই আমি নই;

আবার নরমই হোক্ আর গরমই হোক্ যা-কিছু আমার দেশকে যথার্থ উন্নতির পথে অগ্রসর ক'রে দেয় তাই আমি পরম পবিত্র বস্তু ব'লে জ্ঞান করি।

১৯০৬ সালের স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল বন্যায় যাঁরা ভেসেছিলেন, তাঁদের অনেকেই আবার ভাঁটার মুখে উল্টাপথে ভেসে যাচ্ছেন। যাঁরা স্রোতের মুখে তৃণের মত, নূতনের প্রতিষ্ঠা কর্‌বার জন্য যাঁদের উৎকট পুরুষকার নেই, তাঁদের উদ্দীপনার অগ্নিশিখা শেষে গোলদীঘির ধারে বক্তৃতা ও হাঁকডাকের ধূম্‌রাজিতে পরিণত হ'ল। ব্যবসানীতি ও অর্থশাস্ত্রের ক-খ-জ্ঞান নেই, তাই শুধু বক্তৃতার দ্বারা শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও অর্থসংস্থানের ব্যর্থ চেষ্টা আমাদের ভিতরে বাহিরে খুব একটা প্রবল ধাক্কা দিয়ে গেল। স্বদেশী আন্দোলনে বাঙ্‌লার শিল্প জাগ্‌ল না—কিন্তু জাগ্‌ল—বোম্বাই শিল্প। বোম্বাই প্রদেশে কাপড়ের কলকার্‌খানা স্বদেশীর হাওয়ায় বেশ শ্রীসম্পন্ন হ'য়ে উঠ্‌ল।

বাঙ্‌লায় স্বদেশীশিল্পের যে পুনরুত্থান হয় না তার প্রধান কারণ বাঙালী উদ্যমহীন, অলস ও আরামপ্রিয়। আবেগপূর্ণ ভাবপ্রবণতা দ্বারা আমরা হনুমানের মত এক লাফে সাগর পার হতে চাই। কিন্তু ভাবোচ্ছ্বাসের পশ্চাতে বিপুল কর্ম্মচেষ্টা না থাকায় আমাদের কেবল ভরাডুবি হতে হয়। আবার ভিতরের এই সাংঘাতিক বাধা-সকলকে আমরা কথার চটকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করি। নীরব সাধনা ভিন্ন যে কোন কাজ সম্পন্ন হওয়া একেবারে অসম্ভব—এই খাঁটি কথাটি সত্যভাবে স্বীকার করতে আমরা কুণ্ঠিত হই; কিন্তু অকুণ্ঠিত চিত্তে কেবল গলাবাজীর দাপটে আমরা দু'বেলা দেশোদ্ধার ক'রে থাকি।

বোম্বাই ও কল্‌কাতার মধ্যে তফাৎ অনেক। বোম্বাই সহরে মালাবার পাহাড়ের রমণীয় সৌন্দর্য্যের মধ্যে এবং সমুদ্রসৈকতে যে

সকল সুসজ্জিত প্রাসাদ, তার প্রায় সকলগুলি আমাদের দেশবাসীর। কিন্তু কল্‌কাতার চৌরঙ্গীতে কালা আদ্‌মীর স্থান নেই—তারা থাকে সেই "নেটিভ" কোয়ার্টারে যেখানে আলো ও বাতাস অন্ধকারের মলিনতায় প্রায় ডুবে যায়। বোম্বাই সহরে স্যর দোরাব তাতা, স্যর বিঠলদাস ঠাকারস্থে, স্যর ফজল্‌ভাই করিমভাই প্রভৃতি—এরাই হচ্ছেন ঐ সকল প্রাসাদের মালিক। এরা মহাধনী, শিক্ষিত, কৃতবিদ্য। স্যর বিঠলদাস স্ত্রীশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে একদিনে ১৫ লক্ষ টাকা দান করেছেন। বাঙলায় এমন মহাপ্রাণ বণিকরাজ আছে কি? স্যর ফজলভাই কয়েকটা কলের স্বত্বাধিকারী। কোন কোন কলে ১০০ টাকায় ১০০০ টাকা পর্য্যন্ত মুনাফা দিয়েছে। আর আমরা ১৮ লক্ষ টাকা মূলধনের ভাঙা "বঙ্গলক্ষ্মী" নিয়ে ১৯০৬ সাল থেকে ১৯২১ পর্য্যন্ত হাবুডুবু খাচ্ছি। আমাদের অনুসন্ধিৎসা ও কর্ম্মকুশলতা এতই অল্প যে বাঙলায় ২।১টি ছোটখাট কল চালাবার জন্যে হয় ইংরেজ, নয় বোম্বাইবাসীকে ম্যানেজার নিয়ে আসতে হচ্ছে। এই ১৪ বছর কেবল চীৎকারে কাটালাম।

যুদ্ধের পূর্ব্বে ম্যাঞ্চেষ্টার হ'তে প্রতি বৎসর ৩০০ কোটি টাকার নানাপ্রকার কাপড় বিদেশে রপ্তানি হ'ত। তার এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ প্রায় ১০০ কোটি টাকার কাপড় ভারতের বাজারে আস্‌ত। এই ১০০ কোটি টাকার কাপড় যাদের দরকার তাদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন দরিদ্র কৃষক। কোন রকমে লজ্জা নিবারণের জন্যে আমাদের দেশে এই ১০০ কোটি টাকার কাপড়ের প্রয়োজন। তার মধ্যে কল্‌কাতা হ'তে ৪০।৫০ কোটি টাকার বিলাতী কাপড় বাঙলার বিভিন্ন জেলায়, বিহার ও আসামে চালান হয়। এই কোটি কোটি টাকার কাপড় একদিনে গোলদীঘির আন্দোলনে উৎপন্ন হবে কি?

পাঁচ-ছয়টা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কলকারখানার সঙ্গে আমি বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট।* নানা-প্রকারের ব্যবহার্য্য জিনিষ যাতে দেশেই উৎপন্ন হয়, তার জন্য চেষ্টা করাই আমি জীবনের ব্রত করেছি। আমি নিজকে "স্বদেশী" ব'লে পরিচয় দিলে বোধ হয় কেউ ক্ষুণ্ণ হবেন না। অভিজ্ঞতার ফলে এই সহজ সত্যটি আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, ধর্ম্ম বা বিজ্ঞান বা ব্যবসা-বাণিজ্য যে কোন ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করতে হলে কঠোর তপস্যা চাই। নীরব সাধনা ভিন্ন এক দিনে এক লাফে কোন কাজই হবে না।

কিন্তু আমরা লাফ দিয়েই কেল্লা মেরে ফতে করতে চাই। আমার কাছে অনেক ছাত্র—কি করবো?—এই প্রশ্ন নিয়ে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু তাঁদের চাল-চলন ও কথার ভাবে বেশ বুঝতে পারা যায় যে তাঁরা একটা কিছু ব্যবসা ফেঁদে একেবারে রাতারাতি বড়লোক হতে চান। স্কুল-কলেজের যুবকগণ যা গলাধঃকরণ করেন, পরীক্ষা-মন্দিরে তা উদ্গিরণ ক'রে ডিগ্রি লাভ হলেই ব্যস্ মা-সরস্বতীর সঙ্গে একবারে সেলাম-আলেকম্। তারপর উদ্যম-অধ্যবসায়ের ত কোন ধারই ধারি না—শুধু ব্যবসা-মন্ত্রটা মুখে উচ্চারণ করেই একেবারে লাট হবার স্বপ্ন দেখা। ব্যাপার মন্দ নয়।

সম্প্রতি দেখে এলাম বিলাতে প্রায় ২৫০০ ভারতীয় ছাত্র নানা-প্রকার বিদ্যা অর্জ্জন করছেন। তাঁদের অধিকাংশই তাড়াতাড়ি একটা বিলাতি ডিগ্রী নিয়ে দেশী ডিগ্রীর উপর টেক্কা দিয়ে মোটা মাহিনার চাকরী জুটিয়ে নিতে চান। বাণিজ্য-ব্যবসার কেন্দ্রস্থানে শিক্ষালাভ

* ১। Bengal Chemical and Pharmaceutical Works. ২। Calcutta Pottery Works. ৩। Calcutta Soap Works. ৪। Bengal Canning and Condiments Works. ৫। Bengal Miscellany. আরও ২।১টি আছে।

কর্‌তে গিয়েও তাঁদের আড়ষ্ট বুদ্ধি সাড়া দেয় না; ঐ ডিগ্রী, আর চাকরী। বুদ্ধি খাটিয়ে আপন হাতের জোরে কিছু সৃজন ক'রে তোল্‌বার কল্পনা তাঁদের মনে কখনও জাগে না। এবার বিলাত থেকে প্রত্যাগমনের পথে জাহাজে দু'জন দেশীয় বণিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তাঁদের মধ্যে একজন কল্‌কাতার এক ধনী সওদাগরের পুত্র। লণ্ডন, নিউইয়র্ক প্রভৃতি স্থানে তাঁদের ব্যবসার কেন্দ্র আছে। আর-একজন গুজরাটী বেণিয়া—১৪ মাস বিলাতে ছিলেন—পশমী জিনিষের ব্যবসা করেন। এই দুটি যুবক শিক্ষিত, কিন্তু তাঁদের ডিগ্রী নেই, তাঁরা ছাপহীন। জাহাজে একজন ম্যাট্‌সিনির জীবন-চরিত পাঠ কর্‌ছিলেন. আর একজন প্রথমে ওমর খৈয়াম্‌ এবং পরে Light of Asia পাঠ কর্‌ছিলেন। তাই বলি ব্যবসা ও শিক্ষায় বিরোধ নেই—একেবারেই নেই। কার্ণেগী ও রক্‌ফেলারের নাম কে না শুনেছেন? এদের শিক্ষা যেরূপ গভীর, ব্যবসার বিস্তার সেইরূপ অদ্ভুত। জনসাধারণের হিতার্থে কার্ণেগী ১০০ কোটি টাকা ও রক্‌ফেলার বিদ্যাশিক্ষার ও নরহিতের জন্য ১৫০ কোটি টাকা দান করেছেন। এদের জীবন যেন উদ্যম, অধ্যবসায়, শিক্ষা, দীক্ষা, ব্যবসা, বাণিজ্য এবং করুণা ও মহাপ্রাণতার অপূর্ব্ব সঙ্গম। আর আমাদের এমনি দুর্ভাগ্য যে অন্য দেশে বহু চেষ্টায় যা সম্ভব হয়েছে আমরা একপ্রকার বিনা চেষ্টায় শুধু গলাবাজীর দ্বারা তা সার্‌তে চাই। কিন্তু গলাবাজীর কস্‌রতে গলাই ভেঙ্গে যায়, আসল কাজ এতটুকুও হয় না। তবু আমরা নিজের আলস্য ও উদ্যমহীনতার দোষ দিই না—দোষ দিই পারিপার্শ্বিক অবস্থার। কেউ বলেন—আঃ বড় গরম, কাজ কর্‌তে পারি না; আবার কেউ বা বলেন—উঃ কি শীত, কাজে হাত পা ওঠে না।

তারপর সুপ্রচলিত 'নেশন' শব্দটির (আমাদের দেশের অবস্থা বিবেচনা ক'রে) বিচার করা যাক্। বাঙ্‌লা হিন্দু-মুসলমানের দেশ— উভয়ের মাতৃভাষা এক—বাঙ্‌লার হাওয়ায়, সুজন্মা-অজন্মায়, সুখে দুঃখে, আমরা অনেকটা এক বটে। কিন্তু ধর্ম্মে আমরা পরস্পর থেকে পৃথক। হিন্দুর মধ্যে আবার নানা-প্রকার উপজাতি সব আছেন। এখন একটা ক্ষণিক আবেগের বশে আমরা হিন্দুমুসলমান এক হয়েছি বটে, কিন্তু এই একত্ব কি দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়েছে? একদিনেই বনিয়াদ পাকা হ'য়ে যাবে এমন আশা অবশ্য আমি করি না। তবু আপনাদের এই মিলনকে সত্যবস্তু ক'রে তোল্‌বার জন্যে আমরা বাস্তবিক কি কোন সত্য চেষ্টা করছি? দিল্লীর জুম্মা মস্‌জিদে হিন্দু সন্ন্যাসী আপন মর্ম্মকথা ব্যক্ত করেছেন। হিন্দু মুসলমান তা শুনেছে—মহামতি তিলকের শবদেহ হিন্দু মুসলমান মিলে বহন করেছে। সকলে সে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখেছে। এ-সকলই আশার কথা। কিন্তু এ সম্মিলন স্থায়ী হবে কি? এখনই ভেদনীতির কার্য্য আরম্ভ হয়েছে। আলিগড়ে মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, আবার লক্ষ্ণৌ সহরে শিয়া মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়। কেন এই স্বাতন্ত্র্য? সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি মানুষের অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয়ে এমন কি বস্তু আছে যা হিন্দু মুসলমান আপন আপন ভাইএর মত পাশাপাশি ব'সে শিখতে পারে না? হিন্দু মন্দিরে পূজা করেন, মুসলমান মস্‌জিদে উপাসনা করেন। কিন্তু শিক্ষামন্দিরে যদি আমরা হিন্দুমুসলমান এক আসনে বস্‌তে না পারি, তবে কি ক'রে বলি যে আমরা ভাই ভাই হয়ে মিল্‌তে চেষ্টা করছি। আমরা যে ইচ্ছা ক'রে বুদ্ধির দোষে পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যাচ্ছি। কোথায় সার্ব্বভৌমিকতা ও উদারতার প্রতিষ্ঠা

করব—তা না ক'রে সঙ্কীর্ণতায় গণ্ডিতে আমরা নিজেকে আবদ্ধ করবার চেষ্টা করছি। এই কি হিন্দুমুসলমান-সম্প্রীতির লক্ষণ? এই কি জাতি গঠনের সূচনা?

আমরা এখন "জাতীয়" শিক্ষা চাই। কিন্তু জাতীয় শিক্ষা কি? জাতীয় শিক্ষা অর্থে কি বটতলার বই পড়া? আর্য্যসমাজের লোকে জাতীয় শিক্ষার অর্থ করচেন বেদপাঠ করা; কেননা তাঁদের মতে বেদ অভ্রান্ত। বিবেকানন্দের ভক্ত বলবেন—বেদান্ত পাঠ কর—দ্বৈত, অদ্বৈত ও বিশিষ্টা-দ্বৈত-বাদ বিচার কর। আবার কেহ বা বলবেন—রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ পাঠ কর। কিন্তু হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি নানাধর্ম্মাবলম্বী ভারতবাসীগণ সকলে এই ব্যবস্থায় সম্মত হবেন কি? মুসলমান জাতীয় শিক্ষা অর্থে বলবেন—কোরান পড়। খৃষ্টান বলবেন—বাইবেল পড়। এত মতের অনৈক্য হ'লে আসল কাজে যে বাধা পড়বেই। পরমধার্ম্মিক হিন্দু রাজার রাজত্ব কালে শূদ্র তপস্যা করেছে ব'লে তার শিরশ্ছেদনের ব্যবস্থা হল; মনুমহাশয় ব্যবস্থা করেন যে শূদ্রের কর্ণে বেদোচ্চারণ-শব্দ প্রবেশ করলে উত্তপ্ত তরল সীসক সেই কর্ণে ঢেলে দিতে হয়। এই মনু-স্মৃতি নিয়ে জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা হয় কি? বেদ, বেদান্ত পাঠ্য হ'লে বাঙলার শতকরা ৫২ জন মুসলমান কি করবে? দয়ানন্দ বা বিবেকানন্দ—কোন্ পন্থী হলে মুসলমান ভ্রাতাদের টেনে নেওয়া যেতে পারে? আমরা হিন্দু মুসলমান এক ব'লে আহ্লাদে নৃত্য করছি, কিন্তু মুসলমান আমাদের জল ছুঁলেই সর্ব্বনাশ। জল খেতে হ'লে পানিপাঁড়ে, আর চা খেতে হ'লে কেল্‌নার্। কি চমৎকার! বক্তৃতার স্রোতে গা ঢেলে দিয়ে অনেক যুবক দেশোদ্ধার-ব্রতে জীবন উৎসর্গ করবেন প্রতিজ্ঞা করলেন। কিন্তু আবেগ ও উত্তেজনা

কতদিন স্থায়ী হয়? বি-এ বা এম্-এ পাশ করে যে-সব শিক্ষিত যুবক দেশের কাজ করতে অগ্রসর হচ্ছেন, তাঁরা কতদূর ত্যাগ-স্বীকার করতে প্রস্তুত আছেন জানতে চাই। কলকাতার অনেক ছাত্রাবাসে বামুন, কায়েত, নবশাখের আলাদা আলাদা ঘর; এদিকে বাবুর্চ্চির হাতের অমৃত আস্বাদনে কারও বাধে না। সমাজে বামুনের কাছে সব জাতিই অপাংক্তেয়। শিক্ষিত যুবক! নমঃশূদ্রকে দেশ-বাসী ভাই ব'লে তার সঙ্গে একসাথে খেতে দাঁড়াতে পার? বিবাহের সময় বরপণ গ্রহণের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পার? তোমাদের বিবাহের বিজ্ঞাপন দেখে হতভম্ব লেগে যায়; এত বিচিত্র কুলশীলের তালিকাও তোমাদের আছে! তোমার বিয়ের যৌতুকের চাপে কত স্নেহলতা আত্মহত্যা করছে তার সংবাদ রাখ? না ঠিক ঐ সময়ে তোমার পিতৃভক্তির উৎস উথ্‌লে ওঠে—"কি করব, আমার ত পণগ্রহণে অনিচ্ছা, কিন্তু বাবা বল্‌ছেন! ও বাবা! তিনি যে বুকে ধরে মানুষ করেছেন, সেই বুকে কি ক'রে শেলবিদ্ধ করবো?" হায়রে "বাবার" দোহাই! হে উপাধিধারী যুবক, তুমি ঘোড়া, গরু ও ছাগলের মত নিজকে সর্ব্বোচ্চ দরে বিক্রীত হতে দেও—ধিক্ তোমার শিক্ষা, ধিক্ তোমার দীক্ষা। তুমি আবার স্বদেশ উদ্ধারের জন্য আগুয়ান! তুমি মানসিক-দাসত্বের নিগড় আপন চরণে এমন ক'রে পরিয়েছ, যে, এক পাও অগ্রসর হতে পার না। তুমি দেশাচার-জুজুর ভয়ে এত ব্যতিব্যস্ত যে কোনও প্রকার সমাজ সংস্কারে হাত দিতেও ভীত হও। তুমি বারেন্দ্র হয়ে 'কাপের', বঙ্গজ হয়ে দক্ষিণরাঢ়ীর কন্যার পাণিগ্রহণ করতে বললে, ভয়ে আড়ষ্ট হও।*

* Wanted Rarhi Savab Brahmin bride for (1) Bharadwaj M, A., (2) Sandilya M. A., Bhanga brides for (1) Sandilya Dy. Magte., Cal. house; (2) Sandilya B. Sc., B. E., (3)

আর জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে আর-একটি প্রয়োজনীয় কথা আছে। On national linesএর মানে কি? ইংরেজী ভাষা একেবারে বাদ দেওয়া চলতে পারে কি? শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" নামক পুস্তকে যাঁরা হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত পাঠ করেছেন তাঁরা জানেন কারও স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন এদেশে হয়নি। বরং আমাদেরই একটা গর্ব্বের বিষয় এই যে রামমোহন রায়, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তৎকালীন হিন্দু সমাজের নেতৃবৃন্দ ঐ কলেজ স্থাপিত করেছিলেন। ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের যৌক্তিকতা প্রদর্শন ক'রে রামমোহন রায় লর্ড আমহার্ষ্টকে যে পত্র লিখেছিলেন তা শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই পাঠ ক'রে দেখা উচিত। তিনিই প্রথম প্রণিধান করেছিলেন যে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন-শাস্ত্র প্রভৃতি, স্বাধীনচিন্তা-প্রসূত জ্ঞানরাশি এবং পাশ্চাত্য সাহিত্য দর্শন আয়ত্ত না করলে, দেশের চিন্তাস্রোতে জোয়ার আসবে না; শুধু সংস্কৃত ও পারসী ভাষা অধ্যয়ন করলে দেশকে মধ্যযুগের অন্ধকারেই প'ড়ে থাকতে হবে। তাই তিনি ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের প্রধান উৎসাহী ও উদ্যোগী ছিলেন। তাঁর দূরদর্শিতার ফল আজ ফলেছে। বঙ্কিমচন্দ্র কোন স্থানে যথার্থই বলেছেন যে কিছুকাল অগে জন্ম-গ্রহণ করলে কলম ধ'রে "বঙ্গ দেশের কৃষক" বা অন্য উৎকৃষ্ট সন্দর্ভ বা উপন্যাস না লিখে, তিনি পাঁজী হাতে করে নবমীতে লাউ

Kashyap M. A., B. L., Cal. house, (4) Bharadwaj M. A., Cal. house. Bangaj Kayastha Brides for (1) Basu M. A., (2) Ghose M. A., (3) Roy, pay Rs. 750. Bangaj Baidya bride for (1) Dhanantari Dy. Magte., (2) Saktri M. Sc.

[Bengalee হইতে গৃহীত]

খেতে আছে কি না তার বিচার করতেন। ইংরেজী ভাষার সাহায্যে আমাদের শিক্ষা করবার অনেক জিনিষ এখনও আছে। নূতন কোন বিষয় শিখতে হলে পাঠাগার থেকে আপনারা ইংরেজী বা বাঙলা কোন্ পুস্তক নিয়ে আসেন সে কথা ভেবে দেখলে আমার উক্তির যাথার্থ্যই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আমি মাতৃভাষার নিন্দা করছি না। কিন্তু গায়ের জোরে ভাষার দৈন্য চাপা দিতে আমি একেবারেই প্রস্তুত নই। বরং পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে জ্ঞান সঞ্চয় করে সর্ব্ববিষয়ে মাতৃভাষাকে সৌষ্ঠব ও সমৃদ্ধিশালিনী করবার জন্যে আমাদের ও মধুসূদনের মত বলতে হবে।—

"রচিব এ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

মিল্‌টন, দাঁতে, হোমার, ভার্জ্জিল প্রভৃতি নানা দেশের মধুচক্র হতে মধুসূদন মধুসংগ্রহ করেছিলেন। একি কোন লজ্জার কথা? ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব কি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে দেখা যায় না? **On national lines** মানে কি নবদ্বীপের টোল বা মুসলমানদের মোক্তাব? কোন্ সাহিত্যচর্চ্চার ফলে দেশে রাজনীতিচর্চ্চা আরম্ভ হয়েছে? **No taxation without representation** কোন্ সাহিত্যের কথা? মনুর মতে রাজা দেবতা; তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের স্থান নেই—যা বলবেন তাই মানতে হবে। কিন্তু আজ যে আমরা মানুষের জন্মগত অধিকার ও স্বত্ব বুঝে নেবার জন্যে আন্দোলন আরম্ভ করেছি, তার প্রেরণা কোন্ শিক্ষা হ'তে? হাম্‌ডেন, পিম্ প্রভৃতি স্বাধীনতার আন্দোলনের পুরোহিত জননায়ককে ভুলতে গেলে যে বিষম ভুল হবে!

বর্ত্তমান সময়ে জাতিগঠনের আন্দোলনে লোকশিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষার

স্থান আমরা কোথায় দিয়েছি? বাঙ্‌লার নব জাগরণের দিনে যখন জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হ'ল তখন ব্রজেন্দ্রকিশোর পাঁচ লক্ষ টাকা দিলেন, সুবোধচন্দ্র এক লক্ষ টাকা দিলেন, সূর্য্যকান্ত আড়াই লক্ষ দিলেন। আরও অনেকে মাসিক সাহায্য দিলেন। কিন্তু সে সময়ে পৃথিবীতে স্ত্রীজাতি ব'লে যে কেউ আছেন একথা তাঁরা একেবারেই ভুলে গেলেন। মা, ভগ্নী, সহধর্ম্মিণীকে মূর্খ ক'রে রাখলে কি লাঞ্ছনা হয় তা ত আমরা প্রতিপদে বুঝতে পারছি। তবু ত আমাদের চেতনা হয় না! ইয়ুরোপীয় যুদ্ধে স্ত্রীলোক কত কাজ ক'রে দিয়েছেন তা আজ সকলেই জানেন। আমাদের ঐ সময়ে স্ত্রীলোকের কাছ থেকে সাহায্য পাবার আশা কতটুকু? তাঁদের গণ্ডমূর্খ ও অকেজো পুতুল ক'রে রেখে আমরা সমাজের আধখানা অঙ্গকে পক্ষাঘাতে পঙ্গু ক'রে রেখেছি। স্ত্রীশিক্ষার স্থান ত কোথাও দেখছি না। আর পুরুষের যা শিক্ষা সে ত ডিগ্রী ও চাকরীর লোভে।

আবার লোকশিক্ষার কথা যদি ধরা যায় তাহলে ত বুক শুকিয়ে ওঠে। দেশের শতকরা ৯৫ জন নিরক্ষর। আপনাদের শিক্ষার জন্য আমরা স্কুল কলেজ স্থাপন করছি; কিন্তু কোটি কোটি লোক যে অজ্ঞতার স্তূপের নীচে চাপা প'ড়ে মারা যাচ্ছে। তাদের বাঁচাবার জন্যে আমাদের ক'জনের প্রাণ কেঁদেছে? লোক-শিক্ষার জন্যে সুদীর্ঘ বক্তৃতা হ'তে শুনেছি, কিন্তু খুব অল্প কর্ম্মেরও প্রতিষ্ঠা হ'তে ত দেখিনি। কিন্তু এই বিপুল জনসঙ্ঘ যদি চিরকালই শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে থাকে, তবে কি আমরা আকাশ থেকে জাতিগঠনের উপকরণ সংগ্রহ করবো? জনসাধারণকে নিয়ে জাতি। জনসাধারণকে বাদ দিয়ে যা থাকে তা অন্য কিছু হ'তে পারে, কিন্তু জাতি কোন কালেই নয়। জাগরণের ঢেউ জনসঙ্ঘের

কাছে পৌছান চাই। যদি জিজ্ঞাসা করি—কলিকাতার দোকান-পাট বন্ধ হয়েছিল কেন? উত্তর হবে—মহাত্মার হুকুম। "কেন?" "তা জানি না।"* কিন্তু জাপানে ও ইংলণ্ডে এরকম অজ্ঞতা দেখা যায় না। শতকরা ৯৫ জন পক্ষাঘাতগ্রস্থ হ'লে জাতির দেহে বল-সঞ্চারের সম্ভাবনা কোথায়? প্রজাশক্তি যদি জাগিয়ে তুল্‌তে হয় তবে এখন শিক্ষার দীপ গ্রামে গ্রামে জ্বেলে দিতে হবে। তবেই ত রাজনৈতিক আন্দোলন জনসাধারণের ইচ্ছা, শক্তি, ও সহানুভূতির উপর দাঁড়াতে পারবে। এই সত্যটুকু উপলব্ধি করেই পুণ্যশ্লোক গোখ্‌লে জীবনের শেষভাগে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্যে কি পরিশ্রমই না করেছিলেন!

জনসাধারণের শক্তির উপর ভিত্তি নেই ব'লে ভারতবর্ষে অনেক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'য়ে গেছে। ইতিহাসে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। রণজিৎ সিংহ বা হায়দার আলির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সৈন্যদল বিধ্বস্ত হ'য়ে গেল। দেখা গিয়েছে সেনাপতি যেমনই হত হলেন, অমনি সৈন্যদল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে খরগোশের মত পালিয়ে গেল। তাই বলি কোন আন্দোলনই শুধু মুষ্টিমেয় শিক্ষিতদের নিয়ে সফল হয় না। জনসাধারণের উপর ভিত্তি না থাকলে সব ইমারত্ তাসের ঘরের মত ভূমিসাৎ হ'য়ে যায়। আমি কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় বা রাজনীতিক দলের উপর কটাক্ষ কর্‌ছি না। আমি দূর থেকে ঘটনাবলি পর্য্যবেক্ষণ ক'রে অভিজ্ঞতার দ্বারা যেটুকু বুঝেছি তাই দেশবাসীকে জানাচ্ছি। আমাদের অনেক গলদ আছে। দেহের মধ্যে যদি দূষিত ক্ষত থাকে

---

* হরতাল কেন?—একথার উত্তর অনেক বেহারা ও "সাধারণ" শ্রেণীর লোক প্রকৃতই দিতে পারেনি। কেবল উত্তর পেলাম—"গান্ধী মহারাজের হুকুম।"

তবে অস্ত্রচিকিৎসা চাইই চাই। পূঁজ রক্ত বাহির করে দিতেই হবে, চাপা দিলে শুধু মৃত্যুকে ডেকে আনা হবে।

আজ দেশই আমাদের একমাত্র আরাধ্য দেবতা। তাঁর পূজার নৈবেদ্য সকলকেই সাজিয়ে আন্‌তে হবে। কারও মুখ চেয়ে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে থাক্‌লে রাজার পুকুরে দুধ ঢাল্‌বার মত দুধ আর এসে পৌঁছবে না,—আস্‌বে শুধু জল। তাই আজ মনের ভক্তি ও দেহের শক্তি দিয়ে মায়ের সিংহাসন সাজিয়ে দিতে হবে। এ পূজায় সবারই সমান অধিকার। সকলকেই এ পূজার উপকরণ জোগাড় ক'রে আন্‌তে হবে। হিন্দু মুসলমান হৃদয়ে হৃদয় মিলিয়ে সত্যধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠা কর্‌বে।*

* বালিনিবাসী শ্রীমান রতনমণি চট্টোপাধ্যায় আমার বক্তৃতার সারাংশ বিবৃত করিয় বক্তাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

৮

মিথ্যার সহিত আপোষ ও শান্তি ক্রয়

ইংরাজী ১৮৮৯ সালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে আমি একটী বক্তৃতা দিয়াছিলাম। তাহার সার কথা এই ছিল যে, আমরা বাঙ্গালী—আমাদের জীবনকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; (১) পোষাকী জীবন ও (২) আটপৌরে জীবন। যখন আমরা টাউন হলে ও বড় বড় সভায় বজ্রগম্ভীর স্বরে বক্তৃতা করি, বলি—সমাজ-সংস্কার করিব, অর্থনৈতিক সমস্যা দূর করিব, বাল্য-বিবাহ বন্ধ করিব, বিধবা-বিবাহ প্রচার করিব তখন আমরা 'পোষাকী' জীবনের পরিচয় দিই; বাড়ীর ভিতর প্রবেশের সময় পোষাক ছাড়িয়া আসি—কথায় ও কার্য্যে বিপরীত আচরণ করি; 'আটপৌরে' জীবনের মধ্যে পড়িয়া 'পোষাকী' জীবনের কথা ভুলিয়া যাই।

এই বক্তৃতার পর এক শতাব্দীর এক তৃতীয়াংশেরও বেশী সময় অতিবাহিত হইয়াছে। দেখা যাউক, এই ৩৫।৩৬ বৎসরের মধ্যে আমরা কোন্ বিষয়ে কতদূর সংস্কার সাধন বা উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছি। যাঁহারা শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত রামতনু লাহিড়ীর জীবন-বৃত্তান্ত, রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত, যোগীন্দ্র বসু কৃত মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত প্রভৃতি পড়িয়াছেন তাঁহারা জানেন হিন্দু কলেজের বাল্যাবস্থায়, ডি রোজীও প্রভৃতি অধ্যাপকগণের সংস্পর্শে আসিয়া ও তাঁহার শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া তখনকার ছাত্রগণ কি রকম মত্ত হইয়াছিল। পরলোকগত রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি তখন হিন্দু সমাজের ভিতর বসিয়া, শুধু গোমাংস ভক্ষণ করাই যে

সভ্যতার চরম ও তাহাতেই আত্মার মুক্তি ও তৃপ্তি হয় এই ধারণা পোষণ ও প্রচার করিতেন তাহা নহে, তখনকার দিনে প্রকাশ্যে মদ খাওয়াও চলিত। সমাজের সর্ব্বত্রই একটা উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতার ভাব দেখা গিয়াছিল। পিতৃদেবের কাছে শুনিয়াছি স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় যৌবনকালে মদকে উপাদেয় পানীয় বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু প্রবীণ বয়সে তাঁহার ঐ ভ্রান্ত ধারণা দূর হয়—এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সার গ্রহণ করিয়া স্থূলতঃ তিনি নবজীবন লাভ করেন। শেষ বয়সে তিনি হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। সেই সব বক্তৃতা ছাপার অক্ষরে যখন ঘরে ঘরে ছড়াইয়া পড়িল, তখন অনেকে ভাবিলেন হিন্দু-সমাজ অনেকখানি এগিয়ে গেল, এইবার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সার গ্রহণ করিয়া, রামমোহন রায়ের প্রদর্শিত পথে, দেশের ও সমাজের ভাবী উন্নতির বনিয়াদ স্থাপন করিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে আশা ফলবতী হইল না। তাহার কারণ কি? কারণ এই দেখা গিয়াছে অসত্য ও ভ্রান্ত ধারণার সহিত আপোষ করিতে করিতে আমরা এক পাও অগ্রসর হইতে পারি নাই। সমাজে বাস করিতে হইলে আপোষ দরকার—আপোষ না হইলে চলে না। যদি গাড়ীর সামনে একটা ঘোড়া যুড়ে দেওয়া যায়—এবং গাড়ীর পিছনে আর একটা সমান বলশালী ঘোড়া জুড়ে দেওয়া যায় ও তাহাদের তাড়না করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায় গাড়ী চলে না। যাহারা mechanics পড়েছেন তাঁহারা এই কথাটা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। আমাদের জীবনকে সত্য একদিকে টানে, মিথ্যা অপর দিকে টানে। কাজেই আপোষ দরকার—কিন্তু তাহার সীমা আছে। মিথ্যার সহিত বনিবনাও রাখিতে গিয়া আমরা সব হারিয়ে ফেলেছি। একটা মামুলী গল্প আছে—প্রাচীন কালে এক রাজা এক দীঘি খনন

করাইয়া তাহা উৎসর্গ করাইবার জন্য কুলপুরোহিতকে ডাকিলেন। পুরোহিত বলিলেন, দুধ দিয়ে দীঘি পূর্ণ কর্ত্তে হবে—তারপর উৎসর্গ। রাজা ঢেড়া দিলেন, প্রত্যেক প্রজাকে এক ঘটী দুধ দিতে হবে, পুকুর ভর্ত্তি করিবার জন্য। প্রজারা সকলেই চালাক—প্রত্যেকে ভাবিল, সকলেই দুধ দিবে (অবশ্য তখন দুধ টাকায় ২॥ সের হয় নাই) আমি যদি রাত্রে এক ঘটী জল দিয়ে আসি, কে বুঝবে! পরদিন সকালে দেখা গেল দুধের পরিবর্ত্তে জলে পুকুর বোঝাই—সকলে জল দিয়াছে! আমরা বাঙ্গালী, উল্লিখিত প্রজাদের মতই উর্ব্বর মস্তিষ্কসম্পন্ন—প্রত্যেকেই ভাবি আমি যদি একটু ফাঁকি দিই তাহাতে জাতির কি আসে যায়। কিন্তু প্রত্যেকেই যদি এই প্রকার মনোবৃত্তির পোষকতা করেন তবে জাতির দশা কি হয় তাহা সহজেই অনুমেয়।

জুন মাসের "কলিকাতা রিভিউ" পত্রে, আশুতোষ কলেজের একজন অধ্যাপক "নব্য বাংলা" শীর্ষক একটী সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখেছেন—ভূমিকায় দু' একটী কথা উদ্ধৃত করেছেন তাহা আমার কাছে খুব সুন্দর বলে মনে হয়েছে; তাহা হইতে কয়েক ছত্র মাত্র পাঠ করিতেছি।

"He eats beef, cracks whole bottle of cognac at Spencer's or Wilson's but as soon as he makes his appearance in native Society, he is as it were metamorphosed into a new being. He is then a pattern to the most thorough-going Hindu."

ইহা ১৮৫২ সালের কথা। তারপর প্রায় ৭২ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে দেশের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। এখন বাঙ্গালীর মধ্যে 'স্বদেশী' ভাব প্রবল হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই দেখি রেস্তোরাঁর সংখ্যাও অসম্ভব রকম বাড়িয়াছে। আজ-

কাল কলিকাতার অলিতে গলিতে উইলসন হোটেলের ক্ষুদ্রকায় ও সাধারণ সংস্করণ। বাপ মা কত কষ্ট করে ছেলেকে টাকা পাঠায় তাদের শিক্ষার জন্য—আর তাহারা ইহার অধিকাংশ খরচ করে চপ্ কট্‌লেটে ও বায়স্কোপে। আমি অবাক হ'য়ে দেখি, বিকাল ও সন্ধ্যাবেলা, যখন আমাদের দেশে ছেলে বুড়ো সাধারণতঃ ভোজন করে না—তখন আমাদের শিক্ষিত যুবকগণ কাঁটা চামচের শব্দে রাস্তায় লোককে চমকিত করিয়া তুলেন। ঘরের জীবন ও বাইরের জীবনের এই বিরাট পার্থক্য আমি গত ৫০ বৎসর যাবৎ কলিকাতাতেই লক্ষ্য করিতেছি। বাবুরা বাইরের বাড়ীতে, সহিস ও কোচ্‌ম্যানের মারফত মুরগী পোষেন ও তাহার কোর্ম্মা ভক্ষণ করেন—অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার সময় গৃহিণী একটু গঙ্গাজল ছিটাইয়া শুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের গ্রহণ করেন। মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবার যো নাই। বাঙালী জীবনে ভয় ও সাহসের অপূর্ব্ব সমাবেশ এইখানে। এই রকম দোটানা জীবনের মধ্যে থাকার দরুণ, গত ১০০ বৎসরের মধ্যে আমরা বিশেষ কিছু অগ্রসর হইতে পারিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না। ব্যক্তিগতভাবেই হউক আর সমাজগতভাবেই হউক আমরা বিশেষ কোন উন্নতি লাভ করিতে পারি নাই। না পারার কারণ কি তাহাই আলোচনা করিব।

আমাদের জাতীয় উন্নতির প্রধান অন্তরায় স্ত্রীশিক্ষার শৈথিল্য ও উদাসীনতা। নারী জাতিকে যদি শিক্ষার পথে এগিয়ে দিতে পারিতাম তবে জাতির বর্ত্তমান অবস্থা এত শোচনীয় হইত না। আমাদের দেশে যখন ইংরাজী রাজভাষা হইল—তখন ইংরাজী-ওয়ালাদের আদর খুব বেশী—বড় চাকুরী ইংরাজী-ওয়ালাদের একচেটিয়া হইল। চাকুরীর লোভে তখন লোকে ইংরাজী শিখিত। এখন সে দিন নাই। তবুও অনেকে বলেন মেয়েদের লেখা পড়া শিখে কি হ'বে—তারা ত আর

চাকুরী ক'রে খাবে না (যেন চাকুরীর জন্যই বিদ্যার প্রয়োজন!)। সেনসাস্ রিপোর্টে দেখা যায়, দেশের শতকরা ৫ জন লোক বর্ণজ্ঞান-বিশিষ্ট (literate); মহিলাদের মধ্যে শতকরা আধ জন মাত্র। তাহা হইলে দেখুন, শিক্ষা হিসাবে আমরা কত নীচে। পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিতেছি—দোটানা জীবন ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। স্ত্রীশিক্ষার অভাবেই সমাজে আজ এত ব্যাধি, দুর্নীতি ও কুসংস্কার। পুরুষ ও মহিলাদিগের ভিতর শিক্ষা, দীক্ষা ও চিন্তার বেশী পার্থক্য থাকিলে সমাজ চিরকালই ভগ্নস্বাস্থ্য ও দুর্ব্বল হইয়া থাকিবে। জুলিয়স্ সিজারকে হত্যা করিবার জন্য ব্রুটাস্, কেসিয়াস প্রভৃতি ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। ব্রুটাসের তখন চোখে ঘুম নাই আহার বিহারে তৃপ্তি নাই—মন সর্ব্বদাই চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন। তাঁহার স্ত্রী পোর্সিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া সন্তোষজনক উত্তর পাইলেন না। ব্রুটাস স্ত্রীর নিকট আত্ম-গোপন করিলেন। তখন পোর্সিয়া বলিলেন,

"Is it expected I should know no secrets
That appertain to you? Am I yourself
But, as it were, in sort or limitation,
To keep with you at meals, comfort your bed,
And talk to you sometimes? Dwell I but in the suburb
Of your good pleasure? If it be no more,
Portia is Brutus' harlot not his wife,"—*Julius Caeser*

আমাদের বাঙ্গালী কবি, তাঁহার অতুলনীয় তুলিকায় চিত্র এঁকে দেখিয়েছেন শিক্ষিত ও অশিক্ষিতার মধ্যে ভাবের কি গভীর পার্থক্য!—

বর। 'বল একবার, "আমিও তোমার,
তোমা ছাড়া কারে নাহি চাই!"

ওঠ কেন, ওকি কোথা যাও সখি ?

রুনে। (সরোদনে) "আইমার কাছে শুতে যাই !"

• শ্রেষ্ঠ ও চিন্তাশীল কবিদিগের ভাব একই রকমের হয়। বাংলার শ্রেষ্ঠ মহিলা কবিও গেয়েছেন :

"স্বজনের সাধ পুরাইতে শিশুপত্নী উজলিল ঘর"

* * * *

"অলঙ্কারে সহধর্ম্মিণীরে (কি বিদ্রূপ জানে অভিধান)"

পুনশ্চ "জ্ঞানের আলোকে নাথ তুমি হ'লে অগ্রসর
অজ্ঞানের অন্ধকারে আমি ত বেঁধেছি ঘর।"

এই যে একই সমাজের স্ত্রী ও পুরুষদের মধ্যে একটা বিপুল ব্যবধান—ইহাই আমাদিগকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। মায়ের স্তন্যদুগ্ধ পানের সঙ্গে সঙ্গে সন্তান মায়ের দোষ গুণ সকলের অলক্ষ্যে অর্জ্জন করে। শৈশবাবস্থার শিক্ষা দীক্ষা হয় মায়ের কাছে—মায়ের দ্বারা। ইংরাজ জাতি যে আজ এত বড় হইয়াছে তাহার একটি প্রধান কারণ এই যে, তাহারা মায়ের নিকট হইতে ও মাতৃক্রোড়ে থাকিয়া কুসংস্কার শিক্ষা করিবার সুযোগ পায় না। আমাদের দেশে মায়ের চেয়ে বেশী সর্ব্বনাশ করে মায়ের মা বা দিদিমা ও আইমা। মা যদিও সংস্কার বিষয়ে একটু অগ্রণী হয়েন কিন্তু দিদিমা, ঠাকুরমার হাত এড়াবার যো নাই। এইরূপে আমরা এক পুরুষ পিছাইয়া গিয়াছি। বাল্য সংস্কার দূর করা খুব শক্ত। বইতে পা লাগিলে এখনো আমার দেহের শিরা উপশিরা আপনা আপনিই সঙ্কুচিত হয়—কিছুতেই এই কুসংস্কার ছাড়িতে পারি নাই। এখনও অনেক মেডিকেল কলেজের স্বর্ণপদক প্রাপ্ত ছাত্র গঙ্গাস্নান করিয়া অক্ষয় স্বর্গবাসের কল্পনা করেন। বিজ্ঞানের সব ছাত্রেরাই জানেন অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন হইতেই জল উৎপন্ন হয়। এই জল যদি ঘরে,

থাকে এবং সেই ঘরে যদি একজন পরিচ্ছন্ন, তথাকথিত অস্পৃশ্যজাতীয় লোক প্রবেশ করে তবে চলিত প্রথানুসারে এ জল অশুদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু কেন? শরীরের বা বংশের অপবিত্রতা কি অর্জ্জুনের শর-সন্ধানের মত কলসীভরা জল দেখিলেই তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবে? অথচ সোডা লিমনেড্, ডাব, বরফ্ প্রভৃতিতে দোষ হয় না। কি সুন্দর সংস্কার!

স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যদি শিক্ষা-দীক্ষায় যথেষ্ট তফাৎ থাকিয়া যায় তবে সংসারে শৃঙ্খলা ও সুখের অভাব হইয়া পড়ে। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, অমুক ত এক জন অধ্যাপক, অসাধারণ পণ্ডিত—কলেজের ছুটী হ'লে এক দণ্ড বাড়ীতে থাকেন না—অন্যত্র চলে যান কেন? শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, 'এটা বুঝ্‌তে পারলেন না? বাড়ীতে সহধর্ম্মিণী এঁর মন আকৃষ্ট করে' রাখতে পারেন না। হয়ত বেচারীর অর্থের অভাব, বই কিন্‌তে পারে না—অথচ গৃহিণী বায়না ধল্লেন, ব্রত কর্‌ব, এ চাই, ও চাই—ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হবে ইত্যাদি। বিপদ এইখানে। পরস্পর পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া না চলিতে পারিলে একত্র বাস সুখকর হয় না। ছেলে বেলায় দেখেছি, উকিল, ব্যারিষ্টারকে দরকার হইলে বাড়ীতে পাওয়া যাইত না—তাসের আড্ডা, খোস গল্পের আড্ডা বা পাশের বাড়ীতে খোঁজ করিতে হইত। কারণ ইংরাজীতে যাহাকে বলে amenities of home life তাহা তাঁহারা বাড়ীতে পাইতেন না। আমরা এই অবলাজাতিকে পিছু ফেলিয়া, তাহাদিগকে অজ্ঞ ও মূর্খ রাখিয়া আগুয়ান হইতেছি—প্রকৃত পক্ষে তাহাদিগকে অ-বলা করিয়া রাখিয়াছি। আমাদের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত এইখানে।

তারপর বিবাহ। আজকাল সংবাদপত্রের মারফতে পাত্র পাত্রীর সন্ধান লওয়া হয়। আজকার কাগজ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি;—

দুইজন বাৎস্যগোত্র বারেন্দ্র যুবকের জন্য পাত্রী আবশ্যক। আরও একটা শুনুন,—কায়স্থ মৌদ্‌গুল্য গোত্রজ যুবকের জন্য সুন্দরী ও গুণসম্পন্না পাত্রী আবশ্যক। (সুন্দরী পাত্রী ত সকলেই চাহেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যাঁহারা সুন্দরী কন্যা চাহেন তাঁহারা কি সকলেই কন্দর্পবিনিন্দিত?) এই রাঢ়ী বারেন্দ্র বঙ্গজ—এসব কেন? ব্রাহ্মণের কথা ছাড়িয়া দিই—কায়স্থের মধ্যে এই কৃত্রিম ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে মাত্র ২৫০।৩০০ বৎসর। রঘুনন্দনের ও পুরন্দর খাঁর ব্যবস্থা—শাস্ত্রসম্মত নহে—তবুও এই প্রথা মানিয়া চলিতে হইবে? বঙ্গজ কায়স্থ ও দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ পাশাপাশি বাস করে অথচ বৈবাহিক ক্রিয়া তাহাদের মধ্যে হইবে না; একই শ্রেণীর মধ্যে আবার সকল অবস্থায় কুলীন ও মৌলিকের মধ্যে বিবাহ হয় না। জানি এসব কৃত্রিম প্রথা—এসব লোকাচারের মধ্যে সত্যের অংশ নাই তবু ভয় দূর করিতে পারিতেছি না। জানিয়া শুনিয়া আবার আমরাই এই সব কুসংস্কারের পোষকতা করিতেছি। আজকাল মেয়ের বিবাহে যে এত কষ্ট পাইতে হয়—এইসব কৃত্রিম প্রথাই কি তাহার মুখ্য কারণ নয়? অসবর্ণ বিবাহ দূরে থাক্, যদি উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী, বঙ্গজ ও বারেন্দ্রের ভিতর বিবাহের কোন প্রকার লৌকিক্ বাধা না থাকিত তবে মেয়ের বাপ অনেক দুর্দ্দশার হাত হইতে রক্ষা পাইত। রাজা রাজবল্লভ বিক্রমপুরের বৈদ্য—কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার আত্মীয়গণ গরিফা সমাজ ভুক্ত, অথচ এইটুকু সাহস হইল না যে তাঁহাদের বংশধরগণ পরস্পর বিবাহাদি ক্রিয়া কর্ম্ম করেন। বিবাহ-সমস্যা দিন দিন প্রবল হইতে প্রবলতর হইতেছে। দেশের চিন্তাশীল যুবকগণ ও সমাজের নেতাগণ যদি এখন হইতে সাবধান না হয়েন তবে বিবাহ-সমস্যা অন্ন ও বস্ত্রসমস্যা অপেক্ষা আরও ভীষণ আকার ধারণ করিবে। মিথ্যা দেশাচার ও কপট লোকাচারের উপর যে বিধি-

ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত, জানিনা, হইতে পারে এক সময় তাদের প্রয়োজনীয়তা ছিল, কিন্তু এখন সম্যক্ উপলব্ধি করেছি—যাহা অসার, যাহা বিবেকবিরুদ্ধ, যাহা কৃত্রিম সেই সব প্রথা ও সংস্কার আঁকড়ে ধরে থাকা শুধু সমাজের পক্ষে নয়—দেশের পক্ষে, জাতির পক্ষে অকল্যাণকর। যাহা অন্তঃসার শূন্য ও জাতীয় উন্নতির অন্তরায় ও পরিপন্থী তাহা সর্ব্বোতোভাবে ত্যাগ করিতে হইবে—ইহার জন্য সৎসাহসের প্রয়োজন। স্মরণ রাখা উচিত যে নৈতিক-সাহস বিবর্জ্জিত জাতি কোন দিন জগতের কোন মহৎ কাজ করিতে পারে না।

তারপর বাল্য বিবাহ। রোজগারের ক্ষমতা নাই—অথচ বিবাহ না করিলে চলিবে না। শিক্ষিত হউক আর অশিক্ষিতই হউক, কোন তফাৎ দেখিতে পাই না। ছেলের বাপ হয়ত ছেলের পড়ার খরচ কুলাইয়া উঠিতে পারেন না কাজেই একজন বেহাই খুঁজিতে লাগিলেন—বুক ফুলাইয়া লোকের কাছে প্রচার করিতে লাগিলেন যে তিনি পণ-প্রথার বিরোধী—তবে ছেলেটা খুব মেধাবী—পড়িতে না পাইলে তাহার জীবন 'মরুভূমি' হইয়া যাইবে, সেই জন্যই ছেলের পড়ার বাবদ মাসিক 'যৎকিঞ্চিৎ' সাহায্য পাইলেই পুত্রটীকে পাত্রীস্থ করিতে সম্মত আছেন। মেয়ের বাপ দেখিলেন, একসঙ্গে ৫ হাজার টাকা খরচ করিবার সামর্থ্য তাঁহার নাই—সুতরাং মন্দের ভাল। আর ছেলে বাইরে যাহাই বলুন মনে মনে ভাবিলেন, পড়াও হইবে এবং শ্বশুরের পয়সায় কয় বৎসর বেশ আরামে ও আমোদে কাটিবে। ফেল হইলে হয়ত বাবা টাকা পাঠান বন্ধ করিতে পারেন—কিন্তু শ্বশুরের টাকা নিয়মিত ভাবেই আসিতে থাকিবে। সুতরাং অষ্টাদশবর্ষীয় যুবা এক দ্বাদশবর্ষীয়ার পাণিগ্রহণ (পাণিপীড়ন ?) করিলেন। মা বলিলেন, বেশ ছোট্ট বউ হয়েছে—ঘর 'আলো' করবে। এই যে বাল্য বিবাহের ব্যবসাদারী—

ইহাতে যে সমাজের কত অনিষ্ট হয় দু'এক কথায় তাহাই আলোচনা করিব।

কথায় কথায় আজকাল বলি, আমরা আর্য্যসন্তান, সনাতন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করাই আমাদের কর্ত্তব্য; কিন্তু কথায় ও কার্য্যে কোন প্রকার সামঞ্জস্য রাখিবার চেষ্টাও করি না। বেদ, উপনিষদ বা রামায়ণ মহাভারতের যুগে ছাত্রেরা বিদ্যাশিক্ষার জন্য গুরুগৃহে অবস্থিতি করিতেন। ব্রহ্মচর্য্যপালন করিয়া কাষ্ঠ-আহরণ, গো-পালন, গুরু-সেবা দ্বারা সাধারণ ভাবে জীবন যাপন করিতেন। বিলাসিতা বর্জ্জন ও ব্রহ্মচর্য্যপালন ছাত্র জীবনের প্রধান অঙ্গ। আর আজকাল আমরা বাল্য-বিবাহ করিয়া বা তাহার সহায়তা করিয়া শাস্ত্রের মর্য্যাদা হানি করিতেছি—বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছি। অর্থ-নীতি, স্বাস্থ্যনীতি ও নৈতিক জীবনের দিক দিয়া দেখিতে গেলে বুঝা যায় আমরা নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করিতেছি। কবি গেয়েছেন, "বিয়ে হলেই পুত্র কন্যা, আসে যেন প্রবল বন্যা।" একে ৫।৭ শত বৎসরের দাসত্বের চাপে আমাদের সব সদ্গুণ গুঁড়া হইয়া গিয়াছে—তার উপর যদি স্ত্রীপুত্র লইয়া পরমুখাপেক্ষী হইয়া জীবনধারণ করিতে হয় তবে 'স্বভাব নষ্ট' হইবে তাহা আর বিচিত্র কি? বাল্য বিবাহ এক সময়ে আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল সত্য কিন্তু সে সময়ের বাংলা আর বিংশ শতাব্দীর বাংলায় আকাশ পাতাল তফাৎ। তখন জীবনসংগ্রাম কঠোর ছিল না—সকলেই পেট ভরিয়া খাইতে পাইত। টাকায় ২॥০ সের দুধ ছিল না—মাছের সের ১৷০ সিকা ছিল না—তরকারীর অগ্নিমূল্য ছিল না। গত ১০ বৎসরের মধ্যে টাকার মূল্য (purchasing power) এক তৃতীয়াংশ হইয়া গিয়াছে। বাড়ীভাড়া ও দুধের দাম দিতে কলিকাতাবাসীর প্রাণান্ত। অতি কদর্য্য বাড়ীতে মধ্যবিত্ত গৃহস্থকে বাস করিতে হয়।

যে দু'টী অমূল্য জিনিষের জন্য এখনও ট্যাক্সের বন্দোবস্ত হয় নাই—সেই বাতাস ও আলো, কলিকাতাবাসীদের পক্ষে এক প্রকার দুর্লভ। দিন দিন আমাদের জীবনীশক্তির হ্রাস হইতেছে। যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া সেই জন্য বাঙালী জাতিকে দিন দিন মৃত্যুর পথে লইয়া যাইতেছে। কাল কলিকাতাবাসী একজন ধনী, চিন্তাশীল ও সম্মানিত ব্যক্তি আমাকে একখানি পত্র দিয়াছেন। তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে তিনি লিখিয়াছেন, "বাল্য-বিবাহ, বিলাসিতা, অর্থাভাব এবং বেকার-সমস্যার দরুণ আমরা বিবেকবুদ্ধি সমূলে নষ্ট করিয়া আত্ম-সম্মান হারাইয়াছি—এই চাটুকার জাতির প্রতি জগতের কাহারও শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না।" আফিসে সাহেব সুবার কাছে এত লাঞ্ছনা ও গ্লানি সহ্য করিতে হয় কেন? কারণ, আমরা রোজগার-অক্ষম। একদিন বাড়ী বসিয়া থাকিলে হাঁড়ি চড়ে না। জীবনে স্বাধীনতা থাকিলে, স্বাবলম্বনের ভাবকে জাগ্রত করা যায়—মনুষ্যত্বের বিকাশ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করা যায়। কিন্তু একবার স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণের বোঝা ঘাড়ে চাপিলে, স্বাবলম্বন হারাইয়া যায়—আত্মপ্রচেষ্টার অবসর কমিয়া যায়। এখানে অনেক যুবক উপস্থিত আছেন, যাহারা ইণ্টারমিডিয়েট বা বি, এ, পড়িতে পড়িতে বিবাহ করিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, "কি করব, বাবা ছাড়েন না, মার কষ্ট হয়" ইত্যাদি। বরিশালের অশ্বিনী বাবু বলেছিলেন—বিবাহের সময় বাংলার ছেলেরা মাতৃপিতৃভক্তি দেখাইবার সুবর্ণসুযোগ পায়। আমি বলি, আহা কি সেয়ানা ছেলে! বাপ মা বলিলেই বিবাহ করিবে? লেখা পড়া শিখিয়াছ বা শিখিতেছ—কেন, তুমি কি গরু না ঘোড়া যে ক্রেতাবিক্রেতার মধ্যে দরদস্তুর ঠিক হইলেই গলায় দড়ি দিয়ে হড়্ হড়্ করে টেনে নিয়ে বরের আসনে বসিয়ে দিবে? বিধাতা কি তোমায় কিছুমাত্র বিচারশক্তি দেন নাই। বিবাহের হাটে

নিজেকে বিক্রয় করিতে তোমার কি কুণ্ঠা হয় না—আত্ম-সম্মানের লাঘব হয় না?

কথা এই, আমরা ক্রমাগত মিথ্যার সহিত আপোষ করিয়া আসিতেছি—বুদ্ধি ও বিবেচনাকে অন্ধকার ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছি। যুবকেরা আজকাল বলিয়া থাকেন—বুড়োর দল না মরিলে কিছুই করিতে পারিতেছি না—যত অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে এই সব old fools। আমি জিজ্ঞাসা করি, আচ্ছা, বুড়োর দল যদি একদিনে একই সময়ে গঙ্গাযাত্রা করে, তবে কি যুবার দল তাদের স্থলাভিষিক্ত হইয়া ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জাতির অন্ধ-সংস্কার ও সামাজিক ব্যাধি দূর করিয়া দিতে সমর্থ হইবেন? বুড়োর দলকে বাধা না দিয়া বরং তাহাদের কথামত চলিয়া, বাল্য-বিবাহ করিয়া বা নিজ পরিবারের মেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষার বন্দোবস্ত না করিয়া যুবার দল জ্ঞানকৃত পাপ করিতেছেন। এ বিষয়ে বৃদ্ধ ও যুবার মধ্যে মনোবৃত্তির ত কোন প্রভেদই দেখি না; মনে হয় কার্য্যে ও চিন্তায় প্রত্যেক যুবাই এক একজন, ছোটখাট বৃদ্ধের মতই রক্ষণশীল। যুবকেরা কি বুঝিতে পারেন না যে এক-জন, অশিক্ষিতাকে বিবাহ করিয়া তাঁহারা যে অবিবেচনার প্রশ্রয় দেন তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ, কুসংস্কার ব্যাধি ও দুর্নীতিগুলি অন্ততঃ আর এক পুরুষ ধরিয়া সমাজদেহকে স্বাস্থ্যহীন ও দুর্ব্বল করিয়া রাখিবে? তোমার অবিবেচনার জন্য তুমি দেশের শত্রু হইলে—নিজেরও শত্রুতা সাধন করিলে! তোমার জ্ঞানকৃত পাপের জন্য, তোমার মনের অসুস্থতা ও দুর্ব্বলতার দরুণ, তোমার সমাজ-সংস্কারের চেষ্টার অভাবে, কদর্য্য দুর্নীতি ও পাপাচারগুলিকে সমাজের বুকের উপর মৌরসীপাট্টা দিয়া বসবাস করিবার সুবিধা দিলে!

জাপান আজ ৫০ বৎসরের মধ্যে কি প্রবল শক্তিসম্পন্ন হয়েছে!

সে ইংরাজ, আমেরিকাকে চোখ রাঙিয়ে কথা বলে। কিন্তু আমাদের স্থান কোথায়? আমরা যে এখনও নীচে পড়িয়া আছি তাহার একটা কারণ আত্মপ্রবঞ্চনা ও ব্যবসাদারী। আমাদের দ্বিধাবিভক্ত জীবনের বাইরের দৃশ্য যেমন সুন্দর, ভিতরের দৃশ্য তেমনি কুৎসিৎ। বাইরে—দেশোদ্ধার, সমাজ-সংস্কার, বিধবা বিবাহ, জাতি-ভেদ রহিত, ছুৎমার্গ পরিহার, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রভৃতির আদর্শ লইয়া বক্তৃতা করিতে করিতে আকাশ বাতাস কম্পিত করি—আর ভিতরে, উত্তর-রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বঙ্গজ, কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, ২৬ পর্য্যা, গঙ্গাস্নানের পুণ্যফল, একাদশীতে বিধবার নিরম্বু উপবাস ইত্যাদি অযৌক্তিক কপটাচারের প্রশ্রয় দিই।

ছেলে স্কুলে মাষ্টার মহাশয়ের নিকট শিখিয়া আসিল যে চন্দ্রের উপর পৃথিবীর ছায়াপাতে চন্দ্রগ্রহণ হয়। বাড়ীতে আসিয়া শুনিল, দিদিমা বলিতেছেন, রাহুদৈত্য চন্দ্রকে গ্রাস করে বলিয়া চন্দ্রগ্রহণ হয়—গ্রহণের সময় হাঁড়ি ফেলিতে হয়—কিছু খাইতে নাই—স্নান করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়—ইত্যাদি। দিদিমা এক কথাতেই ছেলের যুক্তিতর্ক ঠাণ্ডা করিয়া দিলেন। বাঙালী ছাত্রের গোড়ার শিক্ষা এই প্রকার সুতরাং তাহার ভবিষ্যৎ জীবন যে দ্বিধা-বিভক্ত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

বাঙালী জাতি ভারতবর্ষের আদর্শস্থানীয় বলিয়া আমরা গর্ব্ব করিয়া থাকি এবং মহামতি গোখেলের সার্টিফিকেট ('What Bengal thinks to-day, India thinks to-morrow') জাহির করিয়া আমাদের কথার সমর্থন করি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই কথা এক সময় খাটিত, আজকাল খাটে না। সমাজ সংস্কার বিষয়ে একদিন বাঙালী অগ্রণী ছিল—আজ অন্যান্য দেশের তুলনায় পিছাইয়া পড়িতেছে।

কংগ্রেসের একজন নেতা, পরলোকগত পরমেশ্বর পিলে—"Representative Indians" নামে একখানা বই লিখেছেন। তাহাতে তিনি রাজা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতির জীবনী আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন, সমাজ-সংস্কারকের জন্ম বাংলাদেশেই হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান বাঙ্গালী জীবনের দৈনন্দিন ইতিহাস ও কার্য্যপদ্ধতি আলোচনা করিলে মনে হয় সমাজ সংস্কার বাংলাদেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে। মনে ভাবুন—পর্দ্দাপ্রথা। ইহা ত মুসলমানদিগের নিকট হইতে ধার করা—ইহা হিন্দু ধর্ম্ম বা সমাজের সনাতন প্রথা নয়। দাক্ষিণাত্য, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর প্রভৃতি স্থানে—পর্দ্দাপ্রথা নাই বলিলেই হয়। এই সমস্ত দেশের উচ্চ ও সদ্বংশজাত মহিলারা স্বচ্ছন্দ-চিত্তে দলে দলে রাস্তায় ভ্রমণ করেন। প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে বোম্বাই নগরে অবস্থিতি কালে সমুদ্রতীরে সন্ধ্যার পর বেড়াইতে গিয়া দেখি, সেখানে মহিলারা অবাধে হাস্যালাপ করিতে করিতে সমুদ্রের বায়ু সেবন করিতেছেন। মান্দ্রাজে মহিলাদের কলেজ সমুদ্রের তীরে—এমন কি একটা প্রাচীর পর্য্যন্ত নাই। এই স্থানে অনেক গোঁড়াহিন্দুঘরের মেয়েরা লেখাপড়া শিখিয়া থাকেন—আর কলিকাতার মহিলারা বদ্ধ-বায়ু ও অন্ধকার ঘরের কোণে রাতদিন থাকিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া থাকেন। অসুস্থতার দরুণ কেহ কেহ কদাচিত মাঠের দিকে বেড়াইতে যান সত্য কিন্তু তাহাও সন্ধ্যার পর—নির্জ্জন রাস্তার ধারে এবং আত সঙ্কুচিত ভাবে। আবরু বিষয়ে আমাদের গোঁড়ামি অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অনেক বেশী।

বিদ্যাসাগর মহাশয় দেশের জন্য আজীবন শক্তি, সামর্থ্য ও ধন উৎসর্গ করিলেন—আমরা বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর দিনে তাঁহাকে স্মরণ করি বটে কিন্তু তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রতকে কি আমরা প্রতিদিন

পদাঘাতে ডুবাইয়া দিই না? আড়াই কোটী বাঙালী হিন্দুর মধ্যে কয় জন বিধবাবিবাহে অগ্রণী। গত বৎসর পাঞ্জাবে ৮৭৫টী বিধবা-বিবাহ হইয়াছে। সার গঙ্গারাম তাঁহার জীবনের অর্জ্জিত অর্থ বিধবা-বিবাহ প্রচারকল্পে ও অন্যান্য সামাজিক সংস্কার কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন। আর বাংলাদেশে একজন বিধবার বিবাহ হইলে, সেই সংবাদ খবরের কাগজে ছাপা হয়, যেন কত বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার। অনেক সময় পুরোহিতেরা বিধবা বিবাহে তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন না। সম্প্রতি কুমিল্লায় এইরূপ একটা ঘটনা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ পাওয়া গেল না দেখিয়া প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও দাতা মহেশ ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"আমি ত এক সময় পৌরোহিত্য করিয়াছি—কেহ না আসে আমিই বিবাহ দিব," এবং দিলেনও।

নৈতিক জীবন সুস্থ ও সবল থাকিলে সমাজের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে—সমাজের অধঃপতন হয় নৈতিক বলের অভাবে। ইতিহাসই ইহার প্রমাণ। গ্রীস্ এক সময়ে সভ্যতা, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্যে আদর্শ ছিল। যে দেশে সক্রেটীস, আরিষ্টটল্, প্লেতো, হোমর প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—সেই গ্রীস্ কি জন্যে রোমের পদানত হইল? একজন চিন্তাশীল লেখক কারণ দেখাইতেছেন—

"The immediate cause of the decline of a society in the order of morals is a decline in the quantity of its conscience, a deadening of its moral sensitiveness, and not a depravation of its theoretical ethics. The Greeks became corrupt and enfeebled, not for lack of ethical science, but through the decay in the numbers of those who were actually alive to the reality and force of

ethical obligations"—Morley's *Compromise.* আমাদের দশাও তাই। হিন্দুসাম্রাজ্যের অধঃপতনের কারণ বিবেকশক্তি ও নৈতিক বলের অভাব। আমরা আজকাল খুব শাস্ত্রবচন আওড়াইয়া থাকি। অতীত যুগের কীর্ত্তি ও সভ্যতা, শিল্প ও উৎকর্ষতা, সাহিত্য ও দর্শন, বেদ ও বিজ্ঞান, শৌর্য্য ও বীর্য্যের জয়গান করিয়া নিজেদের দোষ ও দুর্ব্বলতা ঢাকিবার চেষ্টা করি। একবার বেথুন কলেজের পুরস্কার বিতরণী সভায় আমাদের দেশের একজন গণ্যমান্য নেতা (গোঁড়া হিন্দুও বটে) ও উচ্চ-পদস্থ লোক, লাটসাহেবের সম্মুখে বক্তৃতা দিতে দিতে বলিয়াছিলেন, আমাদের গার্গী, মৈত্রেয়ী ছিল—খণা, লীলাবতী ছিল—এই ছিল, সেই ছিল—ইত্যাদি। কিন্তু তাঁহার বাড়ীতে 'অষ্টমবর্ষে ভবেৎ গৌরী'। বিদেশীর কাছে বাহবা লইবার জন্য ভারতের অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুলিয়া থাকি, কিন্তু গৃহিণীর রাজ্যে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই নূতন মানুষ হইয়া যাই।

মরাজাতি ও জীবন্ত জাতিতে কত প্রভেদ দেখুন। চীন খুব রক্ষণশীল জাতি—কিন্তু আমাদের মত বিপদ তাহাদের নাই, তাহাদের মধ্যে ধর্ম্ম ও সাম্প্রদায়িক বিভিন্নতা নাই। আমার মনে আছে, ১৫।১৬ বৎসর আগে যখন চীনের সহিত জাপানের যুদ্ধের সূচনা হয় তখন দশ হাজার চীন রমণী ক্যান্টনে সভা করিয়া প্রস্তাব করিলেন যে তাঁহারা জাপানী মাল বয়কট করিবেন। এসব কি আমাদের দেশে সম্ভব? সান্ ইয়াট্ সেন্ সাধারণতন্ত্র স্থাপন করিয়া ঘোষণা করিলেন—টিকি কাটিতে হইবে। তখন কালিফর্নিয়া, মালয়, ব্রহ্মদেশ, চীনদেশ প্রভৃতি স্থানে যেখানে যত চীনা ছিল সকলেই শিখা ছেদন করিল। এমন কি বেণ্টিক ষ্ট্রীটের জুতাব্যবসায়ী চীনারা পর্য্যন্ত একটু ইতস্ততঃ করিল না। যেমন একটী বৈদ্যুতিক বোতাম টিপিলে এক সঙ্গে শত শত আলো জ্বলিয়া উঠে

তেমনি চীনারা একদিনে টিকি কাটিয়া ফেলিল—বলিল, টিকি মাঞ্চুদিগের প্রবর্ত্তিত দাসত্বের নিদর্শন—আজ মাঞ্চুরাজতন্ত্রের অবসান। আর আমরা সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের দোহাই দিয়া টিকির গোড়ায় তেল ঢালিতেছি—এবং তাহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও দিতে আরম্ভ করিয়াছি। আর একটা জীবন্ত জাতি এঙ্গোরার দিকে চেয়ে দেখুন—কি প্রবলবেগে তাহারা উঠিতেছে। কপট দেশাচার, ভণ্ডামি পর্দ্দাপ্রথা দূর করিতেছে। একটা নূতন ভাবের একটা জাগরণের নেশায় তাহারা উন্নতির দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে।

যুবকেরাই জাতির আশাভরসাস্থল—দেশসেবার পুরোহিত। তাহারাই এগিয়ে যাবে—কিন্তু তাহারাই অনেক সময় পিছাইয়া যায়। কথা হইতেছে, কে আগে যাবে। সকলেই বলেন, আমি আগে যাব কেন? যাইতে হয় ত এক সঙ্গেই যাইব, কাজ করিতে হয় ত একসঙ্গে করিব। 'দশে মিলি' করি কাজ, হারি জিতি নাই লাজ'।

ন গণস্যাগ্রতোগচ্ছেৎ সিদ্ধে কার্য্যে সমং ফলং
যদি কার্য্যে বিপত্তি স্যাৎ মুখরস্তত্র হন্যতে।

কিন্তু মনে ভাবুন গ্রামে একটা বাঘ আসিয়া খুব অনিষ্ট করিতেছে। কেহই এগুতে সাহস করিতেছে না। তখন এমন লোক এক একজন থাকেন যাঁহারা বন্দুক বা লাঠি সড়কি লইয়া বাঘ মারিতে অগ্রসর হয়েন। তাঁহারা বলেন, তোমরা আসিতে হয়, এস। দেখাদেখি আরও পাঁচ জন অগ্রসর হয়। এই রকম ভাবে এগুতে হবে—দেশের সব লোক অনুসরণ না করুক অন্ততঃ পাঁচ জনও করিবে। না এগুলে রক্ষা নাই—বাঁচিবার অন্য পথ নাই। কার্লাইল্ বলেছেন, "Every new opinion, at its starting is precisely in a minority of one. In one man's head alone, there it dwells as yet. One man alone of the whole world believes it, there is one

man against all men" অন্যত্র, "If he has to ask at every turn the world's suffrage ; if he cannot dispense with the world's suffrage, and make his own suffrage serve, he is a poor eye-servant ; the work committed to him will be *mis*-done. Every such man is a daily contributor to the inevitable downfall."—*Hero-worship.*

১৯০৬ সালে 'স্বদেশী' আন্দোলনের সময় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে বাঙালী যুবক নিজের স্বার্থের জন্য নয়, যশের জন্য নয়, দেশোদ্ধার হইবে এই ধারণার উপর কার্য্য করিয়া অম্লানবদনে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিতে শিখিয়াছে—কিন্তু সমাজ-সংস্কার কার্য্যে, বিধবা-বিবাহ করিতে লোক পাওয়া যায় না—ইহার কারণ কি ? তিনি বলিলেন, বাঙালী ভাবপ্রবণ জাতি—হুজুগের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া মৃত্যুর সম্মুখীন হইতেও ভীত হয় না ; কিন্তু আজীবন সামাজিক নির্য্যাতন সহ্য করিতে অসীম আত্মত্যাগের প্রয়োজন—অবিচলিত সাহসের আবশ্যক। প্রকৃত বীর কে ? যুদ্ধক্ষেত্রে কামানের সম্মুখে যে বুক ফুলাইয়া এগিয়ে যায় সে বীরপুরুষ বটে, কিন্তু যাঁহারা সমাজকে টানিয়া তুলিতে গিয়া—সমাজসংস্কার করিতে গিয়া—বিবেক-বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিতে গিয়া, আজীবন সমাজের অত্যাচার ও অবিচার সহ্য করেন, তাঁহাদের বীরত্ব অতুলনীয়, যদিও সাধারণের চক্ষে এই বীরত্বের সম্মান অনুভূত হয় না। বিখ্যাত দার্শনিক এমার্সন্ এই মতটী সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন। আমাদের আশুবাবুর (যাঁহার অকাল মৃত্যুতে সমস্ত বাংলা আজ শোকসন্তপ্ত) জীবনচরিতে অনেক ঘটনাবলী বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার চরিত্রের একটা দিক—একটা বড় দিক—একটু অন্তরালে পড়িয়াছে। তিনি জীবনে সমাজ-

সংস্কার বিষয়ে যথেষ্ট নৈতিক সাহস ও ৲.রত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন, বিধবা দুহিতার বিবাহ দিয়াছেন—একটী পুত্রকেও "বর্ণ ব্রাহ্মণের" কন্যার সহিত বিবাহ দিয়াছেন। বিধাতা এক এক জনকে এমন প্রেরণা দেন যে তাঁহারা কাজ না করিয়া কিছুতেই নিরস্ত হয়েন না। তাঁহারা যেন প্রত্যাদিষ্ট হইয়া কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠেন। তখন যাঁহারা ইতস্ততঃ করিতেছিলেন—লাভ লোকসান বিচার করিতে-ছিলেন—তাঁহারা অনুবর্ত্তী হন। জগতের অধিকাংশই গড্ডলিকাপ্রবাহে গা ভাসাইয়া দেয়। ব্রাহ্ম-সমাজের আদি ইতিহাস যাঁহারা অবগত আছেন তাঁহারা জানেন, শিবনাথ শাস্ত্রী পিতামাতার একমাত্র পুত্রসন্তান, কত আদরের জিনিষ ছিলেন—তিনি যখন ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন তখন বাপমায়ের বুকে বাজ পড়িল। কিন্তু শিবনাথ যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়া ছিলেন তাহা হইতে বিচলিত হইলেন না। ব্রাহ্মসমাজের পরলোকগত নগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি যদি হিন্দু সমাজে থাকিতেন তবে লাভবান হইতেন—ভোগ-বিলাস ও বিভবের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিতেন। কিন্তু কি নির্য্যাতনই তাঁহারা সহ্য করিয়াছেন, তবু কর্ত্তব্য-পথ হইতে বিচলিত হয়েন নাই। বাংলা দেশে অনেক পথপ্রদর্শক জন্মিয়াছেন—কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য করিতেছি না। স্রোতস্বিনীর গতি রুদ্ধ হইলে উহা যেমন পঙ্কিল হইয়া উঠে ও তাহাতে নানাপ্রকার রোগাণু জন্মায় ও বৃদ্ধি পায়—তেমনই হিন্দুসমাজ এখন পঙ্কিল হইয়া উঠিয়াছে—এত বিষ সমাজদেহে জন্মাইতেছে ও প্রসারিত হইতেছে যে এরূপভাবে আর কিছু দিন চলিলে সমাজের মৃত্যু অনিবার্য্য। হিন্দু-সমাজ বিশিষ্টতা হারাইতেছে—উদারতা হারাইতেছে। উর্ব্বরমস্তিষ্ক-প্রসূত উপর চালাকির জন্য আমাদের মেরুদণ্ড বাঁকা হইয়া পড়িতেছে। মিথ্যার

সহিত আপোষ করিতে করিতে বিবেক-বুদ্ধি ও সাহস হারাইয়াছি—সমাজের ভিতর ভণ্ডামি ও কপটাচরণের অন্তঃসলিলা প্রবাহিত হইবার পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছি। 'স্বরাজ' 'স্বরাজ' বলিয়া চীৎকার করি—বলি, স্বরাজের উপর আমাদের জন্মগত অধিকার। কিন্তু আমাদের সমাজ বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই—সমাজের রীতিনীতির পনের আনাই ফাঁকি—মানুষের গড়া মানুষ-মারা কল। আমরা চাই রাজনীতিক অধিকার লাভ করিতে—কিন্তু যাহারা আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া আছে, আমরা যাহাদের উন্নতিপথের সহায়ক, যাহাদের সহিত জাতীয় উন্নতি ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত—তাহাদিগকে আমরা অবহেলা করিয়া আসিতেছি। ১৯১৮ সালে, **Indian Social Conference**এর সভাপতির অভিভাষণে বলিয়াছিলাম, **"It is the women of India who really belong to the depressed class"**—আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরাই প্রকৃতপক্ষে অনুন্নত জাতিভুক্ত। মাতৃজাতির অজ্ঞানতা দূর করিবার মত সাহস ও প্রচেষ্টা আমাদের নাই—কোন্ মুখে আমরা স্বরাজ লাভের যোগ্য বলিয়া মনে করি?

যুবকেরাই জাতির প্রাণ—জাতির জীবনীশক্তি। তাই আশা হয় বাঙালী মস্তিষ্কের অপব্যবহার হইবে না। যে দেশে বিধির বিধানে মহাপুরুষেরা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, সেই দেশের যুবকেরা মহাপুরুষদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ত্যাগ ও বীরত্বের মহিমায় বাঙালী জাতিকে উজ্জ্বল করুন—ঈশ্বরের শক্তি যেন তাঁহাদের জীবনের পথে চিরসহায় হয়।

৯

সাধনা ও সিদ্ধি

কথারম্ভে মহাত্মা রামমোহন রায়ের পবিত্র নাম গ্রহণ করি,—যাঁর সাধনায় বর্ত্তমান ভারতের সকল প্রচেষ্টার সিদ্ধির বীজ উপ্ত হয়েছিল; যিনি নব্য ভারতের স্রষ্টিকর্ত্তা; অজ্ঞানকুসংস্কারাচ্ছন্ন অমানিশায় যিনি জ্ঞানের বর্ত্তিকা হস্তে জীবনের সকল পথে অগ্রসর হয়েছিলেন; ১০০ বৎসরেরও পূর্ব্বে যিনি জীবনবাঁশীতে জাগরণের সুর তুলে সুপ্ত দেশবাসীকে নূতন পথের পথিক হ'তে আহ্বান করেছিলেন; ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতিক্ষেত্রে যিনি সর্ব্বপ্রথম সংস্কার-চেষ্টা আরম্ভ করেছিলেন; আধুনিক বঙ্গভাষার একজন জন্মদাতা প্রাতঃস্মরণীয় সেই রাজা রামমোহন রায়! রামমোহনের সিদ্ধির মূলে ছিল তাঁর আজীবন সাধনা। সাধনা বিনা সিদ্ধি নাই, এই কথাই আজ আমি বাঙ্গালী যুবককে বড় আশা করে' বল্‌তে এসেছি। আজ এই জীবনসন্ধ্যায় জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতার ফলে আমি শিখেছি ওই একটা পরম সত্য—সাধনা বিনা সিদ্ধি নাই।

আজ বাঙালীকে এই পরম সত্যটি গ্রহণ করতে হবে—শুধু মুখস্থ করা নয়, শুধু স্বীকার করা নয়, একবারে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে গ্রহণ করে' প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। মহামতি গোখলে বলেছেন—**What Bengal thinks to-day, the whole of India thinks to-morrow**—বাঙালীর মস্তিষ্কপ্রসূত চিন্তা সারা ভারত গ্রহণ করে। রামমোহনের সময় থেকে মস্তিষ্কচালনার ক্ষেত্রে বাঙালী অগ্রণী বলে' গণ্য হয়ে এসেছে—বাঙ্‌লার কোলে অনেক ধর্ম্মসংস্কারক,

সমাজসংস্কারক; সুলেখক, বৈজ্ঞানিক, দেশবিশ্রুত বাগ্মী, জন্মগ্রহণ করেছেন—বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র প্রভৃতি এক এক ক্ষেত্রে এক একজন দিক্‌পাল বাঙ্‌লার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়িয়ে দিয়েছেন। বাঙালী আগুয়ান্ হয়ে চলেছে স্বীকার করি—তবু আজ একবার বাঙালী যুবককে কঠোর আত্মপরীক্ষা ক'রে দেখ্‌তে হবে, তার চরিত্রের গলদ কোথায়; অন্তরের কোন্ বাধাটা তার চলার পথে পথ আগ্‌লে দাঁড়িয়েছে।

সক্রেটিস্ বলেছেন, যারা আঠার বৎসর পার হয়েছে, তাদের উপদেশ দিয়ে কোন ফল নেই। তাই আমার বক্তব্য আজ দেশের যুবকবৃন্দের কাছে—যাঁরা আমাদের ভবিষ্যতের আশা—আমাদের হৃদয়ের ধন। এই সম্পর্কে আর এক কথা এই যে "ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্", এটা আমার কাছে নিতান্তই বাজে কথা;—আমি বলি "ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্" অপ্রিয় সত্য বল্‌তে হবে—দেশবাসীকে প্রীতি নিবেদন করে' খুব স্পষ্টভাবেই তাদের ভুল ভ্রান্তি দেখিয়ে দিতে হবে। পত্রাবরণে ভগ্ন স্থান লুকিয়ে রাখ্‌লে দুর্গ-প্রাচীরও সহজেই ভূমিসাৎ হয়ে যায়। ঢাক্‌লে অভাব ঘোচে না; অভাবকে সকল সময়েই মোচন কর্‌তে হয়;—আর তার জন্যে চাই কঠোর আত্মপরীক্ষা, আর তীব্র বেগবতী ইচ্ছাশক্তি।

দুই বৎসর পূর্ব্বে মান্দ্রাজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার তাঁর বক্তৃতায় একস্থলে কতকগুলি মূল্যবান্ তথ্যপূর্ণ কথা বলেছিলেন। কথাগুলি এই, যে, অনেক কষ্ট স্বীকার ক'রে এবং যথেষ্ট ধৈর্য্যসহকারে তিনি মান্দ্রাজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের আঠার হাজার গ্রাজুয়েটের জীবনের ইতিহাস সংগ্রহ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ৩৭০০ জন সর্‌কারের চাকরী করেছেন, তারও অধিক ইস্কুল

মাষ্টার হয়েছেন, আর ৭৬৫ জন ডাক্তার হয়ে বাহির হয়েছেন। এই তালিকা দৃষ্টে এঁরা ভবিষ্যৎ জীবনে কি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা অতি সহজেই অনুমেয়। মান্দ্রাজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীগণ জীবনের একটানা বাঁধা রাস্তা ছেড়ে জ্ঞানজগতে নব নব পথের সন্ধানে বের হ'ন নি। আর মান্দ্রাজী গ্রাজুয়েট সম্বন্ধে যা সত্য, বাঙালী গ্রাজুয়েট সম্বন্ধে সেই কথাই সর্ব্বোতোভাবে প্রযুজ্য। বাঙ্গলা দেশেও ঐ—একই দশা—কেরাণী, মাষ্টার, ডাক্তার আর উকীল। আর সেই গলাধঃকরণ, উদ্গিরণ, পরীক্ষাপাশ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ, তারপর মা সরস্বতীর সঙ্গে সেলাম্ আলেকম্। মুন্সেফ, ডেপুটী, জজ,—তা মান্দ্রাজী গ্রাজুয়েট বাঙালীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হ'টে গিয়েছেন, কিন্তু সবাই বাঁধা ওই চাকরীর ঘানীতে আর সবার অন্তরের কথা হচ্ছে—

"মা আমায় ঘুরাবি কত—কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত।"

আবার এই গ্রাজুয়েট উৎপন্ন কর্বার শক্তি মান্দ্রাজের চেয়ে কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই বেশী। এই ব্যাপারে কল্‌কাতা সবার অগ্রণী—কিন্তু হেসো না, এ-সব ঘরের কথা বাইরে না যায়। অসহযোগ, সহযোগ স্বীকার করি না; এবার ২০,০০০ ছেলে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেবে আর শতকরা অন্ততঃ ৮০ জন পাশ হবে। কিন্তু একজন উপাধিধারী কি প্রকার কূপমণ্ডূক তা চিন্তা কর্‌লে মন বিষাদিত হয়। বর্ত্তমান প্রথানুসারে একজন এম-এসসি কিম্বা এম-এ'র ভূগোলের কোন জ্ঞান না থাক্‌লেও চল্‌তে পারে। ইতিহাস পাঠও ইচ্ছাধীন। আব্রাহাম লিঙ্কল্‌ন্, ফ্রাঙ্ক্‌লিন প্রভৃতির নাম শোনেন নি এমন গ্রাজুয়েটও অনেক আছেন। ভূগোল চাই না, ইতিহাস চাই না, দেশের কথা চাই না, পৃথিবীর কথা চাই না,—শুধু পাশ করে' যাও—ম্যাট্রিক, আই-এ, বি-এ, ফার্ষ্টক্লাস,

সরেস এম্-এ। উচ্চশিক্ষিত যুবক হয়ত ম্যাট্‌সিনীর নাম শুনেছেন—গ্যারিবাল্‌ডিকেও হয়ত মস্ত একটা বীর ব'লে জানেন কিন্তু কাবুলের কথা জিজ্ঞাসা করলেই মাথা চুল্‌কাতে আরম্ভ কর্‌বেন। যদি প্রশ্ন করি আমেরিকায় অন্তর্বিবাদ (Civil War) কেন হ'ল—এ বিপ্লবে কে কে রথী ছিলেন—লিঙ্কল্‌ন্, জ্যাক্‌সন্ কে, কোন্ পক্ষ জয়ী হ'ল? বিরোধের ফলাফলে দেশের লাভ লোক্‌সান কি হ'ল? তাহলেই ফিলসফির ফার্ষ্টক্লাস এম্-এ একেবারে অবাক্ হ'য়ে হাঁ ক'রে মুখের দিকে তাকিয়ে থাক্‌বেন ;—এ-সব আবার কি ? প্রফেসারের কোনো নোটে ত এ-সব লাল নীল সবুজ পেন্সিলে দাগ দিয়ে কস্মিন্ কালে পাঠ করি নি।

চতুর্থবার বিলাত গিয়ে গতবৎসর এই সময় আমি দেশে ফিরে আসি। সেখানে লণ্ডন, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, বার্‌মিংহাম্, লীড্‌স্, এডিন্‌বরা প্রভৃতি স্থানের বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেছি। অনেক-স্থলে এক একটা কলেজ এক একটা বিশ্ববিদ্যালয়। নানা বিদ্যানুশীলনের জন্য বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে আর প্রত্যেক বিভাগেই পাঁচ ছয় জন ছাত্র সেই বিশেষ বিদ্যা সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা কর্‌ছেন। আর পর পর এমন বড় লোক ঐসকল বিদ্যামন্দির থেকে বাহির হয়ে আস্‌ছেন, যা ভাব্‌লে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়। এঁদের অনেকে একটা বিশেষ বিষয়ের গবেষণার নেশায় ভরপূর হয়ে সারা জীবন উৎসর্গ করে' দিয়েছেন। শ্রেষ্ঠ মনীষীগণ একের শূন্যস্থান অপরে পূরণ কর্‌ছেন। আর এই-সকল বিষয়ের বৈচিত্র্যই বা কি! একখানা "নেচার" তুলে নিয়ে চোখ বুজে তার যে-কোন স্থান খুলে য়ুরোপে অনুশীলিত কত রকম বিদ্যার কত রকম রোজনাম্‌চা যে দেখ্‌তে পাওয়া যায় ; সেখানে কতশত অনুসন্ধান-সমিতি, বৈজ্ঞানিক,

সাহিত্যিক, রাষ্ট্রনৈতিক, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতিতে মানবের জ্ঞানভাণ্ডার নিয়ত পরিপুষ্ট কর্‌ছে। এই ইউরোপের সব দেশে স্বাধীন চিন্তার স্রোত নিয়ত মানবের জীবনকে কত উচ্চতর স্তরে নিয়ে যাচ্ছে, যে তার আর শেষ নেই। কত শত বিভিন্ন ব্যাপার নিয়ে কত শত প্রচেষ্টা, কত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, কত একনিষ্ঠ জ্ঞানসাধকের ঐকান্তিক চেষ্টা ঐ-সব দেশে বিদ্যার্থীগণের তথা জনসাধারণের চিত্তবৃত্তিকে সদা জাগ্রত করে' রেখে দিয়েছে। ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে মিশর, আসীরিয়া, বাবিলন প্রভৃতি দেশে লোকে কিরূপ জীবনযাপন করেছিল সেই-সকল প্রত্নতত্ত্বের বিচারের ফলে য়ুরোপীয় সুধীবৃন্দ জ্ঞান-রাজ্যের এক একটা নূতন দিক উন্মুক্ত করে' দিয়েছেন যার নাম হয়েছে—ইজিপ্‌টলজি, আসিরিওলজি ইত্যাদি। লেয়ার্ড, রলিন্‌সন, পেট্রি (Layard, Rawlinson, Petrie) প্রভৃতি এই-সকল বিদ্যার হোতা।

তারপর প্রাচ্যের প্রান্তে এসে দেখা যাক্। জাপানে তোকিও, কোবে, কিয়োতো, প্রভৃতি বিখ্যাত নগরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সৌষ্ঠবে ও জ্ঞানানুশীলনে সর্ব্বাংশে য়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেবার বিলাতগামী জাহাজে আমার সঙ্গে প্রায় দুই শত ভারতবাসী ছাত্র ইউরোপে চলেছিলেন। এদের মধ্যে দুই এক জন ছাড়া সবাই কেমন করে' ফাঁকি দিয়ে একটি বিলাতী সস্তা ডিগ্রি এনে দেশী ডিগ্রির উপর টেক্কা দিবেন সমস্ত সময় সেই চিন্তা ও পরামর্শ কর্‌ছিলেন। আমাদের দেশের যে-সব ছাত্র ম্যাট্রিক-বা আই-এ, আই-এসসি প্রভৃতি পাশ করে' বিলাত চলে' যান, দেখ্‌তে পাওয়া যায় জ্ঞানান্বেষণ তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। তাঁদের চিন্তা, কি করে' শীঘ্র একটা বিলাতী ডিগ্রী নিয়ে এসে দেশবাসীর চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে দেবেন। জাপানী ছাত্র আপন

দেশে কোন একটি বিষয়ে যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ কর্‌বার পর য়ুরোপ যান এবং সেখানে সেই বিশেষ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ মহামহোপাধ্যায়ের নিকট অবস্থান করে' সেই বিষয়টিই শিক্ষা করেন। আর আমাদের ছাত্রগণ অনেকস্থলে ভিটে মাটী বেচে, কেউ বা বড়লোকের জামাতা হবার লোভে ডিগ্রী লাভের আশায় মুগ্ধ হ'য়ে বিলাত যান। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই যে এরূপ ঘটে তা বল্‌ছি না। এর ব্যতিক্রম আছে নিশ্চয়ই। আমাদের ছাত্র জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ও মেঘনাদ সাহা বিদেশে একবার জাপানী ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনারা কি লণ্ডনের ডিগ্রী নিতে এসেছেন্?" তাঁরা জাতীয় গর্ব্বে অনুপ্রাণিত হয়ে বলেন, তাঁরা নিজেদের দেশের ডিগ্রীকে কোন প্রকারে হীন জ্ঞান করেন না। আমাদের দেশেরও উক্ত শ্রীমান্‌দ্বয় বিলাতি ডিগ্রীর মোহে স্বাদেশিকতাকে খর্ব্ব করেন নি, এ পরম গৌরবের কথা। বাস্তবিক ঐ-সব জাপানী ছাত্র এসেছেন, স্যর জোসেফ টম্‌সন, রাদারফোর্ড প্রভৃতি বিজ্ঞানবিশারদদের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জ্জন কর্‌বার জন্য, ডিগ্রীলাভের জন্য নয়।

কিন্তু আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে সেই ১৮৫৭ সাল থেকে আজ পর্য্যন্ত যে হাজার হাজার গ্রাজুয়েট উৎপন্ন হয়েছে তাদের মধ্যে ক'জন পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারে নিজের কিছু দিতে পেরেছে যা একেবারে মৌলিক ও নূতন, যাতে মানবের জ্ঞান পুষ্টিলাভ ক'রে বৃদ্ধি পেয়েছে। কেহই যে কিছু দেন নি এমন কথা বল্‌ছি না। ব্যতিক্রম ত আছেই। কিন্তু তাঁদের আজীবন সাধনার ভিতরের কথা কে বুঝ্‌বার চেষ্টা করে—কে তাঁদের অহেতুকী জ্ঞানতৃষ্ণার যথার্থ সম্মান করতে পারে? এখানে যে সব ছাত্রই ডিগ্রী চাচ্ছেন আর চাকরী কর্‌ছেন! কোন বিষয়ে কৃতিত্ব ত কেউ দেখাতে

পার্‌লেন না। অধ্যাপক যদুনাথ সরকার দেশের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক। আপন রোজ্‌গারের প্রধান অংশ পুরাতন পার্‌সী পুঁথি ক্রয় কর্‌তে ব্যয় করেছেন, পাটনা খোদাবক্‌স্ লাইব্রেরীতে বৎসরের পর বৎসর 'ধ'রে নিবিষ্টভাবে অধ্যয়ন করেছেন। তাই মোগলযুগের ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি আজ Authority বা প্রামাণ্য পণ্ডিত। তাঁর উপর আর কেউ কথা বল্‌তে পারেন না, এদেশেও নয়, য়ুরোপেও নয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীই এর পাণ্ডিত্যের কারণ নয়—এই কৃতিত্বের পশ্চাতে রয়েছে তাঁর জীবনের সাধনা।

কি কুক্ষণেই শিক্ষিত বাঙালীর চাকরীর দিকে ঝোঁক পড়েছিল। সেই পুরাতন হিন্দুকলেজের ছাত্র হ'তে আরম্ভ ক'রে সকলেই আজ চাকরীর উমেদার। হিন্দু কলেজের ছেলেরা যারা মাইকেল-রাজনারায়ণের সমপাঠী—তাঁরা গ্রাজুয়েট হ'লেই প্রথম লর্ড হার্ডিঞ্জের গবর্ণমেণ্ট তাঁদের ডেকে বড় বড় চাক্‌রী দিতেন। এই সময় থেকে মতিগতি যে চাকরীর দিকে গেল সে আর ফির্‌লো না। বাঙ্‌লার ধনে ইংরেজ-মাড়োয়ারীর সিন্দুক বোঝাই হ'ল, আর বাঙ্‌লার গোপালেরা শান্ত শিষ্টভাবে ডিগ্রীলাভের সাধনা কর্‌তে লাগ্‌লেন। সাধনা—ডিগ্রী, তাই সিদ্ধি—চাকরী!

এইরূপে আদর্শ খাটো হয়ে গেল। তাই গভীর জ্ঞানসাধনা দেশে প্রতিষ্ঠিত হ'ল না। ভাসা-ভাসা জ্ঞানেই বাঙালী যুবক সন্তুষ্ট থাক্‌তে শিখ্‌লেন। মল্লিনাথ, বল্লভ, তারাকুমার, সারদারঞ্জন—এই-সব টীকার সাহায্যে এক সর্গ ভট্টি, বা রঘুবংশ প'ড়েই সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত হলেন, কেউ বা আধ সর্গ প্যারাডাইস-লষ্টের নোট মুখস্থ করে' ইংরেজি সাহিত্য দখল করে' বস্‌লেন। কিন্তু লাইব্রেরী থেকে একখানা বাহিরের বই নিয়ে কেউ পড়ে' দেখ্‌লেন না—যেহেতু

সে পাশ করার কাজেই লাগে না। এখন বিশ্ববিদ্যালয় হতে ভূগোল এক প্রকার নির্ব্বাসিত হয়েছে; ইতিহাসও না পড়্‌লে চলে। বাস্তবিক কি লজ্জা, কি পরিতাপের কথা যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ এম্‌-এ, এম-এস্‌সি গণ অশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত অথবা কুশিক্ষিত। ক্যালেণ্ডারে পাঠ্যপুস্তকের তালিকা অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, হার্‌ভার্ডকেও ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু সারা দুবছর ফুটবল ক্রীকেট খেলেছে ও দেখেছে বলে' আমার এক বন্ধু যখন আপন পুত্রের এম-এ পাশ করা সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়্‌লেন, তখন চতুর পুত্র কয়েক দিনের মধ্যে মেস্‌ থেকে মেসান্তর ঘুরে নোট জোগাড় কর্‌লে এবং পরীক্ষকের মন জুগিয়ে চলে' অবহেলে পাশ করে' ফেলে বাপকে একেবারে তাক্‌ লাগিয়ে দিলে!

তাই বলি সর্ব্বনাশ হয়েছে এই ভাসা-ভাসা জ্ঞানে, আর অতি সস্তা পাশে। ফিস্‌ক্যাল-কমিশনে স্যার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা, ঘনশ্যামদাস বির্‌লা প্রভৃতি বস্‌বেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারে এঁদের নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু ক্যালেণ্ডারে যাঁদের নাম জ্বলজ্বল কর্‌ছে সেই (Cobden Medalist) স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত বাঙালী যুবক ত ঐ অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপারের আলোচনায় আহূত হলেন না। স্যার বিঠলদাস ঠাকর্‌সে বড় বড় কলের মালিক—পরন্তু "গোল্ড মেডেলিষ্ট" নন। টাকা নিয়ে হাতে-কলমে কাজ করেন বলে' মহামতি গোখ্‌লে বজেট-বক্তৃতা প্রস্তুতের কালে তাঁর পরামর্শ বহুমূল্য জ্ঞানে গ্রহণ কর্‌তেন। ভারতবর্ষে রেলওয়ে-কার্‌বার-সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে যাঁর মতামত বহুমূল্য বলে' বিবেচিত হয় তিনি হচ্ছেন ডিগ্রীহীন সাতকড়ি ঘোষ। চিন্তামণি, কালীনাথ রায় প্রমুখ সংবাদপত্র-সম্পাদকগণ অনেকেই ডিগ্রীশূন্য; কিন্তু এঁরা সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন,

রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে যে-সব মূল্যবান কথা লেখেন, বড় বড় ডিগ্রীধারীগণ তা থেকে যথেষ্ট শিক্ষালাভ করতে পারেন।

আমরা নিজেদের আধ্যাত্মিক জাতি বলে' গর্ব্ব করে' থাকি আর য়ুরোপীয়দের জড়বাদী ব'লে গালি দিই। কিন্তু জড়বাদী ওরাই আমাদের দেশের স্থানে স্থানে নানা কুষ্ঠালয়, হাস্‌পাতাল ইত্যাদি স্থাপন করে। ভারতবর্ষে ৭২টি কুষ্ঠালয় আছে, তন্মধ্যে দেওঘরে যোগীন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক স্থাপিত একটি ছাড়া আর সবই তো ওদের। ফাদার ডামিয়েন তাঁর জীবনই তো কুষ্ঠীর সেবায় তিলে তিলে বিলিয়ে দিলেন! আর্ত্তকে কেউ কোলে তুলে নিচ্ছে আবার কেউ বা বল্‌ছে—ওকে ছুঁয়ো না। বাস্তবিক কি বৈচিত্র্য ওদের জীবনে! জান্‌বার, বুঝ্‌বার, পাবার কি দুর্ণিবার চেষ্টা! কেউ হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখরে আরোহণ করবার জন্যে বৎসরের পর বৎসর চেষ্টা করছেন, তার আয়োজনই বা কত; কেউ বা আফ্রিকা মহাদেশের কিলিমেন্‌জেরো পর্ব্বতের চিরতুহিনাচ্ছন্নচূড়ায় কোন্ চিরনূতনকে দেখবার প্রয়াস করছেন। সু-উচ্চ গিরিদেশে শ্বাসরোধ হয়ে কেউ বা প্রাণ হারিয়েছে—তবু দৃক্‌পাত নেই। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন। মেরুসন্নিহিত প্রদেশের প্রাকৃতিক অবস্থা জান্‌বার জন্য ফ্রাঙ্ক্‌লিন, ন্যান্‌সেন, শ্যাক্‌ল্‌টন প্রমুখ অনুসন্ধিৎসু কত অসাধ্য না সাধন করেছেন। মানুষের যা সাধ্য তা এরা করবে, আবার মানুষের যা অসাধ্য তাও এরা করবে। কি বিপুল দুর্দ্দান্ত জীবন! উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিৎ ইংরেজ হুকার বিচিত্র লতাগুল্মের সন্ধানে সিকিম প্রদেশে গিয়ে সেখানে বন্দী হলেন। তাই নিয়ে যুদ্ধই বেধে গেল। যুদ্ধজয়ের পর তিনি মুক্ত হলেন। তাঁর **Flora Indica** বর্ণিত সংগ্রহ বিলাতে কিউ গার্ডেনে (**Kew Garden**) কত যত্নে রক্ষিত

হয়েছে। আবার পশুতত্ত্ববিৎ য়ুরোপীয়ান্ সিংহ বন্য হস্তি প্রভৃতি শ্বাপদ-সঙ্কুল আফ্রিকার জঙ্গলে খাঁচার মধ্যে বাস করে' মাসের পর মাস কাটিয়ে দিচ্ছেন—উদ্দেশ্য গরিলা সিম্‌পাঞ্জী প্রভৃতি বনমানুষের অভ্যাস ও আচরণ জানবেন; তাদের ত ভাষা নেই, তাই সঙ্কেতে তাদের ভাববিনিময় লক্ষ্য কর্‌বেন। এমনি অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারেই তাঁরা সত্যের আবিষ্কার করেন।

জ্যোতির্ব্বিদ্যায় টাইকো ব্রেহী, কেপ্‌লার, গ্যালিলিও, নিউটন, হার্শেলের সম্পর্ক কত নিবিড়, কত গভীর! এত গভীরতা শোণিত-সম্পর্কে কোথায় পাবে! গ্যালিলিও কেপ্‌লার সমসাময়িক ছিলেন। কেপ্‌লারের অভাবে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাবলীর আবিষ্কারের পথ সুগম হত না। কত বিনিদ্র রজনীতে উদার উন্মুক্ত অসীম আকাশের দিকে কি আনন্দে কি আশায় এঁরা চেয়ে থাক্‌তেন! কি অমূল্য রত্ন এঁরা পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডারে দিয়ে গেছেন। এঁদের জ্ঞান-সাধনার মূলে গভীর অভিনিবেশ! একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে এঁরা সাধ্য বস্তুর সন্ধান করেছিলেন, তাই সিদ্ধিলাভ ঘটেছিল। জ্ঞানান্বেষণে নিউটন এমনই তন্ময় হয়ে যেতেন যে আপন আহারের কথাই বিস্মৃত হতেন। একদিন নিউটন গভীর চিন্তায় মগ্ন। ভৃত্য আহার্য্যদ্রব্য সম্মুখে রেখে গেল। তাঁর বন্ধু কৌতুক ক'রে সেইগুলি খেয়ে নিয়ে হাড়গুলি ঢাকা দিয়ে রাখ্‌লেন। ধ্যানভঙ্গের পর আহার কর্‌তে গিয়ে নিউটন দেখ্‌লেন হাড়গুলি প'ড়ে আছে। অতএব পণ্ডিতবর সিদ্ধান্ত কর্‌লেন তাঁর আহার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু অত মনে নেই; তাই পাছে কেউ ঠাট্টা করে এই আশঙ্কায় চারিদিক চেয়ে সেখান থেকে চ'লে গেলেন। কি আপন ভোলা ভাব! এরূপ তন্ময়ত্বের আরও কয়েকটি নিদর্শন দেখাই।

রেনেসাঁস যুগে প্যারিস নগরে হোমারভক্ত প্রোটেষ্টাণ্ট স্কালিগার আপন ঘরে পাঠে নিমগ্ন; এদিকে বাহিরে হত্যাকাণ্ড হয়ে গেল Massacre of St. Bertholomew); কত প্রোটেষ্টাণ্টকে খুন করা হ'ল, কিন্তু তিনি এমনই তন্ময় যে হত্যাকাণ্ডের ব্যাপার তার পরদিন জান্‌লেন। এথেন্সের সৈন্যদলভুক্ত হয়ে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ সক্রেটিস একটানা ২৪ ঘণ্টা নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতেন, তবেই ত দুরূহ তত্ত্বসমূহের মীমাংসা পেতেন। গ্রীকদর্শনের তিনি শ্রেষ্ঠ গুরু। প্লেতো তাঁর শিষ্য। ভাষাতত্ত্ববিদ্ বুদিয়স্‌এর বিবাহদিনে গির্জায় কনে এসেছেন, অন্যান্য বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীও উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু বর কোথায়? বরকে ত খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তখন বরের পাঠগৃহে গিয়ে দেখা গেল তিনি ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় মগ্ন আছেন। যাঁর বিয়ে তাঁর মনে নেই। রোমান্ সৈন্য যখন আর্কিমিডিসকে খুন করতে এসেছে তখন আর্কিমিডিস বল্‌লেন—দাঁড়াও একটু, এ বৃত্তটা নষ্ট ক'রে দিও না, এ প্রমাণটা শেষ করি। বর্ব্বর সৈনিক তাঁকে খুন ক'রে জগতের মহৎ সত্য উদ্‌ঘাটনের পথ হয়ত রুদ্ধ ক'রে দিয়ে গেল। এমনই ক'রে আপনহারা হয়ে সাধনা না করলে কি কেউ কখনও কোন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছে?

এই নিঃস্বার্থ সাধনায় সকলেই মুগ্ধ হয়েছে। 'যেখানে স্বার্থপরতা সেখানেই সঙ্কোচ—স্বার্থপর ক্রোড়পতির কেউ সংবাদ লয় না। কিন্তু তাঁর অর্থ যখন 'জনহিতায়' ব্যয় হয়, তখন তিনি হন শ্রেষ্ঠ ও মান্য। জ্ঞানসাধকের সাধনলব্ধ যা-কিছু তা পৃথিবীর সকলেরই সম্পত্তি। তাই তাঁরা সকলেরই বড় আপনার জন। কিন্তু আমরা নষ্ট হয়েছি সাধনার অভাবে, সঙ্কুচিত হয়েছি স্বার্থপরতার প্রভাবে। তাই বিদ্যাক্ষেত্রে, ব্যবসাক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রেই আমরা হ'টে গিয়ে

পিছনে প'ড়ে গেছি। সর্ব্বনাশকারী পল্লবগ্রাহিতা আমাদের নষ্ট করেছে। ৺প্রতাপ মজুমদার বল্‌তেন "জাপানীরা অপেক্ষাকৃত হাঁদা, বাঙালী অতি বুদ্ধিমান।" সেইজন্যই বাঙালী আজ দুর্দ্দশাগ্রস্ত। আত্মঘাতী উদ্যমহীনতা আমাদিগকে স্বল্পায়াসে কৃতকার্য্যতা লাভ কর্‌তে চেষ্টিত করে। তাই আজ সব ক্ষেত্রেই চাই সাধনা। অন্ন-সমস্যা, বস্ত্রসমস্যা, অর্থসমস্যা, স্বাস্থ্যসমস্যা প্রভৃতি নানাসমস্যায় প'ড়ে আমরা সব রকমে মাটি হয়ে যেতে বসেছি। এখন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহকারে লেগে প'ড়ে থেকে এক একটি সমস্যার মীমাংসা কর্‌তে না পার্‌লে আমাদের আর বাঁচ্‌বার আশা নেই।

আর একটা কথা। আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখ্‌তে হবে চেষ্টামাত্রেই অথবা কিছুদিনের চেষ্টাতেই যে এই সকল কঠিন সমস্যার মীমাংসা হ'য়ে যাবে তা কখনই নয়। সুতরাং কাজ আরম্ভ ক'রেই ফলের আকাঙ্ক্ষা কর্‌লে চল্‌বে না। মনে রাখ্‌তে হবে, প্রয়াসসাধ্য সকল কার্য্যেই করার আনন্দটাই মুখ্য, পাওয়ার আনন্দ নয়; মৃগয়ায় যেমন অন্বেষণেই আমোদ, তেমনি প্রকৃতির গূঢ়রহস্য যাঁরা উদ্‌ঘাটন করেন তাঁদের সেই চেষ্টাতেই অপার আনন্দ। আজ আমাদের তাই এই প্রচেষ্টার আনন্দের আস্বাদ গ্রহণ কর্‌তে হবে। জর্ম্মান দার্শনিক লেসিং সম্বন্ধে একটা কথা আছে যে যদি ঈশ্বর এসে তাঁকে বল্‌তেন—তুমি সত্য চাও না সত্যের সন্ধান চাও, তবে তিনি জবাব দিতেন—আমি সত্যের সন্ধান চাই, কিসে পাব, কেমন করে পাব, এই সে দেখা দেবে, পরক্ষণে আড়ালে লুকোবে; এই খোঁজের খেলার বিপুল আনন্দে আমি ভরপুর হ'য়ে থাকৃতে চাই। এই ত প্রাণবন্তের লক্ষণ; বাস্তবিক আনন্দ প্রাপ্তিতে নয়, অন্বেষণে। আর এই অন্বেষণ বা সাধনা একই কথা।

ধর্ম্মজগতে বুদ্ধ, যীশু, মোহম্মদ, চৈতন্য এঁদের সিদ্ধিলাভের ইতিবৃত্ত

একই। জনকোলাহলের বাহিরে পর্ব্বতে জঙ্গলে, গুহার মধ্যে জীবনের কিয়দংশ সাধনা ক'রে এঁরা ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। অরণ্যে লোকচক্ষুর অন্তরালে বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ গ্রথিত হয়েছে। আবার বুদ্ধদেবেরও অপর নাম এইজন্য "সিদ্ধার্থ"; আমরা অতীতের গর্ব্ব করে' থাকি, কিন্তু অতীতের প্রাণের লক্ষণগুলিকে আপন জীবনে ফুটিয়ে তুল্‌তে চাই না;—অতীতের সিদ্ধির উপর আমাদের লোভটুকু ষোল আনা আছে, কিন্তু তার জীবনব্যাপী কঠোর সাধনার কথা শুনেই আমরা আতঙ্কে মরে' যাই। রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা আজ শতদল-পদ্মের মত বিকশিত হয়েছে। কিন্তু একটির পর একটি করে' এই শতদল ফুটেছে,—এর পিছনে আছে একনিষ্ঠ সাধনা। গোখলে ইস্কুল-মাষ্টার ছিলেন, শ্রীনিবাস শাস্ত্রীও ছিলেন। পরাঞ্জপেও তাই। ৭৫৲ টাকা মাহিনায় গোখলে ফার্‌গুসন কলেজে শিক্ষকতা করেছেন। কিন্তু গোখলে আজ দেশপূজ্য, তার কারণ তিনি দেশসেবার সাধনা করেছিলেন। এই দারিদ্র্যব্রতধারীর বজেট-বক্তৃতায় ব্যবস্থাপক সভায় লাট কর্জ্জন কাঁপ্‌তেন। আর এক প্রাতঃস্মরণীয়ের কথা বলে' আমার কথা শেষ করি;—তিনিও দারিদ্র্যব্রতধারী, মহাসাধক মহাত্মা গন্ধী। গন্ধী আজ বিশ্ববিশ্রুত। কিন্তু একদিনেই কি তাঁর নাম সারা বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করেছে? ২১ বৎসর পূর্ব্বে আলবার্ট হলে দক্ষিণ-আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতবাসীদের দুর্দ্দশা দেশবাসীর নিকট বিবৃত করতে আমিই প্রথম তাঁকে আহ্বান করি। স্বর্গগত নরেন্দ্রনাথ সেন সেই সভায় সভাপতি ছিলেন। মহাত্মা গন্ধীর বক্তৃতার বিষয় ছিল—কেপ কলোনিতে (Cape Colony) ভারতবাসীর অশেষ দুর্দ্দশার কথা। মহাত্মা তখন দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদের নেতা। তিনি দেশবাসীর হিতের জন্য আপনাকে একবারে নিঃশেষ করে' উৎসর্গ করে' দিয়ে-

ছিলেন। নেটাল প্রদেশে তিনি তাদের সঙ্গে তুল্য-ভাবে নিগৃহীত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত হয়েছিলেন। মাসে ৫।৬ হাজার টাকা আয়ের ব্যারিষ্টারী তিনি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে' সবার ব্যথাকে বুক পেতে দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। কতবার জেলে গেছেন, কত কষ্ট সহ্য করেছেন, মেথরের কাজ পর্য্যন্ত করেছেন। তাই ত তিনি আজ জনসাধারণের হৃদয় মন অধিকার কর্‌তে পেরেছেন। আজ অন্ততঃ ২৭।২৮ বৎসর যাবৎ তিনি নিগৃহীত ভারতবাসীর নেতা—যেখানে অত্যাচার উৎপীড়ন, সেইখানেই মহাত্মা গন্ধী; তাই আজ তাঁর নামে দলিত জনসঙ্ঘের প্রাণ আনন্দে নেচে ওঠে—আশায় উৎফুল্ল হয়। এই অনন্যপ্রতিদ্বন্দ্বী-প্রভাবের পশ্চাতে রয়েছে মহাত্মাজীর আজীবন সাধনা।

রামমোহন রায়কে বাঙালীর ঘরে পাঠানো বিধাতার একটি বিশেষ বিধান বলে' আমার মনে হয়। আমার স্থির বিশ্বাস, বাঙালীর দ্বারাই ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের পথ উন্মুক্ত হবে। কিন্তু এই গৌরবের পদ অধিকার কর্‌তে হলে বাঙালীর জীবনে আজ চাই সাধনা —তিল তিল করে' আত্মদান। বাঙ্গালী আজ স্থিরপ্রতিষ্ঠ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'য়ে ব্যক্তিগত সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে দেশের কাজে লেগে পড়ে' থাক্‌লে ভারতের নিদারুণ দুর্দ্দশা ঘুচ্‌বেই। আজ বিধাতার ইঙ্গিত—বাঙালীর সাধনা ভারতের সিদ্ধি আনয়ন কর্‌বে।

বঙ্গীয় যুবক-সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ জীবিকা-অর্জ্জন।*

(সমস্যা)

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও উপাধিধারীর সংখ্যা দেখিয়া আমরা সময়ে সময়ে ভয় পাই। অবশ্য বাঙ্গালা দেশেই পাশ্চাত্য শিক্ষার উন্নতি বহুল পরিমাণ হইয়াছে। কিন্তু আট কোটি জনসংখ্যার তুলনায় শিক্ষিত লোকের সংখ্যা মুষ্টিমেয়, এমন কি হিসাবে নগণ্য বলা যায়। কিন্তু বাঙ্গালী জাতি বিদ্যা শিক্ষার জন্য যে প্রকার আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে তাহাতে বোধ হয় ক্রমশঃই শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়িতে থাকিবে। ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মেণী, জাপান প্রভৃতি দেশে আপামর সাধারণ মধ্যে যে প্রকার শিক্ষা বিস্তার হইয়াছে ও হইতেছে সে তুলনায় আমরা কোথায় পড়িয়া আছি তাহার স্থিরতাই হয় না। কিন্তু আমাদের দেশে ইতিমধ্যে এ প্রকার হাহাকার পড়িয়াছে কেন? প্রকৃত পক্ষে দেখিতে গেলে আমাদের বিদ্যাশিক্ষার অন্তরালে শিক্ষালাভ ব্যতীত আর একটী গূঢ় উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভ হইতেই, এমন কি যখন নবাবী আমলে পার্শী রাজভাষা বলিয়া পরিগণিত হইত তখন হইতেই কেবল চাকুরী করা বা ওকালতি পেশা অবলম্বন করাই বাঙ্গালীর বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য হইয়া রহিয়াছে। এ দেশে ইংরাজী শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য এই ছিল যে সহজে চাকরী জুটাইব। মহাত্মা রাজনারায়ণ বসুর "সেকাল আর

---

* ১৩১৭ সালের কার্ত্তিক মাসের "মানসী" হইতে পুনর্মুদ্রিত।

একালে” এ সম্বন্ধে অনেকগুলি কৌতুকাবহ কাহিনী আছে। একস্থানে তিনি বলিতেছেন,—“ইংরাজদের যে সকল সরকার থাকিত, তাহাদের ভাষা ও কথোপকথন আরো চমৎকার ছিল। একজন সাহেব তাঁহার সরকারের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। সরকার বলিল—মাষ্টার ক্যান্ লিব, মাষ্টার ক্যান ডাই। (Master can live, master can die) অর্থাৎ মনিব আমাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন, অথবা মারিয়া ফেলিতে পারেন। সাহেব, “What, master can die ?” এই কথা বলিয়া সরকারকে মারিবার জন্য লাঠি উঠাইলেন। সরকারের তখন মনে পড়িল, “ডাই”—শব্দের অন্য অর্থ আছে, তখন “ষ্টাপ্ দেয়ার” (stop there) অর্থাৎ প্রহার করিতে লাঠি উঠাইও না, এই বলিয়া হাত উঁচু করিল, তৎপরে অঙ্গুলি দ্বারা আপনাকে দেখাইয়া বলিল, “ডাই মি” (Die me) অর্থাৎ আমাকে মারিয়া ফেলিতে পারেন। “ইফ্ মাষ্টার ডাই, দেন আই ডাই, মাই কো ডাই, মাই ব্ল্যাক্ ষ্টোন্ ডাই, মাই ফোরটিন জেনারেশান ডাই।” “If master die, then I die, my cow die, my blackstone die, my fourteen generation die.” “যদ্যপি মনিব মারেন, তবে আমি মরিব আমার ‘কো’ অর্থাৎ গরু মরিবে, আমার ‘ব্ল্যাক্ষ্টোন্’ অর্থাৎ বাড়ীর শালগ্রাম ঠাকুর মরিবেন, আমার ‘ফোরটিন জেনারেশান’ অর্থাৎ চৌদ্দ পুরুষ মরিবে।” একবার রথের দিবস এক সরকার কামাই করে। পরদিন সে আসিলে, সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, “কাল কেন আইস নাই ?” সরকার রথের ব্যাপার কিরূপে বুঝাইবে ভাবিয়া আকুল। শেষে বলিয়া উঠিল, “চর্চ্চ” (church)। রথের আকার গির্জ্জার মত, তাই এই কথাটী বুঝাইবার পক্ষে বড় উপায় হইল। কিন্তু “চর্চ্চ” বলিলে ইটের গাঁথুনি বুঝায়, এ জন্য পরক্ষণেই বলা হইল, “উডেন্ চর্চ্চ” অর্থাৎ কাষ্ঠের গির্জ্জা।

তাহা হইলেও বুঝা গেল না; তখন তাহাকে আরো ব্যাখ্যা করিতে হইল—"থ্রি ষ্টারিস্ হাই"। "Three stories high" "গাড আল্‌মাইটী সিট আপন" (God Almighty sit upon) অর্থাৎ জগন্নাথদেব বসিয়া আছেন, "লাং লাং রোপ" (Long long rope) "থৌজণ্ড মেন ক্যাচ" (Thousand men catch), "পুল, পুল, পুল" (Pull, pull, pull) "রনাওয়ে, রনাওয়ে" (Run away, Run **away**), "হরি হরি বোল—হরি হরি বোল।" *

এই তো গেল ইংরাজ রাজত্বের প্রথম আমলের কথা। তাহার পর যখন ডেপুটী কালেক্টরী, মুন্সেফী প্রভৃতি পদের সৃষ্টি হইল ও সেক্রেটেরিয়টের অল্লাধিক বেতনের কেরাণীগিরির জন্ম হইল, তখন দশ পনরো বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভের এক চরম উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল শীঘ্র শীঘ্র পাশ করিয়া এই সকল পদলাভ করা। কাজেই আমাদের সমাজের এক সংস্কার জন্মিল যে ইংরাজী লেখাপড়া শিক্ষা করিলেই চাকুরী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা সহজ হইবে। কিন্তু একথা কেহ তলাইয়া দেখিল না যে অজস্র চাকুরীর সৃষ্টি কদিন চলিবে? আমাদের দেশে বহুকাল হইতেই একটী সারবান্ বচন চলিয়া আসিতেছে,—

> "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ তদর্দ্ধং কৃষি কর্ম্মণি।
> তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ॥"

নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার কলিকাতা অবরোধের পর ইংরাজদিগের সহিত যে সন্ধি স্থাপিত হয় তাহার অন্যান্য সর্ত্তের মধ্যে একটা সর্ত্ত এই ছিল যে সিরাজ ব্যবসায়ের ক্ষতিপূরণস্বরূপ শুধু আর্ম্মেণীয় বণিকদিগকে

* সেকাল আর একাল—২৫—২৭ পৃঃ

সাত লক্ষ টাকা দিবেন।* ইহাতেই বুঝা যায় যে গোবিন্দপুর, সুতানুটী ও কলিকাতা এই তিন খানি গ্রাম ইজারা লইবার পর হইতে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সমগ্র কলিকাতায় বাণিজ্য ব্যাপার কি প্রকার বিপুল হইয়া উঠিয়াছিল। বলা বাহুল্য আর্ম্মেণীয়দের প্রাপ্ত সাত লক্ষ টাকা এখনকার ক্রয় বিক্রয়ের মূল্যানুসারে (purchase value) অন্ততঃপক্ষে পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকার সমান হইবে। তাহার পর এই দেড় শত বৎসরের মধ্যে সমগ্র ভারতের আমদানী ও রপ্তানী একত্র করিলে প্রায় সাড়ে তিন শত কোটি টাকায় পরিণত হয়। এই বিশাল বাণিজ্য-ব্যাপারে কয় জন বাঙ্গালী সওদাগর সংশ্লিষ্ট আছেন? আমাদের দেশ হইতে যে সমস্ত শস্য সামগ্রী (কাঁচা মাল) রপ্তানী হয় তাহার সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র বাঙ্গালীর হাতে। কিন্তু তাহাও তেলী, তাম্বলী, সাহা, গন্ধবণিক প্রভৃতি শ্রেণীর করায়ত্ত হইয়া রহিয়াছে। যদি এই সকল শ্রেণীর মধ্যে যথেষ্ট শিক্ষার বিস্তার থাকিত তাহা হইলে আমাদের কিছুমাত্র ক্ষোভের কারণ থাকিত না। কিন্তু তাহা না থাকায় ইউরোপীয় বণিকগণ ব্যবসায় চালাইবার যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া থাকেন ইহারা তাহার কোনই খবর রাখেন না। সত্য বটে ইংরাজ আমলের প্রারম্ভে, এমন কি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বাঙ্গালীর সহায়তা ব্যতীত ইউরোপীয় সওদাগরগণ (for want of local knowledge) তাহাদের কার্য্য-সিদ্ধি করিতে পারিতেন না; এই জন্যই রামদুলাল দে, মতিলাল শীল প্রভৃতি ক্রোড়পতি হইয়াছিলেন, এবং অপর অনেক অনেক বাঙ্গালী হৌসের মুৎসুদ্দি হইয়া বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিয়া-

* "For the effects plundered from the Armenian inhabitants of Calcutta, I will give the sum of seven lacks of rupees." [Vide Stewart's History of Bengal. Appendix, page XX., Article No. VII.]

ছিলেন। প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী যে বাণিজ্য ব্যাপারে শীর্ষস্থান অধিকার করিবে ইহার সূত্রপাত হইয়াছিল।* কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইহাদের উত্তরাধিকারীগণ প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও ভোগ-বিলাসে রত হইয়া ভবিষ্যতে বাণিজ্যব্যাপারে দাঁড়াইবার স্থান পাইলেন না। বাণিজ্য ও ব্যবসায় যেন বাঙ্গালীর প্রকৃতিবিরুদ্ধ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালীর অনুপযুক্ততার জন্য বাণিজ্য বসিয়া থাকিবার নয়; প্রকৃতি চিরদিনই শূন্যতার বিরোধী। (Nature abhors vacuum). বাঙ্গালীর বাণিজ্যে অনভিজ্ঞতা ও বাণিজ্য-বিমুখতা দেখিয়া মাড়োয়ারী ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা বাণিজ্য ক্ষেত্রটী একেবারে দখল করিয়া বসিয়াছে। এই কারণেই ইউরোপীয়গণ, মাড়োয়ারীগণ বাঙ্গালার নগরে নগরে এমন কি গণ্ডগ্রামে পর্য্যন্ত নিজের ব্যবসাক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়া ফেলিতেছে। বাণিজ্য দ্বারা কার্য্য-ক্ষেত্র কি প্রকার বিস্তার লাভ করে তাহার একটী মাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি। এই সাড়ে তিন শত কোটী টাকার পণ্য-দ্রব্য বহন করিবার জন্য কতশত

* "Biswanath Matilal, lately the Dewan of the Salt Golas, began life with eight Rupees a month, and is generally understood to have amassed twelve or fifteen lakhs of Rupees before he was required to relinquish his office. The father of Babu Ashutosh Deb, the founder of that wealthy family, served a native master at five rupees a month, before he became a clerk in the late firm of Fairlie Ferguson & Co, in whose employ, and also in that of the American Merchants—who named one of their ships after him Ramdulal Deb, he accumulated a colossal fortune. The present Dictator in the money market, the Rothschild of Calcutta, Muti Babu, began his career with the humble salary of ten Rupees a month.

(Vide The Indian Mirror, Aug. 14, 1910.)

বৃহদায়তন ষ্টীমার সমুদ্রবক্ষে বিরাজ করিতেছে। আবার এই সমস্ত ষ্টীমার চালাইবার জন্য কত সহস্র ও লক্ষ নাবিক, কাপ্তেন, ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত রহিয়াছে। আবার এই সমস্ত গড়িবার জন্য গ্লাসগো, লিভারপুল প্রভৃতি নগরে কত বৃহদায়তন ডক্ রহিয়াছে। আর সেখানে সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ মজুর এবং কত বিজ্ঞানবিৎ ইঞ্জিনিয়ার ইহার নক্সা (naval architecture) নির্ম্মাণের জন্য ব্যাপৃত রহিয়াছেন। আমরা যদি এই প্রকারে কর্ম্মোৎসাহ (spirit of enterprise) বাণিজ্য-পটুতা (commercial activity) না হারাইতাম তাহা হইলে আজ আমাদের নদীবক্ষে ও বঙ্গোপসাগরের উপকূলে কত শত শত ষ্টীমার চালিত হইত তাহাতে কত বাঙ্গালী কাপ্তেন, ইঞ্জিনিয়রের জীবিকা-নির্ব্বাহ হইতে পারিত! অধিক কথা কি, আমাদের দেশে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এত বৎসর স্থাপিত হইয়াছে কিন্তু এই বিদ্যালয়ের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ চাকুরী ব্যতীত আর কোনও উপজীবিকা খুঁজিয়া পান না। Vide J. G. Cumming's Report on "Technical and Industrial Instruction in Bengal", 1888—1908. Part I. of Special Report, page 12.—"The great attraction is the comparative certainty of subsequent official employment. Eight out of every ten students of the Engineering Department find employment under Government, and only one out of ten finds private employment. Mr. Heaton, the Principal, has remarked that this discloses in a startling manner the state of arrested industrial development in Bengal." এই প্রকারে অন্তর্ব্বাণিজ্য আমাদের হাতছাড়া হইয়া যাওয়ায় আমরা কোটি কোটি টাকা

হারাইতেছি। আবার এই সমস্ত ষ্টীমার নির্ম্মাণের জন্য কত mechanical engineerএর প্রয়োজন হইত? আশ্চর্য্যের বিষয় এই, আনুমানিক খ্রীষ্টিয় দ্বিতীয় শতাব্দীর রচিত (১৯২ অব্দে) মৃচ্ছকটিক নাটক পাঠে জানা যায় যে, ইহার নায়ক চারুদত্ত (ব্রাহ্মণ বণিক) ছিলেন। চীন পরিব্রাজক ফা হিয়ানের ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠে জানা যায় যখন তিনি ভারতবর্ষ ও সিংহল হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন তখন অনেক ব্রাহ্মণ বণিক তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন। তাহার পর শ্রীমন্ত সওদাগরের কথা বাঙ্গালা দেশের ঘরে ঘরে প্রচলিত আছে। কিন্তু যেদিন হইতে সমুদ্র যাত্রা ও বিদেশ গমন বন্ধ হইল সেই দিন হইতেই আমরা বাণিজ্য-পটুতা (commercial activity) হারাইয়াছি। বর্ত্তমান সময়ে একবার বেলেঘাটায় গিয়া কি প্রকারের নৌকায় আমাদের অন্তর্ব্বাণিজ্য চালিত হয় আর একবার গঙ্গার ধারে জেটিতে যাইয়া বহির্ব্বাণিজ্য কিরূপে নির্ব্বাহিত হয় তাহা দেখিয়া তুলনায় সমালোচনা করিলে অনেক শিক্ষালাভ করিতে পারা যায়। একদিকে দেড়শত হইতে 'হাজার মণি নৌকা' অপরদিকে আট হাজার দশ হাজার হইতে পঞ্চাশ হাজার টন ভারবাহী বিরাট পোত দাঁড়াইয়া আছে। এ উভয়ের মধ্যে তুলনা অসম্ভব হইলেও, শিক্ষালাভ অসম্ভব নহে। প্রথমে সমুদ্রযাত্রা নিষেধ ও তাহার পর জাতিভেদরূপ মহা নিগড়ে যেদিন আমরা নিজেদের হাত-পা বাঁধিয়াছি সেদিন হইতে অনেক ব্যবসায় লোপ পাইয়াছে আর তাহার বিষময় ফল আমরা এখন ভোগ করিতেছি। যতদিন আমরা ইউরোপের সহিত সংঘর্ষণে আসি নাই ততদিন আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীসমাজ জাতিভেদের বিষময় ফল ভোগ করে নাই। এই পাশ্চাত্য সংঘর্ষণ এত শীঘ্র ঘটিয়াছে যে আমরা উহার ধাক্কা সামলাইয়া উঠিতে পারি নাই। পূর্ব্বে প্রত্যেকটী গ্রাম ক্ষুদ্র

সাধারণ তন্ত্রের মত ছিল। প্রত্যেক গ্রামের কামার, কুমার, ধোবা, নাপিত, যজমান, যাজক স্ব স্ব বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়াছে ; কিন্তু এখন অনেক জনাকীর্ণ সহরের সৃষ্টি হইয়াছে সুতরাং সে নিয়ম ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে। এখন কলিকাতায় পয়সা দিলেও খাঁটি দুধ মিলে না, মাছ অগ্নিমূল্য ও দুষ্প্রাপ্য ; বর্ষাকালে ধোবার বাড়ী কাপড় দিয়া তিন সপ্তাহ কখনো বা এক মাস হাঁ করিয়া পথ তাকাইয়া থাকিতে হয়। এই হাঁ করিয়া থাকিবার জন্য আমরাই দায়ী, কারণ যেমন অন্যান্য বিষয়ে তেমনি এ বিষয়ে আমরাই নিজেদের অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখিয়াছি। পনরো টাকার নকলনবিশির জন্য সাহেবের বড় বাবু ও আফিসের পেয়াদার খোসামুদী করিয়া ছয় মাস কাটাইতে আমাদের লজ্জা বোধ হয় না কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালীতেই হৌক বা লোক রাখিয়া বস্ত্র ধৌত করিবার একটা কারবার (laundry) খুলিতে আমাদের সমুদয় সম্মান লোপ পায়। এমন কি আমরা এমনি অসহায় যে নিজেদের কাজটুকুও কোনমতে চালাইয়া লইতে পারি না। এখন বিলাতের মত বড় আয়োজনে (scaleএ) Dairy farming, আমেরিকার মত মৎস্যের চাষ (Pisci culture) শিখিয়া মৎস্য জন্মাইবার চেষ্টা দরকার ; তাহার সঙ্গে আবার (laundry farming) কাপড় ধোলাই করিবার কারখানা থাকা চাই। কিন্তু এ সব ব্যাপারে বিদ্যাবুদ্ধি ও সংগঠনী শক্তির সহিত (powers of organisation) যৌথ কারবার খোলা দরকার। কিন্তু আমরা নিশ্চেষ্ট ও অকর্ম্মণ্য হইয়া বসিয়া আছি ; সেই সাবেক গোয়ালা, ধোবা ও জেলের উপরেই নির্ভর রহিয়াছে। পদ্মায় অজস্র ইলিশ জন্মায় বটে কিন্তু জেলেদের কাছে দাদন দিয়া বরফাবৃত করিয়া রেলগাড়ী যোগে কলিকাতায় পৌছিয়া দিবার ভার বৈদেশিকের উপর নির্ভর করিয়া আমরা সুখে নিদ্রা

যাইতেছি এবং ব্যবসায়ের মুনফা আমাদের হস্তচ্যুত হইয়া যাইতেছে। এই প্রকারে বাঙ্গালীর কার্য্যক্ষেত্রের পরিসর ক্রমশঃ গুটাইয়া আসিতেছে। যাহা কতক আমাদের জ্ঞাতসারে ও কতক অজ্ঞাতসারে একবার গুটাইতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাকে যথাসময়ে ঠেকাইয়া রাখিবার চেষ্টা না করিলে পরে যে কেবল অনুশোচনা করিতে হইবে এ কথা বলাই বাহুল্য। দেখিতে সামান্য অথচ ফলে বৃহৎ এই যে ব্যাপারগুলি এ গুলি আমাদের দৃষ্টি এড়ায় ইহা কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নহে।

আমাদের দেশে যাহাদের আমরা এখন "ভদ্রলোক" বলিয়া থাকি তাহাদের জীবিকার একমাত্র অবলম্বন চাকুরী হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং এই চাকুরী জোগাড় করিবার একমাত্র উপায় বিশ্ববিদ্যালয়ের "ছাপ" আদায় করা। সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারে আসিয়া আঘাত করিতেছে। যদি বুঝিতাম যে বিদ্যাশিক্ষা ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিলাভ করা একই কথা তাহা হইলে আমার কোনও আপত্তি ছিল না কিন্তু এই উপাধিলাভের প্রধান উদ্দেশ্য কেরাণিগিরি বা ওকালতিতে প্রবেশাধিকার লাভ, এ কথা প্রসঙ্গক্রমে পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। শতকরা নিরান্নব্বই জন লোক উপাধিলাভের পর সরস্বতী দেবীর নিকট হইতে চির বিদায় গ্রহণ করেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় একটি বিরাট কারখানা বা সুরকির কলে পরিণত হইয়াছে। আমা-ঝামা ও ভাল পোড়ের ইট এক সঙ্গে পেষিত হইয়া সেই সুরকিতে পরিণত হয়। প্রতিভা (Genius)র স্ফূর্ত্তি হয় না। আজকাল দেখা যায় এক এক কলেজে বিশেষতঃ দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে সাড়ে চারি শত পাঁচ শত ছাত্র। অধ্যাপক ও ছাত্রের সহিত এখানে ব্যক্তিগত কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া অসম্ভব। কেবল টীকা টিপ্পনি গলাধঃকরণ করানো ও percentage

রক্ষা করাই যেন বিদ্যাশিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাস্তবিক এ বিষয়ে আলোচনা করিলে দেখা যায় যাঁহারা যৌবন-কালে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ফার্কতনামা লইয়া বিদায় হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যেই প্রকৃত প্রস্তাবে অনেকের প্রতিভার বিকাশ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। এখনি কয়েকটী নাম আমার মনে আসিতেছে। কেশব-চন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, নলিনবিহারি সরকার, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, শিশিরকুমার ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই সকল ক্ষণজন্মা পুরুষ স্ব স্ব ক্ষেত্রে যে প্রকার অসাধারণত্ব দেখাইয়াছেন, জিজ্ঞাসা করি কয়জন উপাধিধারী তাহা পারিয়াছেন? এস্থলে ইহা বুঝিতে হইবে না যে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার বিরোধী; আমার বক্তব্য এই যে অন্যান্য সুসভ্য দেশের ন্যায় সকলেই মোটামুটি—যিনি যতদূর পারেন সকলেই স্কুলে বিদ্যাভ্যাস সমাপন করিয়া নানা ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ বাণিজ্য ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবেন। অবশ্য একেবারেই ভুঁইফোড় হইয়া রামদুলাল সরকার হইবেন এ কথা বলি না; কিন্তু মাড়োয়ারীদিগের ন্যায় শিক্ষানবিশ (apprentice) হইয়া বাণিজ্যক্ষেত্রে ঢুকিবেন। কারণ সকল ক্ষেত্রেই শিক্ষানবিশির একটা মূল্য আছে। না-পড়িয়া পণ্ডিত হওয়ার মত ভয়ঙ্কর জিনিস আর কিছুই নাই। বিশেষতঃ ব্যবসায় ক্ষেত্রের উত্থান পতন অতি ভয়ানক; যে কাজ এত গভীর দায়িত্বপূর্ণ সে কাজে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে একটু শিক্ষার দরকার একথা বুঝাইয়া বলিবার দরকার করে না। অল্পদিনের মধ্যেই অনভিজ্ঞ লোকের ব্যবসায় চেষ্টা নিষ্ফল হইয়া যায়, তাহার দৃষ্টান্ত খুঁজিবার জন্য বেশি দূর যাইতে হইবে না। সুতরাং এ শিক্ষাকে কিছুতেই উপেক্ষার ভাবে দেখিতে বলিতে পারি না।

প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতে গেলে গত পাঁচ বৎসর হইতে আমাদের জাতীয় জাগরণের সূত্রপাত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে আমরা কল কারখানা স্থাপন ও নানা প্রকার ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছি, কিন্তু কোনও দিকে তাদৃশ কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই বলিয়া হতাশ্বাস হইয়া পড়িতেছি এবং কেহ কেহ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে বাঙ্গালী জাতির দ্বারা কিছু হইবে না; কিন্তু তাঁহারা অনেক সময়ে ভুলিয়া যান যে ইউরোপ যে আজ বাণিজ্যক্ষেত্রের সর্ব্ববাদিসম্মত নায়কত্ব লাভ করিয়াছে তাঁহা পাঁচশত বৎসর বা ততোধিক কালের, বংশপরম্পরালব্ধ অভিজ্ঞতার ফল। আমরা তাহা এক দিনেই করিতে পারি নাই বলিয়া নিরাশ হইবার কোনও কারণ নাই। যে সময়ে বঙ্গদেশ রঘুনন্দনের শাসনে নিপীড়িত হইয়া জড়বৎ হইয়াছিল এবং সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হওয়ায় ভারতবর্ষের বাহিরে যাতায়াত বন্ধ হইয়াছিল সেই সময়ে একবার ভিনিসের অবস্থা ও নৌ-বাণিজ্যের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়।*

* "It is not easy to realise what Venice must have looked like with this teeming life along her quays and streets, when the pulse of the commercial world beat fullest at Rialto; but there stand forth, to assure us of its splendour, the enthusiastic descriptions of Frate Faber, Pietro Casola, above all of Francesco Petrarch, who bursts into panegyric. "From my windows on the Riva degli Schiavoni", he says, I see vessels as large as my house with masts taller than its towers. They sail to all parts of the world, and brave a thousand dangers. They carry wine to England, honey to the Scythians; saffron, oil, linen to Assyria, Armenia, Persia and Arabia; wood to Egypt and Greece; then return laden with merchandise to be distributed all over Europe. Where the sea

আজকাল দেখা যায় শিল্প বাণিজ্য শিখিবার জন্য শত শত বাঙ্গালী যুবক ইউরোপ জাপান আমেরিকায় ছুটিতেছেন। তাঁহারা শিক্ষিতব্য বিষয়ে যতদূর পারেন জ্ঞানলাভ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া হতাশ হইয়া বেড়াইতেছেন। তুমি বস্ত্ররঞ্জনই (dyeing) শেখ, বৈদ্যুতিক পূর্ত্তকার্য্যই (electrical engineering) শেখ, কি কোন বিশেষ রাসায়নিক শ্রমশিল্পই (chemical industry) শেখ, যতদিন আমাদের দেশের লোক সেই সমস্ত ব্যাপারে (enterprise) প্রবৃত্ত না হইবে ততদিন এই বিদেশলব্ধ শিক্ষা কার্য্যকরী ও ফলবতী হইতে পারিবে না ও এই সকল লোকের কাজে লাগিবার কোন উপায়ই হইবে না। এমন কি স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মাও যদি স্বর্গ হইতে আমাদের কল কারখানা নির্ম্মাণ করিবার জন্য অবতীর্ণ হ'ন তাহা হইলেও তিনি হার মানিয়া পলাইবেন। বঙ্গদেশে যত কল কারখানা, বলিতে গেলে সবই বৈদেশিকের হস্তে; তাঁহারা যে স্বজাতির মধ্য হইতে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি নির্ব্বাচন করিয়া লইবেন ইহাতো সহজ কথা। আমরা গতানুগতিক হইলে চলিবে না।

উপসংহারে শুধু এই কথাই বলিতে চাই যে এই ভীষণ প্রতিযোগিতার দিনে আমাদের যুবকগণ বসিয়া থাকিলে অথবা নির্জীবভাবে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পাশ ফেল গণনা করিলে চলিবে না। দেশে ছোট বড় অনেক চাকুরে লোক আছে তাহাদের বংশ বৃদ্ধি করা কখনও যুবকদের জীবনের লক্ষ্য হইতে পারে না। এ আশা, এ মায়া ত্যাগ করিতেই হইবে। একটী সবল, জীবন্ত যুবক-

---

ends, their sailors quit the ships and travel on to trade with India and China; they cross the Caucasus and the Ganges, and reach the Eastern Ocean." Vide The Venetian Republic, page 81.

সমাজের দরকার হইয়াছে।* গণ্ডীছাড়া স্বাধীন শিক্ষা লাভের জন্য উৎসুক, কর্ম্মোৎসাহে চির নবীন যুবক সম্প্রদায় চাই; তাহারাই এ দেশকে নূতন করিয়া গড়িবে, নূতন মহিমায় মহিমান্বিত করিয়া তুলিবে। বঙ্গীয় যুবকসমাজের সম্মুখে এক বিষম সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। এই সমস্যার সমাধান যদি তাঁহাদের দ্বারা সম্ভবপর না হয় তাহা হইলে ভবিষ্যৎ বড় অন্ধকারময়। যদি এ প্রবন্ধে আমি কোথাও কঠোর কথা ব্যবহার করিয়া থাকি তবে তাহা ক্ষোভের বশবর্ত্তী হইয়াই করিয়াছি, আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই, থাকিতেও পারে না। যেমন নব রবিকিরণে উদ্ভাসিত তরুণ কিশলয়ের শোভা মনোমুগ্ধকর হইলেও আপনাকে বড় করিয়া তুলিবার তাহার একটা ক্ষমতা নাই তেমনি আমাদের দেশের যুবকবৃন্দের দুর্ব্বল স্বাস্থ্যের স্নিগ্ধ হাস্য দেখিয়া আমার একদিকে সহানুভূতি ও অন্যদিকে গভীর দুঃখ হয়। বিধাতার সৃষ্ট একটা জাতির পরিণাম কি এতই ভয়ানক হইবে? এমনি করিয়া কি দিন দিন নিশ্চেষ্টতা ও উৎসাহবিহীনতা বঙ্গের যুবকদিগকে গ্রাস করিতে থাকিবে? তাহা কখনই হইতে পারে না। তাঁহাদের জড়তা ত্যাগ করিতেই হইবে; তাঁহাদের উঠিয়া বসিয়া নূতন পন্থা অবলম্বন করিতেই হইবে। এ পথ ছাড়া আর কোনও পথ নাই। এ পথ অবলম্বন করিতে না পারিলে কেবল অনাহারে এতটা মস্তিষ্কশক্তিসম্পন্ন বাঙ্গালীজাতি লয় প্রাপ্ত হইবে।

* ভগবান প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য দিয়া মনুষ্য সৃজন করিয়াছেন তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। প্রবীণ পসারওয়ালা উকীল ভাবেন তাঁহার পুত্র যতশীঘ্র পারে বি, এল, পাশ দিতে পারিলে "বাঁধা ঘর" ও মক্কেলদিগের নিকট তাহাকে পরিচিত করিয়া অবসর গ্রহণ করিবেন। কিন্তু দুর্ভাগা পুত্রের মতি গতি ও রুচি অন্যদিকে। পিতা জোর করিয়া তাহাকে আইন পাশ করাইবেন। এই প্রকার কত tragedy আমি জানি বলা যায় না।

অর্থনৈতিক সমস্যা—বাঙ্গালী কোথায়?

ছাত্রবৃন্দের এই সভায় তাকিয়ে আজ বাংলা দেশের আশা ভরসা যুবকসম্প্রদায়ের সম্বন্ধে মনে অনেক ভাবের উদয় হয়। সকলেরই মনে কত আশা ও আকাঙ্ক্ষা। আমি আজ শতাব্দীর তৃতীয়াংশ যাবৎ শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী থেকে ছাত্র জীবনের নাড়ী নক্ষত্র জানিয়াছি। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর দিকে তাকালে দেখি আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত মুখ, হৃদয়ে আশা লইয়া জীবন পথে প্রবেশ করছে। কিন্তু

"He counted them at the break of day
But when the sun set where were they?"

কলেজ জীবনের গণ্ডী অতিক্রম করিতে না করিতেই সে মোহের বিচ্যুতি হয়। পরে অবশ্যম্ভাবী সেই একই হাহাকার। তাই আমি বিগত কয় বৎসর ধরে এই নিয়ে আলোচনা করছি। আজকাল যে রকম popular তাতে আর যুবক সম্প্রদায়কে Oxygen, Hydrogen মিশিয়ে জল তৈরি করে বিজ্ঞানের ভোজ বাজী দেখিয়ে আকৃষ্ট করতে হয় না। এখন বিষম সমস্যা হয়েছে যে বাঙালীর অস্তিত্ব ধরা-পৃষ্ঠ হতে অচিরে বিলুপ্ত হওয়া নিবারণ করা। কোথায় বাঙালী আজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে কৃতিত্ব লাভ করবে, না দেখছি তারা সব জায়গাতেই হঠে যাচ্ছে। একজন নিরপেক্ষ ইংরাজ সেদিন দিল্লীর ব্যবস্থাপক সভায় অন্যান্য স্থানের Legislative Councilএর কার্য্যকলাপ বিচার করে বলেছেন যে আজ সকল বিষয়ে মান্দ্রাজ

অগ্রণী—বম্বে দ্বিতীয় স্থানে এবং বাঙালা তৃতীয় ও সর্ব্ব নিম্নে। এই স্থানে ৭।৮ মাস পূর্ব্বে মহামতি গোখ্‌লের একটি কথা বলেছিলাম,—সমস্ত ভারতবর্ষ বাঙলার দিকে তাকিয়ে আছে, বাঙলার বাণীই ভারতের অন্যান্য প্রদেশ উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করে। "What Bengal thinks today, the whole of India will think to-morrow" কিন্তু হায় আজ বাংলা কোথায়!

ব্যবসা বাণিজ্যের কথা তো নেইই, বাঙলা আজ সকল ক্ষেত্র হতেই বিতাড়িত হয়েছে। এর কারণ কি? ইংরাজ শাসনের পূর্ব্বে বাহিরের জগতের সংস্পর্শ শূন্য হয়ে, নিজের আবেষ্টনের মধ্যে আপনার শত অপূর্ণতাতেও আপনি বিভোর ছিল, তখন বাংলার দিন চলিয়াছিল বেশ। জীবন সংগ্রামের কঠিন প্রতিযোগিতায় বাইরের ঘাত ও প্রতিঘাত আমাদের জীর্ণ সমাজ-দেহকে আলোড়িত করিয়া তুলে নাই তাই অপর্য্যাপ্ত ক্ষেতের ধান, পুকুরের মাছ, গরুর দুধে দিন চলিত একরকম বেশ। কিন্তু আজ অন্নাভাব। জীবন ধারণোপযোগী একপোয়া মাছ আধসের দুধ আজ মহার্ঘ। শুধু কলিকাতায় নয় পল্লীগ্রামেও কখন কখন দুধের সের আট আনা। আর মাছ বলে আমরা যা খাই তা তো কেবল মনকে প্রবোধ দিবার জন্য। আজ বাংলা দেশে খাদ্যাভাব। পুষ্টিকর খাদ্য নেই; আজ আমরা যেন ঘাস পাতা খেয়ে কোন প্রকারে জীবন ধারণ করে আছি। তাই পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ আমাদের খাচ্ছেনা। তাই আমরা আমাদের দুর্গতির সমস্ত দোষ ইংরাজের স্কন্ধে চাপাইয়া বলি "ইংরাজ এই সুজলা সুফলা বাংলা দেশের ধন ধান্য লুঠে নিচ্ছে"। বাংলার ধন, বাংলার শস্য ইংরেজ অতি কমই লুঠ করে। আজ **Behar for the Beharees, Assam for the Assamese, Orissa for the**

Oriyas কিন্তু Bengal for every body. বাঙ্গালী অতি পারমার্থিক জাতি। বাংলার দরজা সব সময়েই খোলা। প্রথমে চৌরঙ্গি, তারপর Exchange এ যান দেখবেন আমরা পুরাকালের দধীচি মুনির মত কেমন নিঃস্বার্থভাবে নিজের অস্থি পরের উপকারের জন্য অকাতরে দান করছি। রেলি, টার্ণার মরিসন্, গিলাণ্ডর্স প্রভৃতি বণিকদের উপকারার্থে আমরা অম্লান বদনে কেরানীগিরি করিতেছি। তার পর, ভাটিয়া, মাঁড়োয়ারীরা সমস্ত করতলস্থ করেছে, হ্যারিসন রোড থেকে বাঙালীটোলা প্রায় মাড়োয়ারীর হস্তগত হয়েছে। আমরা স্থানচ্যুত হয়ে ৪।৫ তলা বাড়ীর পায়রার খোপের মত সব অংশে এসে আশ্রয় নিচ্ছি। এখন একটু Tightness of the market বলে যা কিছু রেহাই পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু অচিরেই যে আমাদের বিতাড়িত হতে হবে তাতে কোন সন্দেহ নাই। শ্রমজীবিদের মধ্যে খুঁজলেও বাঙ্গালী শ্রমিকের অবস্থা ভদ্রলোকদেরই মতো। প্রায় ৫০ বছর হল দেখে আস্‌ছি plumber সব উড়িয়া। জল, ড্রেন, গ্যাসের কাজ এরাই কর্‌ছে। রাঁধুনে বামন হয় উড়ে নয় খোট্টা; পাড়াগাঁয়ে অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ীতে পর্য্যন্ত দেখছি উড়ে বামুন, খোট্টা বেহারা। বাংলা দেশের ধন ধান্য কি এতই অপর্য্যাপ্ত যে এখানে কাহারো গৃহে অন্নাভাব নাই, প্রত্যেকের বাড়ীতেই মাটিতে লোহার সিন্দুক পোতা যে এখানে কাহারো মুটে মজুর, বেহারা প্রভৃতি হবার দরকার নেই? আমরা নবাবী করেই চলেছি, কি যে দুর্দ্দশা এতে হচ্ছে তা বুঝতে কাহারো কষ্ট হয় না। বিশদ করে বলে আর কি হবে!

আজকাল আমাদের সাধের কেরাণীগিরি হতেও বিতাড়িত হবার লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। নিরামিষ ভোজী মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণ বাঙালীর চেয়ে অল্প বেতনে কাজ কর্‌তে পারে বলে কেরাণীগিরিতে আজ মান্দ্রাজী।

তেঁতুল-জল ও ডাল খেয়ে বারাণ্ডায় চাটাইয়ে ঘেরাও করিয়া সপরিবারে থাকতে পারে বলে বাঙালী কেরাণী অপেক্ষা অল্প খরচে এদের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হয়। তাই বলি, বাঙালী যায় কোথা ?

৫০ বৎসর পূর্ব্বে দেখেছি বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট চীনেরা দখল করেছে। এখন দেখছি, লাল বাজার, ফৌজদারী বালাখানা পর্য্যন্ত এরা এসেছে। জুতোর দোকানী, ছুতোর সব চীনে। এই বাঙলা দেশে ছুতোর ছিলনা এমন নয়। এখন তারা নিরন্ন। চীনেদের অনেক গুণ, তাই আজ তারা বাঙালী ছুতোরকে প্রতিযোগিতায় হারিয়েছে। এরা ফাঁকি দেয় না এবং এদের উপর কাজ দিয়ে ভরসা পাওয়া যায়। বাঙালী মিস্ত্রি কি রাজমিস্ত্রি কি ছুতোর মিস্ত্রি, চোখের আড়াল হলে, হুঁকো নিয়ে বস্‌বে আর কোন কাজ আদায় করা অসম্ভব। চীনেদের মজুরী বেশী কিন্তু সস্তায় তিন অবস্থা হয় বলেই লোকে বেশী মজুরী দিয়েও এদের কাজ দেয়। তাই আজকাল পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গে চীনেরাই Contract নিয়ে কাজ করছে। আমাদের দেশের মিস্ত্রিরা দিন আনে দিন খায়। মূলধন কোন তাদের থাকে না এবং সমবেত হয়ে কাজ করবারও এদের ক্ষমতা নাই।

বাল্যকালে অনেক বাঙালীর কাঠের গোলা দেখেছি। এখন চাঁপাতলায় গেলে দেখতে পাওয়া যাবে চীনেরা সব কাঠের গোলার মালিক। আর সাবেক বাঙালী মনিবগণ এখন তাহাদেরই কেরানীগিরি করছে। এইরূপে জীবনের নানা ক্ষেত্রে অবাঙালীর peaceful penetration হচ্ছে। এ একদিনে বোঝা যায় না। ক্ষয় রোগীর মতন তিলে তিলে এই আমাদের মৃত্যু। এই অশিক্ষিত চীনেরা পিকিং, ন্যানকিং, ক্যাণ্টন থেকে এসে বিনা মূলধনে আমাদের মুখের অন্ন গ্রাস করছে, আর আমরা চোখ বুজে বসে আছি।

ট্যাঙ্‌রায় কয়েক বছর আগে একটি চীনের সামান্য দোকান দেখ্‌তাম, যুদ্ধের সময় Munition Boardয়ের Contract নিয়ে বড় লোক হয়ে গেল। এখন তার ছোট ছোট অনেকগুলি Sawmill. বাঙালী পারে না কেন ?

Railway Stationএ ষ্টীমার ঘাটে সব কুলী মজুর হিন্দুস্থানী। ধানের ক্ষেতের মধ্য দিয়ে গ্রামের অতি সন্নিকটে রেল গেছে। এক আধ পো মাইলের মধ্যে চাষীদের বাড়ী। তারা ইচ্ছা করলে ট্রেণের সময় মাল নামিয়ে ও তু'লে দিয়ে যেতে পারে। এতে অক্লেশে দৈনিক ॥০ আনা রোজগার হতে পারে। কিন্তু তারা যে জমির মালেক, তারা কি এই ঘৃণিত কুলীগিরি করতে পারে! তাদের ইজ্জত সম্ভ্রম বলে তো কিছু আছে! এদিকে ঋণে ডুবুডুবু। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, অজন্মা তো আমাদের দেশের প্রায় স্বাভাবিক অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু রেলের লাইনের ধারেই ষ্টেসনে ষ্টেসনে হিন্দুস্থানীদের উপনিবেশ বসে গেছে।

এইরূপ শ্রমবিমুখতা ও আলস্যই আমাদের সকল দুর্গতির পশ্চাতে। কিছুদিন পূর্ব্বে আমতার নিকটে একটি পল্লীগ্রামে আমাকে কোন কার্য্য উপলক্ষে যাইতে হইয়াছিল। ষ্টেসন হইতে অনেক দূরে গন্তব্য স্থান। অনেক কষ্টে পাল্কী জুটিল কিন্তু বেহারা মিলিল না। সেখানে গরীব চাষীর তো কোন অপ্রতুল দেখিলাম না। যদি দিন গুজরাণ করা অসাধ্যও হয় তবু পাল্কী বহা,—সে কি করিয়া হয়! মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণীতেও দেখিতে পাই বাজার হইতে ॥০ আনার মাছ আনিতে হইলে ৵০ আনা কুলী ভাড়া বাবদ দেওয়া হয়—তবে সন্ধ্যার আঁধারে এদিক ওদিক তাকিয়ে নিয়ে আসা—সে স্বতন্ত্র কথা। এইরূপ false prestige বা মিথ্যা আত্মসম্মান জ্ঞানই আমাদের চরম দুর্গতির জন্য দায়ী। এই কুভাব আমাদের সমাজের স্তরে স্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে।

আজকাল কলেজে I. Sc., B. Sc. classএ স্থানাভাব। অভিভাবক সম্প্রদায় তাঁদের কুলতিলকেরা I. Sc., B. Sc. পড়িলেই একেবারে নিজকে ধন্য জ্ঞান করেন। এই মোহ না কাটিলে কোন উপায়ান্তর দেখি না। আমি শিক্ষক বটে কিন্তু ব্যবসায়ীও। ছেলেদের কাছে আমি শিক্ষক—ব্যবসায়ীর কাছে ব্যবসায়ী। ৭।৮টি কোম্পানীর সহিত আমাকে জড়িত থাকিতে হইয়াছে। ব্যবসায় ক্ষেত্রে কৃতী রাজেন্দ্র মুখার্জ্জি, নিবারণ সরকার মহাশয় প্রভৃতিদের সহিত আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে জাতীয় চরিত্রগত ত্রুটি সংশোধন না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের কোন আশা নাই। পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী কার্ণেগীও সামান্য হইতেই আরম্ভ (humble beginning) করিয়াছেন। তিনি তো প্রথমে telegraph boy ছিলেন। তিনি যখন ব্যবসায় হতে বিদায় গ্রহণ করেন তখন তাঁর ব্যবসা কিনে নেবার জন্য ৯০ কোটী টাকা মূলধনে একটি syndicate করতে হয়েছিল। তাঁর Empire of business বলে একখানা বই বের হয়েছে। তাতে তিনি বলেছেন (Sweeping of office) ঘর ঝাড় দেওয়া হতে সুরু চাই কিন্তু বাঙালী যুবককে যদি এরূপ বলা যায় তাহলে কি উত্তর পাওয়া যাবে তা বোধ হয় বলতে হবে না।

আমাকে অনেকে বলেন "আপনি কি মাড়োয়ারী হতে বলেন?" আমি নিজে নিতান্ত গণ্ডমূর্খ নই—এখনো আমাকে গবেষণায় বেলা ৯টা থেকে ৪টা পর্য্যন্ত প্রত্যহ ব্যাপৃত থাকতে হয়—এবং কার্য্যগতিকে ব্যত্যয় হইলে সেদিন বৃথা গেল মনে করি—আমিও ব্যবসাদার। "মাড়োয়ারী হও" বলিয়া যুবকদিগকে বিপথগামী করি বলিয়া আমার প্রতি সক্রেটিসের মতো হেমলক বিষের ব্যবস্থা করিবার পূর্ব্বে স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি যে আমি "লেখাপড়া ছাড়" কদাচ বলি না।

"Empire of business"এ বারংবার বলা হইয়াছে যে সর্ব্ব নিম্ন স্তর হইতে আরম্ভ কর। আমাদিগের যুবকগণের মধ্যে হীনতা স্বীকার করিয়া কৃতিত্ব অর্জ্জনের যে কষ্ট তাহা সহিবার শক্তি নাই। প্রায়ই দেখি, কর্ম্ম-শিক্ষাভিলাষী যুবক কোন প্রকারে ১।১॥০ মাস নানা বিভাগের. কর্ম্ম কোন প্রকারে একবার চোখ বুলাইয়াই, একটি departmentএর head হইয়া Table Fan ও Secretariat Table পাইবার আবদার আরম্ভ করেন। এ প্রকার ধৈর্য্যহীনতার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম যাহা তাহাতো সকলেই দেখিতেছি।

ইংরেজী প্রথমশ্রেণীর M. A. মাড়োয়ারীর Correspondence clerk সুন্দর সেক্সপীয়র মিল্টনের গৎ আওড়ে তার নাগরীর তর্জ্জমা কর্‌ছেন! তাই বলি, ঘোড়া বেকুব না সোয়ার বেকুব। কে বুদ্ধিমান—যে চালায় না যে চলে? রামযশ আগড়ওয়ালার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম—কথাবার্ত্তা হিন্দিতেই হ'ল। দেখি—এর বুদ্ধিমত্তা অদ্ভুত। তিনি প্রথমে সামান্য ফেরীওয়ালা ছিলেন। পরে মুদীর দোকান করেন। এখন ক্রোড়পতি—তাঁর জন্য Railwayএর Siding বহু ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। খড়্গ প্রসাদ শীতল প্রসাদ banker (রাজা মতিলাল এঁদেরই আত্মীয়) একখানা সামান্য তুলোট কাগজের কোণ ছিঁড়ে দুর্ব্বোধ্য নাগরীতে কি লিখে দিলেন—এর ব্যাঙ্ক সমস্ত ভারতবর্ষে—সেই কিম্ভূতকিমাকার লেখার জোরে দেখাবামাত্র টাকা মিলে।

কেবল মসীজীবি হলেই কি বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হয়? অনেক বাঙালী তো partnershipএ ব্যবসা করেন। এক অংশীর অসুখ কিম্বা কোন কারণে চোখের আড়াল হলে কি হয়? আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির অত্যুত্তম বিকাশের দরুণ ব্যবসা হয় মাটি—আর এরা New York, Uganda, Kenya থেকে ক্রোড় ক্রোড় টাকা কর্‌ছেন, অংশীদারে

অংশীদারে কখন গোলযোগ হচ্ছে না। এরা ছাতুখোর? আমাদের মস্তিষ্কে Phosphorus আর তাঁদের Cowdung?

শিক্ষালাভের গরবে আমরা নিজেদের সম্বন্ধে অযথা উচ্চ ধারণা পোষণ করি। আর সেই উচ্চশিক্ষাও কি প্রকারের তাহা আমি 'সাধনা ও সিদ্ধি'তেই বলিয়াছি। আজকাল উচ্চ ডিগ্রিধারীর ইতিহাস ও ভূগোলের কোন জ্ঞান না থাকিলেও চলিতে পারে। বিজ্ঞানের কিছু-মাত্র না জানিলেও উচ্চতম শিক্ষিত হইবার কোন বাধা নাই। এক প্রথম শ্রেণীর এম, এ ভূগোলের সামান্য প্রশ্নও উত্তর দিতে পারেন নাই। তিনি Civil Service পরীক্ষা দিবেন হয় তো। Italian War of Independence কবে হয়েছিল এবং তাহার নেতা কে কে ছিল জিজ্ঞাসা করায় তাঁকে বিলক্ষণ বিপদে পড়তে হয়েছিল। American Civil War সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় বল্লেন সপ্তদশ শতাব্দীতে সেই যুদ্ধ হয়। এই প্রকার পণ্ডিত ও শিক্ষিত হবার জন্যই তো আমরা আমাদের সর্ব্বস্ব পণ করিতেছি। আর মাড়োয়ারী, ভাটিয়াদের অশিক্ষিত ছাতুখোর বলিয়া ঘৃণা করিতেছি।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে শিবাজী, আকবর, হায়দার আলি, রণজিৎ সিংহ প্রভৃতি Empire builder অনেকে প্রায় নিরক্ষর ছিলেন। রণজিতের কীর্ত্তি প্রত্যক্ষ করেছেন এমন লোক এখনো আছেন। আকবর লেখাপড়া জানিতেন কিনা সে সম্বন্ধে এখন তর্ক উঠ্ছে। তিনি Great in War and in Peace ছিলেন। তাঁর সভায় তোডরমল্ল, যিনি বাঙলা দেশের রাজস্বের প্রথম ব্যবস্থা করেন, আবুল ফজল প্রভৃতি পণ্ডিত ও গুণীগণের যথেষ্ট সমাদর হইত। আকবর নিজে পক্ষীতত্ত্ব অনুশীলনে যথেষ্ট আনন্দ পাইতেন। তাই বলিতেছি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা না পাইলেও শিক্ষিত হওয়া যায়। আমাদের

দেশে অনেক মহিলার প্রতিভার কথা বিশ্ববিদিত। নিয়মিত শিক্ষালাভ না করিয়াও কিরূপে আত্মোন্নতি করা সম্ভব হয় তাহা প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী, ভূপালের বেগম প্রভৃতির জীবন হইতেই জানিতে পারা যায়। Mill তাঁর Subjugation of Women নামক পুস্তকে এদের কথা লিখেছেন। রাণী ভবানী তো কেবল রামায়ণ ও মহাভারত কিছু কিছু আলোচনা করতেন কিন্তু তাঁর মেধা ও ধীশক্তি ছিল অসাধারণ।

আসল কথা, there is something rotten somewhere. বাবু সুন্দরমলের কথাই ধরুন। ইঁহার গিরিধি অঞ্চলে অভ্রখনি আছে। অনেক Geologyতে Ist class M. A. এর অধীনে prospect করে। এই সমস্ত কৃতবিদ্য বঙ্গজননীর সুসন্তানগণ দ্বারা হয় ইংরেজ নয় মাড়োয়ারীর অধীনে নকরি করা ছাড়া আর কিছু হওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু ইঁহারা মাইকায় শতকরা কত ভাগ ম্যাগ্নেসিয়াম ইত্যাদি আছে কিছুই জানেন না এবং Geology ও Chemistryর কোন ধার ধারেন না—কিন্তু কেমন এঁদের দৃষ্টি এঁরা বুঝতে পারেন কোথায় কোন qualityর অভ্র পাওয়া যাবে। তাঁরা সেই সমস্ত স্থানের মৌরসি নিয়ে রাখেন আর আমাদের কৃতবিদ্যরা Chemistry, Geology পড়েই যাচ্ছে কিন্তু তাহা নিজের কাজে লাগান কদাচ সম্ভব হচ্ছে না। লেখাপড়া আমি ছাড়তে বলি না কিন্তু এর বিরুদ্ধে আমার অভিযোগগুলি আমি বলি। বাঙালী ছাত্র পাঠ্যাবস্থায় যা' শেখে তার দশগুণ সেই সময়ে তার শেখা উচিত। ছাত্রেরা শুধু Syllabusএর দোহাই দিয়ে বসে থাকবে—অর্থাৎ কেবল পরীক্ষকদের চোখে ধূলো দেওয়াই হচ্ছে শিক্ষার উদ্দেশ্য। জ্ঞানার্জ্জনের দিকে দৃষ্টি কোথায়? Paradise lostএর এক অংশ, ভট্টির দু'সর্গ পড়লেই কৃতবিদ্য হওয়া যায় না। এই বাঁধা রাস্তা ছেড়ে তো ছাত্রেরা রেখামাত্র বিচলিত হবে না।

Undergraduateদের ছমাস ছুটী। Post graduateদের বছরে সাত মাস। শ্রীযুক্ত আশু বাবু হিসাব করে বলেছেন এম-এ ক্লাসে বছরে ১৫০ দিনের বেশী পড়ান হয় না। আমি ছুটীর সময় ছাত্রেরা কিরূপে সময় যাপন করে তা' সন্ধানী রেখে জেনেছি। আমাদের পল্লীগ্রামের বাড়ীতে আমার সঙ্গের ছাত্রদের মধ্যেও দেখি দুপুর বেলায় একখানি বই হাতে নিয়ে ঝিমুতে ঝিমুতে নিদ্রা দেবীর স্মরণ নেওয়া। একজন সবল সুস্থ যুবক যে কেমন করে বহুমূল্য সময় এই রকম করে নষ্ট করে তা আমার বুদ্ধির অগম্য। ছুটীর সময় বাইরের বই রাশি রাশি পড়ে Syllabus এর সঙ্কীর্ণতা কেন দূর কর না? দেশে তো কাজ করিবার মতো কাজের কিছু অভাব নাই, ছুটির সময় এগুলি করিলে হয় না? নিরক্ষরের সংখ্যা এদেশে এমন কিছু কম নয়—এদের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের প্রয়োজন নাই এমন তো নয়। দীন মজুরদের-সংসর্গ ভাল লাগে না? কেন লাগ্‌বে? প্রাসাদোপম hostelএ থেকে, আড্ডা দিয়ে বায়স্কোপে দিন কাটিয়ে কি আর পাড়াগাঁয়ে গিয়ে এদের নিয়ে ভাল লাগ্‌তে পারে? পল্লীই হচ্ছে আজ আমাদের বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্র। ইংরাজ বালক মায়ের কোলেই (by the fire side) বা কত শেখে! কত পত্রিকা তাদের জ্ঞানস্পৃহা বৃদ্ধি করিবার জন্য। তারা বড় হয়ে স্কুল কলেজে যেয়ে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। তারা books of adventureএ ভ্রমণ বৃত্তান্ত পড়ে কত কৌতূহলী হয়। আমাদের কোন শিক্ষিত যুবককে যদি Livingstoneএর কথা জিজ্ঞাসা করা যায় তাঁরা বিশেষ কিছু বলতে পারবেন না। এই তো হিমালয়ের দুরধিগম্য শৃঙ্গে আরোহণের সেদিন কত চেষ্টা হল, কয়জন যুবক তার বিবরণ পাঠ করেছেন। এই যে বিমানচারীরা কলিকাতা হতে রেঙ্গুন যাত্রা করেছিলেন এঁদের খবর জানবার জন্য কয়জনের প্রাণে আগ্রহ

হয়েছিল। ইংরেজ সম্প্রদায় এঁদের খবর watched with intense interest আর আমরা তো তোয়াক্কাই রাখিনি। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য তো কোন প্রকারে দিনগত পাপক্ষয় করে যাওয়া। Examiner কি পছন্দ করেন তাই খোঁজ। নোট লইয়া মেসে মেসে দৌড়াদৌড়ি। উৎসাহ আমাদের ওই পর্য্যন্ত। Stephen সাহেব কি note দিয়েছেন তাই জান্‌তে ব্যস্ত, তাই কোন রকমে মুখস্থ করে কোনমতে ফাঁকি দিয়ে উঠ্‌তে পার্‌লেই হ'ল—আর কেন! Boswellএর Life of Johnsonএ পড়েছি তিনি এক Garretএ বসে গোটা গোটা লাইব্রেরী পড়ে শেষ করতেন। Benjamin Franklin খুব বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তিনিই lightning conductorএর প্রবর্ত্তক। ঘুড়ি উড়িয়ে মেঘস্থিত বিদ্যুতের সহিত পার্থিব বিদ্যুতের ঐক্য তিনিই স্থাপন করেন। আর তিনিই American War of Independence এর একজন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। প্রথমে ইংলণ্ডে পরে ফ্রান্সে তিনি দূত হন। তিনি ছিলেন self-taught. তাঁর আত্মজীবনী অতি চমৎকার পুস্তক—তাতে দেখি তিনি প্রথমে ছিলেন Compositor. Count Rumfordও স্ব-শিক্ষিত (self-taught) ছিলেন। বর্ত্তমান যুগে কার্য্যকরী আবিষ্ক্রিয়ায় যিনি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন সেই এডিসনের মাত্র কয়েক মাস স্কুলে শিক্ষালাভ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। অথচ তাঁর মতো inventor জগতে খুব কমই হয়েছে। দু'চারখানা কেতাবি স্কুলে পড়ে আর কতটুকু বিদ্যে হয়? তাই বলে converse সত্যি নয়। যাঁরা self-taught তাঁরা নিজের চেষ্টায় সব শিখেছেন।

বাঙালী কেন পারে না? বাঙালী মনঃসংযোগ করে একাগ্রচিত্তে কোন সাধনাই করতে পারে না। আমাদের জাতীয় জীবনের

সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বনাশ এই উড়ুউড়ু মনের জন্যই হয়েছে। আমাদের ভাবপ্রবণ প্রাণে আবেগ উচ্ছ্বাসের অন্ত নাই। খড়ের আগুনের মতো আমাদের উৎসাহ বহ্নি দপ্ করে যেমন জ্বলে উঠে, নিব্‌তেও তার দেরী হয়না তেম্নি। লাগপড় হয়ে লেগে না থেকে সিদ্ধি কবে কে লাভ করেছে? আজকাল ছাত্রদিগের কাহাকে কাহাকেও যদি জিজ্ঞাসা করা যায় "ওহে তুমি ল' পড়ছ নাকি?" অমনি যেন কৈফিয়ত দেবার জন্য অতি ব্যগ্র হয়ে উত্তর করে থাকেন "আজ্ঞে হাঁ, পড়ছি কিন্তু ওকালতি করব না।" অথচ, কত বই কিনতে হচ্ছে কত টাকা খরচ করতে হচ্ছে। আমাদের কেবলি দুমনা হয়ে কাজ করা। এইরূপে জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ আমরা মনঃস্থির করতে না পেরে ইতস্ততঃ ভাসমান হয়ে বেড়াতে থাকি এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফল যদি বিফলতা আসে তবে কাহাকে দোষ দিব?

মাড়োয়ারীরা ছাতুখোর, কিন্তু তারা জয়ী হয়। তার কারণ তারা আমাদের মতো অত বেশী বুদ্ধিমান নয়। অতশত অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে আট ঘাট, অন্ধি-সন্ধির সন্ধান নিতে নিতেই গ্রাস তাদের মুখছাড়া হয় না। তারা 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন'। তাদের ঝাড়ু দিতেও আপত্তি নেই, দরকার হলে এক আধমণ মোট বইতেও লজ্জা নাই।

একজন বাঙালী কর্ম্মচারী আমায় বল্‌ছিলেন (তিনি ইংরেজ আফিসে কাজ করেন) তিনি সেদিন বড় লজ্জা পেয়েছেন। ঘর থেকে একটা জিনিষ সরাবার প্রয়োজন হয়েছিল। তিনি বেহারার সন্ধান না পেয়ে ইতস্ততঃ কর্‌ছিলেন। আফিসের বড় সাহেব এসে দেখে নিজেই আস্তিন গুটিয়ে যখন লেগে গেল তখন সেই বাঙালী লজ্জা পেয়ে নিজেও লেগে যেতে বাধ্য হলেন। তাই আমি বলি, কাজে

দাঁড়িপাল্লা ধরা থেকে লেগে যাও। দোকান করতে হলে বাঙালী দোকানদারের অবস্থা সাক্ষী গোপালের মতো; একজন কর্ম্মচারী বেহারা না হ'লে চলে না। ছোট স্তর গুলি এড়িয়ে এরা একেবারে হাতে স্বর্গ পেতে চান। আমরা আইনও পড়ি, ব্যবসায়ও করি। এটা যদি না হয় তবে ওটা ধরব। এইরূপ পাটোয়ারী বুদ্ধিই আমাদের সর্ব্বনাশের প্রধানতম হেতু। বিফলতা জীবনে আসেই। যার জীবনে বিফলতা আসেনি সে তো fair weather sailor. বাধা বিঘ্ন বিপদ অতিক্রম করাতেই তো প্রকৃত মনুষ্যত্ব। লাভ করতে গেলে লোকসান দিতে হয়। তাই বলে অতি বুদ্ধিমানের মতো অত অন্ধিসন্ধি এঁটে চলার পরিণাম আমাদের বাঙালী জীবনই তার উদাহরণ। বিফলতা আমাদের অকেজো করে কিন্তু জীবনে যারা জয়ী হয়েছে— বিফলতার উপর ভিত্তি করেই তাদের সৌভাগ্যের প্রাসাদ রচিত।

সম্প্রতি U. P. Governmentএর Chemical Examiner, Dr. Hankin একখানি বই লিখেছেন "Mental limitations of the Experts" এই বই থেকে কিছু বচন উদ্ধৃত করছি। এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে যাঁরা বিশেষজ্ঞ তাঁরা টোলো পণ্ডিত। ঘটত্ব পটত্ব আলোচনায় বিশেষজ্ঞের এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে চলে যাওয়া কিন্তু নূতন নয়। ইংরাজীতে dunce কথাটার অর্থের উৎপত্তি বড়ই কৌতুকাবহ। Duns Scotus ব'লে ইউরোপে আমাদের নবদ্বীপের নৈয়ায়িকদেরই এক বিশিষ্ট সংস্করণ ছিলেন। Scholastic philosophyর. ইতিহাসে ইনি প্রসিদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এঁর ছাত্রদিগকে লোক dunce বলত—অর্থাৎ followers of Duns Scotus. এঁদের পাণ্ডিত্যের জোরে কথাটার

অর্থের কিছু গোলমাল হয়ে এখন যা হয়েছে তাতে গুরু নিশ্চয় শুনে আহ্লাদিত হতেন না। কেতাবী বুদ্ধির সঙ্গে বুদ্ধিহীনতার সাদৃশ্যে dunce কথাটার বর্ত্তমান অর্থ হয়েছে। যাঁরা যত বিশেষজ্ঞ তাঁরা তত সংসার-জ্ঞানানভিজ্ঞ। ডালে তেল দেওয়া দেখে স্ত্রীকে দেবী ভ্রমে স্তুতি করা পণ্ডিতেই সম্ভব! প্রভূত শক্তির অপব্যয় করে এই রকম পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করতে আমাদের ১৬।১৭ বছর অর্থাৎ ২৪।২৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কেটে যায়। এর মধ্যে পরীক্ষা ফেল করা আছে। ২৫।২৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রাণপাত পরিশ্রমে কার্য্যকরী সমস্ত শক্তির ক্ষয় হয়। তাই একটা কথা আছে, a good education is hostile to business instinct. বহুদর্শী প্রসিদ্ধ Canadian শিক্ষক Stephen Laycock বলেছেন "Those who seem the laziest and least enamoured of books তারাই ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য।

It was notorious that the education imparted was so good that its boys were constantly getting scholar ships and exhibition, it was equally notorious one never seems to hear of them afterwards. যেমন আমাদের দেশের মিত্র ইন্‌ষ্টিটুসন প্রমুখ বিদ্যালয়—এদের ছেলে আকৃষ্ট করিবার জন্য যেমন বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয় কোন বৎসর কতজন বৃত্তি পাইয়াছে ইত্যাদি। আমি কোন বিদ্যালয় বিশেষকে লক্ষ্য করে বল্‌ছিনা। সর্ব্বত্রই ঐ একই প্রকার। আমিও বাগেরহাট কলেজে সংশ্লিষ্ট আছি। আমাদিগকেও খদ্দের ডাকিতে এইরূপ ভনিতা করিতে হয়। কিন্তু বিদ্যার দৌড় এই সমস্ত কৃতীগণের ঐ পর্য্যন্তই। ঐ খানেই দীপ নির্ব্বাণ! Senior wrangler গণের দু' একজন Clerk Maxwell

প্রভৃতি ছাড়া জগৎ আর অনেকেরই নাম শোনেনি। The world never heard of them. এডিসন্‌কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তিনি কলেজম্যান তার পরীক্ষাগারে নেন না কেন? তিনি উত্তর করেছিলেন "The College ones are not worth d—d etc." Herbert Spencer বলে গেছেন "absence of education and high engineering skill এক সঙ্গে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান; জেমস্ ষ্টীফেনসন্ "taught himself writing during his apprenticeship." স্যর বেঞ্জামিন বেকার (এডিনবরার নিকট) Forthbridge তৈরি করেন তা' দেখেছি—এটি greatest and most remarkable bridge in the world. ইনিও regular engineering education পান নি। কিন্তু এঁর যা initiative, তা পুস্তক্‌গত বিদ্বান কোথায় পাবেন। Rhodes একজন Empire builder, ইনি College don দের সম্বন্ধে (অর্থাৎ Oxford Cambridgeএর কৃতবিদ্যদের সম্বন্ধে) বলেছেন "they are babes in financial matters" এগুলো ভাববার কথা।

এই যে পাশকরার জন্য তৃষ্ণা—বিসূচিকা রোগের তৃষ্ণার মতো এর আর একটি দোষ—এক ঘেয়ে ভাবে আবহমান কাল চলার ইচ্ছা। বাপ উকীল অতএব ছেলেকে উকীল হতে হবে। কেননা, বাঁধাঘর রয়েছে—ছেলের আইনে রুচি নাই—তবুও শিখ্‌তে হবে। বাপের চার ছেলের উকীল, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়র, স্কুল মাষ্টর হতেই হবে। যে পুত্র প্রতিভার পরিচয় দেয় তাহাকে সর্ব্বতোভাবে শিক্ষা দাও কিন্তু জোর করে যার রুচি নাই তাহাকে বাঁধা ঘরের খাতিরে পড়ানো উচিত নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যত বেশী থাকা যায়, অকর্ম্মণ্যতা তত বেশী বাড়ে।

অনেকে আমার কাছে পরামর্শের জন্য আসেন। আমি জিজ্ঞাসা করি gtaduate হয়েছেন কিনা? যাহারা graduate তাহাদের বলি—তোমাদের সকল পথ রুদ্ধ হয়েছে। শুন্‌লাম, ইন্‌কম্ ট্যাক্সের আপিসে কতগুলি বড় মাহিয়ানার চাকরী খালি হইয়াছিল। ৬।৭ হাজার প্রার্থী দরখাস্ত করেছিল। আবার এদিকে Civil Serviceএর চার ফেলা হয়েছে। সমস্ত ভারতবর্ষ হতে ১০।১২টি চাকরী। বীজগণিতের chance & probability হিসেব করলে এর একটি পাওয়ার সম্ভাবনা কোথায় দাঁড়ায়? ফরিদপুর কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ খুব আনন্দ করে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে টেলিগ্রাম করেছেন যে তাহাদের কলেজের nomination করিবার অধিকার মিলিয়াছে। তাঁহারা যে পরিমাণে nomination করিবেন তাহাতে তাঁহাদের ছাত্রদের সম্ভাবনা কিরূপ (probability অনুযায়ী) তাহা চিন্তা করিলে আনন্দবেগ নিশ্চয়ই সম্বরণ করিতে হইবে।

এক সময় ছিল যখন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি ভদ্রশ্রেণীর ভিতরই শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু আজ সমাজের নিম্নস্তরেও সাড়া পড়িয়াছে। এখন নমঃশূদ্র মুসলমান সকলের মধ্যেই অসাধারণ চেতনা জাগিয়াছে। কিন্তু এই শিক্ষার লক্ষ্য কি কয়টি appointmentএর জন্য প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইবে? কাজ খালি হয় আর কয়টী।

বাঙালা অবাঙালীর হয়ে গেছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গে মাড়োয়ারী পাট, তিসি, সরিষা, ধানের দাদন দিতে আরম্ভ করেছে। পাড়াগাঁয়ে এখনো জমিদার মহাজন আছেন বটে কিন্তু আসলে মাড়োয়ারীগণ মালিক। তারা উষর মাড়োয়ার হতে লোটা কম্বল সম্বল করে এসে আমাদের দেশটা তিলে তিলে জয় করে নিচ্ছে আর আমরা সুখ-নিদ্রায় সমাসীন। আমরা civil serviceএর সুখ স্বপ্নে, এসব নজরে

নিচ্ছি না। আর সেই Civil Service আন্দোলনেরও তো মরণ কামড় আরম্ভ হয়েছে। মর্নিং পোষ্ট লর্ড রেডিং এর recall দাবী করেছে। England এ Civil Servantরা কেরাণী এখানে তারা শাসন কর্ত্তা। খুলনা দুর্ভিক্ষের সময় Civil Service এর file দুরস্ত কাজের নমুনা আমার দেশবাসী একটু পেয়েছে; ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে দুর্ভিক্ষ তদন্তের হুকুম ছোট বড় নানা প্রভুর মধ্য দিয়া পেয়াদাতে এসে পৌঁছায় এবং সেই রকমে তথ্য সংগ্রহ হলে তার বিবরণ পড়ে দেশবাসী অবাক হয়। খুলনার দুর্ভিক্ষের সময় নাকি Milk could be had for the asking—and fruits were in abundance—মাছও নাকি যথেষ্ট ছিল--ধরে খেলেই হল। File ভিন্ন ম্যাজিষ্ট্রেটরা চলেন না তাও personal assistant ডকেট করে দেয়। এইরূপ কার্য্য-কুশলতার অধিকারে তাঁরা দেশের প্রকৃত শাসনের কাজগুলি একচেটিয়া বলিয়া দাবী করেন। আমাদেরও সংস্কার Civil Service এর জবরদস্ত শিক্ষা ছাড়া কলিকাতা করপোরেশনের চেয়ারম্যানী করা চলে না। কিন্তু সম্প্রতি এই ভবানীপুর অঞ্চলেরই সুরেন্দ্রবাবু দেশবাসীর সে ভ্রম দূর করেছেন। (Official Spectacle) সরকারী চশমায় দেখলে আর sound common sense থাকে না। ধরা বাঁধা রাস্তায় চল্‌লে বিদ্যা বুদ্ধি বাঁধা সাঁধা হয়ে পড়ে। কর্ণেগির লোহার কারবার কিনে নেবার জন্য সিণ্ডিকেট তৈরি হয়েছিল। সেই সিণ্ডিকেট তৈরি করেছিলেন Morgan, তিনি এক অসাধারণ পুরুষ। যুদ্ধের সময় যখন আমেরিকায় টাকা তোলার দরকার হল তখন এই ব্যক্তির খোঁজ পড়ল। এই Morgan বলেন ২॥০ শত ডলার দিয়ে একজন বিশেষজ্ঞের নিকট হতে ২॥০ লাখ ডলারের কাজ আদায় করা যায়। আমাদের দেশেরও সুন্দরমল প্রমুখ ব্যবসায়ীগণ

২॥০।৩ শত টাকার মাহিয়ানা দিয়ে যে সমস্ত বিশেষজ্ঞ রাখেন তাদের দ্বারা কত টাকা রোজকার করেন তার ঠিকানা নাই। বিশেষজ্ঞ 'কলুর চোখ ঢাকা বলদের' মতোই চলিতে জানে। কিন্তু ব্যবসায়ী কলু এদের দ্বারাই তৈল প্রস্তুত করেন। আমাদের দেশের স্যর রাজেন্দ্র মুখার্জ্জি যদি আজ B. E. হ'তেন তাহলে দেশের কত বড় যে লোকসান হত তা কি করে বলব। তিনি হয়ত সরকারী উন্নতি মার্গে এতদিনে বড় জোর District ইঞ্জিনিয়রত্বে এসে পৌছিতেন; এবং Chairman এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের কুঁঠীতে প্রমোশনের জন্য হাটা হাটি করে অন্তরনিহিত শক্তি নিঃশেষ করিতেন। কিন্তু ভাগ্যগতিকে তাঁহাকে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াবার প্রয়োজন হওয়াতে আজ তিনি দেশের শ্রেষ্ঠ একজন পুরুষ। I. C. Banerjiর career আমি অনেক বার বলেছি। বাঙালীদের মধ্যে Railway administration এ যিনি বিশেষজ্ঞ সেই সাত কড়ি ঘোষও কেবল নিজের পায়ে চলেই আজ পুরোভাগে এসেছেন। Associated Pressএর কেশবচন্দ্র রায় মহাশয়ের জীবন আরো শিক্ষাপ্রদ। ইনি হিন্দু হোষ্টেলের বাজার সরকার ও লাইব্রেরীয়ান ছিলেন। এঁর ক্ষমতা অসীম। মধ্যরাত্রে—বড়লাটকেও টেলিফোঁ করিয়া ইনি পরামর্শ করিবার ক্ষমতা রাখেন।

তাই বলিতেছিলাম, লক্ষ্য স্থির রাখিয়া সাধনা করিলে সিদ্ধি নিশ্চিত। দুর্গা বলে ঝুলে পড়। Policy of driftingই সর্ব্বনাশ করবে। ল' পড়ছি—পড়ে রাখিনা—ওকালতি তো করব না—বাপের কাছে কিম্বা শ্বশুরের কাছে তিন বছর আরো খরচ পাওয়া যায়। এই রকম উদ্দেশ্য বিহীন জীবন যাপন আর করো না।

অনেকে বলেন "তবে কি আপনি আমাদিগকে মাড়োয়ারী হতে বলেন"? আচ্ছা এই যে Sir Hugh Bray, Sir Alex. Murray

এরা কি অশিক্ষিত ? Oxford, Cambridge এ নাই বা পড়লেন ? Sir Edmund Ironside কি মাড়োয়ারী ? Fiscal Committee তে সদস্য স্যর ইব্রাহিম করিমভাই। ইনি ক্রোড়পতি কাপড়ের কলওয়ালা। কোন্ বাঙালী Cobden medallist—ইহার মেম্বর হবার জন্য আহুত হলেন ?—এদেশে Economicsএর প্রথম শ্রেণীর তো অভাব নাই ? শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম দাস বির্‌লা এর একজন মেম্বর হয়েছেন। এদের শিক্ষা হাতে কলমে। বোম্বায়ে মিঃ দালাল Reverse Council এর কুফল সম্বন্ধে যে রকম মন্তব্য করেছিলেন তাইতো ফলে গেল, কিন্তু কয়টা Economicsএর 1st. class বা অন্য কেহ সেটা তখন বুঝতে পেরেছিলেন ? স্যর সাপুরজি ভারুচ্চা, ইনি prince of share market. স্যর জমসেদ্‌জী তাতা নিজে বৈজ্ঞানিক ছিলেন না, কিন্তু ৩০ লাখ টাকা দিয়ে ব্যাঙ্গালোরে Institute of Science করেছেন। Chemistry, Geology না জেনেও তো তাতা অতবড় লোহার কারখানা সৃষ্টি করেছেন। তাতার ম্যানেজার বড় লাটের চেয়ে বেশী বেতন পান। এদের Expert Perrin বছরে দুতিন মাস থেকে আড়াই লাখ টাকা নিয়ে যান। যিনি এত বড় বড় সব Scheme করেছেন, তিনি ছিলেন স্বয়ং-শিক্ষিত (self-taught).

Venice তার স্বাধীনতার জন্য বাণিজ্যজীবি সন্তানদের কাছে ঋণী ছিল। আসল কথা, যেখানে স্বাধীন চিন্তা, সেখানেই অবাধ বাণিজ্যোন্নতি এবং সেখানে স্বাধীনতাও অবশ্যম্ভাবী। Dutch republicএর ইতিহাস আলোচনা করলেও ঐ একই মূলসূত্র দেখতে পাওয়া যায়। হল্যাণ্ডের অর্দ্ধেক সমুদ্রতল হ'তে নিম্ন ভূমিতে স্থিত। ডাইক বেঁধে, বিরুদ্ধ প্রকৃতির সঙ্গে নিয়ত সংগ্রাম করে তাদের জীবন

ধারণ করতে হয়। Philip II এর মতো নরপতির সঙ্গে তারা অবহেলে যুদ্ধ করল। William the Silent ছিলেন তাদের নেতা। ডাচেরা সংখ্যায় মুষ্টিমেয়, ফিলিপের অজস্র সম্পদ,—মেক্সিকো, পেরু খনি হতে রাশীকৃত রূপা তার আয়ত্তাধীন কিন্তু তবুও ডাচদের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হল। কেননা, বাণিজ্যজীবী ডাচেরা স্বাধীনতার প্রকৃত মর্ম্ম জানত।

আমাদের গৃহের আবহাওয়া আমাদের চরিত্রগঠনোপযোগী নয়। আনন্দময় গৃহের প্রভাব জীবনকে সুগঠিত করে কিন্তু আমাদের যুবকগণ গৃহের শত দৈন্য প্রভৃতিতে অকালে ভারাক্রান্ত হয়ে উদ্যম শক্তি হারিয়ে ফেলে। স্যাডলার বলেছেন যে তিনি বাঙালী যুবককে হাসতে দেখেন নাই। আশ্চর্য্য হবার কোন কথা নয়। বাড়ীতে গুরুজনদের দিবা রাত্র শত অভাবের আলোচনা শুনে যুবকগণ হৃদয়ে বল হারিয়ে ফেলে। তারপর, নানা সামাজিক কুসংস্কারও এইরূপ অবস্থার জন্য কম দায়ী নয়। সামাজিক কুপ্রথার কথা আলোচনা করে কোন ফল নাই। আমরা Spiritual জাতি—ইউরোপীয়রা জড়বাদী। আমাদের আর কিছু শিখিবার, সংশোধন করিবার নাই। রাস্তায় কুষ্ঠ রোগী দেখে আমরা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপের ঘাড়ে বেচারার রোগ যন্ত্রণা চাপিয়ে রেহাই পাই কিন্তু জড়বাদী ইউরোপীয়রা নিজের জীবন তুচ্ছ করে তাদের সেবা করে। মরে আমাদের জাত ভায়েরা কুষ্ঠ রোগে, আর পরমাধ্যাত্মিক আমরা দূরে পলায়ন করি, সেবা করে বিধর্ম্মী জড়বাদী ওরা। দেশের প্রায় সমস্ত কুষ্ঠাশ্রম গুলিই তো ওদের। ওরাই আবার সাঁওতাল পরগণায় ঘোর অরণ্যে যেয়ে সাঁওতালদের মানুষ করছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন "আমাদের spirituality অকর্ম্মণ্যতার অজুহাত মাত্র।"

যাক্, নিরাশার কথা আর বলব না। আজ দিকে দিকে সাড়ার লক্ষণ দেখিতেছি ইহাই আশার কথা। সেদিন পরলোকগত বরেন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের স্মৃতি সভা হল। ইনি যুবকমাত্র ছিলেন কিন্তু বম্বে অঞ্চলে কাপড়ের কল স্থাপন করে যশস্বী হয়েছিলেন, অনেক জেনে কারবার স্থাপন করে গেলেন। এইরূপ যুবকগণের ভিতর প্রাণের সঞ্চার হইতেছে—ইহাই ভরসার কথা। আজ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি—বাঙালীর আশা পূর্ণ হউক—নব প্রেরণার উৎস শতধা হইয়া আমাদের জাতীয় জীবনকে কানায় কানায় পূর্ণ করুক। আমরা অন্তরের অন্তঃ নিহিত অজস্র শক্তির খনির যেন সন্ধান পাইয়া স্বাবলম্বী হই—প্রকৃত শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিয়া যেন আবার নিজেদের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হই।

১২

শিক্ষাবিষয়ক কয়েকটী কথা*

আমাদের ছেলেরাই আমাদের জাতীয় জীবনের ভবিষ্যৎ আশাস্থল। তাহাদের উপর আমাদের দেশের উন্নতি সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করিতেছে। দেশের দুঃখ দূর করিতে, ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প দ্বারা অর্থ উপায় করিয়া আনিয়া দিতে, লোকশিক্ষার দ্বারা জনসাধারণের দৈহিক, নৈতিক ও মানসিক উন্নতি বিধান করিতে, তাহারাই আমাদের সম্বল। যথোচিত শিক্ষাদানে যাহাতে তাহাদিগকে চরিত্রবান্, জ্ঞানবান ও কর্ম্মবীর করিয়া তুলিতে পারি, ইহাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। যাহাতে তাহারা মাতৃভূমির সমস্ত দুঃখ মোচন করিবার জন্য উপযুক্ত সুসন্তান হইয়া উঠিতে পারে, সেই দিকে দৃষ্টি রাখা আমাদের সকলের একান্ত কর্ত্তব্য।

নিজের নিজের বাড়ীর পরেই স্কুল হইতেই আমাদের জীবনের শিক্ষা ও চরিত্র গঠন আরম্ভ হয়। উত্তরকালে যে যেরূপ হইবে, তাহার ভিত্তিস্থাপন স্কুলগৃহেই। এতগুলি নবীন জীবনের বিকাশের সাহায্য করিবার ভার যাহাদের উপর ন্যস্ত, তাহাদের দায়িত্ব কত বেশী, তাহা আমরা সকলেই বুঝি। ছেলেবেলায় নরম মনের উপর সহজেই যে ছাপ পড়ে, বড় হইলে কখনই তাহা আর মুছে না। তখন অলক্ষিতভাবে যে প্রবৃত্তি ও চিন্তা আমাদের মনে প্রবেশ করে, সারাজীবন আমরা তাহাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকি। সেইজন্য ভাল শিক্ষকের ঋণ

* বাগেরহাট শিক্ষক সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ।

আমরা কোন কালে শোধ দিতে পারিনা। তাহারা চেষ্টা করিলে ছেলেদের মন ভালরই দিকে ও অবহেলা করিয়া বা ভ্রমবশতঃ তাহাদিগকে মন্দের দিকে চালিত করিতে পারেন। এরূপ ভাবে দেখিলে বুঝা যায় পিতামাতার ন্যায় শিক্ষকের প্রভাব আমাদের উপর বড় সামান্য নয়।

এইরূপ গুরুভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত, দুঃখের বিষয় আমরা তাঁহাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখি না। যাঁহারা ছেলেদের শিক্ষা দিবেন, তাঁহারা সে কার্য্যের যথার্থ উপযোগী কিনা, শিক্ষা দিবার তাঁহাদের যথেষ্ট সামর্থ্য আছে কিনা, তাহা আমরা ভাবিয়া দেখিনা।

আমাদের স্কুলে শিক্ষকের বেতন খুব সামান্য। অনেক কাব্য-তীর্থ কিংবা আই, এ, উপাধিধারী শিক্ষকের মাহিনা আমাদের দেশের সামান্য শ্রমজীবির মাসিক উপার্জ্জনের অপেক্ষা অনেক সময় কম। আজকাল বিদ্যা অপেক্ষা অর্থের আদর অনেক বেশী। জনসমাজে খাতিরও আজকাল অর্থের পরিমাণের দ্বারা হয়। শুধু অর্থোপার্জ্জনের পথ সুগম করিব এই আশায় আজকাল আমাদের বিদ্যাশিক্ষা; সে হিসাবে শিক্ষকের স্থান অনেক নীচে পড়ে। কলিকাতায় বড় লোকের বাড়ীতে বাজার সরকার, মোসাহেব প্রভৃতি আসবাবের সহিত স্কুলমাষ্টার স্থান পাইয়া থাকেন। তাঁহারা যে কিরূপ মহৎ কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি না।

তাহার ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে যাঁহারা জীবনে আর কোন রকম জীবিকা অবলম্বন করিতে পারেন নাই, তাঁহারাই প্রায় স্কুলমাষ্টার হন। তাঁহাদের হয় হোমিওপ্যাথিক বাক্স লইয়া ডাক্তারি করিতে হইবে, না হয় স্কুলে মাষ্টারী করিতে হইবে।

মাষ্টারীর মাহিনা এত অধিক নয় যে, সেটী একটী আকর্ষণ স্বরূপ হইবে। সকলেরই দৃষ্টি কোম্পানীর নোক্রী, মুন্সেফী, ডেপুটীগিরি ইত্যাদির প্রতি, সে সব না হইলে তখন অগতির গতি মোক্তারি ও ওকালতি। অনেক সময় দেখা যায়, যাঁহারা এই কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, তাঁহারা নিজেদের কার্য্যের গুরুত্ব বুঝেন না। তা ছাড়া জীবন সংগ্রাম তাঁহাদের কাছে অনেক সময় অতি ভীষণ আকার ধারণ করে। বেতন এত অল্প, যে, অনেক সময় বাধ্য হইয়া অবসর সময়েও উপার্জ্জনের অন্য পন্থা দেখিতে হয়। অনেকে সকাল বিকাল ও রাত্রে টিউশনি করেন। এই অক্লান্ত পরিশ্রমের পর স্কুলের কয় ঘণ্টা অনেক সময় তাঁহাদের বিশ্রাম স্বরূপ হইয়া থাকে। প্রকৃত শিক্ষাদানের জন্য যেরূপ মানসিক অবস্থা থাকা উচিত সেরূপ ধৈর্য্য ও সংযম প্রায়ই থাকেনা। ছাত্রদিগের শিক্ষার উন্নতির বিষয় ভাবিবার জন্য অবসর পর্য্যন্ত পান না। এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের প্রতি তাঁহাদের যে শ্রদ্ধা ও অনুরাগ থাকা উচিত, তাহার কিছুই থাকে না। রুটীন্ (Routine) অনুযায়ী "দিনগত পাপক্ষয়" করিলেই তাঁহাদের দায়িত্বের অবসান হইয়া থাকে।

এই প্রণালীতে কার্য্য চলাতে, যে সকল কুফল হইতেছে তাহা আমাদের কাহারও অজ্ঞাত নাই। যথার্থ জ্ঞানের উপর আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধা চলিয়া যাইতেছে। পড়াশুনা কেবল এখন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য। প্রকৃত বিদ্যার আদর নাই। আমরা কেহই এ শিক্ষাপ্রণালীর উপর সন্তুষ্ট নই। এমন কি শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মহোদয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে আমাদের স্কুলের অবস্থা শোচনীয়। স্কুলগৃহে ছাত্র সংখ্যা বেশী হওয়ায় স্থানাভাব। অল্প বেতনে শিক্ষক মহাশয়েরা কেহই সন্তুষ্ট নহেন।

বিদ্যাদানের বিষয়ে আমাদিগকে এরূপ অমনোযোগী হইলে চলিবেনা। ইহার উপর আমাদের জাতীয় জীবনের সমগ্র ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। যাহাতে শিক্ষকদিগের অর্থকষ্ট দূর হয় তাহার জন্য সকলের চেষ্টা করা উচিত। স্কুলের সংখ্যা যাহাতে আরও বৃদ্ধি পায়, শিক্ষা যাহাতে আরও বিশেষ করিয়া জনসাধারণের অনায়াসলভ্য হইয়া উঠে, তাহার জন্য চেষ্টা করা আমাদের প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির কর্ত্তব্য। পুরাকালে অধ্যাপকেরা যেরূপ অল্পে সন্তুষ্ট থাকিতেন, এখনও যে তাঁহারা তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবেন, তাহা আশা করা অন্যায়। সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আমাদের জীবনযাপনের প্রণালীরও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অনেক নূতন নূতন আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে জাগিতেছে। অভাবও বাড়িয়া চলিয়াছে। সুতরাং এখন আর সেরূপ অল্প টাকায় কাহারও চলিতে পারে না। শিক্ষকদিগের বেতন না বাড়াইলে আমরা যোগ্য শিক্ষকের আশা করিতে পারি না। নিজেদের অন্ন চিন্তার জন্য যদি তাঁহাদিগকে ব্যস্ত থাকিতে হয় তবে শিক্ষকেরা কিরূপে প্রশান্তভাবে শিক্ষাকার্য্যে মনোনিবেশ করিবেন?

ইহাও আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, যে কার্য্যে তাঁহারা ব্যাপৃত আছেন তাহা অতি মহৎ কার্য্য। সমগ্র জাতির ভবিষ্যৎ তাঁহাদের উপর পরোক্ষভাবে নির্ভর করিতেছে। অর্থের দিক দিয়া সমাজে তাঁহাদের সম্মান কি আসন ঠিক করিলে চলিবে না। যে গুরুভার তাঁহাদের উপর ন্যস্ত সে দিকে আমাদের দৃষ্টি থাকা চাই। আমাদের বুঝিতে হইবে, যে, ইহার ন্যায় মহৎ কার্য্য আর নাই। যাঁহারা এই কার্য্যে মন ঢালিয়া দিয়াছেন, তাঁহারা সকলের পূজ্য ও শ্রদ্ধার পাত্র।

এ সম্পর্কে একটা কথার উল্লেখ করিতে হয়। আমাদের দেশে পূর্ব্বকালে অধ্যাপকবর্গের সমাজে যেরূপ সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল, আজকাল শিক্ষকবর্গের তাহার কিছুই নাই। এইরূপ শিক্ষকের সম্মান হ্রাস হওয়া যে দেশের দুরদৃষ্ট তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। আমাদের সদা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে শিক্ষকের বৃত্তি কখনও বাণিজ্যাদি অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় লাভজনক হইতে পারে না। কাজেই যদি আমরা চাই যে বুদ্ধিমান ও চরিত্রবান্ যুবকগণ অন্যবৃত্তি ত্যাগ করিয়া শিক্ষকবৃত্তি অবলম্বন করিবেন, তাহা হইলে দেখাইতে হইবে, সমাজ শিক্ষকের আর্থিক দৈন্য সম্মানের প্রাচুর্য্য দ্বারা ঢাকিয়া দিতে সম্মত আছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের স্কুলের দুরবস্থার প্রতি আমাদের গবর্ণমেণ্টের নজর পড়িয়াছে; শিক্ষা বিভাগের উন্নতির জন্য তাঁহারাও মনোনিবেশ করিয়াছেন। তবে আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, অনেক সময়ই দেখা যায়, শিক্ষকের মাহিয়ানা কিম্বা সংখ্যা বৃদ্ধি করা অপেক্ষা ইন্সপেক্টরের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেন কার্য্যকর বলিয়া গবর্ণমেণ্ট মনে করেন। তাঁহাদের মতে উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাবে আমাদের স্কুলগুলিতে আমাদের আশানুরূপ ফল ফলিতেছে না। বৎসরে একদিন কি দুইদিন স্কুলটী পরিদর্শন করিয়া আসিলে কিরূপ তত্ত্বাবধান হয় তাহা আমরা বুঝি না। তাহা ছাড়া ইন্সপেক্টরেরা যে মন্তব্য প্রকাশ করেন তদনুযায়ী কাজ করা, আর বিধবার একাদশী করা দুইই সমান। করিলে লাভ নাই, না করিলে ক্ষতি যথেষ্ট। এইরূপ পরিদর্শনের প্রাচুর্য্যের ফলে হইয়াছে এই, স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষের নজর আজকাল কোনক্রমে বাহিরের ঠাট বজায় রাখিবার দিকে। ভিতরে যথার্থ

কাজ কিরূপ হইতেছে তৎপ্রতি কেহ একবার চাহিয়াও দেখেন না। তবে বর্ত্তমান বড় লাট মহোদয় শিক্ষাকল্পে যে ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন বলিয়াছেন, তাহার ৯৷ লক্ষ শুধু বাঙ্গালার প্রাথমিক ও উচ্চ ইংরাজী স্কুলের শিক্ষকের অবস্থার উন্নতির জন্য ব্যয়িত হইবে। ইহা আমাদের পক্ষে একটা আশার কথা। আমাদের যথার্থ যাহা প্রয়োজন তাহা বুঝিয়া এই টাকাটা খরচ করিলে বাংলার যথেষ্ট লাভ হইবে।

জনসাধারণের শিক্ষার উন্নতি বিধান জনসাধারণের উপর বেশীর ভাগ নির্ভর করে। আমরা আমাদের জন্য যতটা করিতে পারি, অন্য কেহ কখনও ততদূর করিতে পারে না। আমাদের ধনী ও শিক্ষিত লোকদিগের এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। আমরা বিবাহ, শ্রাদ্ধ, তীর্থপর্য্যটন ও অন্যান্য কার্য্যে অজস্র অর্থ অকাতরে ব্যয় করি। ধর্ম্মের নামে যে কত টাকা দেবালয়ে ও মঠে উৎসর্গীকৃত রহিয়াছে ও হইতেছে তাহার কে ইয়ত্তা করিবে? অথচ গ্রামের স্কুলের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়া অর্থ যোগাড় করা অত্যন্ত কঠিন। লোক শিক্ষার সহায়তা যে ধর্ম্মসাধনের একটী প্রধান অঙ্গ, তাহা সমাজের অনেকেই বুঝেন না। আমাদের আর একটী দুর্দ্দশার কারণ এই যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশই গ্রাম ছাড়া। যে পল্লীগ্রামে তাঁহারা লালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছেন, যাহার নিকট তাঁহারা ঋণী, এখন ম্যালেরিয়ার প্রকোপে ও অর্থান্বেষণের বাতিকে, তাঁহারা কদাচিৎ সেই পল্লীগ্রামে পদার্পণ করেন। তাঁহারা মায়া কাটাইয়াছেন বলিলেই চলে। ফলে যাঁহারা সচরাচর পল্লীগ্রামে থাকেন তাহাদের মধ্যে শিক্ষার প্রভাব সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করেন, এরূপ লোক খুব অল্প। তাঁহাদের জীবনের সমস্ত

উত্তম স্কুল প্রভৃতি ভাল বিষয়ের দিকে ব্যয়িত না হইয়া, দলাদলি ও নিরর্থক আমোদ প্রমোদেই ব্যয়িত হয়। স্কুলের প্রতি কাহারও যথেষ্ট সহানুভূতি নাই। ইহাও স্কুলের দুর্দ্দশার একটী অন্যতম কারণ। যে সকল কৃতী সন্তান, পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া শিক্ষালাভ করিয়া উত্তরকালে যশস্বী ও ধনী হইয়াছেন তাঁহাদের ছোট গ্রামের কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। এ বিষয়ে তাঁহাদের সময় ও মনের উপর গ্রামের স্কুলের যথেষ্ট দাবী আছে। নিজ নিজ গ্রামের স্কুলের উন্নতির জন্য যদি তাঁহারা ভাবেন, তাহা হইলে সত্য সত্যই আমাদের কাজ যথেষ্ট সহজসাধ্য হইয়া উঠিবে।

সুখের কথা এই যে, মনে হয়, যেন আজকাল একটু হাওয়া বদলাইয়াছে। শিক্ষিত সম্প্রদায় জনসাধারণের যথার্থ হিতসাধনের জন্য ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দানবীর "পালিত" ও মনস্বী "ঘোষের" কথা আজকাল কে না জানে? তাঁহাদের দৃষ্টান্ত আমাদের জ্বলন্ত আদর্শ স্বরূপ হওয়া উচিত।

পূর্ব্বে আমাদের দেশের ছেলেদের প্রথমে পাঠশালে পাঠান হইত, উদ্দেশ্য এই যে তাহারা পড়িতে লিখিতে এবং অঙ্ক কষিতে (ইংরাজীতে যাহাকে **the three R's** বলে, অর্থাৎ **reading, writing and arithmetic**) শিখুক। অনেকে তখন পাঠশালের পড়া শেষ করিয়া পৈতৃক পেশা আরম্ভ করিত। এখন জনসাধারণের মতে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে। এখন পিতামাতা ইচ্ছা করেন যে তাহার ছেলে বেশী লেখাপড়া শিখুক। কারণ বেশী লেখাপড়া শিখিলে বেশী অর্থোপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে এবং সুখে স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে। এই জন্যই

প্রবাদ আছে যে, "লেখাপড়া করে যে, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে;" এই অর্থকরী বিদ্যার মোহিনী মায়ায় আবদ্ধ হইয়া অনেকে পুত্রদিগকে উচ্চশিক্ষা দিতে লালায়িত হন। সুতরাং উচ্চশিক্ষার যে যে অংশটুকু অর্থ উপার্জ্জনের সহায়তা করে কেবলমাত্র সেইটীর উপরেই লোকের দৃষ্টি থাকে। রাজকীয় উচ্চপদই বল, আর ডাক্তারী ওকালতিই বল, অর্থোপার্জ্জনের প্রচলিত পথে চলিতে হইলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপযুক্ত ডিগ্রীরূপ টিকিট চাই। যাঁহার গাত্রে ঐ নির্দ্দিষ্ট ছাপ আছে তিনি অনায়াসে ঐ পথে অগ্রসর হইতে পারেন। যাঁহার নাই তিনি বিতাড়িত হইবেন। (এই জন্যই ডিগ্রীর এত আদর। এই ডিগ্রীর প্রতি অত্যধিক আসক্তিই আজকাল যত অনর্থের মূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইজন্য পাঠ্যপুস্তকের স্থলে নোটবুক বা অর্থ পুস্তকের এত আদর। শিক্ষকের নিকট Notes বা টীকা আদায় করিবার জন্য যত তাগাদা, আর পাঠ্যপুস্তক ছাড়িয়া দিয়া পুরাতন বৎসরের প্রশ্নপত্রের যথাযথ উত্তর মুখস্থ করিতে তত ব্যস্ততা দেখা যায়। প্রশ্নপত্র চুরিও এই অত্যধিক ডিগ্রীব্যাধির কুফল। এই শিক্ষার ফলে লোকে সর্ব্বশাস্ত্র পাঠ করিয়াও মূর্খ হইয়া থাকে। যতদিন অর্থের উদ্দেশ্য বিদ্যাশিক্ষা এই ভুল ধারণা আমাদের মন হইতে সম্যক্‌রূপে অপসারিত না হইবে, ততদিন প্রকৃত শিক্ষা জনসাধারণের নিকট পৌঁছিবে না। নৈতিক ও মানসিক উন্নতি সাধনই যে শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য এ কথা ভুলিলে চলিবে না। অর্থ উপার্জ্জনের ত বিবিধ পন্থা আছেই এবং উচ্চশিক্ষা লাভ করিলে যে অর্থ উপার্জ্জনের সহায়তা হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া উচ্চ শিক্ষাকেই অর্থোপার্জ্জনের একমাত্র উপায় স্থির করিলে চলিবে না। এ ভ্রম দূর করিতে হইবেই। না করিলে নিস্তার নাই। শত শত বালক

পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইলে বলে—"My career is ruined" আমার জীবনের গতি রুদ্ধ হইয়া গেল, যেন পাশ হইলে তাহারা স্বর্গের চাঁদ হাতে পায়। এখানে Career অর্থে অর্থ উপার্জ্জনের সহজ উপায় বুঝাইতেছে। যদি অর্থ উপার্জ্জনই লক্ষ্য হয় তাহা হইলে এত অর্থ ব্যয় করিয়া অনর্থক শরীর পাত করিবার কি আবশ্যক? কই স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জে সি ব্যানার্জ্জি এবং হাজার হাজার মাড়োয়ারী তাঁরা ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ পান নাই।

বাস্তবিক কথা বলিতে কি, আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আর তেমন অর্থকরী নহে। অর্থোপার্জ্জনের জন্য শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকের পক্ষে ব্যবসা বাণিজ্য অবলম্বন ভিন্ন গত্যন্তর নাই। দূরদেশ হইতে মূর্খ মাড়োয়ারী ও গুজরাটীগণ আসিয়া আমাদের টাকা লুটিয়া লইয়া যাইতেছে, আর আমরা দেখিয়াও দেখিতেছি না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি শিক্ষিত বাঙ্গালী ব্যবসায়ে মন দেন তাহা হইলে এই টাকাটা ভদ্র লোকগণের বর্ত্তমান ভীষণ অন্নকষ্ট কিয়ৎ পরিমাণে দূর করিতে পারে।

অর্থের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি প্রকৃত শিক্ষার জন্যই বিদ্যালয়ে বালকদিগকে প্রেরণ করা হয় তাহা হইলেও আর এক বিপদ উপস্থিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে সকল বালককেই স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া একই পথে চলিতে হইবে এবং একই পথ দিয়া বাহির হইতে হইবে। নির্দ্দিষ্ট পথের একটু এদিক্ ওদিক্ হইলেই হয় শিক্ষকের তাড়না, না হয় পরীক্ষায় অকৃতকার্য্যতা সতর্ক করিয়া দিবে। এই প্রণালীতে শিক্ষা দিলে বালকের প্রতিভা স্ফুরিত হইবার অবকাশ পায় না। যাহার মনের গতি যে দিকে, যদি বলপূর্ব্বক সেই গতি রোধ করিয়া তাহাকে অন্যদিকে চালিত করিবার চেষ্টা করা যায় তাহা হইলে সে গতি যে

দুর্গতি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য অসৎ পথে প্রধাবিত হইলে যে তাহাকে বাধা দেওয়া উচিত নয় একথা আমি বলি না। তবে সকলেরই যে একই বিষয় ও একই কথা তোতাপাখীর মত কণ্ঠস্থ রাখিতে হইবে এ কথা আমি বলি না এবং সময় উপস্থিত হইলে তাহা আবৃত্তি করিয়া প্রশংসা পাইবে, এমন ব্যবস্থার দ্বারা কি উপকার সাধিত হয় তাহা আমার বোধগম্য নহে।

যে সকল বিষয়ে কিছু কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক, সেই সকল বিষয় সকল বালকই কিছু কিছু শিখুক। কিন্তু তাই বলিয়া যে বালকের অঙ্কশাস্ত্র আদৌ ভাল লাগে না তাহাকে যে বাধ্য হইয়া নীরস জ্যামিতিক টীকা টিপ্পনীর অনুপানের সহিত মিলাইয়া সরস করিয়া শিক্ষকের তাড়নায় ও পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হওয়ার ভয়ে গলাধঃকরণ করিতে হইবে এমন কি কথা আছে? হয়তঃ তাহার ইতিহাস পাঠে অধিক ইচ্ছা; কিন্তু গণিত শিক্ষক যদি দেখেন যে সে বালক তাহার দুর্ব্বোধ্য জ্যামিতি পুস্তক ফেলিয়া ইতিহাস পাঠ করেন, তাহা হইলে তাহার হাতে ইতিহাস পরিহাসের বিষয় হইয়া উঠে। এইরূপে বাধাপ্রাপ্ত তাহার প্রতিভা স্বতঃ-প্রণোদিত পথে প্রধাবিত হইতে পারে না। ফলে তাহাকে অনেক বিষয় তিক্ত ঔষধের ন্যায় হজম করিতে হয়, এবং হয়তঃ দুর্ভাগ্যবশতঃ যে বিষয়ে তাহার আদৌ প্রবৃত্তি নাই সে বিষয়ের পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া উচ্চতর শিক্ষার মন্দিরে প্রবেশ করিবার অনুমতি পত্র পাওয়ায় বঞ্চিত হয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সুরকীর কলের মত আমা, ঝামা, হাজা, শুকা সর্ব্ব প্রকার ইট পরীক্ষা যন্ত্রে পেষণ করিয়া ১নং, ২নং ৩নং সুরকী করিয়া ছাপ দিয়া দেয়।

এক একটী শ্রেণীতে অনেক রকমের ছেলে লইয়া শিক্ষকগণের কারবার করিতে হয়। কেহ বা অসাধারণ প্রতিভাশালী, কেহ বা

মধ্যম কল্পের, কেহ বা হীনবুদ্ধি (dull)। শিক্ষক ক্লাশে এক ঘণ্টায় (official তিন কোয়ার্টার) এই সমস্ত ছাত্র লইয়া মাত্র একটি প্রশ্নের সমাধান, কি একটি প্যারার ব্যাখ্যা করিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত প্রতিভাশালী ছাত্র সেই সময়ের মধ্যে তাহার দশগুণ পাঠ আয়ত্ত করিতে পারে।

এইজন্য অনেক সময় দেখা যায় পাঠ্য পুস্তকে নির্দ্ধারিত বিদ্যাশিক্ষা অনেকের পক্ষে প্রকৃত জ্ঞান লাভের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। তা ছাড়া আজকাল ভূগোল কি ইতিহাস একেবারে বাদ দিলেও পরীক্ষা পাশের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। আমি দুই বৎসর হইল "দেশে" গিয়া আমার বসিবার ঘরে ইউরোপের একখানি মানচিত্র টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছিলাম এবং কয়েক জন আই, এ, বি, এ, পরীক্ষার্থী ছেলেদের যুদ্ধক্ষেত্রের স্থান নির্দ্দেশ করিতে বলিলাম; তাহারা অন্ধের ন্যায় হাতড়াইতে লাগিল। এক এক জন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী এই সকল বিষয়ে এত অজ্ঞ যে দেখিলে দুঃখ হয়। যাঁহারা ভাল ভাল ইংরেজী সংবাদপত্র পাঠ করেন তাঁহারা নানা বিষয়ে এত জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারেন যে নির্দ্ধারিত পাঠ্য পুস্তক পাঠ করিয়া তাহা অসম্ভব। এইজন্য মহানুভব কব্‌ডেন একবার পার্লামেণ্টে বলিয়াছিলেন যে এক কপি টাইম্‌স্ পড়িলে এত বিষয় জানা যায় যে সমগ্র গ্রীক ইতিহাস পড়িলেও তাহা কোন কালেই হয় না। যদি কোন শিক্ষিত লোককে আমি জিজ্ঞাসা করি যে আজকাল যুদ্ধের অবস্থা কিরূপ, আর তিনি যদি তাহা আমাকে বুঝাইতে অক্ষম হন, আমি বলিব, তাহার বিদ্যাশিক্ষা পণ্ড হইয়াছে।

সেইরূপ প্রত্যেকেরই স্বাস্থ্যরক্ষা ও নিজের দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ইতিহাস অর্থে কেবল কতকগুলি

রাজার নাম ও তারিখ নহে—দেশের সভ্যতা ও সামাজিক অবস্থার ধারাবাহিক বিবরণই প্রকৃত ইতিহাস নামের যোগ্য। এইরূপ ইতিহাস পাঠে সুকুমারমতি বালক বালিকাগণের মনে স্বদেশ প্রেমের বীজ বপন হয়। তাহারা জানিতে পারে কত বড় উচ্চ অঙ্গের আর্য্য সভ্যতার তাহারা উত্তরাধিকারী। আর আমাদের মত ম্যালেরিয়া পীড়িত দেশের পক্ষে স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধীয় জ্ঞান যে কত প্রয়োজনীয় তাহা কি আর বুঝাইতে হইবে? যদি আমাদের দেশের লোক ম্যালেরিয়ার কারণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে তাহা হইলে হয়তঃ তাহারা কোমর বাঁধিয়া ডোবা ও জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া গ্রামগুলিকে ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর করাল কবল হইতে মুক্ত করিতে পারে। আমি জানি পল্লীগ্রামের অনেক লোকের যথেষ্ট অবকাশ আছে। যদি তাহারা অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত না থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা নিজের হাতে কুড়াল ধরিয়া বাড়ীর চারি পাশের জঙ্গল সাফ করিয়া ফেলিত, নিজের হাতে কোদাল ধরিয়া ডোবার পঙ্কোদ্ধার করিত।

অনেক সময় দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির ছাপ অজ্ঞতা ঢাকিবার আবরণ মাত্র। ফলতঃ নিজের চেষ্টায় যেটুকু শেখা যায় সেইটুকুই আমাদের কাজে আসে। পাঠ্য পুস্তক কণ্ঠস্থ করিয়া "কেতাবী" হওয়া যায় বটে কিন্তু প্রকৃত মানুষ হওয়া যায় না। আমাদের কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ধার বড় একটা ধারেন নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কি তাঁহাদিগকে আমরা শিক্ষিত সম্প্রদায় হইতে বাদ দিব? আল্‌ফিরি জ্যামিতির প্রথম ভাগের ৫ম প্রতিজ্ঞা অনেক চেষ্টা করিয়াও বুঝিতে পারেন নাই, লর্ড বাইরনেরও জ্যামিতি দেখিলে আতঙ্ক উপস্থিত হইত। স্যর ওয়াল্টার স্কট সম্বন্ধে তাঁর এক শিক্ষক বলিয়াছিলেন—"Dunce he

is, and dunce he will remain", ওটা নিরেট বোকা, নিরেট বোকাই চিরদিন থাকিবে।

তাই আমি শিক্ষকমণ্ডলীকে নিবেদন করি, তাঁহারা যেন কোন ছাত্রকে নির্দ্ধারিত কোন বিষয়ে পারদর্শিতা দেখাইতে না পারিলে, তাহাকে গাধা ও অকর্ম্মা বলিয়া নিরুৎসাহ না করেন। হয়ত তাহারা অন্য বিষয়ে প্রতিভার পরিচয় দিতে পারিবে।

তাই বলিতেছি যে, নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকের সহিত অন্যান্য বিবিধ বিষয়ক পুস্তকও বালকদিগের হস্তে দেওয়া উচিত। যাহার যেরূপ রুচি সে সেইরূপ পুস্তক বাছিয়া লইবে। ইহাতে তাহার প্রতিভা বিকাশের সহায়তা করিবে। এ বিষয়ে মার্কিন দেশীয় বিখ্যাত দার্শনিক এমার্সন যাহা বলিতেছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য :—

"I advise teachers to cherish mother art. I assume that you will keep the grammar, reading, writing and arithmetic in order; it is easy and of course you will. But smuggle in a little contraband wit, fancy, imagination, thoughts. * * * They shall have no books but school books in the room; but if one has brought in a Plutarch or Shakespeare or Don Quixote or Goldsmith or any other good book, and understands what he reads, put him at once at the head of the class * * *. If a child happens to show that he knows any fact about astronomy or plants or rocks or history that interests him and you hush all the classes and encourage him to tell it that all may hear, then you have made your school room like the world."

মোট কথা এই, যে ছেলে পাঠ্যতালিকাভুক্ত পুস্তকের বাহিরে যত খবর রাখিবে আমি সেই ছেলেকে তত বাহবা দিব। অর্থাৎ যে শিক্ষার দ্বারা স্বাভাবিক প্রতিভার স্ফুরণ হয় ও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে, ও মৌলিকতা ও উদ্ভাবনী শক্তির উন্মেষ হয় তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। আমার নিজের জীবনস্মৃতির কথা বলিতে আমি বড়ই সঙ্কুচিত হই, কিন্তু একটা কথা প্রসঙ্গক্রমে বলিতে হইতেছে। আমি যখন হেয়ার স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে পড়িতাম তখন একবার দুরন্ত আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া এক বৎসর ভুগি। সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে প্রায় দুই বৎসর লাগিয়াছিল। এই দুই বৎসর বাধ্য হইয়া আমাকে বাড়ীতে আবদ্ধ থাকিতে হয়। ঐ সময়ে লাটিন, ফরাসী ইত্যাদি ভাষা আয়ত্ত করি। বঙ্গদর্শনে রামদাস সেন প্রমুখ ব্যক্তিগণ যে প্রত্নতত্ত্বঘটিত প্রবন্ধ লিখিতেন আমি তাহা আগ্রহের সহিত পাঠ করিতাম। সেই অল্প বয়সে আমার মনে ঐ যে ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসার প্রতি আগ্রহ হইয়াছিল তাহা বহুকাল ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় গুপ্ত থাকিয়া হিন্দু-রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস লিখিবার সময় পুনর্ব্বার প্রকাশিত হয়। বাল্যের সেই যে প্রবৃত্তি বদ্ধমূল হইয়াছিল তাহাই উত্তরকালে কিয়ৎ পরিমাণে কার্য্যকরী হইয়াছে।

প্রকৃত শিক্ষা কিরূপ সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া আমার এত কথা মনে আসিতেছে যে দুই এক কথার মধ্যে তাহা শেষ করা অসম্ভব। শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষ তৈয়ারি করা অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বৃত্তিগুলি যথোচিতরূপে পরিস্ফুট করিয়া তোলা। কি উপায়ে তাহা নিষ্পন্ন হইতে পারে তদ্বিষয়ে প্রাচীনকাল হইতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষীগণ মাথা ঘামাইয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের চিন্তাপ্রসূত যে সকল অমূল্য গ্রন্থরাজি রহিয়াছে প্রত্যেকের কর্ত্তব্য

তাহা পাঠ করা। শিক্ষকতা কার্য্য অত্যন্ত কঠিন ও অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ, এই কার্য্যের জন্য বিশেষভাবে পাঠ ও চিন্তা না করিলে কেহ প্রকৃত শিক্ষকপদবাচ্য হইতে পারেন না।

প্রসঙ্গক্রমে এক্ষণে আমি শিক্ষাসংক্রান্ত দু-একটা কথার উল্লেখ মাত্র করিতে চাই। আমাদের স্কুলে বালকগণের শারীরিক বৃত্তিগুলির অনুশীলনের কোনও ব্যবস্থা নাই বলিলেই হয়। যাহাতে ছেলেরা মাঝে মাঝে দশবিশ মাইল হাঁটিতে পারে, দু—চার মাইল দৌড়িতে পারে, দু—এক মাইল সাঁতার কাটিতে পারে, বা দশ পনের মাইল দাঁড় বাহিতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত থাকা উচিত। শরীরকে সবল ও কষ্টসহকরা যে কত প্রয়োজনীয়, বর্ত্তমান ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে তাহা প্রমাণ হইয়েছে।

এক্ষণে সভ্যজাতিগণের সকল সুস্থ যুবককেই সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া দেশের সম্মান রক্ষা করিতে হইতেছে। আমাদের গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গালীকেও সৈনিক হইবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং আজকালকার দিনে সৈনিকোচিত সুপটু দেহ নির্ম্মাণ করা যে সকল যুবকেরই অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে?

মানসিক শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। নৈতিক শিক্ষা সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কথা হইতেছে চরিত্র গঠন। উহা কয়েকখানি নীতিপুস্তক পাঠ বা কিছু উপদেশ প্রদান দ্বারা সম্পন্ন হইবার নহে। দিনের পর দিন পরোপকার, চিত্তের পবিত্রতা রক্ষা ও ভগবচ্চিন্তা প্রভৃতি কয়েকটী সৎ অভ্যাস পালন করা হইলে কালক্রমে আদর্শ চরিত্র গঠিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক ছাত্রের উচিত প্রতিদিন কিছু না কিছু ভাল কাজ করা, যেমন কোনও স্বার্থত্যাগ করা বা ক্রোধাদি কোন রিপুর দমন করা, আর্ত্তত্রাণ হেতু বীর্য্য প্রদর্শন করা,

ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করা ইত্যাদি। শিক্ষক উপদেশ দ্বারা, বিশেষতঃ নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা, ছাত্রকে ধর্ম্মপথে চলিতে উৎসাহিত করিবেন। প্রসঙ্গক্রমে বলিতে চাই, নৈতিক শিক্ষাসম্বন্ধে আমাদের ব্রহ্মচর্য্য নামক প্রাচীন শিক্ষা প্রণালী হইতে এখনও অনেক শিখিবার আছে।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই, যাঁহারা এই মহান্ কার্য্যে ব্রতী হইয়া জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহারা যেন সর্ব্বদাই মনে রাখেন, যে দেশের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের প্রেরণায় কার্য্য করিতেছেন। পল্লীগ্রামের কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, দলাদলির মধ্যে তাঁহাদের জীবনের উচ্চ আদর্শ, ছাত্রদিগকে যেন সতত মঙ্গলের দিকে চালিত করে। আমার বিশ্বাস যে, আমাদের দেশ এখনও এত অধঃপতিত হয় নাই, যে দেশের লোকে বিদ্যা ও বিদ্বানের আদর করিবে না।

"স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে" প্রাচীন নীতিবিশারদের এই উক্তি, পূণ্যভূমি ভারতবর্ষের উপর এক সময় প্রযুজ্য ছিল। বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষকেরা সাধারণের দৃষ্টির অগোচরে ও অন্তরালে, নীরবে যে কাজ করিতেছেন, তাহার গুরুত্ব ও মহত্ত্ব প্রত্যেক সহৃদয় ব্যক্তিই হৃদয়ঙ্গম করিবেন। এই কার্য্যে তাঁহাদের যথেষ্ট যশ কিংবা খ্যাতি হইতেছে না বলিয়া যেন তাঁহারা অবসাদ সাগরে নিমজ্জিত না হন।

এই সময় আমার কর্ম্মবন্ধু পরলোকগত মহাত্মা গোখলের কথা মনে হইতেছে। তিনি বিশ বৎসর ধরিয়া মাত্র ৭৫৲ টাকা বেতনভুক্ শিক্ষক থাকিয়াও স্বদেশ প্রেমিক ও রাজনীতিজ্ঞদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। প্রতিভাশালী শিক্ষকদের মধ্যে যে কেহ ইচ্ছা করিলে গোখলের মত উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারেন। যুক্তরাজ্যের বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসনও একজন শিক্ষক।

এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে প্রতিভাশালী ব্যক্তি শিক্ষকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও দেশপ্রসিদ্ধ হইতে পারেন, যদি তিনি নিজের প্রতিভার উপযুক্ত কার্য্যে আপনার সমস্ত শক্তি অক্লান্ত-ভাবে নিয়োগ করিতে পারেন।

উপসংহারে আমার বলিবার কথা এই যে, প্রত্যেক জেলাতেই উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় বালকদিগের শিক্ষাকার্য্যে সহায়তা করিতেছে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্নভাবে আপন আপন কার্য্য করিতেছেন। বৎসরান্তে একবার তাঁহারা একস্থানে মিলিত হইয়া পরস্পর আপন আপন অভিজ্ঞতার বিষয় আলোচনা কিম্বা শিক্ষাসংক্রান্ত কোন জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিবার চেষ্টা অথবা স্ব স্ব স্বাধীন চিন্তার আদান প্রদান করিয়া উৎসাহিত হউন। পরিশেষে, আমার দেশবাসী যে যেথায় আছেন, আজ আমি সকলের নিকট যুক্তকরে প্রার্থনা করিতেছি, আমাদের মাতৃভূমির অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া পুনরায় তাঁহাকে প্রাচীন কালের মত জগদ্বরেণ্যা করিবার জন্য প্রত্যেকে অকাতরে নিজ নিজ শক্তি প্রয়োগ করুন। ধনবান, আপনি ধনের কোষ উন্মুক্ত করুন; বিদ্বান, আপনি অর্থলোভ ত্যাগ করিয়া শিক্ষকতা বৃত্তি অবলম্বন করুন। আর আমার যে সকল দেশভ্রাতা ধনসম্পদ বা বিদ্যাসম্পদ লাভে সৌভাগ্যবান্ হন নাই, তাঁহারা প্রত্যক্ষ-ভাবে না পারেন, পরোক্ষ ভাবে এই মহৎ কার্য্যের সহায়তা করুন—সকলে মিলিয়া শিক্ষককে তাঁহার পদোচিত মর্য্যাদা দান করিতে থাকুন। তাহা হইলেই যোগ্য শিক্ষকের হাতে আমাদের ছেলেরা মানুষ হইয়া উঠিবে—আমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে।

১৩

পাঠাগার ও প্রকৃত শিক্ষা*

এমার্সন বলেন "গোলাপ বাগান কার?—আমার"; আমার দেখে সুখ, চোখের তৃপ্তি, হৃদয়ের আনন্দ! বাগানের মালিক বেড়া বাঁধান, মালি রাখেন, জল সেচন করেন; সে অনেক কাণ্ড। কিন্তু অমন শোভা কাহারও একার নয়।" কারণ গোলাপের সার্থকতা ফুটে, সৌন্দর্য্যের বিকাশ ক'রে। আর সে সৌন্দর্য্য দর্শক মাত্রেই উপভোগ করতে পারেন। কথাটি পাঠাগার সম্বন্ধেও সত্য। পাঠাগারের যাঁরা উদ্যোগী তাঁরা পয়সার যোগাড় করবেন, জমি কিনবেন, ঘর তুলবেন; তারপর উৎকৃষ্ট পুস্তকরাশি সংগ্রহ ক'রে জনসাধারণের হাতের কাছে এনে দেবেন। সে পুস্তকের অধিকার কারো একার নয়। পাঠক মাত্রেই তার সৌন্দর্য্য রস উপভোগ করতে পারবেন। এই গ্রন্থশালা জ্ঞানলিপ্সুদের বড় আদরের জিনিষ।

জ্ঞানের অনুশীলন আমি ক'রে থাকি। আমি আজীবন ছাত্রভাবে আছি। আমার শৈশব, কৈশোর, যৌবন কখন্ চ'লে গেছে বুঝ্তে পারি নি। আজ বার্দ্ধক্যে পা দিয়ে আমি সেই ছাত্রই আছি। আমি দিনের মধ্যে দু ঘণ্টা নিভৃতে ভাল পুস্তককে সঙ্গী ক'রে কাটিয়ে দি,—দিন সার্থক হয়। জগতে যা কিছু সৎচিন্তা, উৎকৃষ্ট ভাব আছে, যা কিছু উদ্দীপনা সৃষ্টি করে এবং মানুষের হৃদয়ে প্রেরণা দেয়, তার সবই পুস্তকে নিহিত। উপনিষদ্ ও ষড়্দর্শনের তত্ত্ব, গ্রীসদেশের সক্রেটীস্, প্লেটো ও আরিষ্টটল্ প্রভৃতি মহানুভবগণের চিন্তারাশি, এবং পৃথিবীর অন্যান্য

* কলিকাতার উপকণ্ঠ কস্‌বা (বালিগঞ্জ) লাইব্রেরীর বাৎসরিক উৎসবে প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ। শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বিবৃত।

স্থানে যে মনীষীগণ জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের বাণী,—সকলই পুস্তকের মধ্যে। তাঁরা যা দিয়ে গেছেন তা অমূল্য সামগ্রী। আমরা সকলেই উত্তরাধিকারসূত্রে তার অধিকারী। যিনি ধনী তিনি স্ত্রীপরিবারকে সুখে রাখেন, তাঁর ব্যক্তিগত রোজগার ছেলে, নাতি, বড়জোর আত্মীয়স্বজনে খায়। তিনি গহনা গড়ান, কোম্পানীর কাগজ করেন, জমীদারী কেনেন, আর পাটা কবুলত লেখেন। তাঁর জিনিষ ঘরের বাইরে যায় না। কিন্তু ভাব ও চিন্তাজগতের কথা স্বতন্ত্র। প্রতিভাশালী ব্যক্তি ভাব-সমুদ্র মন্থন ক'রে যে রত্ন আহরণ করেন তা'তে সকলের সমান অধিকার। ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি সকলের সাধারণ সম্পত্তি। তাই গ্রন্থকার ও বৈজ্ঞানিকগণ মহামান্য, জগতকে তাঁরা মহাঋণপাশে আবদ্ধ ক'রে রেখে যান।

এদেশে লাইব্রেরীর উন্মেষমাত্র হচ্ছে! আমাদের মুস্কিল এই যে পাঠ্যপুস্তক ছাড়া আর কিছু বড় কেউ পড়্তে চায় না। তাই বলি, আমাদের কপাল পুড়ে গেছে। ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তনের সূচনা থেকে ছাত্রগণের একমাত্র চিন্তা হ'য়ে উঠেছে—কি ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উপাধি নেব। তারপর উকীল, ডাক্তার, মাষ্টার, কেরানী,—এ ছাড়িয়ে যাবার আর যোগ্যতা নেই; কেবল দাসত্ব আর গতানুগতিকে গা ঢালা। স্বাধীন জীবিকা ব'লে যে একটা কথা আছে শিক্ষিতদের সে ধারণা নেই। পোষ্ট আফিসের ছাপের মত তাঁরা ইউনিভার্সিটির ছাপটাকেই সার বুঝেচেন। যা হোক এখন সুবাতাস বয়েছে, সময় এসেছে। তাই ধীরে ধীরে পাঠাগারের আদর বাড়্ছে।

আমেরিকায় প্রায় ৪৮টী ষ্টেট্ আছে। প্রত্যেক ষ্টেটে একটী বা কোনটিতে দুটি ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়, তা ছাড়া আবার প্রাইভেট্

ইউনিভার্সিটিও আছে। জাপানেও তাই,— শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক। জ্ঞানের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে ব'লেই তারা নিজের দেশে দরিদ্র জনসাধারণের হিতার্থে জ্ঞানের পথ উন্মুক্ত ক'রে দিচ্ছে। বাতাস, জল যেমন বিনা মাশুলে মেলে, ঐ সব দেশে তেম্‌নি সৎপুস্তক-রাশিও দরিদ্রের অনায়াসলভ্য সম্পত্তি হচ্ছে। সকলেই তা বিনা মাশুলে পাচ্ছে, তার জন্যে ব্যয় করতে হচ্ছে না। সেখানে ধনীরা বলেন—দরিদ্রের গৃহে শিক্ষার পথ পরিষ্কারের স্থচনামাত্র এখানে হয়েছে; লাইব্রেরী এই স্থচনার প্রধান লক্ষণ। ঐ সব দেশে জ্ঞান পিপাসা অত্যন্ত বলবতী। কিন্তু আমাদের জ্ঞানপিপাসা এখনও হয় নি। পরীক্ষা পাশই আমাদের বরাবর সন্ধান ছিল। তাই দেখতে পাওয়া যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্ষ্ট ক্লাস (First class) এম-এ পাশ ক'রেও কেউ রিসার্চের (Research) দিকে ঘেঁসে না। কারণ তা'তে বিপুল উদ্যম ও ধৈর্য্য চাই, দিনের পর দিন একটানা খাটুনি চাই। কিন্তু সে উৎসাহ কোথায়? তাই বলি প্রায় কোনো গভীর চিন্তাপ্রসূত ফল হয় নি এই লেখা পড়ায়; এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষায়, পৃথিবীর সামনে দাখিল করা যায় এমন কিছু অল্পই আছে।

আপনারা কার্ণেগীর নাম শুনেচেন। তিনি স্কট্‌লণ্ডের লোক। ছেলেবেলায় খবরের কাগজ বিলি করতেন। তারপর নিজের উদ্যমের বলে আমেরিকায় পিট্‌স্‌বার্গে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোহার কারখানার মালিক হয়েছিলেন। ৯০ কোটি টাকা দিয়ে একজন নয়—একদল লোক মিলে তাঁর কারখানা কিনলে। তিনি টাকা নিয়ে স্কট্‌লণ্ডে ফিরে এলেন। তাঁর আয় বছরে ৪ কোটি টাকা হবে, অর্থাৎ সমগ্র বাংলা দেশ থেকে গবর্ণমেণ্ট ভূমির রাজস্ব হিসাবে যত টাকা পান প্রায় তাই। দেশে ফিরে এসে তিনি গ্ল্যাসগো, ডণ্ডী প্রভৃতি বড় বড় সহরে

Workingmen's Institute অর্থাৎ শ্রমজীবীদের জন্যে বড় বড় বিদ্যামন্দির ও গ্রন্থশালা খুলে দিলেন। সমস্ত দিন কলকারখানায় খেটে সন্ধ্যার পর তারা এইসব পাঠাগারে নানারকমের বই, খবরের কাগজ প্রভৃতি পাঠ করে। সেখানে তারা চা, কাফি খায়,—মদ নয়; ইংলণ্ড ও আমেরিকায় মদের বিষময় ফল ফলে। শ্রমজীবীদের পাঠাগারের জন্যে কার্ণেগী অনেক বড় সহরে সাড়ে সাত লক্ষ ক'রে টাকা দিয়েছেন। ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে এ রকম পাঠাগার স্থাপিত হ'তে আরম্ভ হয়েছে। সে সব দেশে মুটে, মজুর, গাড়োয়ান কাগজ পড়্ছে, রাজনীতি আলোচনা ক'র্ছে। যারা মাটীর নীচে খনিতে কাজ করে তারাও কাগজ পড়ে। চাকরাণী, মেথরাণীও দেশের খবর রাখে। জাপানেও তাই। রবিবাবু বল্লেন—জাপানে তাঁর বাসার দাসী তাঁর গীতাঞ্জলির খবর রাখে। দেখুন এই সব জায়গায় জ্ঞানস্পৃহা কত বলবতী। আর আমাদের দেশের দিকে চেয়ে দেখুন। যে বই কেনে সে পড়ে না, আর যার পড়্বার ইচ্ছে আছে তার কেন্বার পয়সা জোটে না। তারপর বই চেয়ে নিয়ে গিয়ে ফেরত দেয় না—ওজর দেখায় অমুক নিয়ে গেছে। এই রকমে দিন কতক কাটিয়ে দিয়ে শেষ বইখানার অস্তিত্ব বিলোপ ক'রে দেয়। এই রকম জঘন্য আচরণে লাইব্রেরী উজাড় হ'য়ে গেছে শুনেছি।

বাঙ্গালী গয়না গড়াবে, চাঁদনীতে নানা ফ্যাসানের কাপড় কিন্বে, নানা রকম বিলাসে পয়সা নষ্ট করবে, কিন্তু পুস্তকে নয়! মান্দ্রাজে দেশীয় লোকের খুব বড় পুস্তকের দোকান আছে। উদাহরণ স্বরূপ—গণেশ কোম্পানী ও নটেশন্ কোম্পানীর নাম করা যেতে পারে। নটেশন্ মোটর চড়েন। প্রথম দেখে মনে হয়েছিল বইএর দোকান ক'রে মোটর হাঁকাচ্ছেন অর্থাৎ পৈতৃক সম্পত্তির অপচয় করছেন।

কিন্তু তা ত নয়—এর পিছনে মান্দ্রাজীদের জ্ঞানের আদর ও পাঠের তৃষ্ণা বর্ত্তমান। তাই তিনি নিজের রোজগারেই মোটর কিনেছেন। আমাদের বাঙ্গলাদেশে Text book ছাত্রপাঠ্য বই না ছাপালে দোকান উঠে যায়; কিন্তু নটেশন্ Text book বা ছাত্রপাঠ্য বই ছাপান্ না। তাঁরা বাংলা তথা ভারতবর্ষের চিন্তাশীল পণ্ডিতগণের বক্তৃতা ছাপান্; রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, মনস্বীগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী, প্রভৃতি নানাপ্রকারের পুস্তক প্রকাশিত করেন। এই কাজে ব্যবসায়ী যে শুধু লাভবান হন্ তা নয়, সৎপুস্তক প্রকাশ ক'রে দেশের একটা অভাবও দূর করেন। তাই বল্‌তে হয় সেখানে জ্ঞানতৃষ্ণা বেশী। কলিকাতার বড় পুস্তকবিক্রেতাকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানা যায় "People's Library" প্রভৃতি সংস্করণের অল্প মূল্যের বই মান্দ্রাজীরা বেশী কেনেন, বাঙ্গালী বড় একটা কেনেন না। বাংলা-দেশে "টেক্‌ষ্ট বুক কমিটি"র—অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তক না হ'লে আর বই উদ্ধারের উপায় নেই। এখানে রসায়ন-সম্বন্ধে ক্ষুদ্র পুস্তকের আদর হয় না। কারণ তার জন্যে "ল্যাবোরেটরী" চাই। কিন্তু ছেলে-দের চিড়িয়াখানায় নিয়ে গেলে জীব জন্তু সম্বন্ধে কৌতূহল হ'তে পারে এই ভেবে একখানা ছোট "প্রাণীবিজ্ঞান" লিখেছিলাম। কিন্তু বইখানা কয়েক বৎসর পড়ে রইলো, কাট্‌তি হ'লো না। কিছুকাল পরে জানি না কেন, সেখানা 'টেক্‌ষ্ট বুক কমিটি'র (Text Book Commitee) অনুমোদিত হ'য়ে গেল। একজন ইন্‌স্‌পেক্‌টার পূর্ব্ব বাংলার একটা অঞ্চলের জন্য সেখানা পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিলেন; ব্যস্, এক নিশ্বাসে সব বই বিক্রী হয়ে গেল।

বিজ্ঞান-কলেজের জন্য স্যর্ তারকনাথ ও স্যর্ রাসবিহারী পঁচিশ লক্ষ টাকা দিয়েছেন। দুটি ল্যাবোরেটরীর প্রত্যেকটিতে ২০ জন

ছাত্রের জন্য বছরে ৫০ হাজার টাকা খরচ করা হয়, অর্থাৎ মাথাপিছু ২৫০০ টাকার উপর ব্যয় হচ্ছে। তবু কি ব্যাপার! প্রকৃত জ্ঞানান্বেষী কজন পাই? অনেক সময় কাঁদতে হয়। এখন ক্রমশঃ হাওয়া ফিরছে। তবে কোকিল একবার ডাক্‌লেই যে বসন্ত সমাগত হয় এমন ভাবলে চলে না। সে বসন্তের অগ্রদূত মাত্র। লণ্ডন, প্যারী প্রভৃতি স্থানের Chemical Journalএ অর্থাৎ রসায়নসম্বন্ধীয় সাময়িক পত্রিকায় প্রত্যেক বারে বর্ণমালা অনুসারে হাজার দু-হাজার রাসায়নিকের নাম থাকে। তার অন্ততঃ ৫০০ জন রসায়ন সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করেন। জার্ম্মানীতে ৫০০০, ইংলণ্ড আমেরিকায় কয়েক হাজার, এবং সমস্ত য়ুরোপে অন্ততঃ ১০,০০০ রাসায়নিক প্রতিদিন মৌলিক গবেষণা করেন। আর আমরা? এই কবির কথায় বিংশতি কোটী—এখন ত্রিশকোটি মানুষ, আমরা কি করছি? আমাদের গর্ব্বের কিছু নেই। আমায় সভাপতি হবার জন্য টানাটানি করেন; আজ সমাজ সংস্কারের আলোচনা, কাল পাটেল বিল; কিন্তু এক মুর্গী কবার জবাই হয়? অন্ততঃ ত্রিশ কোটির মধ্যে ত্রিশ জন (chemist) রাসায়নিক হোক, তবে ত নিষ্কৃতি; নইলে বিশ্রাম কোথায়? শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লণ্ডনে পাঠাগারের প্রচলন দেখে অবাক হয়েছিলেন—

"আমি গিয়া দেখিলাম শিক্ষিত দেশহিতৈষী ব্যক্তিদিগের মনে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের উৎসাহ অতিশয় প্রবল। তাহার ফলস্বরূপ ঐ শ্রেণীর মানুষের মনে জ্ঞানস্পৃহা দিন দিন বাড়িতেছে এবং ব্যবহারের জন্য চারিদিকে অসংখ্য ছোট ছোট পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক রাজপথে দুই-দশখানি বাড়ীর পরেই একটি ক্ষুদ্র পুস্তকালয়; নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা সেখানে নামমাত্র কিছু পয়সা জমা দিয়া সপ্তাহে সপ্তাহে বই লইয়া যাইতেছে ও ঘরে

গিয়া বসিয়া পড়িয়া—সে পুস্তক আবার ফিরাইয়া দিতেছে। ইহার অনেক পুস্তকালয় দোকানঘরের মধ্যে। দোকানদার অপরাপর জিনিসের ব্যবসা করিতেছে, সেই সঙ্গে একপাশে একটি পুস্তকালয় রাখিয়া কিছু উপার্জ্জন করিতেছে। ইহা ভিন্ন স্বল্পমূল্যে বিক্রেয় ব্যবহৃত পুস্তকের দোকান অগণ্য। এইরূপ একটি পুস্তকালয়বিশিষ্ট দোকানে গিয়া একদিন যাহা দেখিলাম ও শুনিলাম তাহা মনে রহিয়াছে। আমি দোকানে অন্য কাজে গিয়া দেখি, একপার্শ্বে দুইটি আল্‌মারিতে কতকগুলি পুস্তক রহিয়াছে। মনে করিলাম পুস্তকগুলি স্বল্পমূল্যের ব্যবহৃত পুস্তক। জিজ্ঞাসা করিলাম—এ-সব পুস্তক কি বিক্রয়ের জন্য?

উত্তর—না, একটা সার্কুলেটিং লাইব্রেরী।

আমি—এ সব পুস্তক কারা লয়?

উত্তর—এই পাড়ার নিম্নশ্রেণীর লোকেরা।

আমি—আমি কি বই লইতে পারি?

উত্তর—হাঁ পারেন, এ ত সাধারণের জন্য।

তারপর আমি একখানি ৬।৭ টাকা দামের বই লইয়া দুই আনা পয়সা জমা দিয়া ও আমার নাম ও বাড়ীর ঠিকানা রাখিয়া আসিলাম। আবার সপ্তাহান্তে বই ফেরৎ দিয়া আবার দুই আনা দিয়া আর একখানি বই লইয়া আসিলাম। এইরূপ তিন চারি সপ্তাহের পর একদিন গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এ ব্যবসা তোমরা কতদিন চালাইতেছ?

উত্তর—গত ৮।৯ বৎসর।

আমি—মধ্যে মধ্যে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হও না?

উত্তর—কিরূপে?

আমি—লণ্ডনের মত বড় সহরে মানুষ এক পাড়া হইতে আর এক পাড়ায় উঠিয়া গেলে খুঁজিয়া পাওয়া ভার। মনে কর যদি বই ফিরাইয়া না দিয়া এ পাড়া হইতে উঠিয়া যায়, তাহা হইলে বই কি করিয়া পাইবে?

এই প্রশ্নে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহারা বলিল, "তা কি করিয়া হইতে পারে? এ যে আমাদের বই? উঠিয়া যাইবার সময় ফিরাইয়া দিতেই হইবে।"

আমি—মনে কর যদি না দেয়!

তাহারা হাসিয়া কহিল, "সে হতেই পারে না"। বই না দিয়া যে কেহ চলিয়া যাইতে পারে—ইহা যেন তাহাদের ধারণাই হয় না।

আপনারা হাজারখানা বই নিয়ে লাইব্রেরী করুন, মাসিক চাঁদা দু আনা। দেখ্‌বেন মাসে মাসে অনেক বই ফাঁক হ'য়ে যাবে।

জগতে দেখা যায় যাঁরা বিদ্যাভ্যাস প্রকৃত করেছেন তাঁরা অনেকেই Self-taught অর্থাৎ নিজের চেষ্টায় শিখেছেন। ডাক্তার জন্‌সনের মত বিদ্বান বিরল। তাঁর অবস্থা ভাল ছিল না, কিন্তু তাঁর পিতার পুস্তকের দোকান ছিল। তিনি পাঠাগার থেকে কোনো বই নিতেন আর একটি উচ্চস্থানে ব'সে একমনে পড়্‌তেন। এইরূপ চেষ্টায় তিনি অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেছিলেন। নব্য বাংলার অভ্যুদয়ের প্রধান উৎস রাজা রামমোহন রায়, রংপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ডিগ্‌বি সাহেবের কাছে ইংরেজী পড়্‌তে আরম্ভ করেন, আর্‌বী পার্শী শিক্ষার অনেক পরে। কিন্তু অল্প দিনে এমন ব্যুৎপত্তি লাভ করেন যে ইংরেজী নবীশরা অবাক্। দেশে কাশী, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে অনেক টোল ছিল। তাই সংস্কৃত কলেজ-প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি ক'রে তিনি একখানা চিঠি লেখেন। বিশপ হিবার সেই চিঠি তদানীন্তন

গভর্ণর জেনারেল্ লর্ড আমহার্ষ্টকে দেন। সে চিঠির ইংরেজী রচনা এত উৎকৃষ্ট হয়েছিল যে তাঁর মৃত্যুর পর সেটি প্রকাশিত হয়,—এশিয়াবাসীর লিখিত ব'লে তার উল্লেখ করে বিশপ্ হিবার বলেছিলেন "Real curiosity অর্থাৎ বিস্ময়ের বস্তু।" তাই বলি যাঁরা প্রতিভাশালী তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধার ধারেন না—নিজের শিক্ষার ভার তাঁরা নিজের উপরেই রাখেন। যদি বল **Dr. Ray, D. Sc.** তবে বুঝ্তে হয় এই যে তাঁর ১৮৮৫ বা ৮৭ সালের ডিগ্রীর কথা হচ্ছে। তার পর ৩৫ বৎসর ধ'রে তিনি রসায়ন বা অন্য কোনো শাস্ত্র সম্বন্ধে যে গবেষণা করলেন, **D. Sc.,** বল্লে সেটাত স্বীকার করা হয় না। স্থতরাং ডিগ্রীটা কিছু নয়,—ওটা অনেক সময় অজ্ঞতার আবরণ মাত্র। অনেকে অমুক সালে দর্শন শাস্ত্রে পরীক্ষা দিয়ে স্থবর্ণ পদক পেয়েছি ব'লে গর্ব্ব করেন; এদিকে হয়ত পরীক্ষার পর পড়া ছেড়েছেন ব'লে হ্যামিল্টন ও রীডের মত ছাড়া নূতন দার্শনিক তত্ত্বের খোঁজ রাখেন না। অনেক ডাক্তার বাবু ১৮৭২ সালের অর্জ্জিত জ্ঞান অনুসারে রোগীর প্রেস্ক্রিপ্সন্ লেখেন। সে কালের মতের খণ্ডন হয়ে কত নূতন মত প্রচলিত হয়েছে তার খবরই রাখেন না। আলোচনা না কর্লে অজ্ঞতা এইরূপই দাঁড়ায়। কিন্তু ইংলণ্ড, আমেরিকায় লোক এত ডিগ্রী চায় না। তারা চায় প্রকৃত শিক্ষা।

আমাদের দেশে একে ত লাইব্রেরীর অভাব, তারপর লাইব্রেরী যেখানে আছে সেখানে পাঠকের অভাব। সাময়িক পত্রে এখন চুট্‌কী গল্পই বেশী। এতে পাঠকের রুচি বিকৃত হ'য়ে যায়। তাঁরা আর কঠিন ভাবপূর্ণ বিষয় পড়তে পারেন না, ঐ চানাচুর, সাড়ে আঠার ভাজাতেই মস্গুল্ হ'য়ে থাকেন। কিন্তু চাই ভাল জিনিষ। উৎকৃষ্ট বিষয়ের অনুশীলন কর্তে লোকের যাতে প্রবৃত্তি ও রুচি জন্মে—তারই

বন্দোবস্ত করবার জন্যে আমাদের সচেষ্ট থাকতে হবে। লাইব্রেরীর যাঁরা প্রতিষ্ঠাতা, এই কার্য্যের ভার তাঁদেরই উপর বিশেষ ভাবে ন্যস্ত রয়েছে। আমার ধারণা পাঠাগারে নভেল যত কম থাকে ততই ভাল। উপন্যাস পাঠের সার্থকতা আছে, এ কথা আমি কখনও অস্বীকার করি না। স্কট, ডিকেন্স, অথবা বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরচ্চন্দ্র প্রভৃতি প্রতিভাশালী লেখকগণের উপন্যাসে অনেক বিচিত্র চরিত্র চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু বাঙ্গালী পাঠকসাধারণের মধ্যে ভাবুকতা ও রস-গ্রাহিতার অত্যন্ত অভাব। তাঁরা উপন্যাস পাঠে গল্পাংশের অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করতে পারেন না। আর সেই কারণেই গভীর ভাবাত্মক কোন বিষয় তাঁদের ভাল লাগে না। লাইব্রেরীতে নানা বিষয়ক উৎকৃষ্ট পুস্তক থাকা চাই: যেমন মহাপুরুষগণের জীবনী, ভ্রমণকাহিনী, ভূগোল, ইতিহাস, ভাবুক লেখকগণের সমাজ, শিক্ষা, নীতি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলী, কাব্যগ্রন্থ এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় পুস্তক। আর থাকা চাই সারগর্ভ প্রবন্ধে পূর্ণ সাময়িক। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে আজকালকার সাময়িক পত্রিকাগুলি নিতান্ত মামুলি ধরণের হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের "বিবিধার্থ সংগ্রহ" বা অক্ষয়কুমারের "তত্ত্ববোধিনী" অথবা বঙ্কিমের "বঙ্গদর্শনের" মত সাময়িক পত্রিকা আর ত দেখি না। নূতনের মধ্যে এই মাসের "প্রবাসী"তে "মেঘদূতের পক্ষিতত্ত্ব" নামক উপাদেয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ইংরেজী সাময়িক পত্রিকা থেকে লোকে Aeroplane বা উড়োজাহাজের ও Arctic exploration বা মেরু সন্ধানের খবরও পায়। আর দুঃখ এই, আমাদের বিদ্যালয়েও কেউ ভাল ক'রে এর খোঁজ নেয় না।

"ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ," কথাটা আমি প্রায়ই ব'লে থাকি। আমার দাঁত পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু সে কথাটা আমি বুঝতে পারি শুধু

খাবার সময়, উৎসাহের সময় কখনও নয়। যুবকেরা আমার সঙ্গে কাজে পাল্লা দিতে পারে না। আমি ৯টা থেকে ৪টা পর্য্যন্ত ল্যাবোরে-টারীতে খাটি। আমি তাদের সমকক্ষ, জুড়িদার। কিন্তু মুস্কিল ত এইখানে। যাঁরা অন্বেষণের জন্য ১০০ টাকা বৃত্তি পাচ্ছেন—এদেশে এক-শ' অর্থাৎ ইংলণ্ডে পাঁচ-শ'—প্রথম বয়সে নবীন উৎসাহে তাঁদের ত আরও বেশী পরিশ্রম করা উচিত। আর যে ছাত্রদের প্রত্যেকের জন্যে সায়ান্স কলেজে বার্ষিক দুহাজার বেশী ব্যয় করা হয় তাঁরাই বা কি করেন? বিশেষ ভাবে বিজ্ঞান অনুশীলন কর্‌বার উৎসাহ ও যোগ্যতা অনেকের মধ্যে ত দেখ্‌তে পাই না; দু-একটির মধ্যে কদাচিৎ পাওয়া যায়।

কিন্তু যাঁরা বিশেষ অনুশীলনে ব্যস্ত অর্থাৎ যারা বিশেষজ্ঞ হচ্ছেন তাঁদের দেখে, সময় সময় আমার ভয় হয়। ঘোড়া যেমন চলে তাঁরা নিজের বুদ্ধিটাকে ঠিক তেমনি একরোকে চালান্, দুনিয়ায় আর কোন দিকে চেয়ে দেখেন্ না। চর্ম্মকারের কাছে যেমন Nothing like leather অর্থাৎ দুনিয়ায় চামড়াই সার বস্তু, ময়রার কাছে যেমন ঘি আর চিনি, বিশেষজ্ঞের নিকট তেম্‌নি তার Special subject, বিশেষ বিষয়টি—Vibration of the Violin string বেহালার তারের অনুসরণ বা অন্য কিছু। (সভায় সায়ান্স কলেজের অন্যতম অধ্যাপক মিঃ রমণ উপস্থিত ছিলেন।) আমার এক ছাত্র আছেন; তাঁর খ্যাতি য়ূরোপে পৌঁছেচে। তিনি একজন এই রকম বিশেষজ্ঞ, একজন D. Sc.। একদিন ছাত্রপরিবেষ্টিত হ'য়ে ব'সে তাঁকে বল্লাম, "আমার ত বয়স হ'ল। B. C. P. W. অর্থাৎ বেঙ্গল্ কেমিক্যাল আমার মেয়ে আর ছাত্রেরা আমার ছেলে। এখন বুড়া বয়সে দেখ্‌চি আমার King Lear রাজা লীয়ারের দশা হবে। কেউ কর্ডেলিয়া

হবেন, কেউ গনেরিল আবার কেউ বা রেগান।” ছাত্র ত শুনে অবাক্—বল্লেন, “তারা কে?—” দুনিয়ার সব রসে বঞ্চিত হয়ে এ রকম রসায়নরসিক হওয়া ত বড় মুস্কিল। আর বিশ্ববিদ্যালয় এর জন্যে বড় কম দায়ী নয়। কুক্ষণে ম্যাট্রিকুলেশনের পাঠ্যতালিকা থেকে ভূগোল নির্ব্বাসিত হয়েছে। পরীক্ষায় কাজে লাগবে না, সুতরাং আমাদের দুলালরা আর ভূগোল পড়্‌বেন না, কে যেন মাথার দিব্যি দিয়েছে। ম্যাপ (Map) টাঙ্গান রয়েছে; পাশ-করা ছেলেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম “বার্লিন কোথায়?” সে ইংলণ্ডের দিকে চেয়ে রইলো। আমার একজন সহাধ্যাপক, তিনি M. Sc তে Figure of the Earth অর্থাৎ পৃথিবীর আকৃতি বিষয়ে গণিতশাস্ত্রমূলক বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজন ভূগোলে সম্পূর্ণ অজ্ঞ—তারা পৃথিবীর আকার নির্দ্ধারণ কর্‌তে এসেছে, কিন্তু ভূতলের উপরে কি কি প্রসিদ্ধ দেশ, নগর বা সমুদ্র আছে সে বিষয়ে তাদের কোনও ধারণাই নেই। তারপর কন্‌স্‌টাণ্টিনোপল্‌ দেখাতে বলায় ম্যাপের উপর অন্ধের মত হাতড়াতে লাগ্‌লো। ইংলণ্ডে কিন্তু এমন হয় না। সেখানে ছেলেরা ভূগোল, প্রাকৃতিক ভূগোল আগে শেখে; পর্ব্বত, হ্রদ, নদী, নগর, দেশের উৎপন্নদ্রব্য প্রভৃতির কথা জান্‌বার আগ্রহ তাদের খুব। আমাদের দেশে পালে পালে পাশ হয়, কিন্তু কেউ কোন খবরই রাখে না।

বিলাতে যারা ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে তাদের মধ্যে শতকরা ১০।১৫ জন কলেজে যায়, কিন্তু এখানে শতকরা ৯৯ জন। কলেজে পড়্‌তে না পেলে তারা ভাবে জীবনটা নষ্ট হ’য়ে গেল। আরে পাশ কর্‌লেই মাটি! কেবল কতকগুলো অকেজো পুতুল সৃষ্টি! শিবপুর কলেজ থেকে একজন এম-এস্‌সি বা বি-এস্‌সি “অনার্স” এর জন্যে

বিজ্ঞাপন দিয়েছে, মাসিক ৫০৲ টাকা। দেখুন কি ব্যাপার দাঁড়িয়েছে। বড় ষ্টেশনে রেলের মুটে মাসে ৫০৲ রোজগার করে। যশোর জেলার শ্রমজীবী গ্রীষ্মকালে পোস্তা থেকে আম কিনে 'গোপালভোগ' 'ক্ষীরভোগ' নাম দিয়ে দিনের বেলা বেচে। আর রাত্রে বেচে বরফ। এতে তারা একজন গ্রাজুয়েটের চেয়ে বেশী রোজগার করে। এ-বিষয় আর কত বল্‌বো! এখন অর্থাগমের নূতন পথ খুল্‌তে হবে, শুধু পাশ কর্‌লে চল্‌বে না। বেঙ্গল কেমিক্যালে প্রথম যিনি ৭৫৲ টাকা পেতেন তিনি এখন ১০০০৲ টাকা পাচ্ছেন। গত বৎসর কারখানার কয়েকজন উচ্চশ্রেণীর রাসায়নিককে পরিচালকগণ যথেষ্ট টাকা পুরস্কার দিয়েছেন। 'Knowledge is power', "বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য" শুধু মুখে ব'ল্‌লে কি চলে? বিদ্যার জোরে য়ুরোপ এত কর্‌লে; আমরা কি পাশকরা ছাড়া কিছুই কর্‌তে পারি না? লেখা পড়া শিখে আমরা কি কেরানী ছাড়া আর কিছুই হ'তে পারি না? যদি এম্‌নি ক'রে শিক্ষার অপব্যবহার কর্‌তে থাকি তবে আমাদের দুর্গতির শেষ কোথায়? কলিকাতার যত লোকসংখ্যা তার প্রায় তৃতীয়াংশ অ-বাঙ্গালী (non-Bengalee)—অর্থাৎ শুধু ইউরোপীয় নয়—মাড়বারী—ভাটিয়া—দিল্লিওয়ালা—হিন্দুস্থানী—ওড়িয়া—চীনে প্রভৃতি লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে এসে বাঙ্গালীর মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে। ব্যবসা বল—বাণিজ্য বল—যত রকম অর্থাগমের প্রকৃষ্ট উপায় সমস্তই বিদেশীর হাতে স'পে দিয়ে আমরা অদৃষ্টের ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপিয়ে হাত পা গুটিয়ে ব'সে আছি—আর শিক্ষিত এই ভান ক'রে উপবাসে ক্লিষ্টদেহে দিন কাটাচ্ছি।

১৪

অধ্যয়ন ও জ্ঞানলাভ

আমি এখন নিজেকে ছাত্র ব'লে গণ্য করি। ঐ জীবন ত্যাগ ক'রে একদিনও অন্য জীবনে পদার্পণ করেছি বলে মনে হয় না। "ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ"—বাস্তবিক এই ঋষিবাক্য বড় সত্য—বড় সার কথা। আর আমাদের এই ছাত্রজীবন ও গার্হস্থ্যজীবনের পার্থক্যের প্রাচীর বড়ই অমঙ্গলকর।

ইউরোপীয় অবস্থাপন্ন লোকের একটি ষ্টাডী অর্থাৎ পাঠাগার থাকে। সেখানে প্রবেশ করবার অর্থ এই—আর যেন কেউ না দেখে বা ঢোকে। যেমন আমাদের দেশের ঠাকুর-ঘর। ভক্ত সেখানে আপন মনে সাধনা করেন, হৃদয়দেবতাকে ভক্তির অর্ঘ্য দান করেন—কিন্তু তা লোকচক্ষুর অন্তরালে—আর কেহ দেখে না। আমাদের পাঠাগারকে ঠাকুরঘরের পবিত্রতায় মণ্ডিত করতে হ'বে, তাকে নিভৃতে স্থাপন করতে হবে—যেন চপলতার গোলমাল সেখানে না পৌঁছায়।

আমাদের দেশে অনেক ছাত্র বাড়ীতে থাকেন, আবার অনেকে মেসে থাকেন। এখানে ছাত্রের প্রধান বিপদ এই যে তার কোন স্বতন্ত্র পাঠাগার থাকে না। বড় লোকে বড় বাড়ীতে থাকেন—নানাকার্য্যের বন্দোবস্তের জন্য তাঁদের অনেক ব্যয় করতে হয়। কিন্তু বাড়ীর ছেলে কিরূপে কোলাহলের বাইরে নির্জ্জনে ব'সে পড়বে সাধারণতঃ কোন বাড়ীতেই তার বন্দোবস্ত থাকে না—এরূপ বন্দোবস্ত যে থাকা দরকার তাও কেউ ভাল ক'রে উপলব্ধি করেন না। আর

মেসের ত কথাই নেই। আমাদের দেশে কথা আছে—'একে উস্‌খুস্ দুয়ে প্যাঠ, তিনে গণ্ডগোল চারে হাট।' মেসে অনেকে একত্র জোটে—কাজেই প্রত্যেকে হাটের মধ্যে গিয়ে পড়ে। হাটে হয় হট্টগোল, সরস্বতী সেখানে টিক্‌তে পারেন না; মন্দিরে যেরূপ ভক্তের জপতপ আরাধনা—পাঠাগারে সেইরূপ ছাত্রের অধ্যয়ন ও সাধনা। ছাত্রের প্রধান কর্ত্তব্য অধ্যয়ন; আর এই অধ্যয়ন তপস্যা ব্যতীত আর কিছু নয়। একাগ্রচিত্ততা এই তপস্যায় সিদ্ধি দান করে।

প্রথমে কথা এই যে—কি ক'রে পড়্‌তে হয়? ক ঘণ্টা পড় তার হিসাব রাখ্‌বার দরকার নেই, কিরূপ একাগ্রতার সহিত অধ্যয়ন কর সেইটাই সবার চেয়ে দর্‌কারী জিনিস। পড়াশুনার উদ্দেশ্য সফল কর্‌তে হ'লে—ঘণ্টার উপর নয়—একাগ্রতার উপর নির্ভর কর্‌তে হয়। আমি আজ সকালে 'খুব' পড়েছি—কিন্তু মোটে একঘণ্টা কি তার কিছু বেশী। এই ভাবে আমি রোজই পড়ি, তা রবিবার নেই, ছুটীও নেই, অবকাশও নেই। এই ভাবে সমানে (নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সহিত) পড়ে যেতে হবে। কিন্তু এদেশে ছাত্রদের প্রধান বিপদ গল্প, খেলা আর আড্ডা। একাগ্রতার ত সম্পূর্ণই অভাব; তার উপর খেয়াল ও হুজুগে, পড়্‌বার সব সময়টা কেটে যায়। পরে যখন পরীক্ষা কাছে এগিয়ে আসে তখন আহার, নিদ্রা ত্যাগ ক'রে, রাত্রি জাগরণে স্বাস্থ্য নষ্ট ক'রে তার জন্যে প্রস্তুত হবার বিপুল প্রয়াস। এ-কে লেখা পড়া বলে না, এ লেখা পড়া নয়, এ ইউনিভারসিটিকে ফাঁকি। কেবল মুখস্থ আর উদরস্থ; পেটুকের মিষ্টান্ন ভক্ষণের মত—একমণ সন্দেশ টপাটপ্ করে গেলা, তারপর গলায় আঙুল দিয়ে বমি। সব সময়টা ফাঁকি দিয়ে পরীক্ষা কাছে এলেই টপাটপ্ মুখস্থ ও উদরস্থ করবার প্রয়াস; তারপর পরীক্ষামন্দিরে গিয়ে একেবারে

বমি। পরীক্ষার পরই সরস্বতীর সঙ্গে সকল সম্বন্ধ লোপ। আর পাশ হ'লে 'হকার' চাচার দোকানে পুস্তক বিসর্জ্জন। মনে পড়ে ছেলে-বেলায় জ্বর হ'ত, আর কেবল মিছরী, বেদানা ও কুইনীন্ খেতে হ'ত। বাল্যজ্বর মনে করিয়ে দেয় ব'লে ঐজিনিসগুলোয় আমায় একটা ভয়ানক বিতৃষ্ণা আছে—ও-গুলো আমার কাছে বিভীষিকা! পাশকরবার পর এদেশের ছাত্রদের পুস্তকের উপর ঠিক্ ঐ রকমই তীব্র বিতৃষ্ণা হয়—বইগুলো তাদের কাছে আতঙ্ক উপস্থিত করে। পুস্তককে আজীবন সঙ্গী করতে হবে, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে পরীক্ষার পর বই আর পাবার জো নাই! শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় একবার কোন ছাত্রকে বলেছিলেন 'ব্ল্যাকীর "সেল্ফ্-কাল্‌চ্যর্" বইখানা দাও ত।' সে জবাব দিলে 'সে বই তালা বন্ধ, দেখ্‌লে ভয় হয়।' এ বড় দুঃখের কথা। সৎপুস্তককে আজীবন সহচর করতে হবে, আজীবন ধ'রে সৎপুস্তক পাঠে ভাব সংগ্রহ করতে হবে, হৃদয়ে উদ্দীপনা জাগিয়ে রাখতে হবে এবং প্রকৃত জ্ঞানেরঅনুশীলন করতে হবে। ইংরেজ কবি সাদি পুস্তককে লক্ষ্য করে যথার্থ ই বলেছেন—

"The mighty minds of old"

* * * *

"My never-failing friends are they."

পুস্তক পাঠের উদ্দেশ্য সফল করতে হ'লে খুব বেশী বই পড়্‌বার দরকার হয় না। অনেকে যা পায় তাই পড়ে, পরিণত বয়সেও তাদের এই অভ্যাস থেকে যায়। তারা কখনও পুস্তক নির্ব্বাচন করে পড়ে না। ছুটী পেলে তারা অনেক রকমে অনেক পয়সা ব্যয় করবে। বেড়াবার সখ মেটাবার জন্যে দামী পোষাক, ট্রাঙ্ক, গ্লাড্‌ষ্টোন্-ব্যাগ কিন্‌বে, কিন্তু ছুটীতে পড়্‌বার জন্যে কি বই সঙ্গে নিয়ে যাবে কখনই তার কিছু স্থির

কর্‌বে না। হাতে যা পাবে তাই পড়বে, কিছু বিচার করবে না। বায়রনের পদ্য থেকে এমার্সন বলেন "He knew not what to say, and so he swore"। প্রথম মনে হ'ল কি পড়্‌ব? খবরের কাগজখানা তুলে নিলাম, আগে খবর পড়্‌লাম, তার পর অন্য কথা পড়া হ'ল, শেষ বিজ্ঞাপনস্তম্ভ পর্য্যন্ত নিঃশেষ করা গেল। কি পাওয়া গেল, কি বোঝা গেল, তার কোন চিন্তাই করলাম না। কিন্তু এরকম ঠিক্ নয়, উদ্দেশ্যবিহীন পাঠ কোনমতেই ঠিক নয়। সবার আগে পড়্‌বার উদ্দেশ্য খুব ভাল ক'রে বুঝ্‌তে হবে, তারপর রুচি অনুসারে পুস্তক নির্ব্বাচন কর্‌তে হবে, কারণ সকলের সব বই ভাল লাগে না, কিন্তু একটা উদ্দেশ্য মনে রেখে তারই উপযোগী পুস্তক নির্ব্বাচন করা এদেশের ছাত্রদের মধ্যে নেই বল্‌লেই চলে। যে-কোনো লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষগণকে যদি জিজ্ঞাসা করে দেখেন "পাঠকগণ নভেল নাটকই বা কত পড়েন আর ইতিহাস ও জীবনীই বা কখানা পড়েন," দেখ্‌বেন তৃপ্তিকর উত্তর পাওয়া যাবে না।

আমাদের ছাত্রদের মধ্যে নভেলের প্রতি একটা ভয়ঙ্কর আগ্রহ দেখা যায়। ভাল-পাশ-করা শিক্ষিতছেলে ছুটীতে যদি নভেল পেলে ত স্নানাহার বন্ধ—যতক্ষণ না বইখানা শেষ হয়। কিন্তু একখানা বড় নভেল পড়্‌তে আমার ছ মাস লাগে, কারণ আমাকে ঠিক সময়-মত কাজ কর্‌তে হয়, ল্যাবরেটরীতে কাজ করার পর আধ ঘণ্টা সময় পেলে পড়ি, নইলে নয়। সব কাজেরই একটা নির্দ্দিষ্ট সময় থাকা চাই—সকলেরই এই প্রণালী অবলম্বন করা উচিত, বিশেষ আমাদের দেশে, যেখানে স্বাস্থ্যের একান্ত অভাব। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে লোকে আজীবন ব্যাধিগ্রস্ত; দেশে খাবার নেই, শরীরে পুষ্টি নেই। সকলেই দীন দরিদ্র, অন্নসংস্থানের ভাবনায় সবাই অস্থির। বাঙ্গালীর প্রধান

পুষ্টিকর খাদ্য মাছ ও দুধ সর্ব্বত্রই দুষ্প্রাপ্য হ'য়ে উঠেছে। একে অস্বাস্থ্যের এইসব কারণ উপস্থিত রয়েছে, তার উপর ছাত্রের অতিরিক্ত পাঠ, কাজেই অল্প বয়সে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় এবং সে কাজের বার হ'য়ে পড়ে। ২৪ ঘণ্টায় একদিন। ছেলেমানুষের আট ঘণ্টা ঘুমুলেই যথেষ্ট হয়। ১৬ ঘণ্টা হাতে থাকে। তার মধ্যে রোজ ৪ ঘণ্টা পড়্লেই প্রচুর। কিন্তু পড়্তে হবে পরিপূর্ণ একাগ্রতার সহিত, নইলে কোন কাজ হবে না। বাঙ্গালী ছাত্রের প্রধান শত্রু—পড়্বার সময় অনেকের একত্র অবস্থান। এরূপ কর্‌লে গল্প আস্‌বেই—অন্ততঃ অতর্কিতভাবে আসবে। আর বাঙ্গালীর প্রধান বিপদ হচ্ছে আড্ডা। বেশী বয়সে আমরা সবাই বসে কাটাই, বাহিরে উঠে হেঁটে বেড়াতে উৎসাহ আসে না, প্রবৃত্তিও হয় না; তাস-পাশাতেই কত সময় কেটে যায়। আবার এই তাসপাশার আড্ডার পাশে অনেক সময় ছেলেরা পড়াশুনা করে। বিপদ্ কি ভয়ানক! ইউরোপীয়ান যখন পাঠাগারে একমনে অধ্যয়ন করে তখন তার স্ত্রীকেও ("May I come in") "আমি কি ভিতরে যেতে পারি" এই ব'লে দরজায় (knock) ঠোকা দিতে হয়। যেন অনিচ্ছাসত্বেও ঘরে যেতে হচ্ছে, যেন শুধু বিরক্ত কর্‌তে। কারণ পাঠাগার ঠাকুরঘরের মত পবিত্র স্থান, সেখানে কথা কওয়া পাপ।

তার পরের কথা—

"Work while you work, play while you play,
This is the way to be cheerful and gay"—

কাজের সময় কাজ কর্‌তে হয়, খেলার সময় খেলা; তা হলেই মনে আনন্দ ও উৎসাহ থাকে। আমি সর্ব্বদাই কাজ করি, আবার অবসর-মত করি না। একজন বড় ইংরেজ দোকানদার আফিসে একমনে

পাঁচ ছয় ঘণ্টা কঠিন পরিশ্রম ক'রে কাজ করে, কিন্তু যেমনি কাজ শেষ হয় অমনি গঙ্গার ধারে—খোলা মাঠে মুক্ত বাতাসে বেড়াতে যায়। তারা সে সময়ে বসে থাকে না—কুড়েমি করে না, আড্ডা বা মজ্‌লিসে জমে না। কিন্তু আমরা স্বাস্থ্য রাখ্‌তে জানি না, সময়ে কাজ করি না, তাই শরীর ও সময় দুইএরই অপব্যবহার হয়; স্বাস্থ্যও থাকে না, কাজও ওঠে না।

এদেশে শুধু বই পড়িয়ে বিদ্যা শেখানো হয়। কিন্তু ইউরোপে সাধারণ পুস্তক পাঠের সঙ্গে প্রকৃতির উন্মুক্ত বিশাল গ্রন্থ পাঠ ক'রে জ্ঞানার্জ্জন কর্‌বার প্রবৃত্তি জাগিয়ে দেওয়া হয়। শুধু বই প'ড়ে কত শেখা যায়? নিজের চেষ্টায় বিশ্বরাজ্যের নানাপ্রকার অদ্ভুত ঘটনা নিপুণচক্ষে পর্য্যবেক্ষণ কর্‌তে হয়; তবেই প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জন হয়। পুঁথিগত বিদ্যার দৌড় কখনই বেশী হয় না। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ডিকেন্স সময়ে সময়ে ছদ্মবেশে মদের দোকানে গিয়ে বসে থাক্‌তেন। উদ্দেশ্য মাতালের কথাবার্ত্তা শুনে তার প্রকৃতি বুঝে দেখা। এই ভাবে নানা রকমে বিখ্যাত ইউরোপীয়েরা মানবপ্রকৃতি নিখুঁত করে জান্‌বার চেষ্টা করেন। এ-ই প্রকৃত অধ্যয়ন। মানবপ্রকৃতির পর জড়প্রকৃতি। পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা তাও বুঝ্‌তে হবে। লণ্ডনের কাছে এক বটানিকেল গার্ডেন আছে, তার নাম কিউ গার্ডেন্‌স্ (Kew Gardens), পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। উদ্ভিদ্‌বিদ্যা আহরণ কর্‌বার জন্যে শত সহস্র বিদ্যার্থী সেখানে যান। নানা রকমের গাছ, তাদের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির নিয়ম—নিজের চক্ষে সুকৌশলে পর্য্যবেক্ষণ ক'রে উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে তাঁরা অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন। আর আমাদের এই সুজলা সুফলা দেশে, এই ভারতবর্ষে গাছের ত অভাব নেই। কিন্তু উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে কি তত্ত্ব জান্‌তে পেরেছি আমরা?

বিলাতে তিন মাস কি তার কিছু বেশী দিন ধ'রে গাছপালার সবুজ পাতা থাকে। অন্য সময়ে কাঁচের ঘরের মধ্যে কলাগাছ প্রভৃতি বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হয়। কিন্তু সে দেশের লোকেরা এই কয়মাসের সুবিধায় উদ্ভিদ্‌বিদ্যা অধ্যয়ন ক'রে সেই সম্বন্ধে নানা সত্য আবিষ্কার করে। আর আমরা এই চিরসবুজ দেশে চিরকালই চুপ ক'রে বসে থাকি। চক্ষুষ্মান কারা? ১৮৪৫ সালে হুকার নামে এক ইউরোপীয়ান্ এদেশে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা আহরণ কর্‌তে এসেছিলেন। তখন দার্জ্জিলিঙ্গের রেল হয়নি। কিন্তু তিনি অশেষ ক্লেশ স্বীকার ক'রে গাছগাছড়া দেখ্‌বার জন্যে সিকিম গেলেন। তারপর সে দেশে বন্দী হলেন; সেই কারণে সিকিমের সঙ্গে যুদ্ধই বেধে গেল। যা হোক্, অক্লান্ত পরিশ্রমের পর তিনি ১০০০০ (দশ হাজার) রকম আবশ্যকীয় গাছগাছড়া সংগ্রহ ক'রে বিলাতে ফিরে গেলেন; সে-সব এখনও কিউ গার্ডেন্সে (Kew Gardens) আছে। আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে ভারতের উদ্ভিদ্‌জ্ঞান ইংরেজের বই প'ড়ে শিখ্‌তে হয়।

রক্‌স্‌বর্গের **Flora Indica** নামে এক অমূল্য গ্রন্থ আছে। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে তিনি সমস্ত ভারত পদব্রজে ভ্রমণ করে নানা রকম গাছ সংগ্রহ করেছিলেন। এবং প্রত্যেকটির বাঙ্গালা, হিন্দি, তামিল নাম জোগাড় করেছিলেন। তাঁর বই সকলে পড়ে। এঁরা ইউরোপীয়ান্ ম্লেচ্ছ, কিন্তু আমাদের চিরস্মরণীয়।

জুঅলজিক্যাল গার্ডেনে ইউরোপীয়েরা নানা রকম পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ প্রভৃতির জীবন-যাপন-প্রণালী অধ্যয়ন করেন। ফরাসী দেশের একজন উকিল কুড়ি বৎসর ধ'রে শুয়াপোকা ও প্রজাপতি কেমন ক'রে এক থেকে অপরে পরিণত হয় তা পর্য্যবেক্ষণ করেছেন,

আর তার একটি কৌতূহলপ্রদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। এ ছাড়া তিনি নিজের চোখে গুটি ও তুঁত-পোকার জীবনযাত্রা দেখে ঐ-সকল কীট থেকে রেশম উৎপন্ন করা সম্বন্ধে অনেক আবশ্যকীয় নূতন কথা সভ্যজগৎকে জানিয়েছেন। আর একজন অন্ধ, মধু-মক্ষিকার ইতিহাস লিখেছেন। তিনি যৌবনে অন্ধ হয়েছিলেন। তাই তাঁর স্ত্রী ও ভৃত্য মধুমক্ষিকার জীবনযাত্রা পর্য্যবেক্ষণ ক'রে সেই-সব কথা তাঁর কাছে বল্‌তেন এবং তিনি বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে তা লিপিবদ্ধ কর্‌তেন। এই প্রকারে হিউবার্ (Huber) তাঁর বিখ্যাত পুস্তক মৌমাছির ইতিবৃত্ত (History of the Bees) লিখেছেন।

ইংরেজ ও আমেরিকানের এক-একটা Hobby অর্থাৎ খেয়াল আছে। কেউ গার্ডেনিং করেন, বাগানে নানারকম ফলফুল উৎপন্ন করেন। এ একটা সুন্দর খেয়াল। কেউ বা প্রাণীতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন, আবার কেউ বা পতঙ্গবিজ্ঞান (Entomology) সম্বন্ধে আলোচনা করেন। আমাদের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল নিজে পতঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। ইংরেজ কখনো ব'সে থাকে না। এই রকম একটা খেয়াল থাকে। এইসকল ব্যাপার অধ্যয়ন করে তাদের সকলেই যে কলেজের অধ্যাপক হয় তা নয়, কিন্তু এইসব কথা পুস্তকে প্রকাশ ক'রে তাঁরা জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করেন, তাঁদের বিলক্ষণ আয়ও হয়।

এদেশে গবর্ণমেণ্ট পুনা কৃষিকলেজে লেফ্রয় (Lefroy) নামক একজন মস্ত পতঙ্গবিজ্ঞানবিৎ (Entomologist)কে আনিয়াছেন। তিনি কোন্ কোন্ পতঙ্গ শস্য নষ্ট করে সে সম্বন্ধে আলোচনা কর্‌ছেন। আমরা জানি শুধু পঙ্গপালই ফসল নষ্ট করে দেয়; কিন্তু

আরও অনেক রকম পতঙ্গ আছে যারা ফসলের বড় কম ক্ষতি করে না। ইনি তাদেরই জীবনচরিত আলোচনা কর্‌ছেন আর কিসে তাদের নষ্ট করে শস্য বাঁচানো যায় তার উপায় আবিষ্কার কর্‌বার চেষ্টা করছেন। এই সকল ব্যাপারের আলোচনা ও অধ্যয়ন আমাদের ব্যবসা ও ধনাগম সম্বন্ধে অনেক সাহায্য করে। যাঁরা পতঙ্গবিজ্ঞান অধ্যয়ন করেছেন, তাঁরা কি করে তুঁতপোকাকে রোগের হাত থেকে রক্ষা করে বর্দ্ধিত কর্‌তে হয় তা জানেন। গুটিপোকার রোগ হলে তা থেকে ভাল রেশম হয় না।" ফ্রান্সে "Disease of Silkworm" অর্থাৎ গুটিপোকার রোগ সম্বন্ধে পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। সেই বই পড়ে যাঁরা রেশমের চাষ করেন, তাঁরা গুটিপোকাকে বর্দ্ধিত কর্‌বার নানারকম উপায় জানতে পেরেছেন, আর সেই কারণে রেশমের চাষে খুব লাভবান হয়েছেন। আর আমাদের দেশে মুর্শিদাবাদ ও বহরমপুরে—যেখানকার উৎকৃষ্ট রেশম এক সময়ে সব দেশে আদৃত হ'ত—সেখানে রেশমের চাষ দিন দিন উঠে যাচ্ছে; কারণ আমরা ঐ কাজ অজ্ঞ চাষাদের হাতে ফেলে রেখে দিয়েছি, যাদের গুটিপোকা সম্বন্ধে খুব বেশী কিছু জ্ঞান নেই।

এই-সমস্ত কারণেই বল্‌ছি যে শেখবার অনেক আছে, শুধু কেতাব পড়্‌লেই হয় না। আমি এলবার্ট স্কুলে পড়তাম। সেখানে প্রত্যেক শনিবার কেশবসেনের বক্তৃতা হ'ত। তিনি এক সময়ে বলেছিলেন, "বাঙ্গালীর ছেলের লেখাপড়া শেখা যেন বালিসের খোলে তূলো পুরে দেওয়া; কেবল ঠাসো আর গাদো।" তার উপর অভিভাবক সর্ব্বনাশ কর্‌ছেন—স্কুলের ছুটি হলেই মাষ্টারবাবুকে ছেলের পিছনে লেলিয়ে দেবেন, ছেলে বিদ্যে শিখ্‌বে। এঁরা হচ্ছেন murderer of boys অর্থাৎ বালকহন্তা; কারণ স্কুলের ছুটির পর

অন্ততঃ দুই বা আড়াই ঘণ্টা খেলা চাই। সে সময়টা খোলা মাঠে ছোটো, দৌড়াও, লাফাও, নদীতে নৌকা বাও। তবে ত স্বাস্থ্য থাকবে, মনে প্রফুল্লতা আসবে। তা নয়, বাড়ী এসেই কেতাব নিয়ে বসো। তার পর কোন্ ছেলে কোন বিষয়ে backward অর্থাৎ কাঁচা, অমনি প্রাইভেট টিউটর লাগাও,—ইংলিশে একটী, সংস্কৃতে একটি, সববিষয়ে একটি একটি। টিউটরের ঠেলায় বেচারি ছাত্র একেবারে dull অর্থাৎ গাধা হয়ে ওঠে, নিজে ভাব্বার বা নিজের উপর নির্ভর কর্বার শক্তি তার একেবারে লোপ পায়। তাই বলি এ প্রথার অনেক দোষ! এমার্সন বলেন, "Guardians are benefactors but sometimes they act like the worst malefactors,"—অভিভাবকগণ ছেলের উপকার করেন বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে ভয়ঙ্কর অপকার সাধন করে থাকেন। বেশী পড়লেই বিদ্যে হয় না, আমি আজীবন ধরে সামান্য একটি বিদ্যা আয়ত্ত করবার চেষ্টা কর্‌ছি, কিন্তু পাঠ ঐ একঘণ্টা।

আমাদের বাঙ্গালীর ছেলের জীবন যেন একটা ভার বওয়া। বেদান্ত-মতে জীবন কিছুই নয়, দুহাজার বছর ধরে আমরা চিরকাল শুনে আস্‌ছি, জীবন মানে কিছুই নয়—নলিনীদলগতজলমিব—এর একটা প্রভাব জাতীয় চরিত্রে ত আছেই। আমরা সকলেই খানিকটা স্বীকার করে নিই যে জীবন একটা দুর্ব্বহ ভার। তার উপর আবার এই ভয়ঙ্কর জীবনসংগ্রাম। সকালে আটটার সময়, বাড়ী থেকে দৌড়োদৌড়ি করে ম্যালেরিয়া-জীর্ণ শরীরখানি নিয়ে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করা অর্থাৎ কলম-পিষে জীবিকা-অর্জ্জনের জন্য সহরের দিকে ছুটোছুটি করা। দিন যে কোথা দিয়ে চলে যায়, দুর্ভাগ্য বাঙ্গালী তা জানতে পারে না—পৃথিবীর কোন আনন্দই সে

উপভোগ করে না। আকাশের উন্মুক্ততা, আলোকের হাসি বা বাতাসের সুখময় স্পর্শ কিছুই তার প্রাণে সজীবতা ও নবীনতা আনয়ন করে না। লাবকের 'জীবনের সুখ' নামে একখানি পুস্তক আছে। ঐ পুস্তকে তিনি বল্‌ছেন—জীবন কি শুধু ঔষধ গেলা? জীবনে আনন্দ উপভোগই বিধাতার উদ্দেশ্য। কিন্তু আমরা কর্ম্মদোষে সেই উদ্দেশ্য বিফল করি। পাখী গায় কেন, প্রজাপতি মধু আহরণ করে কেন, যদি বিধাতার সৃষ্টিতে আনন্দ না থাকে।

লাবক একজন ধনী মহাজন (broker) ছিলেন। অতুল তাঁহার ধন ঐশ্বর্য্য, কিন্তু তিনি লেখাপড়া যথেষ্ট জান্‌তেন। তিনি আজীবন ছাত্র ("student")। অনেক ইউরোপীয় ধনী মৌমাছি পিঁপ্‌ড়া প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা আবিষ্কার করেছেন। আমরা তা বই পড়ে জানি, কিন্তু তাঁরা নিজের চোখে দেখে ঐসব কথা লিখে গেছেন। আমরা চোখ থাক্‌তেও অন্ধ। শুধু চোখ থাক্‌লেই হয় না, সূক্ষ্ম দর্শন চাই। ইউরোপীয়ান্ লেখক লাবক মৌমাছিদের সাধারণতন্ত্র (Republic) সম্বন্ধে এক চমৎকার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। মৌচাকে কেমন করে সকলে কাজ করে সে অদ্ভুত বিবরণ পড়্‌লে মাতোয়ারা হয়ে উঠ্‌তে হয়। লর্ড এভ্‌বেরী (Sir John Lubbock) যে শুধু ধনী ছিলেন তা নয়, কিন্তু তিনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও চিন্তাশীল লেখক। আমাদের দেশের ধনী সাধারণতঃ জবড়্‌জং জানোয়ার হয়। তার নাকের ডগা থেকে ওলন-দড়ি ঝুলিয়ে দিলে ভুঁড়ির দরুণ Perpendicular অর্থাৎ লম্ব রেখার যে বিচ্যুতি হয় তাই তাঁর ধনশালিতার মাপ। ধনী জুড়ি চড়েন আর আয়েসে বিলাসে ডুবে থাকেন। কিন্তু ইউরোপে অনেক স্থলে এরূপ হয় না। বিলাতে মাটির তলায় রেল (under-ground railway) আছে। তাতে

প্রথম দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণী নেই। লাখ্‌পতি ও সাধারণ লোক সব এক সঙ্গে এক জায়গায় বসে। এণ্ড্রু কার্ণেগী একজন ক্রোড়পতি; পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লৌহের মালিক। আমেরিকার পিট্‌স্‌বর্গে তাঁর লোহার কারখানা ছিল। প্রথম বয়সে তিনি খবরের কাগজ রাস্তায় বেচ্‌তেন। তারপর অসাধারণ অধ্যবসায়ের বলে আমেরিকায় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হন। পরে টাকা রোজ্‌গার ত্যাগ করে অধ্যয়নে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করেন। তাঁর ব্যবসা এত বড় ছিল যে একজনে নয়—অনেকে প'ড়ে ৯০ কোটি টাকা দিয়ে সেই ব্যবসাটি কিনেছেন; তার বাৎসরিক আয় হচ্চে সাড়ে চারকোটি টাকা। তিনি শ্রমজীবীদের জন্যে আমেরিকা ও স্কটল্যাণ্ডের অনেক সহরে বিনাব্যয়ে অধিগম্য পাঠাগার স্থাপন করেছেন। মজুরগণ সন্ধ্যার পর যখন অবসর পায় তখন ঐ সমস্ত লাইব্রেরীতে নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠ ক'রে আত্মোন্নতি সাধন করে। কার্ণেগী এখনও (এই বছর দু তিন হয়) অনেক বই লিখ্‌ছেন। নাইণ্টিন্থ্‌ সেঞ্চুরী পত্রিকায় তিনি শ্রমজীবীদের উন্নতি সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। আগেই বলেছি তাঁর আয় ছিল সাড়ে চারকোটি টাকা। আমাদের এই বাঙ্গালা বেহার ও অন্য জায়গার সকল জমিদারের বাৎসরিক আয় জড়িয়ে সাড়ে চারকোটি নয়। এখানকার সকল জমিদারকে একদিকে আর কার্ণেগীকে একদিকে রেখে ওজন করলে টাকায় তিনিই ভারী হবেন। কিন্তু বিচিত্র কথা এই যে তিনি এখনও পড়েন। ছিলেন "ষ্ট্রীটবয়", রাস্তায় কাগজ বেচতেন, কেবল স্বাবলম্বনের জোরে লক্ষ্মী-সরস্বতীর বরপুত্র হয়েছেন।

তোমরা অনেকেই ইউনিভারসিটির ফার্ষ্ট সেকেণ্ড হও; সেটা ভাল; কিন্তু আমাদের দেশের অপযশ। কারণ পাশের পর তোমরা

নষ্টস্বাস্থ্য, ম্যালেরিয়াজীর্ণ, রুগ্ন, ক্লিষ্ট, ক্ষীণদৃষ্টি। এ রকম ভাল-পাশ-করা ছেলের যজ্জীবনম্ তন্মরণম্। ইংলণ্ডে কিন্তু তা নয়। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেরা খুব বেশী পড়ে না, অকালপক্ক হয় না, এঁচোড়ে পাকে না। ১৮৭৫ সালে ফার্ষ্ট ক্লাশ পাশ করে আমরা আজীবন তার দোহাই দিয়ে থাকি, যদিও এই পাশ করার পর লেখা-পড়ার সঙ্গে আর কোন সম্পর্কই আমাদের থাকে না। তারপর এই ফার্ষ্ট ক্লাশ পাশ করাটাই বা কি ? বিশ্ববিদ্যালয়ের যা Academic year তাতে ত দুবছরে দশমাস মাত্র পড়া হয়। এই দশমাস পড়ে সব বিদ্যা আয়ত্ত হয়ে যায় কি ? আজীবন না পড়লে শেখা যায় না। প্রত্যেক দিন নূতন নূতন তত্ত্ব প্রকাশিত হচ্ছে, সে-সকলের খবর রাখ্‌তে হবে। ফার্ষ্ট হও আর না হও, আজীবন পড়বে, পাশ হবার পরেই কেতাবের সঙ্গে সেলাম আলেকম্ ক'রে তার নিকট চিরবিদায় গ্রহণ কি ভয়ঙ্কর! কি সর্ব্বনাশ! এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী দেখলে আতঙ্কে আমার প্রাণ শিউরে ওঠে। তারা ছদ্মবেশী মূর্খ।

এমার্সন বলেন "কোন ছেলে backward অর্থাৎ পড়াশুনায় কাঁচা হলে তিরস্কার কর্‌বে না। সাধারণতঃ ছেলেরা সব বিষয়ে ভাল বা চৌকস হয় না। যে সববিষয়ে ভাল, সে ত একটা miracle—একটা অদ্ভুত কিছু, যা ভূতলে অতুল।" এমার্সন আরও বলেন "কোন ছেলে যদি চুরি করে ক্লাসের বই ছাড়া অন্য বই পড়ে, মাষ্টার তাকে বেত মারেন ; আমি হলে পুরস্কার দিই।" ছাত্র হয়ত নেপোলিয়নের জীবনী বা গোল্ডস্‌মিথের ইতিহাস বা যা তার স্কুলপাঠ্য নয় এমন কিছু পড়ছে, তাতে বাধা দেওয়া অন্যায়, উৎসাহ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত, কারণ সে অনেক নূতন বিষয় শিখতে পার্‌বে। ছাত্রের প্রতি চাপ দেওয়া উচিত নয়, তার প্রতিভার যাতে বিকাশ হয় শিক্ষকদের তাই করা

চাই। ইউনিভারসিটির বাঁধা বই পড়লে বা গোটাকতক পাশ করলে প্রতিভার বিকাশ হয় না। হালিসহরে রামপ্রসাদ জন্মেছিলেন, তাঁর কথা সবাই জান। তিনি হিসাব লেখার এক চাকুরি পেয়েছিলেন, কিন্তু খাতার পিঠে পিঠে কালী-সংকীর্ত্তন লিখতেন। এমন কি ভারতের যে দুজন জগতে অসাধারণ কীর্ত্তি অর্জ্জন করছেন,—রবীন্দ্রনাথ ও রামানুজম্ (ইনি সম্প্রতি রয়েল সোসাইটির সভ্য হয়েছেন) তাঁদের কেহই ইউনিভারসিটির এডুকেশনের ধার ধারেন না, তাঁরা পাশ-করা নন। কিন্তু এই পাশ না করতে পারলেই আমাদের ছেলেদের মুখ আঁধার। (মা বলেন—পোড়াকপাল আমার, ছেলে পাশ হলো না।) আবার সময় সময় ছেলে আত্মহত্যা ক'রে বসে। আমি বলি—তোমার যা ভাল লাগে তাই কর। উৎসাহের সহিত একটা নূতন কিছু আরম্ভ করে দাও। কারণ উকিল ডাক্তার ও কেরাণী এই নিয়ে জাতি টেঁকে না। আমাদের চরম দুর্গতি হয়েছে। এখন আমাদের নানা বিষয়ে, অর্থকর বিষয়ে, ব্যবসাবাণিজ্যে মন দিতে হবে। এ সম্বন্ধে আমি আমার লিখিত "বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার" নামক পুস্তিকায় কয়েকটা কথা লিখেছি, তোমরা সেটা পড়ে দেখো। আমাদের অবস্থা দেখে মনে হয় বিধাতা যেন বলেন, "বাঙ্গালীর ছেলে, শরীর নষ্ট করবি আর কেরাণীগিরি করবি ; তার বেশী কিছুই নয়।" এ অবস্থায় থাকলে চলবে না, এ জীবনের পথ নয়, মৃত্যুর পথ ; এ পথ থেকে ফিরতেই হবে।

১৫

জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা। *

মাননীয় সভাপতি ও সমাগত ভদ্রমহোদয়গণ,—

এই মেদিনীপুরের প্রান্তে উপস্থিত হইবার পর হইতে আপনারা যেরূপ বর্ষাকালের বৃষ্টির ন্যায় আমার মস্তকোপরি কৃপাবারি বর্ষণ করিতেছেন তাহাতে আমি অভিভূত হইয়াছি। বাস্তবিক আপনারা আমার প্রতি যে ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন আমি তাহার সহস্রাংশের একাংশেরও উপযুক্ত নহি। ইহা আপনাদের দয়া ও সহৃদয়তার চিহ্ন মাত্র। আমি আগন্তুক, তাই অতিথি সৎকারের ভাজন হইয়াছি। যাহা হউক এই ব্যক্তিগত বিষয় লইয়া আর আপনাদের সময় নষ্ট করা উচিত নহে।

এই যে মহতী সভা—এই সভায় উপস্থিত হইবার পর আমার মনে অনেক নূতন ভাবের উদ্রেক হইতেছে। আমি বাংলার যে অংশে থাকি তাহা ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-প্রধান স্থান। সেখানে এক রকম দেখিতেছি। আমার জীবনের যে প্রধান সাধনা তাহা এখানে কিয়ৎপরিমাণে সিদ্ধির পথে উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। এখানে মাহিষ্য সমাজের প্রাধান্য, তাহা ছাড়া আপনারা এই সভায় পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়, নমঃশূদ্র, তন্তুবায় প্রভৃতি সমাজের প্রতিনিধিগণকে আহ্বান করিয়াছেন। ইহাতে

---

* মেদিনীপুর জেলার কলাগাছিয়া গ্রামে প্রদত্ত বক্তৃতা ১৫ই জানুয়ারী ১৯২৪।

দেখা যাইতেছে যে মহাত্মা যে আদর্শ দেখাইতেছেন তাহা এখানে প্রতিফলিত হইতেছে। মহাত্মা গান্ধী যে কত বড় একজন পুরুষ, কেন যে তিনি শুধু ভারতে নয় অনেক সুসভ্য দেশেও যুগাবতার বলিয়া গণ্য হইতেছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

জাতীয় শিক্ষা—কেন আমি এখানে আসিয়াছি? কোন্ ডাকে আসিয়াছি? আপনাদের জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত পরেশনাথ মাইতি ৪।৫ মাস পূর্ব্বে আমাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। আমি মেদিনীপুরের শ্রীযুক্ত সাতকড়িপতি রায়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "আপনাদের জেলায় কলাগেছিয়া বলিয়া কোন জায়গা আছে? তিনি বলিলেন "হাঁ, আছে, সেখানে কয়েকজন ত্যাগী যুবক আছেন, তাঁহারা অন্য জীবনোপায়ের পথ না রাখিয়া দেশের উন্নতির জন্য অনেক চেষ্টা করিতেছেন।" ভগীরথ যেমন শঙ্খনিনাদ করিয়া মর্ত্তে গঙ্গা আনয়ন করিয়াছিলেন, আপনাদের জাতীয় বিদ্যালয়ের সম্পাদক জগদীশবাবুও সেইরূপ বিদ্যারূপিণী গঙ্গাকে আপনাদের দ্বারে আনিয়াছেন। আপনারা এক এক ঘটী না হউক এক এক গণ্ডুষ পূত সলিল গ্রহণ না করিলে বড়ই ক্ষোভের বিষয় হইবে।

আমি জাতীয় বিদ্যালয়ের জন্য এ দেশ সে দেশ ঘুরিয়া বেড়াই কেন? বরিশাল, বিক্রমপুর প্রভৃতি অনেক জায়গায় গিয়াছি। এখানেও আমার আসার কি প্রয়োজন ছিল? আমি ত আজীবন "গোলামখানায়" দাসখত লিখিয়া বসিয়া আছি। ২৫।২৬ বৎসর চাকুরী করিয়া পেন্সন ভোগ করিতেছি। বাংলার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড রোণাল্ডসে স্বয়ং আমাকে পত্র লিখিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টের মেম্বার করিয়া দিয়াছেন। আমি বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অবৈতনিক অধ্যাপক। এইরূপে আমি অনেকগুলি "গোলাম-

খানার” সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছি। যাঁহারা খুলনা জেলার কোনও খবর রাখেন তাঁহারা জানেন আমি খুলনার অনেক স্কুলের (affiliated) অনুষ্ঠাতারূপে পরিগণিত, এবং সেখানকার বাগেরহাট কলেজের সহিতও সম্পর্কিত। সেই আমি—আমার কি অধিকার এই জাতীয় বিদ্যালয়ে আসিয়া দাঁড়াই! ইহার কৈফিয়ৎ আপনারা চাহিতে পারেন। যে মাতাল, যে মদের নেশায় সর্ব্বস্বান্ত, মদ খাওয়ায় কত অনিষ্ট সে যেমন জানিতে পারে শুধু বইতে মদের অপকারিতা পড়িয়া কেহই তেমন জানিতে পারে না। তাহা বলিয়া আমি গবর্ণমেণ্টের স্কুল কলেজ পরিত্যাগ করিতে বলিতেছি না। কিন্তু জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে আমি অনেক চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি এবং তাহার যে উপযোগিতা কি—বিশেষতঃ আপনাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে—তাহা আমি বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছি।

আমি গোলামখানার সহিত সম্পর্কিত হইলেও মুসলমানগণ আমাকে আলিগড় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি বিতরণ (Convocation) উপলক্ষে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হাকিম আজমল খাঁ প্রথমে ঐ জন্য আমাকে তার করেন। আমি জানাইলাম আমার কাজ অনেক, এখন যাওয়া সম্ভব নহে। তখন হাকিম আজমল খাঁ ও ডাক্তার আন্সারী উভয়ে মিলিয়া আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহাদের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। কয়দিন পরেই সেই আমিই আবার সবরমতী গুজরাট বিদ্যাপীঠে—যেখানে মহাত্মার আশ্রম—তাহার ভিত্তি সংস্থাপনের জন্য আহূত হই। এবারও চুপ করিয়া থাকিতে পারি নাই। এ বড় অদ্ভুত! বাংলা দেশেও যত জাতীয় বিদ্যালয় আছে সব স্থান হইতে আহ্বান পাই। কি কারণ? কেন আসি? শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা বিদ্রূপ করেন তাঁহারা বলেন জাতীয় বিদ্যালয়-

গুলি মরিয়া গেল—অনেকগুলি উঠিয়া গিয়াছে—২।৪টী মাত্র শ্বাস টানিতেছে— ও-গুলিকেই বা রাখিয়া দরকার কি? কলাগেছিয়া জাতীয় বিদ্যালয় উঠিয়া গেলে আপনাদের অনেক ক্ষতি হইবে। বাংলা দেশে জাতীয় বিদ্যালয় টেকে না কেন? অতি সহজেই ইহার উত্তর দেওয়া যায়। ইহার কারণ বাংলার ব্রাহ্মণ বলুন, কায়স্থ বলুন, বৈদ্য বলুন; ইঁহাদের লেখাপড়া শিখিবার মূলমন্ত্র চাকুরী। আবার অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই রোগ সংক্রমিত হইতেছে। ইহার ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে একজন গ্রাজুয়েট ৩০৲ টাকাও উপায় করিতে অক্ষম। কিন্তু একজন কুলী ইহা অপেক্ষা অধিক উপার্জ্জন করে। তাহা বলিয়া লেখাপড়া বাদ দেওয়া উদ্দেশ্য নয়। এত চাকুরী কোথায় পাওয়া যাইবে? রজনী সেনের একটী গান মনে পড়ে যাহার অর্থ এই যে আদালতে মক্কেলের চেয়ে উকীল বেশী। গানটী এই—

"উকীল

দুর্দ্দশার কি দিব ফর্দ্দ?
দেখ হয়েছি বেহায়ার হদ্দ;
কাজ যত, তার ত্রিগুণ উকীল,
মক্কেল তাহার অর্দ্ধ।"

আবার গবর্ণমেণ্টও ব্যয়-সংক্ষেপ করিতেছেন। চাকুরীর সংখ্যা বরং কম হইবে কিন্তু বাড়িবে না। যে কয়জন বৎসরের মধ্যে মরে বা পেন্সন পায় ততটী চাকুরী খালি হয়। আবার মাহিষ্য, বারুই প্রভৃতি জাতি শিক্ষায় অগ্রসর হইতেছে। আর মুসলমান ভ্রাতাদের ত কথাই নাই। হাজার হাজার গ্রাজুয়েট—হাজার হাজার চাকুরী কোথায় পাওয়া যাইবে! চাকুরীকে উদ্দেশ্য করিলে চলিবে না। তারপর আমেদাবাদেই বা জাতীয় বিদ্যালয় ভাল চলে কেন? গুজরাটে জাতীয়

বিদ্যালয়ে ছাত্রের স্থান সঙ্কুলান হয় না। সেখানে গিয়া একটী অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া আসিয়াছি। আমাকে এক জায়গায় স্কুলের কর্তৃপক্ষ সদর রাস্তায় লইয়া গেলেন। সেনাপতি যেমন সৈন্য পরিদর্শন করেন, সেইরূপ দেখিলাম প্রায় ১০ হাজার নিম্ন প্রাথমিক ছাত্র-ছাত্রী সারি দিয়া আমার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। আমেদাবাদে এক জায়গায় একটী উচ্চ শ্রেণীর জাতীয় বিদ্যালয়ে দুই হাজার ছাত্র পড়ে। ইহার কারণ অন্য কিছু নয়, কেবল গুজরাটে সকলেই ব্যবসায়ী। ব্যবসাই তাহাদের অবলম্বন। মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, গুজরাটীদের জিজ্ঞাসা করুন—লেখাপড়া শিখিয়া কি চাকুরী করিবে? তাহারা বলিয়া বসিবে—আমরা কি বাঙ্গালী বাবু যে চাকুরী করিব, নোকরী করিব? হয়ত আপনাকে প্রহার করিতে আসিবে। গুজরাটে, আমেদাবাদে ও বোম্বাইএ কাপড়ের কলের মালিকগণ যুদ্ধের সময় শতকরা ১৫০।২০০৲ টাকা মুনফা পাইয়াছে। শ্রীযুক্ত নরোত্তমদাস মোরারজি,-শোলাপুরের একটী কলের ম্যানেজিং এজেন্ট, তিনি অংশীদারগণকে শতকরা হাজার টাকা মুনফা দিয়াছেন। বাংলার ধন কি? যদি এক বৎসর অজন্মা হয়, প্রজা খাজনা না দেয়, তবে কতজন জমিদার আছেন, যাঁহারা "মহামহিম শ্রী—" না লিখিয়া থাকিতে পারেন? এই ত আমাদের দেশে বর্দ্ধমান মহারাজার নীচেই কাশিম বাজারের মহারাজা। তিনি এক কোটী টাকার জন্য একটী ইউরোপীয় কোম্পানীর নিকট জমিদারী বন্ধক দিতে বাধ্য হইতেছেন। বোম্বাইয়ে এমন অনেক ব্যবসায়ী আছেন, যাঁহারা এককোটী টাকার চেক্ হাসিতে হাসিতে দিতে পারেন। বাঙ্গালী যদি জীবন সংগ্রামে জয়লাভ করিতে চায়, তবে তাহাকে ব্যবসা অবলম্বন করিতে হইবে। বাংলার যা কিছু রক্ত, যা কিছু সার তাহা বিদেশীগণ শোষণ করিয়া লইতেছে। বাংলার

অন্নসমস্যার সমাধানের জন্য আমি অনেক প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত আছি। আমি স্কুল মাষ্টার—অনেক সময় বলি যাঁহারা স্কুলে শিক্ষকতা করেন তাঁহাদের মাথায় কিছুই নাই। তাঁহারা সংসারে অনভিজ্ঞ। তাঁহারা অনেক সময় ন্যায়শাস্ত্র ও স্মৃতির পণ্ডিতের ন্যায় এক হাতে কাছা, এক হাতে গাড়ু লইয়া গ্রামান্তরে চলিয়া যান। সংসারের কোনও ব্যাপারই তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। আমি স্কুল মাষ্টারের নিকট স্কুল মাষ্টার, ব্যবসায়ীর নিকট ব্যবসায়ী। আমি ৮টী যৌথ কারবারের সহিত সংশ্লিষ্ট। তাহাদের মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা। আমার প্রিয় বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের বর্ত্তমান মূলধন প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে উহা মাত্র ৮০০৲ টাকা লইয়া আরম্ভ করি। একদিন আমার ছোট ভাইর উপর চিনি কিনিবার ভার দেই। সে শ্যাম বাজারের এক ডাক্তারখানার বিলের টাকা হইতে বড় বাজারে গিয়া চিনি সওদা করিবে, তবে আমি সিরাপ প্রস্তুত করিব। ট্রামের ভারা ৪ পয়সা জুটিল এক পয়সা জুটিল না। লেখা পড়ার সহিত ব্যবসার অনেক পার্থক্য। বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠার সময় কুমিল্লার এক ব্রাহ্মণ সন্তান আদালতে পিয়াদা হইবার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ পরিশ্রম করিতে পারিবে না বলিয়া মুন্সেফ তাঁহার আবেদন না-মঞ্জুর করেন। সেই তাঁহার সৌভাগ্য। চাকুরী করিলে তিনি হয়ত আজ মাসে ১৫৲ টাকা বেতন পাইতেন। এই ব্রাহ্মণ-সন্তান বিফল মনোরথ হইয়া নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি ব্যবসা করিয়া এখন বৎসরে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন এবং তাঁহার অধিকাংশ উপার্জ্জন কুমিল্লার শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে ব্যয় করেন। তিনি তাঁহার স্বচরিত 'ব্যবসায়ী' নামক পুস্তকে সমস্ত ব্যক্ত করিয়াছেন। ইনি কলিকাতার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ঔষধবিক্রেতা শ্রীমহেশচন্দ্র

ভট্টাচার্য্য। তাঁহারও মত, পয়সা উপার্জ্জন করিতে হইলে স্কুল কলেজে অধিক লেখাপড়ার কোনও আবশ্যক থাকে না। এই যে পিতামাতা অনাহারে থাকিয়া, এমন কি বিধবা মাতা গায়ের গহনা বন্ধক দিয়া পুত্রকে মাসে ৪০।৪৫৲ এমন কি মেডিকাল কলেজে পড়িবার জন্য মাসে ৬০৲ টাকা দিয়াও কলিকাতা পাঠান, তাহাতে শ্রীমানদের ইহকাল পরকাল যায়। তাহারা একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। তাহারা থিয়েটার দেখে, সিনেমা দেখে, গায়ে পাঞ্জাবী, হাতে রিষ্ট ওয়াচ, পায়ে পামসু, পরণে মিহি কাপড়, আর নাদুশ নুদুশ নন্দদুলালের মত চলন। তাহারা ছুটীতে বাড়ী আসিলে যেমন সাহেবদের গ্রেহাউণ্ড কুকুর দেখিয়া গ্রাম্য কুকুরগুলি ঘেউ ঘেউ করিতে থাকে, তেমনি পল্লীগ্রামের গো-বেচারা ছেলেরা তাহাদের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া থাকে। সহুরে ছেলেরা গ্রামে কত রকম ফ্যাসান দেখান, তাঁহারা থিয়েটার দেখান, তাঁহাদের কতরকম সেভিং এপারেটাস দেখান, সঙ্গে সঙ্গে আবার Hazel Snow. এখনকার ছেলেরা একবেলা রান্না করিয়া খাইতে পারে না। এই সকল অকর্ম্মণ্য পুতুল লইয়া দেশের কি কাজ হইতে পারে? ননীর পুতুল হইয়া পড়ে বলিয়া আমাদের ছেলেরা ব্যবসা করিতে পারে না। আপনাদের সব ছেলে কলেজে বিদ্যা-দ্রিগ্‌গজ্ হইয়া মুন্সেফ্, ডেপুটী, কেরাণী হইলে আপনাদের সব ক্ষেত পড়িয়া থাকিবে। তাই আমি বলি এখানে যদি জাতীয়ভাবে শিক্ষা হয়, জাতীয়তা রক্ষা হইবে, দেশাত্মবোধ জাগ্রত হইবে। একটী জাতীয় বিদ্যালয় ও একটী গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের মধ্যে তফাৎ কি? আমি আমার গ্রামের স্কুলের স্থায়িত্বের জন্য কিছু সম্পত্তি দান করিয়াছি। একা গবর্ণমেণ্ট প্রায় ৪৫ হাজার টাকা গৃহ নির্ম্মাণের জন্য দান করিয়াছেন। ইন্‌স্পেক্টর স্কুল গৃহ দেখিয়া বলিলেন যে, ইহা Finest

building in Khulna, and one of the finest buildings in Bengal. কিন্তু আমার মন আর গ্রামমুখী হইতে ইচ্ছা করে না। আমি সেই স্কুলের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু কেহ মানুষ হয় নাই। পাশাপাশি গোলামখানা ও জাতীয় বিদ্যালয় থাক্—তাহাদের মধ্যে অনন্ত তফাৎ দাঁড়াইবে। জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা মাথা উঁচু করিয়া থাকে, ইহাদের মধ্যে দেশমাতৃকার প্রতি ভালবাসা জাগ্রত, ইহারা নর-নারায়ণের সেবায় সর্ব্বদা ব্যগ্র।

জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সব সময় জানে যে ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। দুর্ভিক্ষ আর বন্যায় তাহারাই সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হয়। খুলনার দুর্ভিক্ষের জন্য ৩ লক্ষ টাকা ও উত্তর বঙ্গের জল-প্লাবনের জন্য ৭ লক্ষ টাকা দেশবাসী আমার হাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত টাকাই আমাকে ব্যাঙ্কে জমা দিতে হইত অথবা দাতাদিগের নিকট ফেরত দিতে হইত যদি জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র ও কংগ্রেস কর্ম্মিগণ আমাকে অম্লানবদনে অকাতরে সাহায্য না করিতেন। এই সব স্বেচ্ছাসেবক আসিয়াছিলেন ফরিদপুর, মাদারিপুর, বাজিতপুর, বিক্রমপুর ও বরিশাল হইতে। খুলনার নয়, যশোহরের নয়, পশ্চিম বাংলার নয়, মেদিনীপুর হইতেও বেশী পাই নাই। এখনও ৫০।৬০ জন স্বেচ্ছাসেবক সেই সকল স্থানে কাজ করিতেছেন। আপনাদের এই জাতীয় বিদ্যালয়টীকে রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা বলিয়া আমি ৯০০ শত affiliated স্কুল ভাঙ্গিতে চাই না। আপনাদের অধিকাংশ কৃষিজীবী, কৃষিই আপনাদের প্রধান উপজীবিকা। নিজের হাতে জমি চাষ করিতে হইবে, নিজেকে কোদাল ধরিতে হইবে—তবেইত ঠিক মানুষ হইবে।

ভাটিয়া, মাড়োয়ারীরা আমাদের দেশকে জয় করিয়াছে কেন?

আর আমরা কলমপেশা হইতেছি কেন? লজ্জাই আমাদের সর্ব্ব নাশের কারণ। আমরা এমন বিলাসী যে একটা ইলিশ মাছ বাজারে যদি ৷৷৵০ আনায় কিনি তবে কুলী করিয়া আনিতে ৵০ লাগে। আর যদি রাত্রি হয় তাহা হইলে এ দিক ওদিক তাকাইয়া চোরের মত কোনওরূপে ঘরে লইয়া আসি। এ দিকে দেখুন, সাহেবেরা কেমন শ্রমী, তাহারা nation of shop-keepers বটে কিন্তু তাহারা nation of beggars নহে। তাহারা কেমন জামার আস্তিন গুটাইয়া মই লইয়া ক্রেতাদের মন যোগাইবার জন্য হাজার হাজার জিনিস দেখাইতেছে। কোনওরূপে পছন্দ করাবেই—জিনিস কিনাবেই। তাহারা কোনওরূপেই ক্রেতাকে অসন্তুষ্ট করে না। আমরা মেসে থাকি, ৬৷৭ টাকা ঘরভাড়া দেই, বিবাহের বরযাত্রীর মত আমরাও ঘরের মধ্যে পড়িয়া থাকি, মাছ হোমিওপ্যাথিক ডোজে খাই, ডালও যা খাই তা গঙ্গার জলের ন্যায় পাত্‌লা। আমি প্রতিভাশালী ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার বারণ করি না। জমিদারের ছেলেরা সকলেই উচ্চশিক্ষা করিলে তাহাদের জমিদারী দেখিবে কে? তাহারা চাকুরীর জন্য দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেলে দেশের কল্যাণ হইবে কি করিয়া? শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের "পল্লীসমাজ" পড়িলে পল্লীগ্রামের অবস্থা বেশ বুঝা যায়। অশিক্ষিত লোক দেশে বসিলে কেবল মামলা মোকদ্দমার সৃষ্টি করে এবং সমাজের দোহাই দিয়া একে অন্যকে এক ঘরে ইত্যাদি করিয়া বাঙ্গালী মস্তিষ্কের অপচয় করিয়া থাকে। যাহারা ইংরাজী শিক্ষা করে তাহারা কেবল চাকুরী, চাকুরী ক'রে ৩০৲ মাহিনায় বিদেশে উপবাস করিবে তবুও পল্লীগ্রামে থাকিবে না। সৌভাগ্য যে এখন আর চাকুরী মিলিতেছে না। জাতীয়ভাবে ছাত্রদিগকে শিক্ষিত করিয়া আমাদের যুবকগণের চাকুরীর মোহও নষ্ট করিতে হইবে।

যেমন সৈন্যগণ সেতুবন্ধন করিয়া নদী পার হয় এবং সম্মুখে শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পশ্চাদ্ধাবিত হইবার সম্ভাবনা দূর করিবার জন্য নিজেরাই সেই সেতু নষ্ট করিয়া দেয়—সেইরূপ জাতীয়ভাবে শিক্ষা লাভ করিলে শিক্ষার্থী দিগের অনন্যোপায় হইয়া চাকুরী অবলম্বন করিবার আশা থাকে না। জাতীয় শিক্ষার আর একটা উপকারিতা আছে। অতি অল্প-দিনের মধ্যে ভারতকে জগৎসভায় স্থান পাইতে হইলে তাহার সন্তান-গণকে জাতীয়ভাবে শিক্ষিত হইতে হইবে। জাপান নিজের জাতীয়তা রক্ষা করিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিয়াছিল বলিয়াই গত ৫০ বৎসরের মধ্যে তাহার এই অভূতপূর্ব্ব উন্নতি। জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিলে একই সময়ের মধ্যে ১০ গুণ অধিক শিক্ষালাভ করা যায়। কারণ, এখানে মাতৃভাষায় সমুদায় বিষয় শিক্ষালাভ করিয়া শিক্ষার্থিগণ পাশ্চাত্য ভাষার শব্দ গাম্ভীর্য্য, ব্যাকরণ বিভীষিকার হাত হইতে নিষ্কৃতি পায়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বলিয়াছেন, মহামতি জষ্টিশ রানাডে একদিন প্রশ্ন উত্থাপন করেন—ইংরাজ শাসনে আমাদের কি কি অপকার সাধিত হইয়াছে? তিনি উত্তরে বলেন আমাদের দেশে সমস্ত ধন শোষিত হইয়া বিদেশে যাইতেছে এবং শাসনে আমাদের কোনও হাত নাই। কিন্তু রানাডে মহাশয় মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিলেন "সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্ট এই যে আমরা সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীর মধ্যে পড়িয়াছি। আমাদের wider outlook কমিয়া যাইতেছে। দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তা কমিয়া গিয়া আমরা খুঁটিনাটি লইয়া আছি। এবং তাহাতে আমাদের সর্ব্বনাশ হইতেছে। যদি আমাদের স্বরাজ থাকিত তাহা হইলে আর এমনটি হইত না।" জাতীয় বিদ্যালয়ে পড়িলে এই কৌপীনধারী মহাত্মা এবং যাঁহারা দধীচির মত সর্ব্বস্ব দিয়া দেশের সেবা করিয়াছেন, তাঁহারাই ছাত্রদিগের আদর্শ হন। সেই

সব ভারত মাতার সুসন্তান ধন্য। দেশ তাঁহাদিগকে শীর্ষস্থান দিবেই। মেদিনীপুরে ২৬ লক্ষ লোকের বাস, এখানে ৪টী জাতীয় বিদ্যালয়ের স্থান নাই বলিলে চলিবে কেন ?

বহিমিয়া এখন স্বাধীন হইয়াছে—তাহা বোধ হয় জানেন। কিন্তু যখন ইহা পরাধীন ছিল তখন মুষ্টিমেয় কয়েকজন যুবক জাতীয় শিক্ষার প্রচার করিয়া ঐ দেশ স্বাধীন করিবার কল্পনা করিতেন। এক দিন তাঁহারা বলিয়াছিলেন "If the ceiling of the roof under which we sit, were to fall and crush us there would be an end of the national Government." সেই মুষ্টিমেয় যুবকসম্প্রদায় দেশের মধ্যে যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে তাহাতে সমগ্র দেশের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছিল। আজ এই একটী নিতান্ত গণ্ডগ্রাম কলাগেছিয়াতে এই যে জন কয়েক যুবক তুষের আগুন জ্বালিয়াছেন, অদূর ভবিষ্যতে ইহার আভায় সমস্ত দেশ উজ্জ্বল হইবে। কিছুদিন পরে যখন মেদিনীপুরের ইতিহাস লিখিত হইবে—(তখন হয়ত আমার দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হইবে)—তখন তাহাতে কলাগেছিয়ার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবে। এবং মেদিনীপুরের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম জাতীয় বিদ্যালয় কলাগেছিয়াতে স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া মেদিনীপুরের ইতিহাসে কলাগেছিয়ার নাম অতি উচ্চস্থান লাভ করিবে।

স্ত্রী শিক্ষা—

সময় সংক্ষেপ, বলিবার অনেক কথা আছে। দেশে স্ত্রী-শিক্ষা দিতেই হইবে। মা যতদিন মুর্খ থাকিবে ছেলের ততদিন কোনও উন্নতি হইবে না। আপনারা যতই M. A, B. A. হউন না, আপনাদের সহধর্ম্মিণী নিশ্চয়ই গণ্ডমূর্খ। মার স্তন্য পানের সময়ই প্রকৃত শিক্ষার সময়। আপনারা রবীন্দ্রনাথের, সহধর্ম্মিণীর স্বামীর নিকট সেই

"টোপাকুল ও আইমার কাছে যাব" গল্প জানেন। স্বামী যতই শিক্ষিত হউন না কেন তাহাতে দেশের ও সমাজের কিছুই উপকার হইবে না যতদিন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এমন একটা উচ্চ প্রাচীর ব্যবধান থাকিবে যাহা কখনই উল্লঙ্ঘন করা যাইবে না। আপনারা 'আলো ও ছায়া' প্রণেতার সেই কবিতাটী জানেন "তোমাতে আমাতে মিলন, আলোক আঁধারে যেমন"। স্ত্রী-শিক্ষা না হইলে কিছুতেই চলিবে না। গ্রামে গ্রামে স্ত্রী শিক্ষা চাই। নেপোলিয়ান বলিয়াছিলেন ফ্রান্স দেশে যতদিন না মা তৈয়ার হইতেছেন, ততদিন ফ্রান্সের উন্নতি অসম্ভব। আমাদের দেশেও সেই অবস্থা। গ্রামে গ্রামে অন্ততঃ নিম্ন প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় থাকা নিতান্ত প্রয়োজন

খদ্দর—

চরকা ধরুন। ঘরে ঘরে তূলার চাষ করুন। সেদিন অন্ধ্রদেশ হইতে আসিয়াছি। সেখানে শতকরা ৯৫ জন খদ্দর পরেন। আমরা বেশী সুসভ্য, তাই খদ্দর পরি না। তাহাদের ক্ষেতে তূলা উৎপন্ন হয়, তাহারা বাঙ্গালীর মত এত সুসভ্য নয়। আমরা যে বেশী সুশিক্ষিত হইয়াছি। মিহি কাপড় না হইলে পরিতে পারি না। ইঁহারা বলেন খদ্দর খুব ভারী। ইঁহাদের ফিন্‌ফিনে ধুতি চাই। আমি জিজ্ঞাসা করি মা লক্ষ্মীদের গহনার ওজন কত? কেরাণীবাবুদের ধড়াচূড়া হ্যাট কোট ইত্যাদির ওজনই বা কত? যত দোষ এই খদ্দরের বেলায়। বিলাতী কাপড় পরিলে টাকাটা জন্মের মত দেশ হইতে বিদায় দিলাম। হাতের সূতা গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় যে তন্তুবায় আছে, জোলা আছে, তাহারা বুনিবে। গ্রামের টাকা গ্রামেই থাকিয়া যাইবে। অনেকে বলেন মিলের কাপড় পরিলেই ত হইল। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? টাকাটা বোম্বাই কি আমেদাবাদে চলিয়া গেল। ঠিক মহাজনের

নিকট নিজের বাস্তুভিটা বন্ধক দেওয়ার মত হইল। আমি এ বিশ্বপ্রেম চাই না। আমি বাঙ্গালী, আমার অন্ন সকলে কাড়িয়া খাইতেছে। ভাটিয়া, দিল্লীওয়ালা, মাড়োয়ারী, পাঞ্জাবী, উড়িয়া, সকলে বাঙ্গালীর মুখের গ্রাস কাড়িয়া খাইতেছে। কেবল বাঙ্গালী 'হা অন্ন' 'হা অন্ন' করিয়া মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছে। যদি ৩০ কোটী টাকা বৎসরে বৎসরে বাংলা দেশ হইতে বাহির করিয়া না দিয়া ঘরে ঘরে চরকা, ঘরে ঘরে তূলার চাষ করি, তবে আমাদের অবস্থা অনেক উন্নত হইবে। তমলুকে দেখিলাম কত সুন্দর সুন্দর চরকার সূতার কাপড় হইয়াছে। আমি বিশ্বাস করিতে পারি নাই যে সেগুলি চরকার সূতার কাপড়। ক্রমশঃ তাঁতির হাত আরও পাকিবে। ঢাকাই কাপড় কত ভাল ছিল। যে দেশে এমন সূক্ষ্ম কাপড় হইত, যে দেশের মস্‌লিন রোম হইতে সারা ইউরোপ হইতে টাকা লুটিয়া আনিত আজ সে দেশের লোক দিগম্বর সাজিয়াছে। আমরা এমনই অপদার্থ। কবির কথায়,—
"তাঁতি কর্ম্মকার করে হাহাকার, সাজ দিগম্বরের বেশ।"

দুই বৎসর পূর্ব্বে বোম্বাইতে মহাত্মার সঙ্গে যখন আমার দেখা হয় তখন তাঁহার কাছে আমি বলিয়া আসি যে আমি খদ্দর প্রচার করিব। সেই মহাত্মাজী আজ কারাগারে। আমাদের সেজন্য প্রত্যেককেই শোকচিহ্ন ধারণ করিতে হইবে। ইংরাজীতে যাহাকে বলে "The whole nation is in mourning." খদ্দরই সে শোকচিহ্নের পরিচায়ক হওয়া আবশ্যক। আমাদের এক ফসলের দেশ। ৮।৯ মাস লোকে হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকে। ফসল না হইলে অনাহারে মৃত্যু বা ঋণে জর্জ্জরিত কিন্তু তবুও তাহারা খাটিবে না। কিন্তু কলিকাতার ভাটিয়া, মাড়োয়ারী, যাহাদিগকে লক্ষপতি বলিলে অপমান করা হয়, তাহাদের একটুও সময় নাই। এই তমলুক

হইতে এই সব দেশ হইতে শ্রীমন্ত সওদাগর শত শত জাহাজ পণ্য বোঝাই করিয়া বিদেশে বাণিজ্য করিতে যাইত। কিন্তু সেই দেশের লোক আজ নিজের দোষে অন্নের কাঙ্গাল।

'অস্পৃশ্যতা—

জাতিভেদ কি বিষ! এ পাপেরই বা কি প্রায়শ্চিত্ত! বাঙ্গালী মানে কেবল ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বৈদ্য নহে। ব্রাহ্মণ ১২।১৩ লক্ষ মাত্র, কায়স্থের সংখ্যাও ঐরূপ, বৈদ্যের সংখ্যাও এক লক্ষের কম। এই ২৫।২৬ লক্ষ লোক লইয়া বাংলা হয় নাই। সমস্ত হিন্দুর সংখ্যার শতকরা ৫ জন এবং হিন্দু মুসলমান দুই ধরিলে শতকরা ২ জন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য। আমার যেখানে বাস সে অঞ্চলে ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রধান সমাজ বটে, কিন্তু শতকরা ৫০।৬০ জন মুসলমান। সেইজন্য বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগকে অনেক জটিল প্রশ্নের মধ্যে আসিয়া পড়িতে হইয়াছে। কিন্তু এখানে শতকরা ৯০ জন হিন্দু মাহিষ্য। এখানে বড় আহ্লাদের বিষয় আপনারা নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া স্বাবলম্বী হইতে শিক্ষা করিতেছেন। মাহিষ্য সমাজের মধ্যে অনেক বড় লোক জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আপনাদের নেতা শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের ত্যাগ অসাধারণ। তিনি ধনী, জমিদার, ব্যারিষ্টার হইয়াও মায়ের আহ্বানে সমস্ত ত্যাগ করিয়া কারাবরণ করিয়াছেন। এ রকম মুকুটমণি যে মাহিষ্য সমাজের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে শুধু মাহিষ্য সমাজ নহে—সমগ্র বঙ্গদেশ ধন্য হইয়াছে। আমার রাম প্রসাদের সেই গানটী মনে পড়িতেছে, "এই, মানব জমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফল্‌তো সোনা।" বাস্তবিক মাহিষ্য বলুন, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বলুন, ইহাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হয় নাই। এই সব পতিত জমি আবাদ করলে কি সোনাই ফল্‌তো! এই সমাজের মধ্যে একজন আমার প্রিয়

শিষ্য এম, এস্-সি পরীক্ষায় বেশ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন এবং রসায়ন-শাস্ত্রে গবেষণা করিবার জন্য বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এখন ইনি মেদিনীপুরে ওকালতি করিতেছেন। আমার অনেক ছাত্র আপনাদের বীরেনবাবুর মত অথবা তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর ত্যাগ করিয়াছেন। ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বিলাতে না গিয়াও রসায়ন শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে যথোচিতভাবে টাঁকশালের কর্ত্তা (Assay master of mint) করিয়া দিয়াছিলেন। আজ পর্য্যন্ত চাকুরী করিলে তাঁহার ১৭০০৲ টাকা বেতন হইতে পারিত। তিনি দরিদ্রের সন্তান হইয়াও আন্দোলনের প্রথমেই দেশ মাতৃকার আহ্বানে নিজের সমস্ত স্বার্থ বিসর্জ্জন দিলেন। আমার আরও অনেক ছাত্র এইরূপ যাঁহারা সমাজে অনুন্নত তাহাদিগকে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমিও সেই পথের পথিক।

বাংলার মুসলমান আমাদের রক্তমাংস। তাঁহারা হিন্দু সমাজের সংকীর্ণতা ও অনুদারতার নিমিত্ত ধর্ম্মান্তর গ্রহণে বাধ্য হইয়াছেন। তারপর আমরা যাহারা হিন্দু আছি আমাদের মধ্যে আত্মকলহ উপস্থিত। আজ যে বাংলায় শতকরা ৫২ জন মুসলমান তাঁহারা আমাদের "পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ। এই সকল অস্পৃশ্যজাতি আমাদেরই অত্যাচারে—রাজশক্তি প্রয়োগে নয়—ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। যদি রাজশক্তি প্রয়োগে হিন্দুরা মুসলমান হইত তাহা হইলে দিল্লী বা মুর্শিদাবাদ প্রভৃতির নিকটবর্ত্তী স্থানে মুসলমান সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইত। তাহা না হইয়া দেখা যায় যতই রাজতক্ত হইতে বেশী দূরে ততই মুসলমানের সংখ্যা অধিকতর। বল্লালী নিয়মের কঠোরতাই ইহার একমাত্র কারণ। ইসলাম ধর্ম্মের মূলমন্ত্র একতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব। যখন

মুসলমানগণ এদেশে আসিয়া এই মূলমন্ত্র প্রচার করিলেন তখন সকলে দলে দলে গ্রামের পর গ্রাম আসিয়া মুসলমান হইতে লাগিল। তাহাদের আমির ফকীর একসঙ্গে উপাসনা করেন। বাদসাহ যেখানে উপাসনার জন্য বসিবেন একজন গরীব ভিস্তিওয়ালাও সেইখানে উপাসনার জন্য বসিবে। দেখুন দেখি তাহাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব কতখানি! কত বড় সমতা! ইসলাম ধর্ম্ম বলিয়া পরিচয় দিলে সব এক। এক পাত্র হইতে খাইতে হইবে। আরব দেশে মুসলমান অতিথিকে ভিন্ন পাত্রে খাইতে দিলে তাহার অবমাননা করা হয়। আমাদের বার রাজপুত ত তের হাঁড়ি। কপটতা সহ্য হয় না। আমরা যে কত পাপ করিতেছি তাহা বলিবার নয়। সেনসাস্ দেখিলে বুঝিতে পারিবেন মুসলমানের সংখ্যা বাড়িতেছে। ৫০ বৎসর পরে গঙ্গার ওপারে—এদিকে নয়-সব মুসলমান হইয়া যাইবে। ভেদনীতিতে দেশ দুর্ব্বল বই সবল হইবে না। ব্রাহ্মণ কায়স্থের উচিত নিম্নশ্রেণীকে আলিঙ্গন করা। হিন্দুজাতি যে ধ্বংসোন্মুখ! ভগবানের নিকট কেহই উচ্চ নয় কেহই নীচ নয়। চণ্ডালোঽপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠঃ। এখন সকলকে আলিঙ্গন করিতে হইবে। যদি হিন্দুজাতি বাঁচিয়া থাকিতে চায় তবে আপনি মাহিষ্য হউন বা যাহাই হউন না কেন ভাই ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিয়া থাকিতে হইবে। এই যে আমাদের দেশাত্মবোধ জাগ্রত হইয়াছে ইহা শুভ চিহ্ন বুঝিতে হইবে। যদি আত্মকলহ থাকে তবে চিরকালই পরের অধীন হইয়া থাকিতে হইবে। যাহাতে ধরাপৃষ্ঠ হইতে হিন্দুজাতি বিলুপ্ত না হয়—তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। যাঁহারা অনুন্নত আছেন তাঁহারা কতকটা উঠুন আর যাঁহারা উন্নত আছেন তাঁহারাও কতকটা নামুন। তাই মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন "যদি স্বরাজ চাও তবে অস্পৃশ্যতা দূর কর"। বিবেকানন্দ বলিয়াছেন

"আমাদের ধর্ম্ম গিয়াছে ছুঁৎমার্গের মধ্যে। আপনি উপপত্নী রাখুন, যত পাপ করুন ছাই চাপা দিলে সব চুপ।" এই ত মেদিনীপুর। এখানকার বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বিলাপে কে কান দিল? কেনা জানে সমাজ পাপে কলুষিত হইয়াছে। আর আপনি ৬৫ বৎসর বয়সে ১০।১২ বৎসরের বালিকাকে বিবাহ করিলেন সে বিধবা হইয়া কি নির্জলা একাদশী করিবে? এই যে পাপ, ইহা কি সহ্য হয়? তাই বলি সমাজ সংস্কার দরকার, শিক্ষা সংস্কার দরকার, ধর্ম্মসংস্কার দরকার, যাবতীয় কুসংস্কার দূর করা দরকার।

উপসংহার—

আজ আমার বড় শুভদিন। আপনাদের সকলকে এক সঙ্গে পাইয়াছি। আমার নিকট হিন্দু নাই, মুসলমান নাই, মাহিষ্য নাই, এক বাঙ্গালী, এক রক্ত, এক বাঙ্গালার মাটী, বাঙ্গালার জল, বাঙ্গালার বায়ুতে সকলেই পরিপুষ্ট। আমরা সকলেই ভাই। আমরা সকলেই এক। মনে পড়ে কেবল মহাত্মার সেই অদ্ভুত বাণী যাহার স্পর্শে এত লোক নবজীবন লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে। আপনাদের নিকট আজ করযোড়ে প্রার্থনা করি এই যে ১০।১২ জন যুবক বিদেশে না গিয়া দেশের জন্য জীবন আহুতি দিয়াছেন এই জাতীয় বিদ্যালয় যদি তাঁহাদের এত বড় ত্যাগ স্বীকার সত্ত্বেও না বাঁচে তাহা হইলে আমি বলিব বঙ্গমাতা তুমি চিরদিনই হতভাগিনী। আমি আপনাদের নিকট প্রার্থনা করি আপনারা এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত একটী জাতীয় বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া ইহাকে একটী আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করুন। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে গঙ্গার বন্যা আসিয়াছে। আসুন এই শুভমুহূর্ত্তে পাল তুলিয়া স্বরাজের পথে যাত্রা করি।

১৬

বাঙ্গালা ভাষায় নূতন গবেষণা

রাজসাহীর সাহিত্য-সম্মিলন সভায় (সভাপতির অভিভাষণ, সন ১৩১৫) আমি বলিয়াছিলাম যে, "আমরা যতদিন স্বাধীনভাবে নূতন নূতন গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া মাতৃভাষায় সেই সকল তত্ত্ব প্রচার করিতে সক্ষম না হইব, ততদিন আমাদের ভাষার এই দারিদ্র্য ঘুচিবে না"। এই কথা বলিবার একটু কারণ ছিল। তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে আমাকে বুঝাইতে হইয়াছিল যে, যদিও অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিককাল ধরিয়া বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থসকল প্রচারিত হইতেছে, তবু ইহাতে বিশেষ কিছু ফললাভ হয় নাই কেন? আমি বলিয়াছিলাম, একাদশ বা দ্বাদশবর্ষীয় বালকদিগের গলাধঃকরণের জন্য যে সকল বিজ্ঞানপাঠ প্রচারিত হইয়াছে, সে সকলের দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের ইষ্ট কি অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, তাহা ঠিক বলা যায় না। আসল কথা, এই বিজ্ঞানের প্রতি একটা আন্তরিক টান না থাকিলে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের ২।৩টি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় বিশেষ ফললাভ হয় না। সম্প্রতি এক ধূয়া উঠিয়াছে যে, বহু অর্থ-ব্যয়ে যন্ত্রাগার (Laboratory) প্রস্তুত না হইলে বিজ্ঞান শিক্ষা হয় না, কিন্তু বাঙ্গালা দেশের গ্রামে ও নগরে, উদ্যানে ও বনে, জলে ও স্থলে, প্রান্তরে ও ভগ্নস্তূপে, নদীতে ও সরোবরে, তরুকোটরে ও গিরিগহ্বরে, অনন্ত পরিবর্ত্তনশীল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অভ্যন্তরে

জ্ঞানপিপাসুর যে, কতপ্রকার সম্বন্ধ বিষয় ছড়াইয়া রহিয়াছে, তাহা কে নির্ণয় করিবে? বাঙ্গালার দয়েল, বাঙ্গালার পাপিয়া, বাঙ্গালার ছাতারের জীবনের কথা কে লিখিবে?

এতদিন পরে ১৩২৮ বঙ্গাব্দে এই প্রশ্নের সদুত্তর পাইয়াছি। প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র শ্রীমান সত্যচরণ লাহার "পাখীর কথা" আমাকে যেন এক নূতন আশার বাণী শুনাইয়াছে, পুস্তক খানি পাইয়া আমি আদ্যোপান্ত পড়িয়া ফেলিলাম। পড়িতে পড়িতে যুগপৎ আনন্দে বিস্ময়ে এমন-অভিভূত হইলাম যে, কিছুকালের জন্য আমার প্রিয় রসায়ন-শাস্ত্র-চর্চ্চার কথা বিস্মৃত হইতে হইল। আমাদের দেশে যাঁহারা ধনীর সন্তান হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা তাঁহাদের "কর্ম্মহীন সুদীর্ঘ অবসরে" কি প্রকারে কালাতিপাত করেন, তাহা পাঠকবর্গের অবিদিত নাই। বহিখানি পাঠ করিয়াই বুঝিতে পারিলাম যে, ইহার রচয়িতার দৈনন্দিন জীবনের Atmosphere (বেষ্টনী) ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিজ্ঞান সাধনার অনুকূল। ইচ্ছা হইল, একবার স্বচক্ষে তাহা ভাল করিয়া দেখিয়া আসি। যে পক্ষিভবনে (Aviary) তাঁহার সযত্ন-সংগৃহীত বিহঙ্গগুলি উদ্যানমধ্যে পালিত হইতেছে, তাহা দেখিবার জিনিষ; যে লতাকুঞ্জের অভ্যন্তরে ময়ূরগুলি বিচরণ করিতেছে, তাহা দর্শকের চক্ষু এড়াইতে পারে না। পুষ্পভবনে বিচিত্র বিদেশী পরগাছা (Orchid) শোভা পাইতেছে। স্বতন্ত্র বড় বড় পিঞ্জরে ছোট বড় পাখী সেবা পাইতেছে। তাঁহার পাঠাগারের ও বসিবার ঘরের দেওয়ালে তাঁহারই নির্দ্দেশমত অঙ্কিত বড় বড় চিত্রে পাখীর জীবনলীলা ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। কাচের আলমারীর মধ্যে বিহঙ্গ-শব Stuffed হইয়া যেন জীবন্ত ভাব ধারণ করিয়া আছে;—শুনিলাম, তাহার অনেকগুলি শ্যাংহাই হইতে আনীত। জীবন্ত পাখী সম্মুখে রাখিয়া তাহার

চিত্রকর যে ছবিগুলি আঁকিয়াছেন, তাহা কোনও পাশ্চাত্য পাখীর ছবি অপেক্ষা কোনও অংশে হীন নহে। আমি দেখিলাম যে, আমার অনুমান মিথ্যা নহে। বুঝিতে পারিলাম যে, আমাদের দেশের হাওয়া ফিরিয়াছে।

য়ুরোপে দেখা যায় যে, যাঁহারা জ্ঞানরাজ্যের সীমান্ত-রেখা নিজ নিজ প্রতিভাবলে সুদূর প্রসারিত করিয়াছেন, তাঁহারা একটা না একটা খেয়াল বা নেশার বশবর্ত্তী হইয়া তাহাতেই আপনাদিগকে উৎসর্গ করিয়া থাকেন। হোয়াইট (White)এর Natural History of Selbourne পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়, কেমন করিয়া একজন মধ্যবিত্ত পাদ্রী কতকগুলি বিহঙ্গের হাবভাব স্বভাব (Habits) ও জীবন-কাহিনী সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। Swallow জাতি কি প্রকারে নীড় রচনা করে এবং কোন সময়ে তাহারা ইংলণ্ডে আইসে এবং শীতের প্রারম্ভে জীবন রক্ষার্থ কোথায় চলিয়া যায়;—এই সকল বিচিত্র ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া বিহঙ্গতত্ত্ববিদ্গণের মধ্যে তিনি উচ্চ আসন অধিকার করিয়া জন-সাধারণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া আসিতেছেন। আমাদের "পাখীর কথা" রচয়িতা যথার্থই বলিতেছেন,—"তত্ত্বলাভের তীব্র বাসনা য়ুরোপীয় বালকবৃন্দকে যে কেবল দেশীয় পক্ষীর পালন-ব্যাপারে লিপ্ত করিতেছে, তাহা নহে; তাহারা বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নানাবিধ বিদেশীয় পক্ষীকে সাবধানে ও সযত্নে স্বদেশে আনয়নপূর্ব্বক অনভ্যস্ত প্রকৃতি-প্রতিকূল জলবায়ু কৃত্রিম উপায়ে অভ্যাস করাইয়া কৃত্রিম খাদ্যাদির সাহায্যে উহাদিগের পুষ্টিসাধন করিয়া বৈদেশিক পাখীগুলির জীবনলীলা পর্য্যবেক্ষণের যথেষ্ট অবসর পাইতেছে। এমন কি, কোন কোন তত্ত্বজিজ্ঞাসু কেবল বৈদেশিক পক্ষিপালনে নিযুক্ত থাকিয়া

ধারাবাহিকরূপে উহার জীবন-রহস্য উদ্ঘাটনের নিমিত্ত আপনাদিগের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।"

য়ুরোপবাসীদিগের মধ্যে যাঁহারা পুরাকালে ভারতবর্ষে সিভিল-সার্ভিস্ এ প্রবেশলাভ করিয়া উচ্চপদস্থ হইতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই উচ্চাঙ্গের পক্ষিতত্ত্ববিদ্ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। ইঁহারা সরকারী কাজে ব্যস্ত থাকিয়াও স্ব স্ব খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া অবসর-মত ভারতবর্ষের নানাজাতীয় বিহঙ্গের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। যে মিষ্টার হিউম্‌কে (A. O. Hume) আমাদের ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের জন্মদাতা বলিয়া সকলেই জানেন, তিনি যে পাখীর বিষয়ে পুস্তক রচনা করিয়া য়ুরোপীয় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় অল্প লোকই জ্ঞাত আছেন। তাঁহার রচিত Nests and Eggs of Indian Birds নামক বৃহৎ পুস্তকের উল্লেখ মাত্র করিলেই যথেষ্ট হইবে। স্বনামখ্যাত ডগলাস দেওয়ারের (Douglas Dewar) নাম পক্ষিবিজ্ঞান বিভাগে সুপরিচিত।

যে সকল মনীষী প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনে আপনাদিগকে উৎসৃষ্ট করিয়াছেন, তাঁহাদের বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে বসিতে স্বতঃই হিউবারের (Huber) কথা মনে পড়ে। ইনি প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এবং মক্ষিকাতত্ত্ববিদ্ বলিয়া বিদ্বজ্জন সমাজে প্রথিতনামা। যৌবন কালে ইনি চক্ষুরত্ন হইতে বঞ্চিত হয়েন; কিন্তু তাঁহার সহধর্ম্মিণী স্বামীর চক্ষুস্বরূপ হইয়া মধুমক্ষিকা জীবনের সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করিতেন। সেই মনস্বিনী নারীর পরীক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া তদবলম্বনে হিউবার অনেক বৎসর ধরিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে 'Natural History of the Bees' নামক একখানি সুন্দর গ্রন্থ রচনা করেন।

এই যে আজকাল আমরা কথায় কথায় queen bee, drone, মৌমাছি ও পিপীলিকা জাতির republicএর কথা এতটা জানি, তজ্জন্য ইহার নিকটে আমরা কৃতজ্ঞ; কারণ, ইনি একজন প্রধান পথপ্রদর্শক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এক একটি খেয়াল পোষণ করিতে না পারিলে অনেক সময় জীবন মধুময় হয় না। সার জন লাবক (Sir John Lubbock, পরে Lord Avebury) একজন ধনী শ্রেষ্ঠীর সন্তান এবং প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু তাঁহার এই কর্ম্মবহুল জীবনের মধ্যেও তিনি 'Ants, Bees and Wasps' নামক এমন একখানি বহি লিখিয়া ফেলিয়াছেন, যাহা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়, কি বিপুল ধৈর্য্য ও অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে গ্রন্থকর্ত্তা পিপীলিকা ও মক্ষিকাগণের জীবনলীলা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন; তাঁহার এই খেয়াল ছিল বলিয়াই তিনি পুস্তকান্তরে Pleasures of Life ও Beauties of Life নিপুণ ভাবে চিত্রিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। হেন্‌রী ক্যাভেণ্ডিসের নাম জড়বিজ্ঞানে অদ্বিতীয়। ইনি ইংলণ্ডের অভিজাত-শ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ কৌলীন্য-মর্য্যাদাসম্পন্ন একজন ডিউকের পুত্র (Duke of Devonshire); ইনিও এক খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া, পার্থিব সুখ-সম্পদ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া আজীবন পরীক্ষাগারে (Laboratory) কালাতিপাত করেন এবং নিউটনের ন্যায় তদ্গতচিত্ত হইয়া জড়তত্ত্বের গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারিয়াছেন। সংসারধর্ম্ম করিবার অবসর পর্য্যন্ত ইনি পান নাই। একদিন ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের জনৈক প্রতিনিধি সহসা তাঁহার পরীক্ষাগারে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "মহাত্মন্! ব্যাঙ্কে আপনার এক কোটী টাকা মজুত; আপনি আদেশ করিলে আমি তাহা সুবিধামত খাটাইবার বন্দোবস্ত করি।" সাধকের তপোভঙ্গ হইল। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া আগন্তুকের প্রতি এমন

ভ্রুকুটী কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন যে, সে ব্যক্তি উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া তথা হইতে পলায়ন করিল। আবার বৎসরান্তে ব্যাঙ্ক তাঁহার টাকার কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলে, তিনি বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন—"দেখ যদি তুমি ফের আমাকে বিরক্ত কর, তাহা হইলে তোমার কাছ থেকে প্রত্যেক পাই পয়সাটি পর্য্যন্ত তুলে নে'ব (Look here Sirrah ! If you trouble me again I shall withdraw every farthing from your Bank)"। আভিজাত্যাভিমানী Salisbury সেসিল-বংশধরগণ (House of Cecil), মারলবরো বংশীয়েরা (The Churchills) ও অন্যান্য অনেক বড় বড় কুলপতি বিদ্যাবুদ্ধি, রাজনীতিকুশলতায় কাহারও অপেক্ষা এখন ন্যূন নহেন। ধনবান্ চিকিৎসকের সন্তান চার্লস ডার্বিণ (Charles Darwin) বহু বৎসর পরিশ্রম করিয়া বিবর্ত্তনবাদ, বা ক্রমবিকাশ বাদ প্রচার করিতে পারিয়াছিলেন। ফলতঃ আজীবন এই রকম একটী খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া থাকা, একনিষ্ঠ সাধক হইয়া বিজ্ঞানানুশীলনে রত থাকা কেবল য়ুরোপেই দেখা যায়, তবে জাপানও য়ুরোপের পশ্চাদানুসরণ করিতেছে।

এইত গেল য়ুরোপীয়ের কথা। এ সকল কথা আমি তুলিতাম না, যদি আজ আমার মনে একটু আশার সঞ্চার না হইত। আমাদের দেশের অভিজাত শ্রেণীর মধ্যেও এই সু-লক্ষণ দেখা যাইতেছে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর কথা উত্থাপন করা নিষ্প্রয়োজন। দর্শন, কাব্য, গল্প, সাহিত্য,সঙ্গীত, চিত্রবিদ্যা, অর্থাৎ যাহা কিছু কলা বিদ্যা নামে অভিহিত, সমস্তই ঠাকুর বাড়ী হইতে উৎসারিত হইতেছে। আহ্লাদের বিষয়, কলিকাতার প্রসিদ্ধ লাহা পরিবারের মধ্যে লক্ষ্মী ও সরস্বতী দ্বন্দ্ব ভুলিয়া গিয়াছেন। শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ প্রত্নতত্ত্ব আলোচনায় কায়মনো-

বাক্যে আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছেন; শ্রীযুত ভবানীচরণ নিপুণ চিত্র-শিল্পী হইয়াছেন; শ্রীমান সত্যচরণ পক্ষিবিজ্ঞানে ভারতবাসীর পথপ্রদর্শক হইলেন।

এতদিন আমাদের দেশের পাখীর তথ্য জানিতে হইলে বিদেশী গ্রন্থ উদ্ঘাটন করা ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না। শতাধিক বর্ষ পাশ্চাত্য শিক্ষা এতদঞ্চলে প্রচলিত হইলেও প্রাণিবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান ও জীবতত্ত্ব বিষয়ে আমাদের রুচি আদৌ স্ফুরিত হয় নাই। এ স্থলে ইহাও স্মরণ রাখা উচিৎ যে, পুরাতন হিন্দু কলেজের প্রথিতনামা অধ্যাপক রামচন্দ্র মিত্র, ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে 'পক্ষিবিবরণ' নামক ৬৬০ পৃষ্ঠা পরিমিত একখানি গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয়, এই ৮৭ বৎসরের মধ্যে এদিকে কাহারও মন যায় নাই। আবহমান কাল হইতে হতভাগ্য বাঙ্গালীর ছেলে মেয়েরা কেবল মাত্র মুখস্থ বা কণ্ঠস্থ বিদ্যাকে পরমার্থ জ্ঞান করিয়া আসিয়াছে। ফলে এত দিন এ দেশীয়ের মস্তিষ্ক এক প্রকার অসাড় ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। প্রাণিতত্ত্ব বিষয়ে যে দুই একখানি গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষায় ইতঃপূর্ব্বে রচিত হইয়াছে, তাহা প্রায়ই ইংরাজী পুস্তকের অনুবাদ মাত্র, এমন কি, সহিমুহুরী নকল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সত্যচরণের 'পাখীর কথা' সে দলের নহে, গ্রন্থকার স্বয়ং নানা শ্রেণীর পাখী প্রতিপালন করিয়া তাহাদের habits দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, মাতোয়ারা হইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহার বহু নিদর্শন এই পুস্তকের মধ্যে, এবং বোম্বাইএর ও বিলাতের নানা বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় দিয়াছেন। বুলবুল পাখীর Albinism ও Melanism লক্ষ্য করিয়া এই বিচিত্র রহস্যময় বর্ণ-বিপর্য্যয়ের সম্যক্ পরিচয় ইনিই সর্ব্ব প্রথমে

পক্ষিবিজ্ঞান জগতে প্রচার করিয়াছেন। এই সমস্ত খণ্ড প্রবন্ধের বিষয় আপাততঃ ছাড়িয়া দিলেও গ্রন্থকারের এই প্রথম প্রকাশিত বাঙ্গালা পুস্তকে পাখী সম্বন্ধে যথেষ্ট মৌলিক গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। কোনও ইংরাজ পণ্ডিতও এ-দেশীয় পালিত অথবা বন্য বিহঙ্গের পরিচয় এমন ভাবে দিবার চেষ্টা করেন নাই। পাখী পুষিতে হইলে কি কি করা চাই, পোষা পাখীর পর্য্যবেক্ষণ কিরূপ হওয়া উচিৎ, আবদ্ধ অবস্থায় প্রসূত বর্ণ সঙ্করের বন্ধ্যাত্ব দোষ থাকে কি না, পাখীর সহজ সংস্কারের পশ্চাতে কোনরূপ বিচার বুদ্ধি আছে কি না, কৃত্রিম পক্ষীগৃহে নীড়স্থ ডিম্বগুলি হইতে একই সময়ে কি উপায়ে শাবক বাহির করিতে হয়,—এই সমস্ত অত্যন্ত কৌতূহলপ্রদ রহস্যময় ঘটনার বিবৃতি ও আলোচনা অন্যান্য বহু অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের মধ্যে যথাযথ পুস্তকের প্রথম ভাগে সুবিন্যস্ত রহিয়াছে। তরুণ গ্রন্থকারের লিপি চাতুর্য্যও বিশেষ প্রশংসার্হ। দ্বিতীয় ভাগে ব্যবহারিক পক্ষিতত্ত্ববিষয়ক এমন অনেক কথা সুনিপুণ ভাবে আলোচিত হইয়াছে, যাহা পাঠ করিলে পাঠক বর্গের কৌতূহল চরিতার্থ হইতে পারে এবং বোধ হয় কৃষিজীবী বাঙ্গালীর উপকারে আসিতে পারে। তৃতীয় ভাগে কালিদাস সাহিত্যে বিহঙ্গ-পরিচয় বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে শুক্, সারী, চক্রবাক্, কুররী প্রভৃতি বিহঙ্গ কুলের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক পাখীকে সনাক্ত (Identify) করিবার জন্য গ্রন্থকার যে, কেবল সংস্কৃত সাহিত্য ও অভিধান মন্থন করিয়াছেন, তাহা নহে; য়ুরোপীয় বিশেষজ্ঞ-গণের রচনা হইতে ভূরি ভূরি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কবিবর হেমচন্দ্র সেক্সপীয়ারকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—"ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি।" অবশ্য মানব প্রকৃতি বর্ণনায় ইংরাজ কবি অতুলনীয়; কিন্তু আমার বোধ হয় যে, Nature বা নিসর্গ চিত্র

অঙ্কনে ভারতের কবির সমকক্ষ কেহ নাই। আমি পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই যে, মহাকবি কালিদাস বিহঙ্গ জাতির স্বভাব-চরিত্র, যাযাবরত্ব প্রভৃতি এত সূক্ষ্ম ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করিয়াছেন।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, গ্রন্থকার বাঙ্গালা ভাষায় এই পুস্তক প্রচারিত করিয়া মাতৃভাষাকে বিশেষ সমৃদ্ধিশালিনী করিয়াছেন। আশা করি, নবীন লেখক Ornithology বা পক্ষিতত্ত্বের নূতন নূতন তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত করিয়া আমাদের জ্ঞান ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে থাকিবেন।

জাতিভেদ ও তাহার প্রায়শ্চিত্ত *

আজ যে প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেছি, সে সম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে দশ বার দিন নানাদিক হইতে বলিলেও তাহার সম্যক্ আলোচনা শেষ হয় না। জাতিভেদ রূপ মহাপাপ ভারতবর্ষকে অধঃপতনের পথে কিরূপে চালিত করিয়াছে তাহার আলোচনা নানাদিক্ হইতে করা যাইতে পারে। আমি এস্থলে তাহার মাত্র দুই একটি দিক্ সম্বন্ধে কিছু বলিব। সম্প্রতি ভারতবর্ষে অন্যূন ৫০ হাজার মাইল (প্রায় পৃথিবীর পরিধির দ্বিগুণ) আমাকে পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছে, নানা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত অনেক কার্য্যে—দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনেক প্রকার অনুষ্ঠানে—যাইয়া অনেক শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিতে হইয়াছে। তাহার ফলে যেটুকু অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহাতে বুঝিয়াছি যে জাতিভেদ দেশের যে কি সর্ব্বনাশ করিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

আর্য্যেরা যখন এদেশে আসিয়াছিলেন সেই বেদের যুগে জাতি-ভেদের অস্তিত্বও এদেশে ছিল না। জাতিভেদের কথা সংস্কৃতে নাই। ইহা Caste system-এর বাঙলা তর্জ্জমা। সংস্কৃত সাহিত্যে 'বর্ণভেদ', 'বর্ণসঙ্কর' প্রভৃতি কথা আছে বটে। আদিশূরের সময়ে বেদবিহিত ক্রিয়াকলাপ লোপ হওয়ায়, তিনি কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে

* ভবানীপুর ব্রাহ্ম সমাজে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ। শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, পি এইচ্. ডি ও প্রফুল্ল কুমার বসু, এম্ এস্. সি কর্ত্তৃক অনুদিত।

বাঙ্গালাদেশে আনয়ন করেন, এইরূপ প্রবাদ আছে। সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণ হইতে বর্ত্তমান কুলীন ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। বলা বাহুল্য যে, সেই ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের পত্নীগণকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন কিনা তাহা জানা নাই। তৎপরে বল্লালসেন কৌলিন্য প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়া বঙ্গের তথাকথিত উচ্চজাতিগুলির মধ্যেও উপজাতির সৃষ্টি করেন এবং তখন আমাদের দেশে জাতিভেদের ভিত্তি সুদৃঢ়রূপে স্থাপিত হয়। এখন আমরা আমাদের চতুর্দ্দিকে নানা প্রকার "জাতি" দেখিতে পাই, বাঙালাদেশের ৩৬ জাতির কথা সকলেই অভিজ্ঞাত। কিন্তু হিসাব করিয়া দেখিলে এই সংখ্যা ৬০।৭০ এরও অধিক। অথচ এতগুলি জাতির মধ্যে জাতি ও বর্ণ অনুসারে কোন বৈষম্য নাই। নৃতত্ত্বের দিক্ (ethnologically) দিয়া দেখিতে গেলে একজন নমঃশূদ্র ও একজন ব্রাহ্মণের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য বুঝিতে পারা যাইবে না। এক সময়ে বাঙালাদেশে বৌদ্ধমত অত্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল—প্রায় হাজার বৎসর ধরিয়া বাঙালাদেশে বৌদ্ধ প্রভাব বর্ত্তমান ছিল; তৎকালে জাতিভেদের বাঁধন শিথিল হইয়া পড়ে। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে জাতিভেদ আবার তাহার সমস্ত কঠোরতা লইয়া ফিরিয়া আসে।

বর্ত্তমানে বাঙালাদেশে শতকরা ৫০ জনেরও অধিক মুসলমান। অথচ এই মুসলমানদিগের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন লোকের শরীরে হিন্দুর রক্ত। আজ যে বাংলাদেশের এই শতকরা ৫০ জনেরও অধিক মুসলমান—ইহার কারণ হিন্দু সমাজের কঠোরতা। জাতিভেদের কঠোর বন্ধনে, হিন্দু সমাজকে আমরা সঙ্ঘবদ্ধ করিতে যাইয়া তাহাকে কেবল পঙ্গুই করিয়াছি। এই শতকরা ৯৯ জন মুসলমান,—যাহাদের রক্ত হিন্দু ও ভাষা বাংলা—তাহারা আমাদেরই অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া ইসলামের উদার বক্ষে আশ্রয় লইয়াছে। মুসলমান সমাজ মানুষকে

চিরদিনই মানুষ বলিয়া স্বীকার করে। যেদিন ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করা গেল সেইদিন বাদ্‌শাহ, ফকীর এক মস্‌জিদে উপাসনা করিতে অধিকারী হইল। হেয়, অবজ্ঞাত হইয়া কাহাকেও থাকিতে হয় না। সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইলে ফকীরের পুত্রের ওম্‌রাহের দুহিতার পাণিগ্রহণেও কোন বাধা নাই। আমাদের দেশে গ্রামের পর গ্রাম ইস্‌লামের এই উদার আহ্বানে ধর্ম্মত্যাগী হইয়াছিল। প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে চৈতন্যদেব ধর্ম্মজগতে নূতন যুগ আনয়ন করিলেন। প্রেম ও ভক্তির যে বার্ত্তা লইয়া তিনি আসিলেন, তাহাতে কোন ভেদের কথা ছিল না। "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ"। তাই দলে দলে লোক বৈষ্ণব ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। ফলে, বর্ত্তমানে আমরা দেখিতে পাই তথাকথিত নিম্নজাতিরা প্রায় সকলেই বৈষ্ণব। চৈতন্য যদি আবির্ভূত না হইতেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ এই ২৬ লক্ষ বাদে বোধ হয় সমস্ত দেশই মুসলমান হইয়া যাইত। এতবড় হিন্দু সমাজের এই ২৬ লক্ষ কতটুকু অংশ? হিন্দু সমাজের এই বৃহত্তর অবজ্ঞাত অংশ তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মধ্যে আমরা বেশী খ্যাতনামা ব্যক্তি যে দেখিতে পাই না, তাহার কারণ কোন সুযোগ বা সুবিধা ইহাদিগকে আমরা কখনো দিই নাই। ৺কৃষ্ণদাস পাল ও মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি ২।১ জন স্মরণীয় ব্যক্তির অবশ্য নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু সমগ্র সমাজের তুলনায় ইহা ধর্ত্তব্যই নহে। হিন্দু সমাজ এই নিম্নশ্রেণীর উন্নতির পথ বন্ধ করিয়াই রাখিয়াছে—ফলে সমাজের বৃহৎ অংশই আজ সমস্ত জাতিকে পিছনে টানিয়া রাখিয়াছে। জাতীয় আন্দোলন আজ দেশের প্রধান আন্দোলন, কিন্তু এই আন্দোলনের সীমা কতটুকু পৌঁছিয়াছে? আমাদের দেশে জাতীয়তা মুষ্টিমেয় শিক্ষিত তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর

মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই জাগরণের প্রবাহে অনুন্নত তথাকথিত নিম্ন-শ্রেণীর লোকেরা কোথায়? শিক্ষার অভাবে তাহারা ইহার প্রকৃত স্বরূপটি কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। শিক্ষিত তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর সহিত তাহাদের সামাজিক বা হৃদয়ের কোন যোগাযোগ না থাকায় জাতীয় আন্দোলনে আমরা তাহাদের সহানুভূতি পাইতেছি না। শিক্ষা ও দীক্ষা (Culture) মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ—ইহার বিস্তার না হইলে এইরূপ জাতীয় আন্দোলনের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে লোকে কৃতী ও বিত্তশালী হইলে তাহাদের আয়ের একটি অংশ দেশের ও গণের কাজে নিয়োজিত করেন। এই প্রকার দান করা এখন সর্ব্বসাধারণ নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিলাতি কাগজে Wills & Bequests নামে একটি স্তম্ভ থাকে, তাহাতে এই প্রকার মৃত্যুকালীন দান উল্লিখিত হয়। যদি কোন অর্থবান মৃত্যুকালে বা জীবদ্দশায় তাঁহার অর্থের কিয়দংশ দেশের কাজের জন্য না দান করিয়া যান তাহা হইলে জনসাধারণে তাহাকে হেয় জ্ঞান করে। কাজেই সামাজিক কল্যাণকর অনুষ্ঠান বিলাতে সাধিত করিবার জন্য কখনো অর্থাভাব হয় না। Guy's Hospital প্রভৃতি জগৎবিখ্যাত প্রতিষ্ঠানগুলি এইরূপ স্বেচ্ছাকৃত দানের উপর নির্ভর করে। শিক্ষা, সমাজসেবা, দেশসেবা প্রভৃতির নানা আয়োজন এই প্রকার লব্ধ অর্থের দ্বারা চালিত। দেশে সমস্ত স্তরের লোকের মধ্যে এক অঙ্গাঙ্গীভূত যোগই এই প্রকার দানশীলতাকে অনুপ্রেরিত করে। আর এদেশে? আমাদের মাত্র শতকরা ৬।৭ জন শিক্ষিত অর্থাৎ বর্ণজ্ঞানবিশিষ্ট। কোন প্রকারে নাম দস্তখত করিতে পারিলেই আদম সুমারীর হিসাবে শিক্ষিত বলিয়া ধরা হয়। ভারতবাসী অশিক্ষায় ও কুসংস্কারে মগ্ন। দেশ ম্যালেরিয়া, অন্নকষ্ট, জলকষ্ট, বন্যা, দুর্ভিক্ষ

প্রভৃতি নানাবিধ দুর্ভাগ্যে পীড়িত। তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিকাংশই চাকুরীজীবী। জমিদারবর্গ প্রজার রক্ত শোষণ করিয়া সহরে বাস এবং অর্থের অপব্যয় করেন। দান করিবার মতো অর্থ তাঁহাদের কাজেই নাই। অনুন্নত শ্রেণীর নিকট হইতে দেশের মঙ্গলকর কার্য্যে কোন সাড়া পাওয়া যায় না। জাতিভেদের প্রায়শ্চিত্তই এইখানে। আর শিক্ষিত ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ আমাদের, Shakespeare, Milton মুখস্থ করা Culture (কর্ষণ) মাড়োয়ারীর আড়তে বা সদাগরী আফিসে কেবল কলমপেশাতেই পর্য্যবসিত হয়। দান করিবার মতো অর্থ 'আমাদের কোথায়? পূর্ব্ববঙ্গে অনেক সাহা ও তিলি-জাতীয় ধনী ব্যবসায়ীর বাস। আমাদের চিরকাল তাহাদের একদিকে কোণ ঠাসা করিয়া রাখিবার ফল এই হইয়াছে যে, তাহাদের আমাদের কোন চিন্তাধারার সঙ্গে যোগ নাই। পূর্ব্ববঙ্গে আমাদেরই কয়জন Research Scholar অর্থাৎ গবেষণারত ছাত্র কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। ইঁহারা নগ্নপদে ২০।২৫ মাইল পর্য্যটন করিয়াও ধনীব্যক্তিদিগের নিকট হইতে ৫৲ টাকাও সাহায্য পান না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই সমস্ত ধনী ব্যক্তিরই নিকট যদি কোন বাবাজীর শুভাগমন হয়, তখন সেই ব্যক্তি প্রভুর আদেশে গললগ্নীকৃতবাসে "একসের" গাঁজা মাঙাইতে ও হাজার লোক খিলাইতে" কোন প্রকার দ্বিধা করে না।

দুর্ভিক্ষ, বন্যা প্রভৃতিতে মাড়োয়ারীদের নিকট হইতে তবুও কিছু সহানুভূতি পাওয়া যায়। কেননা জীবে দয়া তাহাদের ধর্ম্মের অঙ্গ। কিন্তু দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি বিপৎপাত ভিন্ন যখন দেশের Constructive (গঠনশীল) কোন কাজ করিবার দরকার হয় তখন আর কোন উৎসাহ আসে না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নাগপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রদান উপলক্ষে গমন করিয়া স্যর বিপিনকৃষ্ণের নিকট

শুনিয়াছিলাম তত্রস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিয়া বিশেষ কোন ফললাভ করা যায় নাই। অথচ সেই বিশ্ববিদ্যালয়েরই অনতিদূরে এক ধনী মাড়োয়ারী এক মর্ম্মরনির্ম্মিত পান্থশালা বা ধর্ম্মশালার স্থাপনা করিতেছেন। ব্যয় অন্যূন ৮।১০ লক্ষ হইবে! পূর্ব্বে যখন রেলপথের সৃষ্টি হয় নাই তখন না হয় এই প্রকার পান্থনিবাসের সার্থকতা ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান কালে ইহার সেরূপ প্রয়োজনীয়তা কোথায়? পরলোকগত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পূর্ব্ববঙ্গের কোন প্রসিদ্ধ তিলিজাতীয় ধনীর গৃহে অর্থ সংগ্রহে গমন করিয়াছিলেন। অনেক কথা ও সময় ব্যয়ের পর সেই কোটীপতি দেশসেবায় ১০৲ টাকা দান করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন! ইহা কি আমাদেরই পাপের ফলে নহে? জাতিকে নানা দিক দিয়া উঠিতে হইবে। নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কোন দিকেই পশ্চাতে পড়িয়া থাকিলে চলিবে না।

জাতিভেদের লৌহশৃঙ্খল আমাদিগকে পাষাণ-মন্দিরে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। বাল্যকালে দেখিয়াছি যেখানে এখন কৃষ্ণদাস পালের মূর্ত্তি সেইখানে পাদোদক-পিয়াসিগণ ভিড় করিতেন। এই শতকরা ৯৫ জনকে পায়ের নীচে রাখিয়া ব্রাহ্মণই আজ অধঃপতিত হইয়াছেন। নিজেদের কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখিবার জন্য অন্যের বুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তা নষ্ট করিয়া যে দেশের সর্ব্বনাশ হইয়াছে তাহারই ফল আজ সমস্ত দেশকে ভোগ করিতে হইতেছে।

আজ বাঙালীর অর্থ মাড়োয়ারী লইতেছে। যদিচ এই মাড়োয়ারীগণ ৩।৪ পুরুষ এদেশে বাস করিতেছে তথাপি তাহারা মাড়োয়ারীই রহিয়া যাইতেছে। আমাদের সমাজের সঙ্গে, মিশ্রিত হইবার কোন উপায় নাই। কাজেই বাঙলাদেশের কোন লাভ

হইতেছে না! ইংলণ্ডে বিদেশের লোক আসিয়া ইতিহাসের নানা সময়ে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। দু'এক পুরুষ' পরে এই সমস্ত বিদেশীই ইংরাজ হইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ কায়স্থেরা বিক্রমপুর যাইয়া বসবাস আরম্ভ করিলেন; ব্রাহ্মণেরা কুলীন শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইলেন, কিন্তু কায়স্থেরা হইলেন বঙ্গজ। তাঁহাদের সঙ্গে রাঢ়ীয় কায়স্থগণের আদান-প্রদান বন্ধ হইল। আর ওদিকে ইটালী হইতে নির্য্যাতিত হইয়া ও ফ্রান্স হইতে নিপীড়িত Huguenotগণ ইংলণ্ডে আসিয়া আশ্রয় লাভ করিলেন। Lombard Streetএ বিখ্যাত Bank-গুলি এইরূপ ঔপনিবেশিক বিদেশিগণ দ্বারাই স্থাপিত হইল। পশমের' (Wool) কাজে পারদর্শী কারিগরগণ আসিয়া ইংলণ্ডে উলের ব্যবসার সূত্রপাত করিলেন। বিভিন্ন দেশের লোকদিগকে আশ্রয় দিয়া ও নিজের অঙ্গে টানিয়া লইয়া ইংরাজ আজ এত বড় সমৃদ্ধিশালী জাতি। তাহার নানা ব্যবসায়ের সূত্রপাত হইয়াছে এইরূপ বিভিন্নদেশীয়দের দ্বারা। আজ সমগ্র ইংলণ্ডবাসী এক বিরাট পরিবার। নানাদেশের লোকের নানাগুণ ইংরাজ চরিত্রে তাই স্থানলাভ করিতে পারিয়াছে। আমাদের দেশে যে সকল উদ্যমী অ-বাঙালী আসিতেছেন, তাঁহারা পুরুষানুক্রমে এখানে বাস করিয়াও অ-বাঙ্গালীই রহিয়া যাইতেছেন। সুতরাং আমাদের racial type কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত বা উন্নত হইতেছে না।

আমাদের ভরসাস্থল ২৬ লক্ষ ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য বলিতে সকলেই শিক্ষিত এরূপ বোঝা উচিত নহে। ব্রাহ্মণের মধ্যে আবার কত রকম আছে। কেহ ভিখারী, কেহ পূজারি, কেহ রাঁধুনি, গলদেশে উপবীত ও হস্তে একটি শীতলা বা ঐরূপ কিছু থাকিলেই যখন উদরান্নের সংস্থান হয়, তখন অনেক যে গণ্ডমূর্খ জুটিবে তাহার আর

বিচিত্র কি! প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্বের একটি উদ্ভট শ্লোক হইতে বুঝা যাইবে এ অবস্থা যে শুধু আজ হইয়াছে তাহা নয়। পুরোহিত বাক্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—পুরীষস্য 'পু', রোষস্য—'রো', হিংসয়োঃ—'হি', তস্করস্য—'ত'।

সেদিন রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন "জাতিভেদই শ্রদ্ধানন্দের হত্যার জন্য মুখ্য ও গৌণভাবে দায়ী"—কোন কোন সংবাদপত্রে এ বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ হইয়াছে। যাঁহারা একটু চিন্তা করিবেন, তাঁহারা দেখিবেন ইহা কতদূর সত্য। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের রক্তে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্যক্‌রূপে হইবে কি?

জাতিবিভাগ অনুসারে মানুষের গুণ ও কর্ম্মবিভাগ করা যায় না। কারণ গুণ বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয় না। তাহা হইলে "গুণকর্ম্ম-বিভাগশঃ"—এ উক্তির সার্থকতা কোথায়? ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নাই। Defoe কসাইপুত্র ছিলেন। Bunyan স্বয়ং পিতল-কাঁসার ঝালাই করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেন। William Carey এদেশে সেকালের একজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। তিনি এদেশে আসেন "মিশনারী" হইয়া। বিদেশী ও বিজাতি হইয়া তিনি হইলেন বাংলা গদ্য-সাহিত্যের অগ্রদূত। বাল্যকালে তিনি পাদুকা মেরামতের কার্য্য করিতেন। একবার Fort William Collegeএর সান্ধ্যভোজনে তাঁহার নিমন্ত্রণ হয়। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের কেহ Lord Wellesleyর কানে কানে বলেন, "Carey! Was he not a shoe-maker?" Carey ইহা শুনিতে পাইয়া বলেন, "Sir, you do injustice to me, I was not a shoe-maker, but a cobbler" অর্থাৎ আমি "জুতি-সেলাই" ছিলাম।

Duke, Robert of Normandy একদিন মৃগয়ায় বাহির

হইয়া এক স্রোতস্বতীর তীরে চাষার কন্যা Priscillaকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহারই গর্ভে William, the Conquerorএর জন্ম হয়। জগদ্বরেণ্য রাসায়নিক জীবাণু-বিদ্যার জন্মদাতা Pasteur ছিলেন চর্ম্মকারের পুত্র। উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক Carlyle ("Master of terse vigorous style") রাজমিস্ত্রি-পুত্র ছিলেন। ইঁহার পিতা শেষ জীবনে কৃষিকার্য্য করিতেন। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক Michael Faraday; ইঁহার সম্বন্ধে বলা হয় "Faraday is electricity and electricity is Faraday."—Dynamo বর্ত্তমান সভ্যতার একটি স্তম্ভ বিশেষ, ইঁহারই আবিষ্কার। ইঁহার পিতা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ব্যবসায়ে কর্ম্মকার ছিলেন। Napoleonএর সহিত যুদ্ধের সময় লণ্ডনে খুব অন্নকষ্ট হয়, কারণ, বাহির হইতে কোন খাদ্যের আমদানী হইতে পারিত না। উপরন্তু তাঁহার পিতা বড় দরিদ্র ছিলেন। সপ্তাহে ভিক্ষাস্বরূপ (dole) একখণ্ড রুটি ও জল ব্যতীত তাঁহার আর কিছুই আহারের জুটিত না! বাল্যকালে তাঁহাকে এক দপ্তরীর দোকানে কর্ম্ম করিতে হয়।

Smilesএর "Lives of British Engineers" গ্রন্থে দেখা যায় Metcalf, Telford, প্রভৃতি Englandএর প্রসিদ্ধ engineerগণ অনেকেই দরিদ্রের সন্তান। তাঁহারা, আরো আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রায় সকলেই পল্লীবাসী,—অথচ অধ্যবসায়বলে উত্তরকালে এত প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। ইহা ঐ দেশে সম্ভব, কেননা সমাজ ব্যক্তিত্বের উপর পাষাণ চাপাইয়া মনের স্বাধীন ও স্বাভাবিক বিকাশকে পঙ্গু করে না। আমাদের দেশের ন্যায় সেখানে শূদ্রের বেদ উচ্চারণে "জিহ্বাচ্ছেদন" বা শ্রবণে তপ্ত তৈল কর্ণবিবরে প্রদান করিবার কোন বিধি ছিল না।

আমরা স্বেচ্ছানির্ম্মিত নিগড়ে নিজেরাই আবদ্ধ হইয়াছি। হিন্দু

সমাজ এক বিশাল সাগর বিশেষ,—ইহার প্রত্যেকটি জাতি এক একটি দ্বীপ, একের সহিত অন্যের কোন সম্পর্ক নাই। কাজেই বিভিন্ন শ্রেণীর ভিতর আন্তরিকতার একান্ত অভাব। ব্রাহ্মণই স্থধু দেবমন্দিরে প্রবেশ করিতে অধিকারী, কায়স্থ প্রাঙ্গণ হইতে দর্শন করিবে, শূদ্র ও অস্পৃশ্যকে মন্দিরের শতহস্ত দূর হইতেই দেবতার কৃপা লাভ করিতে হইবে। অথচ আমরাই বলি সর্ব্বভূতেষু নারায়ণঃ! উচ্চশিক্ষিত যাঁহারা তাঁহারাও কি এ সমস্ত বুঝিয়াও বুঝিতে চাহেন না? মানুষে মানুষে এই প্রকার ভেদের প্রাচীর তুলিলে আন্তরিকতা কোথা হইতে আসিবে?

বাঙলায় হিন্দু-মুসলমান, মান্দ্রাজে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমস্যা অতি দারুণ। এই সমস্ত সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা কেবলই দেশের চারিদিকে ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা সমস্যা দেখিতে পাইব। দেশাত্মবোধ কিছুতেই জাগ্রত হইতে পারিবে না।

জাতিভেদের পাপের ফলে হিন্দু আজ মরণোন্মুখ। বাংলায় সমস্যা উঠিয়াছে—হিন্দু বাঁচিবে না মরিবে? একটি জাতি কতদূর অধঃপতিত হইলে তাহার মরণ-বাঁচনের প্রশ্ন উঠে? হিন্দু সমাজের ললাটে যে মৃত্যুর কাল ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে ইহা আমাদের বহুযুগসঞ্চিত পাপের অবশ্যম্ভাবী ফল। মানবের আত্মাকে অপমান করিয়া আজ ভারত অপমানিত।

"হে ভারত—যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাদের সমান।"

তাই আমরা আজ সমাজের এই বৃহৎ অংশকে অস্পৃশ্য করিয়া নিজেরাই জগতের নিকট অস্পৃশ্য হইয়া গিয়াছি। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া বিরাট মানব-সমাজের দরবারে উন্নতমস্তকে আমাদের প্রবেশ করিবার অধিকার নাই।

১৮

ঘর সামলাও *

প্রায় আট বৎসর কাল আমি ইংলণ্ডে ছিলাম। এই ইউরোপ প্রবাসের কালে ৪ বার যাতায়াত করতে হয়েছে। গত ৩ বৎসরেও মোটমাট ৪০ হাজার মাইল ভ্রমণ করেছি, গত তিন মাসেও আট হাজার মাইলের বেশী পর্য্যটন করেছি। আজ এই জীবনসন্ধ্যায় সকল বিষয় আলোচনা করবার স্পৃহা হয়। সকল শ্রেণীর লোকের সহিত আমি মেলামেশা করেছি, বোম্বাইর বহু ক্রোড়পতি হইতে সামান্য পর্ণকুটীর-বাসী—সকলের সঙ্গেই সমান ভাবে মিশেছি। এক সময় নব জাগরণের উত্তাল তরঙ্গে সমস্ত ভারতবর্ষ প্লাবিত হয়েছিল। ঢেউতে নৌকার মাঝি যেমন উঁচুনীচু হয়, হাবুডুবু খায়, তেমনি আন্দোলন স্রোতে গা ভাসায়ে কত তোলপাড় খেয়েছি। আজকাল আমরা কেন, কিসের জন্য, পিছিয়ে পড়েছি? এর কারণ কি? প্রভঞ্জন-তুল্য প্রবল এত বড় আন্দোলন হঠাৎ এত শীঘ্র আকাশে বিলীন হয়ে যাওয়ার কারণ কি?

সব আন্দোলনই ভাসা ভাসা—কোন আন্দোলনই আমাদের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করতে পারে না। বাঙালী বড় ভাবপ্রবণ। আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ,—'লাগপড়' হয়ে কোন বিষয় কামড়ে থাকতে পারি না। আমাদের আবেগ উৎসাহ খড়ের আগুণের মত দপ্ করে জ্বলে' উঠে' অচিরেই আবার খপ্ করে নির্ব্বাপিত হয়ে যায়। কিছুরই চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকে না।

---

* সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে ছাত্রসমাজের সমক্ষে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের মৌখিক বক্তৃতার সার মর্ম্ম।

তেঁতুল কাঠ, কুলকাঠ একবার জ্বাল্‌লে উপরে ভস্মাচ্ছাদিত হ'লেও ভেতরে ভেতরে আগুণ জ্বল্‌তে থাকে। বৃহৎ কাঠ একমাস তুইমাস ধরে' জ্বল্‌তে থাকে—তার ভেতরের আগুণ কিছুতেই নিভে না—অনবরত জ্বল্‌তেই থাকে।

আমাদের জাতির মধ্যে কিসের অভাব? জাতীয় জীবনে কোথায় কি কি গলদ আছে, সমস্ত ক্রটি তুর্ব্বলতা আজ আলোচনা করে দেখা দরকার। এই দেখুন হলণ্ডের মত ক্ষুদ্র দেশ—যা আয়তনে বাংলাদেশের একটি জিলার মত, এক মৈমনসিংহ জিলার আয়তন অপেক্ষা হলণ্ডের আয়তন বড় নয়—তাও আবার অধিকাংশ সমুদ্র গর্ভের নীচে; বাঁধ ভেঙ্গে গেলে দেশের অর্দ্ধেক জলে নিমজ্জিত হয়ে যায়। এই দেশে সর্ব্বদা অস্তিত্ব সঙ্কট, দিবানিশি প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকতে হয়। তিন শ' বছর আগে যখন স্পেন সাম্রাজ্য পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল, যখন স্পেনের পদতলে অর্দ্ধেক ইউরোপ লুন্ঠিত ছিল, যখন ব্রাজিল, পেরু, মেক্সিকো স্পেনের করতলস্থ ছিল, উপনিবেশ হইতে রাশি রাশি স্বর্ণরৌপ্য আনিয়া স্পেন যখন তাহা মুদ্রায় পরিণত করিতে ছিল, স্পেন যখন বিপুল গৌরবে ইংলণ্ড বিজয়ের চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিল—স্পেনিস আরমাডার কথা বলা বাহুল্য—ক্ষুদ্রকায় হলণ্ড তখন সেই প্রবলপ্রতাপান্বিত স্পেনকে অমিতবিক্রমে বাধা দিয়েছিল—কখনও আপনাকে বিজিত করতে দেয় নাই—হলণ্ড তখন প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম বজায় রেখেছিল—স্পেনের সেই সুবিখ্যাত ডিউক অব এল্‌বা এ জাতির কিছুই করতে পারেনি। হলণ্ডের তুলনায় আমাদের দেশের আয়তন কত বড়, লোক সংখ্যা কত বেশী। অথচ জগতে আজও আমরা উপহাসাস্পদ হই, পরাধীন, পরমুখাপেক্ষী, পরপদানত বলে পদে পদে লাঞ্ছনা গঞ্জনা অপমান সহ্য করি।

এখন কথা হচ্চে এই যে আমরা 'বাঙ্গালী জাতি', 'ইণ্ডিয়ান নেশন' বলে চীৎকার করি, একটা গোটা জাতি বলে জগৎ সমক্ষে পরিচয় দেই। কিন্তু জাতির ভেতর কত রকম গলদ, কত দুর্ব্বলতা রয়েছে, তা একবার স্থিরচিত্তে ভেবে দেখ্‌তে হবে। মানুষ মানুষের হাতে খাবে না, মানুষ মানুষের ছায়াটি পর্য্যন্ত মাড়াবে না, একথা বাইরের লোকে স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। হিন্দু ভারতের বাইরে এসব কথা লোকে ধারণাই কর্ত্তে পারে না ; কোল, ভীল, সাঁওতাল, গারো—তাহারা পর্য্যন্ত ধারণা কর্ত্তে পারে না, মানুষ মানুষকে ছুঁলে অপবিত্র হয় কিরূপে। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন যে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা কুকুরকেও কোলে করে আদর করে কিন্তু একজন মানুষ এলে তাকে একেবারে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। সম্প্রতি মান্দ্রাজে একটী ঘটনা ঘটেছে। একজন প্যারিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে, পবিত্র ধর্ম্মভাবের আবেগে মন্দিরের সম্মুখস্থ হয়—আত্মবিস্মৃত হয়েই সে মন্দিরের সম্মুখীন হয়েছিল। তাহার মোহ অপসারিত হ'লে সে মন্দির ছেড়ে চলে আস্‌ছিল এমন সময় ধরা পড়ে গেল। 'মন্দির অপবিত্র হয়েছে—সর্ব্বনাশ হয়েছে' ইত্যাকার কোলাহলের মধ্যে ঐ লোকটাকে চোর, ডাকাত কিম্বা খুনী আসামীর মত অপরাধীজ্ঞানে পুলিশের হাতে সমর্পণ করা হইল। উচ্চশ্রেণীর হিন্দু বিচারপতি তাহার জরিমানা করিলেন—কারাদণ্ডের ব্যবস্থা দিলেন। এই লঘুপাপে গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা দেখে অসহযোগ আন্দোলনের প্রধান নেতা শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল আচারী নিজকে আর সাম্‌লে রাখ্‌তে পার্‌লেন না। তিনি ঐ প্যারিয়ার পক্ষাবলম্বন করে উচ্চ আদালতে আপীল কর্‌লেন। আপীলে লোকটা নিষ্কৃতি পেল—জেল আর হ'ল না। জজ একটা টেকনিক্যাল গ্রাউণ্ডে তাকে মুক্তি দিলেন—বল্লেন ইচ্ছাকৃত অপবিত্র করার কোন

প্রমাণ নেই। তাই তিনি নিম্ন আদালতের রায় বহাল রাখলেন না। দেবতার অর্চ্চনার অপরাধে ভক্ত নিগ্রহ ও লাঞ্ছনার হাত হতে অব্যাহতি পেল।

আমাদের মধ্যে যে সব আন্দোলন হয় তাহা মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ। খুলনা দুর্ভিক্ষ কিম্বা উত্তর বঙ্গের বন্যার সময় অর্থের জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছি, লোকে যথেষ্ট সাড়াও দিয়াছে, কিন্তু জাতীয় কাজ—নানাবিধ জাতীয় অনুষ্ঠান যাতে জাতির ভবিষ্যৎ কল্যাণ নিহিত—এমন সব কাজের জন্য অর্থাভাব ঘটে কেন, কেন লোকে টাকা দেয় না? কারণ আমার মনে হয় এই সব জাতীয় আন্দোলনে সাধারণের সহানুভূতি থাকে না—দেশাত্মবোধ মুষ্টিমেয় জনকতক লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ—সামান্য কয়েকজন শিক্ষিত লোকের গণ্ডীর বাইরে দেশাত্মবোধ জাগে নাই বল্লেও চলে। আর সেই শিক্ষিতের সংখ্যাই বা কত?

ইংলণ্ডে চার্লস্ দি ফার্ষ্টের সময় গৃহবিবাদের কথা স্মরণ করুণ, ক্রমওয়েল হ্যামডেন পিম প্রভৃতি বীরবৃন্দ চার্লসকে বাধা প্রদান করলেন, পার্লিয়ামেণ্ট এই civil war এ অগ্রণী ছিল। তখন এক লণ্ডন সহর সাধারণের স্বার্থ রক্ষার্থ অজস্র অর্থ দিয়েছিল। রয়েলিষ্ট নোবেল্‌ম্যানেরা সাধারণের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত, তাঁরা অর্থ পান না, নিজেদের রৌপ্য বাসন গহনাপত্র গলিয়ে টাকা ক'রে রাজার পক্ষে লড়েছিলেন। দেশের বড় বড় সহর পার্লিয়ামেণ্টের নেতাদের অজস্র টাকা যোগায়েছিল। হলণ্ডের বড় বড় সহরের বণিকেরাও অম্লানবদনে তাঁদের সমস্ত অর্থ William, the Silent—তাদের নেতার হাতে সমর্পণ করেছিল। আর আমাদের দেশের অবস্থাটা একবার ভাবুন দেখি।

আমাদের দেশে দেশাত্মবোধ যাদের ভিতর জেগেছে তারা হচ্ছে

মধ্যবিত্ত। কোন রকমে কষ্টে স্বষ্টে দিনপাত করে মাত্র। এসব কথা "অন্ন সমস্যা"য় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। আমাদের দেশের যে ধনী সম্প্রদায় মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, দিল্লীওয়ালা—সাহা, তিলি, গন্ধ-বণিক, সুবর্ণবণিক তাদের সঙ্গে আমাদের সহানুভূতি আছে কি? ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজেও গত শুক্রবার বলেছি যে আমাদের মধ্যে সহানুভূতির বড়ই অভাব। স্বর্গীয় দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী মহাশয় "অবলা বান্ধবে" প্রথমে এই কথাটী ব্যবহার করেন--শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সহ+অনুভূতি ব'লে ইহার ব্যাখ্যা করেন। সমস্ত জাতির ভিতর বৈদ্যুতিক প্রবাহের মত একটা অনুভূতি সমানভাবে বহিয়া গেলেই তাকে বলে সহানুভূতি। কিসের দ্বারা সহানুভূতির বিস্তার হয়? কিসে all the people can think alike—সকল লোক একভাবে ভাবতে, চিন্তা করতে পারে! আমাদের দেশের অবস্থা হচ্ছে এই যে এদের কাছে আবেদন করলে, এরা কিছু বুঝতে পারে না। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ—সে আজ ১৭।১৮ বৎসরের কথা—সে সময়ে কয়েক লক্ষ শিক্ষিত বাঙালী আন্দোলন করলে—নিরক্ষর অশিক্ষিত বাকী ৪।৫ ক্রোটী লোক—যারা দেশের কথা ভাবতে পারে না,—স্বদেশী আন্দোলনের মর্ম্ম বুঝতে পারে না—বাবুরা কেন দেশী কাপড় পরতে খোসামুদি করে, বাবুদের খোসামুদি করতে দেখে তারা সব হেসে উড়ায়ে দিতে লাগল। তাই বলি দেশের ক'জন লোক আজ দেশের কথা ভাবতে শিখেছে।

বাংলা দেশে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর সংখ্যা কত? আমি অনেকবার বলেছি—বাংলা দেশের পৌণে ৫ কোটী অর্থাৎ ৪৭৫ লক্ষ লোকের মধ্যে আমরা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য মাত্র ২৭ লক্ষ। ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রায় সকলে সমান—২৬ লক্ষ আর বৈদ্য ১ লক্ষের কিছু কম। এই ২৬।২৭ লক্ষ

লোকের মধ্যে যা একটু শিক্ষার বিস্তার হয়েছে—তাও আবার শত করা ৫ জন আর বাকী ৯৫ জন কোথায় ?

ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের শিক্ষিতদের মধ্যে চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় কিম্বা ঘোষ বসু গুহ মিত্র এই উচ্চ শ্রেণীর কুলীনের সংখ্যাই বেশী—ক্যালেণ্ডারে পাশের লিষ্ট খুঁজ্‌লেই আমার কথার সত্যতার প্রমাণ পাবেন। ১৩ লক্ষ ব্রাহ্মণের মধ্যেই বা আবার কতজন শিক্ষিত ? পাড়াগাঁয়ে কত নিরক্ষর ব্রাহ্মণ ঘুরে বেড়ায়। বাংলা দেশে ৭২ ঘর কায়স্থ আছে। আম বেচা বরফ বেচা কত রকমেরই কায়েত আছে—'জাত হারালেই কায়েত'। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও রাঁধুনে, পূজারি, ভিখারী ব্রাহ্মণের অন্ত নাই। বামুন এবং ঠাকুর দুটো কথাই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই দুটী শ্রেষ্ঠ কথার সংযোগে একটী অদ্ভুত কথার সৃষ্টি হয়েছে—বামুন ঠাকুর। কথাটী শুনে আপনাদের হাসি পায় বটে কিন্তু আমার বুক ফেটে কান্না আসে। বাঁকিপুরে ১৭।১৮ বৎসর আগে একবার বক্তৃতা দিতে গিয়াছিলুম। তখন সেখানকার একজন প্রফেসর বলেছিলেন যে বেহারের অনুন্নত শ্রেণী হচ্ছে ব্রাহ্মণ। বিহার ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে দোবে, চোবে, তেওয়ারী প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা আমাদের দেশে কি সম্মান পান তা আপনারা জানেন। বাড়ীর দরওয়ান হয়ে খাটিয়া পেতে বসে থাকে, দিনান্তে ময়দা ঠেসে ছেকে চাপাটী করে খেতে বসে যায়। দোবে অর্থাৎ দ্বিবেদী, চোবে অর্থাৎ চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণেরা আজ গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান, কেহ বা স্বহস্তে লাঙ্গল চষে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। বিহারের লালা কায়েতরা তাদের চেয়ে অনেক উন্নত—স্বর্গীয় সুন্দর লাল, পণ্ডিত নেহেরু, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রভৃতি কাশ্মীরি বা মালবীয় ব্রাহ্মণ—উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ব্রাহ্মণদের স্থান কোথায় !

কথা হচ্ছে এই যে যখন একটা সম্মান সুবিধা নিজের চেষ্টা যত্ন দ্বারা আয়ত্ত করতে হয় না, যখন আভিজাত্যের সম্মান বংশপরম্পরা ক্রমে অনায়াস লভ্য হয়ে উঠে, সেই দিন হইতেই জাতির অধঃপতন সুরু হয়। তাই আজ এ দেশে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিয়া লেখা পড়া না শিখিয়া বর্ণ জ্ঞানহীন হইয়াও পূজা করিতে পারে—আজ ৫৪ বৎসর কলিকাতায় আছি, কলেজ ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের মোড়ে কৃষ্ণদাস পালের মর্ম্মরমূর্ত্তির ধারে দেখেছি সাবেকী বৃদ্ধারা লোক দেখলে জিজ্ঞেস করতেন, "আপনি কি ব্রাহ্মণ—একটু যদি পাদোদক দেন—" বৃদ্ধারা ব্রাহ্মণের পাদোদক গ্রহণ না করে জল স্পর্শ করতেন না—তা সে ব্রাহ্মণ যতই গণ্ডমূর্খ ও কদাচারী হৌক না কেন! ক্ষমতা ও প্রভুত্ব বংশগত হয়ে গেলে নিজের আর কোনো চেষ্টা করার দরকার হয় না। মানুষ সব অলস ও কর্ম্ম বিমুখ হয়ে যায়। বংশগত জমিদারদের দেখে বড় দুঃখ হয়—অলস বিপুলকায় জমিদারেরা শারীরিক পরিশ্রম করবে না, **exercise** নেবে না, বেড়াবে না, মাটিতে তাদের পা স্পর্শ হতে পারবে না, তাতে তাদের অপমান হয়। সাড়ে আঠারো রকমের ব্যামো তাদের লেগেই আছে। একজন ইংরেজ লর্ডের অবস্থা দেখুন না—লণ্ডনে টিউব রেলওয়েতে একজন শ্রমজীবীর সাথে এক আসনে বসে যাচ্ছে—ইংলণ্ডে বহু কোটীপতিও একজন মুটে মজুরের পাশে বসে যেতে লজ্জা বোধ করে না। আধমনী গ্লাডষ্টোন ব্যাগ হয়ত হাতে করেই চল্ল, কারণ, সেখানে অঙ্গুলি সঙ্কেতেই ভারবাহী মুটে পাওয়া যায় না।

আমাদের দেশে পিতা পিতামহ অর্থ সঞ্চয় করে কিম্বা জমিদারী কিনে আমাদের শাপগ্রস্ত করে রেখে যান। ভগবান যিশুখৃষ্ট বলেছেন, "Ye shall not eat except by the sweat of

your brow." ইংরেজী আরও একটা সুন্দর কথা আছে "Live on six pence a day and earn it." বল্লাল সেন আচার বিনয় বিদ্যা দেখে কুলীন করে দিয়ে গিয়েছেন ; আর আজ গুণের সঙ্গে দেখা নাই অথচ কৌলিন্য বজায় আছে। নানারূপ সামাজিক Privilege আমরা অকাতরে বংশপরম্পরা ক্রমে উপভোগ করে আস্‌ছি। "কুলীন কুল সর্ব্বস্ব" নাটক অনেকে দেখে থাকবেন। নৈকষ্য কুলীনের বিবাহের অন্ত ছিল না, এক এক জনের একাদি ক্রমে ৫০টা বিয়ে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। এক সঙ্গে সাত পাক ঘুরিয়ে বিয়ে ছেলে বেলা অনেক দেখেছি। শত শত বৎসর এইরূপ এক চেটিয়া প্রভুত্ব ভোগ করে সর্ব্বনাশের ধ্বংসের পথে চলেছে সবাই। যক্ষ্মার বীজ যখন প্রবেশ করে, প্রথম তার লক্ষণ বোঝা যায় না। সমাজে পৌরোহিত্যরূপ অত্যাচারের কথা ধরুন। ইংলণ্ডে ধর্ম্ম যাজক Archbishop of Canterbury উচ্চতম জ্ঞানেবিজ্ঞানে মণ্ডিত সর্ব্ব বিষয়ে সমুন্নত—ওদের পাদ্রীরা পর্য্যন্ত উচ্চ শিক্ষিত ; ওদের ধর্ম্ম যাজক আর আমাদের পুরোহিতের মধ্যে অনেক তফাৎ। যে Alexander Duff রাজর্ষি রামমোহনকে ইংরেজী শিক্ষায় সাহায্য করেছিলেন তিনি কত সু-পণ্ডিত ছিলেন তা বোধ হয় অনেকে জানেন—শিক্ষা ও সাধনার সঙ্গে তাঁরা সর্ব্বোচ্চ সম্মান লাভ করে থাকেন। এঁদের মধ্যে বংশগত কিছুই না—ইংরেজ ও মোছলমানের মধ্যে যে কেহ পাদ্রী বা মৌলবী হইতে পারে। আমাদের ধর্ম্মযাজক বংশানুক্রমিক! যত মোহন্ত আছে তাদের চরিত্র সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। পুরোহিত সংস্কৃত জানে না, দুই পয়সা এক পয়সা দক্ষিণায় পূজা করে—অর্দ্ধেক মন্তর আওড়ায়, তাও আবার উচ্চারণ অশুদ্ধ। মন্ত্র জানে না, মন্ত্রের অর্থ বোঝে না,

চল্প পূজা কর্ত্তে। সে মন্ত্র পড়লে তাহা ভগবানের কাণে পৌছবে, আর তার অপেক্ষা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি যিনি ব্রাহ্মণবংশ সম্ভূত নহেন—তিনি উচ্চারণ করলে হবে না, তুমি আমি মন্ত্র পড়লে তার শুদ্ধ সংস্কৃত হবে না। পুরোহিতের বেশ সুন্দর একটা শ্লোক আছে—"পুরীষের 'পু', রোষের রো, হিংসার 'হি' ও তস্করস্য 'ত' ইতি পুরোহিত"—concentrated essence of all. মনে করবেন না যে আমি নিজে শ্লোক তৈরী করেছি। ২ হাজার বৎসর পূর্ব্বে বাণভট্টের "হর্ষ চরিতে" ব্রাহ্মণের যে বিবরণ পাঠ করা যায় তাহাও অতি আশ্চর্য্য। এই পুরোহিত ঠাকুরদের ব্যবসা-সম্বন্ধে সকলেরই একটু বিশেষ করে ভাবা উচিত।

জাতিভেদের কথা তুল্লে প্রায়ই শুনতে পাই যে ইংরেজদের দেশেও ত জাতিভেদ আছে। ইংলণ্ডেও জাতিভেদ আছে স্বীকার করি—কিন্তু আমাদের দেশের জাতিভেদ এবং ওদের দেশের জাতিভেদে অনেক পার্থক্য। ইংলণ্ডে যে কোনো লোক Peer হইতে পারে। ম্যাকলে তাঁহার ইংলণ্ডের ইতিহাসে ত্রয়োদশ শতাব্দীর সমাজের কথা বলছেন—"It had none of the invidious character of caste. Any one could become a peer." আমাদের বর্ত্তমান বড়লাট লর্ড রেডিং সামান্য লস্কর হয়ে মাস্তুল তোলা হইতে ডেক পরিষ্কার পর্য্যন্ত সবই করতেন—একবার কলকাতায়ও এসেছিলেন। তিনি জাতিতে ইহুদি। যুদ্ধের সময় আমেরিকায় দৌত্য কার্য্যে প্রেরিত হ'ন—শেষে Peer of the Realm হ'ন। আর বিদেশের কথায় কাজ কি—আমাদের লর্ড সিংহের কথাই ধরুন না। তিনি জাতিতে বাঙ্গালী হইয়াও লর্ড উপাধিতে ভূষিত হলেন! "From Subaltern to the Field-marshal." নিম্নতম সৈনিক

হইতে উচ্চতম সেনাপতি হওয়া কেবল ওদের দেশেই সম্ভব। আর ইংলণ্ডে কেবল জ্যেষ্ঠ পুত্রই লর্ড হয়—লর্ডের অন্যান্য ছেলেরা সাধারণ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হ'ন। ক্ষমতাশালী উইনষ্টন চার্চ্চিল Duke of Marlboroughর ছেলে—উচ্চ অভিজাত বংশোদ্ভূত হইলেও নিজে Mr. W. Churchill. ইংলিশ লর্ড ও আমাদের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে অনেক তফাৎ।

আমাদের দেশে নৈকষ্য কুলীনেরা গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ—প্রত্যেক পরিবার গড় কেটে, পরিখা কেটে বাস করে—এই সর্ব্বনাশকর বংশগত আভিজাত্যের প্রথা একটু বিশেষ ভাবে আলোচনা করা দরকার। বল্লাল সেন নব কুল লক্ষণ দেখে কুলীন করে গেলেন—আমরা চিরকাল কৌলিন্যের দাবী করব এ কেমন কথা?

কায়স্থ ব্রাহ্মণ বৈদ্যের কথা বাদ দিলে বাংলার ৪৭০ লক্ষের উপর লোক থাকে। এর মধ্যে ২½ কোটী মুসলমান আর নমঃশূদ্র প্রায় ২৫ লক্ষ—মাহিষ্য, রাজবংশী, ব্রাত্যক্ষত্রিয় প্রভৃতি জলাচরনীয় জাতির লোক—সাহা, তিলি, শুরী হইতে বাগ্দী চামার—মৈমনসিংহে আর এক জাত আছে ভূঁইমালী—হিন্দু সমাজে সব যেন থার্ম্মোমিটারের স্কেলের মত গ্রেড করা। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ডাক্তার এনিবেসান্টের সভাপতিত্বে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে এই Graded Thermometric Scaleএর সম্বন্ধে বলেছিলাম। মান্দ্রাজের অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয়—মান্দ্রাজী হিন্দুদের মধ্যে দৃষ্টিদোষ আছে। সুখের বিষয় বাংলা দেশে সেটা নাই। মান্দ্রাজে লোকে ঘেরাও করে খায়। আমি একবার বলেছিলাম যে দূর হইতে দূরবীক্ষণ (Telescope) দিয়া দেখিলে তারা খাদ্য দ্রব্য ফেলে দেবে কি না? ১৩।১৪ বৎসর পূর্ব্বে বলেছি বাঙালীর মস্তিষ্ক অতি অদ্ভুত মস্তিষ্ক। মান্দ্রাজের আয়ার আয়াঙ্গারদেরও তদ্রূপ—

মস্তিষ্কের ভিতর সব water-tight compartments—প্রাত্যাহিক জীবনে বিদ্যার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নাই—বিদ্যা শুধু বক্তৃতা দিবার জন্য—দিল্লী এসেমব্লীতে জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিবার জন্য। অনেক বক্তাকে আমি জানি, তাঁহারা জাতিভেদের বিষময় ফল সম্বন্ধে লম্বা গলায় বক্তৃতা করেন কিন্তু কাজের বেলা সমাজে ঘোরতর গোঁড়া হয়ে উঠেন—তাদের লিষ্ট আমার নিকট আছে। মান্দ্রাজে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণের অহিনকুলের সম্পর্ক—Madras Ministry হইতে ব্রাহ্মণদের বিতাড়িত করেছে—অব্রাহ্মণদের নিজেদের Justice বলে একখানা কাগজও আছে। ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণদের ভেতর হিংসা দ্বেষের অন্ত নাই—খুব রেষা রেষি চল্‌ছে—সে হিসাবে বাংলাদেশ—রামমোহন কেশবচন্দ্র বিবেকানন্দের দেশ ত স্বর্গ।

গত অকৃটোবর মাসে বক্তৃতা দিতে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। অমরাবতীতে অস্পৃশ্য জাতদের দেখেছি—বেরারে মারাঠাদের দেশে—মারাঠা মানে শূদ্র। তথায় তূলোর দাম দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় রায়তারী বন্দোবস্তের দৌলতে যোতদাররা বছরে ১০।১২ হাজার টাকা আয় করেন। এই অনুন্নত ধনী সম্প্রদায়ের আবেদন ও মর্ম্মবেদনা শুন্‌লে পাষাণও বিগলিত হয়ে যায়। তারা নিজেরা স্কুল করেছে—অজ্ঞান অন্ধকার অমানিশার মতই ঘন—তারা জাগ্রত হচ্ছে—হৃদয়ে রোষ হিংসা দ্বেষ পোষণ করে নিজেদের অবস্থা উপলব্ধি করিতেছে—নিজেদের লোক নাই—মান্দ্রাজ হইতে পিঁলাই নাইডু প্রভৃতিদের ডেকে এনে সভাপতি করছে। ব্রাহ্মণদের প্রতি ভয়ঙ্কর বিদ্বেষ। অমরাবতীতে মুসলমান সংখ্যা খুব কম, ভেবেছিলাম জাতি গঠনের অনেক সুবিধা হবে ওখানে। তা' নেতাদের হৃদয়েও ব্রাহ্মণদের উপরে গাঢ় বিদ্বেষ। নাগপুরে মাহার অন্ত্যজ বলে

ব্রাহ্মণদের উপর ভয়ঙ্কর বিদ্বিষ্ট। মাহারদের ব্রাহ্মণেরা পশুর চেয়েও অধম বলে ঘৃণার চক্ষে দেখে। "আমি যদি একটী ব্রাহ্মণকে খুন করে মরতে পারি তবে জীবন ধন্য হইবে" কলেজের কোন মাহার ছাত্রের মুখে এ প্রকার কথা শুনেছি। ভাবুন দেখি আমাদের ভিতরে কত গলদ, আমরা মুখে একজাতি একজাতি করি তাতে লাভ কিং।

বাংলা দেশে হিন্দু মুসলমানের ধমনীতে একই রক্ত—মোগল আফগান তাতার বংশোদ্ভুত মুসলমান বাংলায় ক'জন? মৌলনা আক্রাম খাঁর এবং ঠাকুর পরিবারের এক পূর্ব্ব পুরুষ—উভয়ে এক বংশজাত—ঘ্রাণে অর্দ্ধভোজনের গল্পটা সকলেই জানেন বোধ হয়—রবিবাবু বলেন যে ঘ্রাণের চেয়ে একটু বেশী এগিয়ে ছিল বোধ হয়। ঠাকুর পরিবারের কথা বাদ দিন—ধন বিদ্যা ও অশেষগুণালঙ্কৃত এঁরা—সমাজে এঁদের মর্য্যাদা প্রতিপত্তির কথা বিচার না করে—ইহাদের জ্ঞাতিগোত্র পাড়াগাঁয়ে কি ভাবে থাকেন, তা কাহারও অজানা নেই।

একটা কথা শুনি যে মুসলমানরা জোর করে হিন্দুদের মোছলমান করেছে। কথাটা সত্য বলে মনে হয় না। মুর্শিদাবাদ ও দিল্লীর নিকটবর্ত্তী স্থানে হিন্দুর সংখ্যা খুব বেশী—আধার দিল্লী বা মুর্শিদাবাদ হইতে দূরে চাটগাঁ অঞ্চলে মুসলমানের সংখ্যা খুব বেশী, আমার বিশ্বাস হিন্দু সমাজের অত্যাচারে কৃষিজীবী অনুন্নত পদদলিত লোকেরাই দলে দলে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেছে। সুবিধা দেখেই গ্রামকে গ্রাম মুসলমান হয়েছে। বাগেরহাটে খাঞ্জেয়ালির দরগা দেখেছি—শত সহস্র হিন্দু তথায় মানত করে, ভক্তিশ্রদ্ধা সহকারে সিন্নি দেয়। মওলালির দরগার কথা শুনেছি; হিন্দুরা তথায় মানত না করলে পীরসাহেবকে উপোষ করে থাকতে হয়। শাহজালালের দরগার কথা সকলেই জানেন। মনীষী কার্লাইল বলেছেন যে "Islam is a perfect equaliser of

men”—ইসলাম ধর্ম্ম মানুষের সহিত মানুষের মোটেই প্রভেদ রাখে না—বাদসা আমীর ওমরাহ হইতে মুটে মজুর সকলেই এক মসজিদে উপাসনা করে—এক পাত্রে আহার করবার অধিকারী। যে দিন ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করা যায় সেই দিন হইতে সমাজে এক পদবী লাভ, একত্র আহার বিহার, বিবাহ আদান প্রদান প্রভৃতি চলে। খৃষ্টধর্ম্ম হইতেও ইস্‌লাম ধর্ম্ম এবিষয়ে উদার এবং অগ্রসর।

মুসলমানেরা হিন্দুদের শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলনে একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছেন কিন্তু আমি তাদের বল্‌ছি, পাঁচশত শ্রদ্ধানন্দ এলেও পাঁচ জন মুসলমানকে হিন্দু করতে পার্‌বেন না—মোছলমানরা কিছুতেই হিন্দু হবে না—আমি জানি অনেক হিন্দু বিধবা কলঙ্কময় জীবন যাপন করা অপেক্ষা ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়া শ্রেয় জ্ঞান করেন। হিন্দু সমাজে স্বামী অনায়াসে স্ত্রীকে ত্যাগ করে, পুনরায় বিবাহ কর্ত্তে পারেন—স্ত্রীর আর কোনো উপায় থাকে না। ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করলে বিবাহ বন্ধন খণ্ডন করা যায়—ঘরের ভিতর কত বিবাদ কত গলদ, ভাব্‌লে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যেতে হয়।

জাতির প্রয়োজনে টাকা পাই না—কারণ হচ্ছে পাপের প্রায়শ্চিত্ত—জাতিভেদের বিষময় ফল, আমরা এখন ভোগ করছি। মাড়োয়ারী-দেরও বাঙালী বল্‌তে হবে—এক হিসেবে তারাও বাঙালী বৈ কি—বাংলায় বসবাস করিতেছে—মাড়োয়ারী is making his piles—মাড়োয়ারী টাকা করতে ব্যস্ত। সাহা, তিলি, সুবর্ণবণিক, গন্ধ বণিকেরাও ঐ পথের পথিক। মহারাজা স্যার মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর মত দুই একজন লোক—তাঁরা হচ্ছেন—exceptions proving the rule. আর তিলি, সাহা, সুবর্ণবণিক, কংসবণিক, গন্ধবণিক এদের ভিতর শতকরা ক'জনই বা শিক্ষিত?

দেশে যখন কোন জাতীয় জাগরণ বা আন্দোলন আরম্ভ হয় তখন দেশের বণিককুলই অজস্র অর্থ সংগ্রহ করে' সে আন্দোলনকে সজীব রাখে। পূর্ব্বে বলেছি গৃহবিপ্লবের সময় লণ্ডনের বণিকেরা বিপুল অর্থ সাহায্য করেছিল; ইংলণ্ডের বড় বড় সহরের বণিকেরা অজস্র অর্থ দিয়ে দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় অগ্রসর হয়েছিলেন। সব দেশেই জাতির নানা কাজে যখনই অর্থের প্রয়োজন হয়েছে তখনই বণিককুল অকাতরে দিয়ে দিয়েছে। আমাদের দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যে রত সাহা, তিলি, গন্ধবণিক, মাড়োয়ারী প্রভৃতি সকলেই অজ্ঞান অন্ধকারে নিমগ্ন। আমার একটি মেধাবী ছাত্র প্রাণের আবেগে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়েছিল—একটি জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করে' দেহমন অর্পণ করে' নগ্নপদে অস্থিচর্ম্ম সার হয়ে' দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিল। তার কাছে শুনেছি যে টাকা তোলা দায়—লোকে এসব কাজে এক পয়সাও দিতে চায় না। অথচ একজন বাবাজী এসে যদি আড্ডা গেড়ে বসে মহোৎসবের জন্য ঘি, ডাল, চা'লের এক লম্বা ফর্দ্দ দাখিল করেন তবে অনেক ধনী সওদাগর মহাজন গললগ্নীকৃতবাসে বল্‌তে থাকে "প্রভু, এ অধম আপনার কি উপকার কর্‌তে পারে—আপনার কোন্ কোন্ বিষয়ের ভার আমার উপর দিবেন?" বাবাজী হয়তঃ একসের গাঁজা—দাম ৮০ টাকা—ও মহোৎসবের বিবিধ উপকরণের এক ফর্দ্দ দেন। মহোৎসবে হাজার লোক খাওয়াতে হবে। সওদাগর মহাজনদের ভিতর এই সময় অর্থদান নিয়ে ভীষণ প্রতিযোগিতা চলে। প্রয়াগে কুম্ভমেলায় বড় বড় মোহান্ত স্বর্ণরৌপ্যখচিত সিংহাসনে বসে হাতীতে চড়ে বেড়ায়—অপার ঐশ্বর্য্যের অদ্ভুত আড়ম্বর। হায়! আমাদের দেশের ধনী সম্প্রদায় দেশহিতকর কাজে টাকা না দিয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে স্বামীজি বা বাবাজি মহারাজের পায়ে সমস্ত নিবেদন করে। এতমণ ঘি, এতমণ

ময়দা যোগাইতে পারলেই স্বর্গে তাদের মৌরসী পাট্টা হয়ে গেল। শ্রাদ্ধে, মহোৎসবে, মঠমন্দির প্রতিষ্ঠায় কে কি রকম ক্রিয়াবান তার প্রতিযোগিতা চল্‌বে আর দেশের কাজে দশের কাজে—জনহিতকর কোন কাজে কেউ প্রাণান্তেও একটি পয়সাও দেবে না। নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইচ চ্যান্সেলর স্যার বি, কে, বসু বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে আবেদন করে বড় কিছু পেলেন না, আর বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্নিকটে এক মাড়োয়ারী ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়লের মত দুগ্ধফেননিভ মারবেল পাথরে ৮।১০ লক্ষ টাকা খরচ করে বিরাট এক মন্দির গড়ে তুলেছেন—সেই মন্দিরে আবার endowment—দেবার্চ্চনার বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী টাকা ধর্ম্মের নামে পরকালের জন্য অকাতরে ব্যয় করছে—আর শিক্ষাদানের নিমিত্ত, জ্ঞানের আলোক বিতরণের নিমিত্ত এক কাণাকঁড়ি দিতে লোকের প্রাণে বাজে।

হিন্দু সমাজে নির্য্যাতিত, অধঃপতিত, পদদালত তথাকাথত নিম্নশ্রেণীদের জন্য কেহ ভাবেনা—সমবেদনা সহানুভূতির বড়ই অভাব। সকলে সমান ভাবে শিক্ষিত হইবার কোন সুযোগ সুবিধা পায় না—শিক্ষা উচ্চ শিক্ষিত জনকতক লোকের মধ্যে আবদ্ধ। লর্ড ডাফ্‌রীন্ আমাদের বিদ্রূপ করেছিলেন—তোমরা কংগ্রেস কর—তোমরা ত মুষ্টিমেয় (microscopic minority), তোমরা আন্দোলন কর, তোমাদের চেনে কে? একথার আমরা কি জবাব দিতে পারি? সত্য সত্যিই এক জাতি? আমরা কি একজাতি বলে পরিচয় দেবার যোগ্য?

জাতিভেদের দোষ সম্বন্ধে আমি অনেক বলেছি। আমার একজন ছাত্র আছে, যার অসামান্য কৃতিত্বের জন্য আমি আজ গর্ব্বভরে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াইতে পারি—মেঘনাদ সাহার নাম আজ

জগৎবিখ্যাত—Saha's Law এর কথা সকলেই জানে—কোথায় দুনিরীক্ষ্য নক্ষত্র কি উপাদানে তা গঠিত, সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকেরা যাহা যুগযুগান্তর ধরে নির্ণয় করে উঠ্‌তে পারে নি, আজ Saha's equation এ সেই সমস্ত সূক্ষ্ম তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। ভাবুন দেখি জাতিটা আজ কত বড় হইত যদি এই ৫ কোটী লোকের ভেতর সমান মস্তিষ্ক চালনা হইত। প্রেসিডেন্ট উইলসন তাঁর New Freedom নামক পুস্তকের এক স্থানে আমেরিকার বিশেষত্ব সম্বন্ধে বলছেন যে সে দেশের রাস্তার মুটে পর্য্যন্ত প্রেসিডেণ্ট হবার আশা পোষণ করতে পারে—আজ যে মুটে মজুর, কাল সে রাষ্ট্রনায়ক হবে, কেউ আটকে রাখতে পারবে না ; ওদের দেশেই "From Log Cabin to White House" সম্ভব হয়। ওরা শ্রমের মর্য্যাদা বোঝে—কৃষক, শ্রমজীবী, খানসামা, মুটে, মজুর শীতকালে কলেজে পড়ে—রকফেলারের মত কোটীপতির ছেলের সাথে একসঙ্গে একত্র পড়ছে—এক মেসে থাকে কেউ কাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করবার জো নাই—যদি করে সকলে তাকে ill-bred অভদ্র বলে বিতাড়িত করে দেয়। আমেরিকা কত বড় জাতি —Dignity of labour কত ? আর আমাদের দেশে আমরা শ্রমের মর্য্যাদা বুঝি না—একটা মাছ কিনে হাতে করে আন্‌তে পারিনা—আট আনায় ইলিস মাছ কিনে দুই আনা দিতে হয় মুটে ভাড়া—নিজেরা সাহস করে মাছটা হাতে করে আনতে পারি না।

জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক কথাই বলেছি। ইংলণ্ডের কথা ধরুন—নরম্যানরা ইংলণ্ড দখল করে বিজিত স্যাকসন-দের সমস্ত জমাজমি কেড়ে নিয়ে Deer Park মৃগয়া ক্ষেত্র করে কত রকম অত্যাচার করেছে। William the Conqueror-এর সময় হইতে "Down with the Saxons", "Down with the Normans"

এই রব শুনা যেত কিন্তু যে দিন Magna Charta সকলে মিলে রাজা জনের কাছে থেকে আদায় করা হ'ল, যে দিন Barons and Yeomen রা মিলে নিজেদের right—birth right এর দাবী করল সেই দিন বিজেতা ও বিজিত এক হয়ে গেল। মেকলে বলেছেন "Here commences the History of the English nation." বিবাহের আদান প্রদান ও আহারাদিতে বিবাদ বা মনোমালিন্য থাকতে পারে না। আমাদের দেশে সব অদ্ভুত ব্যাপার। পদ্মার ওপার গিয়ে যারা বসবাস করল—তারা হ'ল বঙ্গজ—যত নৈকষ্য কুলীন সব বিক্রম-পুরে। বঙ্গজ ও রাঢ়ীতে কাজ হবে না—উত্তর রাঢ়ী দক্ষিণ রাঢ়ী আলাদা—এর ভিতর কোনো Logic নাই। কায়স্থ গেল পদ্মার ওপার, তার সঙ্গে আর ক্রিয়া কর্ম্ম চলবেনা—কোন যুক্তি তর্ক নাই—Without any Rhyme and Reason. গৌহাটী, তেজপুরের এক এক জন উকিল মেয়ের বিয়ে দিতে সর্ব্বস্বান্ত হ'ন—যিনি বারেন্দ্র শ্রেণী ভুক্ত, বর খুঁজ্তে ৬ মাস এসে বরেন্দ্র ভূমিতে বাস করতে হবে—বম্বে নাগপুরে যে সমস্ত বাঙ্গালী আছে, বর খুঁজ্তে তাদেরও বাংলা দেশে আসতে হয়, তাই একবার মেয়ের বিয়ে দিতে ৪,৫ বছরের জমান টাকা খরচ হয়ে যায়। পরিবারবর্গ নিয়ে যাতায়াত—কত ঝঞ্ঝাট। নাগপুর বম্বে অঞ্চলে যাঁরা থাকেন তাঁদের কত অসুবিধা—বাংলা পড়িবার জো নাই, ভাবুন দেখি আমাদের অসুবিধার অন্ত নেই। আর একজন ইংরাজ ফ্রান্স বা জর্ম্মেণীতে গিয়ে সেখানেই একজন ফরাসী বা জার্ম্মাণ বিয়ে করে ঘর সংসার করে। মুসলমানেরা যেখানে খুসী বিয়ে থা' করে বসবাস করতে পারে। আমাদের হিন্দুদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডী, কোটর করে প্রত্যেকে পৃথক খাঁচার মধ্যে চুপ করে বসে আছি।

গত শুক্রবার ভবানীপুর ব্রাহ্ম সমাজে জাপানের কথা বলেছিলাম। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে নব্য জাপানের (New Japan) অভ্যুত্থান। কাউণ্ট অকুমার কীর্ত্তি কলাপ আমি নখ দর্পণে দেখিতেছি। ৫০ বৎসরে জাপান পৃথিবীর সভ্য জাতি সমূহের সমকক্ষ হয়েছে। আমরা সকল দোষ গভর্ণমেণ্টের ঘাড়ে চাপাই, মনে করিবেন না যে আমি গভর্ণমেণ্টের খোসামুদি করছি—আর আমি গভর্ণমেণ্টের কতটুকু খোসামুদি করে চলি তা সবাই জানে। আমাদের সমাজ দেহের ভেতরে ব্রণ—পূতিগন্ধময় ক্ষত, উপরে মলম প্রলেপ দিয়ে লাভ কি? অস্ত্রোপচার (Surgical operation) দরকার। ব্যাধি পোষণ করে কি লাভ? কত ক্ষতি হচ্ছে তাত চক্ষের উপর দেখিতেছি। যখন আমি খুলনা দুর্ভিক্ষ নিয়ে বিব্রত ছিলাম, তখন একদিন এক গ্রামে গিয়েছি। তখন জ্যৈষ্ঠ মাস, কতগুলি যুবক এসে বল্ল "দেখুন এসে আপনি ত দুর্ভিক্ষ নিবারণে ব্যস্ত—Relief operation নিয়ে বিব্রত আছেন, দেখুন এসে ষ্টীমারে কি ভিড়—কত বিধবা লাঙ্গল-বাঁধ তীর্থে যাচ্ছে।" বিধবারা সারাজীবনের গচ্ছিত ধন পরের হাতে তুলে দিতে যাচ্ছে দেখে মনে বড় ব্যথা হ'ল। কত বিধবা শাকান্নে তৃপ্ত হয়ে, নটে শাক, কলমি শাক খেয়ে টাকা মাটিতে পুঁতে ৪০৲, ৫০৲, ১০০৲ জমায়ে অর্দ্ধোদয়, লাঙ্গলবন্ধ, শ্রীক্ষেত্র, গঙ্গাস্নান প্রভৃতি তীর্থ যাত্রা উপলক্ষে সর্ব্ব পাপ ক্ষয় করে পরকালের গতির ব্যবস্থা করে। সংস্কারের ভালমন্দ সম্বন্ধে কিছুই বল্‌বোনা—তীর্থ যাত্রার ন্যায় অন্যায় সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে চাই না—আর এই ব্রাহ্মসমাজের পুলপিট থেকে তীর্থযাত্রার বিরুদ্ধে বল্লেও বোধ হয় তেমন কোন অপরাধ হবে না। যাহোক, আমি Economic—অর্থ নৈতিক দিক হইতে এ বিষয় আলোচনা করছি। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বলছি এই জন্য যে চন্দ্রনাথ, গয়া, কাশী, প্রয়াগ,

মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ যাত্রা দ্বারা খরচের চৌদ্দ আনা টাকা লণ্ডনে মনি অর্ডার করি; বাদবাকী দু' আনা গরীব ষ্টেশন মাষ্টার, কেরাণী, কুলি ও তীর্থের পাণ্ডাদের দেই। কোথায় বদরিকাশ্রম আর কোথায় রামেশ্বর সেতুবন্ধ—কত কোটী, কত লক্ষ লক্ষ টাকা আমরা তীর্থযাত্রা উপলক্ষে ব্যয় করি; অথচ দেশের কাজের জন্য, জাতির কল্যাণের নিমিত্ত, জলাশয় দীঘী খনন, পথ ঘাট নির্ম্মাণ প্রভৃতি সৎ-কাজের জন্য টাকা পাওয়া যায় না—পুণ্যশ্লোকা রাণী ভবানী ও অহল্যা বাইয়ের দৃষ্টান্ত লোকে অনুসরণ করে না। "তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"—অন্ধ আতুর কলেরা ম্যালেরিয়া কালাজ্বর গ্রস্থ দুস্থ গ্রামবাসীদের সেবার জন্য টাকা পাওয়া যায় না—অথচ কত টাকা তীর্থের জন্য ব্যয় হয়। পূর্ব্বে যখন রেল ষ্টীমার ছিল না—তখন অবশ্য এই তীর্থের টাকার অনেকাংশ দেশী মাঝি মাল্লার হাতে ঘুরত। তীর্থ যাত্রার ন্যায় অন্যায় আলোচনা আমি করব না—অর্থনৈতিক দিকের কথাই বল্লাম। কি সর্ব্বনাশকর মোহ—আমার উদ্ধার হোক—আর দুনিয়াশুদ্ধ সব উৎসন্নে যাক—কি ঘোরতর স্বার্থপর ভাব "প্রয়াগে মুড়িয়ে মাথা মরগে পাপী যথা তথা" কি অন্ধসংস্কার। এই ভাবে আমরা দিন দিন জাহান্নামে যেতেছি।

ইউরোপীয় এবং আমেরিকানদের আমরা জড়বাদী বলি—Materialistic—আমেরিকার বহুক্রোড়পতির নাম জানি—প্রবাসীতে কয়েক মাস পূর্ব্বে এদের আয়ের একটা তালিকা দেওয়া হয়েছিল—এরা এই কোটী কোটী টাকা কি ভাবে ব্যয় করে? আমরা অর্থ উপার্জ্জন করি পরকালের সদগতির নিমিত্ত, এরা করে ইহকালের জন্য—কোটী কোটী টাকা ব্যয় করে রিসার্চ্চ ইনিষ্টিটিউট, হাসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করে থাকেন। কার্ণেগী ১০০ কোটি টাকা ও রকফেলার

বিদ্যাশিক্ষা ও নরহিতের জন্য ন্যূনাধিক ১৫০ কোটী টাকা দান করেছেন; মান্‌সিন্‌ আট মিলিয়ন পাউণ্ড অর্থাৎ ১২ কোটী টাকা আর্ট ও কালচারের জন্য ব্যয় করেছেন। জনহিতকর কাজে যাতে কুসংস্কার বিদূরিত হবে এমন কল্যাণকর কাজে দেশহিতের জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করেন আমেরিকার ধনী সম্প্রদায়।

আর আমাদের দেশে আমরা আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি—আমরা মধ্যবিত্তেরা ত লক্ষ্মীছাড়া। যাদের ঘরে লক্ষ্মী আশ্রয় নিয়েছেন সেই মাড়োয়ারী—মাড়োয়ারীদের কথা বল্‌তে আমি বাধ্য, না বল্‌লে অকৃতজ্ঞ হতে হবে। খাইতে পায়না, পরের দুঃখ কষ্ট শুনিলে দয়ায় তাদের হৃদয় বিগলিত হয়। পিঞ্জরাপোলই করুক আর মন্দিরই তুলুক তাদের হৃদয় আছে। সাহা, তেলী, সুবর্ণবণিক প্রভৃতির সহানুভূতি লাভে আমরা বঞ্চিত। ঐ সব ব্যবসায়ীদের মধ্যে যদি সমান ভাবে লেখাপড়ার বিস্তার হইত তবে দেশের কাজে ওদেরও সাড়া পাওয়া যাইত।

বিগত শতাব্দীর সত্তরের কোটা পর্য্যন্ত আমাদের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের ন্যায় জাপানের সামুরাই জাতি সমস্ত সুবিধা একচেটিয়া করে রেখেছিল। সামুরাইরা জাপান জাতির মস্তক স্বরূপ, আমাদের দেশে যেমন ব্রাহ্মণ। ১৮৫৩ সালে যেদিন কমোডোর পেরী জাপানের তীরে এসে কামান্‌ পেতে অবাধ বাণিজ্যের দাবী করে বস্‌ল, সেদিন জাপানের চোখ্‌ ফুটল—জাপানীরা অবশ্য তীর ধনুক নিয়ে বাধা দিতে দণ্ডায়মান হয়েছিল। কিন্তু ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে জাপানের Feudal Systemএর অবসান হ'ল—অভিজাত সম্প্রদায় স্বেচ্ছায় সমস্ত প্রভুত্ব সম্রাটের পদতলে বিসর্জ্জন দিলেন। সামুরাই Nobility—আমাদের যেমন ব্রাহ্মণ কায়েস্থ বৈশ্য—সমস্ত অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান তুলে দিল। সমস্ত

জাতি পরস্পর সহানুভূতিতে এক হতে পারল। এতা ও হিনিন নামে দুইটী জাতি অস্পৃশ্য অতি ঘৃণিত বলে বিবেচিত হ'ত—আমাদের দেশের হাড়ি ডোম চামার প্রভৃতি হীন অনুন্নত ইতর শ্রেণীর সামিল—গ্রামের বাইরে তাদের বাস করতে হ'ত। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর জাপানের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়, স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। কারণ ঐদিনে আভিজাত্য দর্পে গর্ব্বিত সামুরাইগণ নিজেদের দেশভক্তি ও উন্নত হৃদয়ের প্রভাবে স্বেচ্ছায় আপনাদের সর্ব্ববিধ বিশেষ সুবিধা ত্যাগ করলেন—এতা ও হিনিন সম্প্রদায়কে আলিঙ্গন করে বল্লে "আজ থেকে সমস্ত জাপান এক—আমরা সব ভাই ভাই।"

"Indian Caste" নামক পুস্তকে জনৈক সাহেব লিখেছেন যে ভারতে অন্ততঃ পাঁচ হাজার রকম শ্রেণীবিভাগ বিদ্যমান—একই বৈদ্য, তা বিক্রমপুর আর কালনায় ক্রিয়াকর্ম্ম চল্‌বে না। সায়ান্স কলেজে দেখি দোবে চোবে ব্রাহ্মণরা ৪।৫টা উনুন করে রাঁধছে, একদিন বল্লাম যে "তোমরা সবাইত বামুন—একত্র রান্না বান্না করলেই ত পার, তাতে খরচও কম পড়ে—কয়লা কম লাগে, পরিশ্রম কম লাগে—পালা করে রাঁধলেই ত পার।" উত্তরে তারা বল্ল যে ওত ঠিক বাত হ্যায় বাবুজি লেকেন হাম কনোজী বামন, অমুক ত গয়া জিলামে আতা হ্যায় ইত্যাদি।

অনেক কুচক্রী বক্তৃতাবাগীশ সমাজপতির নাম আমি জানি—আমার কাছে লিষ্ট আছে—যাদের যত লম্বা টিকি তারাই তত নষ্টের মূল—একেবারে in the direct ratio. গৃহ বিবাদে সব ত উৎসন্নে যেতে বসেছে!

আমাদের পদে পদে বিপদ! সে দিন বরিশালে ব্রজমোহন কলেজে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে কি কাণ্ডটাই না হয়ে গেল। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর কত গলদ। ঢাকায় কিন্তু এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখেছি—রমণার

কালীবাড়ী ও মুসলমানদের মসজিদ খুব কাছাকাছি; কালীবাড়ীর ঢাকঢোল শঙ্খ ঘণ্টার নিনাদ ২।৪ রসি তফাতে মসজিদ থেকে খুব স্পষ্টই শোনা যায়; কৈ মুসলমানরাত তাতে কোনদিন টু শব্দটীও করে নি; সম্রাট জাহাঙ্গীর কিম্বা শায়েস্তা খাঁর অঙ্গুলী সঙ্কেতে কালীবাড়ী উধাও হয়ে যেতে পারত। সন্ধ্যাবেলা মসজিদে নামাজ এবং মন্দিরে ঢাক ঢোল শঙ্খ ঘণ্টা করতালের প্রকাণ্ড কলকোলাহলের মধ্যে সন্ধ্যা আরতি সম্পন্ন হয়।

আজ কেন এই হিন্দু মুসলমানের বিবাদ, ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণের রেষারেষি দ্বেষাদ্বেষি—তাই বলছি সময় থাকিতে এখনও ঘর সামলাও। ঘর শত্রুতে রাবণ নষ্ট। আমরা স্বার্থত্যাগ করবো না, নিজেদের অন্যায় আবদার অধিকার ছাড়বোনা, কি করে বড় হ'ব, জাতি গড়ে তুলবো? জাপানে যা একদিন সম্ভব হয়েছে, ভারতে কি তা হবে না? অস্পৃশ্যতা পাপ হিন্দু ভারতবর্ষ ব্যতীত কোথাও পাবেন না। "Cleanliness is next to godliness" একথা কে অস্বীকার করবে? লিবিগ্ বলেছিল "Civilisation of a nation is measured by the amount of soap it consumes." পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া সকলের আগে চাই—কিন্তু হিন্দু সমাজ ত সে দিকে চায় না—উড়িষ্যা বা বিহার হইতে যে কেহ গলায় একগাছ দড়ি দিয়া আস্লেই হইল—সে যে জাতেরই হোক না তা খোঁজ করবার দরকার নাই—গলায় দড়ি থাকলেই হ'ল। এই উড়ে বামুনদের 95 per cent suffer from incurable and abominable diseases—শতকরা ৯৫ জন ঘৃণিত কুৎসিৎ ব্যাধিগ্রস্থ।

মনীষী ইমার্সন বলেন "Only that good avails which we can share in common." জাতিভেদের উপকারিতা

হয়তঃ এককালে ছিল—এখন উহার মাহাত্ম্য একেবারে চলিয়া গিয়াছে। জানেন ত সেদিন প্রেসিডেন্সী কলেজের একটী promising চোখা ছেলে কোন তরুণীর প্রেমে পড়ে আত্মহত্যা করেছে—তথাকথিত শূদ্রশ্রেণী ও ব্রাহ্মণে বিয়ে হবে কি করে? "আলো ও ছায়া"র কবি বলিয়াছেন যে

"সংসারে দোঁহারে তাঁরা বাঁধিল হাতে হাতে।
বাঁধিতে নারিল তারা হৃদয় হৃদয় সাথে॥"

বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহারের আলোচনায় বলেছি যে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন যে "অবনতাবস্থায়ও বঙ্গমাতা রত্নপ্রসবিনী"—রঘুনন্দন ও কুল্লুকভট্টের নাম করে বঙ্কিমচন্দ্র ঐ কথা বলেছেন। বঙ্গমাতা যে রত্ন প্রসব করেছেন সে রত্ন মনু, যাজ্ঞবল্ক, পরাশর প্রভৃতি মন্থন ও আলোড়ন করে নবম বর্ষীয়া বিধবা নির্জ্জলা একাদশী না করলে তার উর্দ্ধ ও অধঃ কয় পুরুষ নিরয়গামী হবে তার সমাধান করেছেন—কেহ বা কাকচরিত্র রচনা করেছেন—প্রাতে দুই দণ্ড দশ পল গতে নৈঋত কোণে কাক কা কা রব করলে সেদিন কি প্রকারে যাবে—কেহ বা পাত্রাধার তৈল না তৈলাধার পাত্র, তাল পড়িয়া ঢিপ করে না ঢিপ করিয়া তাল পড়ে এই সব অমোঘ তত্ত্বের মীমাংসায় ব্যস্ত রয়েছেন—ঠিক এই সময়েই ইউরোপে গ্যালিলিও, কেপলার, নিউটন প্রভৃতি মনস্বীগণ নব নব বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব আবিষ্কারে ব্যস্ত ছিলেন।

বঙ্গমাতা উপরোক্ত শ্রেণীর রত্ন যত কম প্রসব করবেন ততই দেশের মঙ্গল হবে। পৃথিবীর বৈঠকে ভারতবাসীর স্থান কোথায়? প্যারিয়াকে যেমন আমরা কুকুর বিড়াল অপেক্ষাও অধম করিয়া ইতর অন্ত্যজ পঞ্চম শ্রেণীভুক্ত করে' রেখেছি, তেমনি সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপই যেন পৃথিবীর বৈঠকে আমরা এক ঘরে হয়ে আছি। তাই

আজ কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা উচিত যে তিনি যেন অচিরে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মতন একজন যুগাবতার পাঠান, যিনি হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খৃষ্টিয়ান সকলকে সমানভাবে দেখিবেন, ভগবান যেন অচিরে এইরূপ একজন অলোকসামান্য মহাপুরুষ প্রেরণ করেন।

১৯

বাঙ্গালায় গো-ধনের অভাব ও বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যনাশ

বিলাতে অনেকবার গিয়াছি ; এবার পঞ্চমবার সেখানে পর্য্যটন করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। পূর্ব্বে প্রায় রাসায়নিকের চক্ষে ইউরোপ দেখিয়াছি। কিন্তু আজ কয়েকবৎসর ধরিয়া বাঙ্গালীর অন্নসমস্যা ও তাহার সমাধান লইয়া আমি বহু চিন্তা করিয়াছি এবং সেই মর্ম্মে কত প্রবন্ধ লিখিয়াছি ও কত বক্তৃতা করিয়াছি। এইজন্য এবার আমি বাঙ্গালীজাতির (Physical deterioration) বা শারীরিক অবনতি এবং পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব (malnutrition) এবং তজ্জন্য বাঙ্গালীরা যে কি প্রকার হীনবীর্য্য ও অস্থিচর্ম্মসার হইয়া পড়িতেছে, তাহাই মনে রাখিয়া ইউরোপ সন্দর্শন করিয়াছি। মার্শেলিশ হইতে নামিয়াই, যে সমস্ত বালকবালিকাগণ প্রাতে বিদ্যালয়ে যাইতেছে, তাহাদের সবল স্বাস্থ্য ও স্ফূর্ত্তিব্যঞ্জক চেহারা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। প্যারিস নগরে অবস্থিতি কালেও মেয়ে ও ছেলেদের চেহারা দেখিয়া আমাদের দেশের সেই বয়সের মেয়ে ও ছেলেদের চেহারার পার্থক্য বুঝিতে আর বিলম্ব রহিলনা। আবার মার্শেলিশ হইতে যখন রেলগাড়ীতে প্যারিসনগরী চলিতে লাগিলাম, তখন দেখিলাম ফরাসী দেশও প্রকৃতপক্ষে গ্রীষ্মকালে সুজলা, সুফলা ও শস্যশালিনী,—

দুইধারে কেবল শ্যামবর্ণ দীর্ঘ তৃণদল, কোথাও বা বিপুলকায়া গাভী চরিয়া বেড়াইতেছে এবং ইচ্ছামত শুইয়া রোমন্থন করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে আলু, গোধূম, দ্রাক্ষা প্রভৃতিরও চাষ। একটুকরা জমিও পতিত নাই। ফ্রান্সের দক্ষিণে আপেল, কমলালেবু প্রভৃতিও যথেষ্ট পরিমাণে জন্মে। লিও নগরী ও তাহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থান রেশমের চাষের জন্য বিখ্যাত।

যখন ক্যালে পার হইয়া ডোভারে পৌঁছিলাম এবং ডোভার হইতে লণ্ডনে রওনা হইলাম, তখনও অবিকল ঐ প্রকার দৃশ্য দেখিলাম। অনেকের সংস্কার যে ইংলণ্ড কেবল সহরময় এবং স্তূপীকৃত পাথর ও ইটের সমাবেশ। সত্য বটে, লণ্ডন বিশেষতঃ ম্যান্‌চেষ্টার, বার্ম্মিংহাম, লিভারপুল, নিউক্যাসেল প্রভৃতি সহর দেখিলে এই কথাই মনে হয়। কিন্তু এইসব সহর সমস্ত ইংলণ্ডের কতটুকু স্থান অধিকার করে? লণ্ডন হইতে মিডল্যাণ্ড রেলওয়ে (Midland Railway) দিয়া এডিনবরায় যাইতে হইলে কেবলই দেখা যায় বিস্তীর্ণ তৃণপূর্ণ মাঠ। তা ছাড়া, সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ উদ্ভিদ ও তরীতরকারীর ক্ষেত। এক কথায় বলিতে গেলে, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে কৃষি শব্দে Cattle breeding বা পশুপালনও বুঝায়—এমন কি ইহাই তাহার প্রধান অঙ্গ। এই গ্রীষ্মকালে ঘাসের আবাদে প্রায় দুই কখন বা তিন কিস্তী ঘাস কাটিয়া শুকান হয়। এইজন্য ইংরাজীতে প্রবাদ আছে Make hay while the sun shines। এই শুষ্ক ঘাস রাশীকৃত করিয়া শীতকালে গরুর খোরাকের জন্য রাখা হয়। এতদ্ভিন্ন শালগম, গাঁজর, এবং একপ্রকার বৃহদাকার শালগম বিশেষ (mangel wurzel) এই সমস্ত চাষ করিয়া গরুর খাদ্যের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখা হয়। এতদ্ভিন্ন গম, ওট, যব, বার্লি আদির বিচালী প্রভৃতিও যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। লণ্ডনের

সন্নিকটে একটি Dairy farm অর্থাৎ গো-শালা আমি দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম উপরি লিখিত খাদ্যাদির সহিত প্রচুর পরিমাণে oilcake (খইল), ভূষি প্রভৃতি ব্যবহার হয়। এক একটা গাভী পনর সের হইতে আধ মণের কম দুধ দেয় না। ছয় বৎসর পূর্ব্বে একবার শীতকালে আমি যখন ইংলণ্ডে গিয়াছিলাম, তখন একটা গাভী একমণ দুধ একদিনে দিয়াছিল বলিয়া সংবাদপত্রে হুলুস্থুল পড়িয়া যায়।

আমার এই কয়টী কথা লেখার তাৎপর্য্য এই, যদি প্রকৃত পক্ষে কোন দেশে গো-পালন ও গো-সেবা থাকে, তাহা ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে আছে। আবার গরুর কোনপ্রকার সংক্রামক ব্যাধি আছে কিনা (Foot and mouth disease, rinder pest), ইহার জন্য স্বাস্থ্যবিভাগ হইতে ইনস্পেক্টারগণ নিয়ত তদারক করিবার জন্য নিযুক্ত আছেন। কোনস্থানে সংক্রামক ব্যাধি দেখিলে তৎক্ষণাৎ সেই গরুকে গুলি করিয়া মারা হয় এবং তাহার দেহ ভস্মীভূত করা হয়, পাছে সংক্রামক ব্যাধি বিস্তার লাভ করে। আমাদের দেশে প্রায়ই দেখা যায়, আবাদ অঞ্চলে যখন ফসল উঠাইয়া লওয়া হয়, তখন গরু ও বলদ ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এবং যদি গো-বসন্ত প্রভৃতি রোগ একবার দেখা যায়, তখন মনে করুন নদীয়া হইতে তাহার সংলগ্ন যশোহর, যশোহর হইতে তাহার সংলগ্ন খুলনা এবং খুলনা হইতে তাহার সংলগ্ন বরিশাল, ফরিদপুর প্রভৃতি স্থান পর্য্যন্ত গো-মড়ক উপস্থিত হয়। এই প্রকারে লক্ষ লক্ষ গরু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আমাদের দেশের চাষীরা শীতলার কৃপা বলিয়া হাত পা কোলে করিয়া বসিয়া থাকে।

লণ্ডনে প্রাতে সাতটার পূর্ব্বে প্রতি গৃহস্থের বাড়ীর দরজার নিম্নে মুখ-আটা দুগ্ধপূর্ণ পাত্র দুধওয়ালারা রাখিয়া যায়। গৃহস্থ গাত্রোত্থান

করিয়া সুবিধামত সেই দুধ ঢালিয়া লয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যদিও এই দুধ বাহিরে রাখিয়া চলিয়া যায়, তবু কেহ ইহা স্পর্শ করে না। ইহা ছাড়া পাড়ায় পাড়ায় Dairy অর্থাৎ "গব্যজাতের-ভাণ্ডার" আছে। ইংরেজেরা সেখান হইতে ইচ্ছামত দুধ, মাখন, কিনিয়া আনিতে পারে। ইংরেজ জাতি 'গোখাদক' বলিয়া বিখ্যাত। তা ছাড়া, তাহারা মেষ, শূকর, শশক ও নানাবিধ পক্ষীর (Partridge) মাংস প্রচুর পরিমাণে খায়। ইহা সত্ত্বেও ইংরাজদিগের শিশু সন্তান প্রধানতঃ দুগ্ধে পরিপুষ্টি লাভ করে এবং তাহারা নিজেরাও যথেষ্ট পরিমাণে দুগ্ধ পান করে।

এখন বুঝা যাক ইহারা কেন সবল। পুষ্টিকর খাদ্য ইহারা যথেষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করে। আমি সম্প্রতি আয়রলণ্ড ভ্রমণ করিয়াছি। ইহার একটি নাম এমারাল্ড আইল (Emerald Isle) অর্থাৎ সবুজ ঘাস পূর্ণ দ্বীপ। আয়রলণ্ডের কৃষিজাত দ্রব্যই প্রধান ধন। সেখানে কলকারখানা—কেবল মাত্র বেলফাষ্টে দৃষ্ট হয়। নিজেদের অর্থাৎ আইরিশদের অভাব মোচন হইয়া প্রচুর পরিমাণে মাখন, পণির ও ডিম্ব ইংলণ্ডে রপ্তানী হয়। হায় বাঙ্গলা! তোমার আজ কি দুরদৃষ্ট! তুমি ভারতের মধ্যে উর্ব্বরা ও সুজলাসুফলা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছ। চাষ অর্থাৎ কৃষিজাত দ্রব্যই তোমার একমাত্র ধনসম্পত্তি। কিন্তু আজ আমি বাঙ্গলার যেখানেই যাই—বিশেষতঃ এই বর্ষাকালে, টাকায় দুই সের আড়াইসেরের বেশী দুধ মিলে না। তাহাও যথেষ্ট পরিমাণে নয়। এমনকি, একমণ, দুমণ দুধ সংগ্রহ করিতে হইলে অন্ধকার দেখিতে হয়।

আমাদের দেশের গরুর অবস্থা দেখিলে ক্রন্দন সম্বরণ করা যায় না। বিশেষতঃ পাটের চাষ বৃদ্ধি হওয়ার পূর্ব্বে যাহা কিছু গোচারণের মাঠ ছিল, তাহা বাজেয়াপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখন গৃহস্থের গো-পালন করা

একপ্রকার অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। আমার ছেলেবেলায় অর্থাৎ পঞ্চাশ ষাট বছর পূর্ব্বে বাঙ্গালীর ঘরে গোয়ালভরা দুগ্ধবতী গাভী ছিল, আর এখন দেখা যায় অতি অল্প গৃহস্থেরই ঘরে গো-পালনের ব্যবস্থা আছে এবং গরুর খাদ্যের সুবন্দোবস্ত নাই বলিয়া সাধারণতঃ এক একটা গাভী আধ সের তিন পোয়া মাত্র দুধ দেয়। ইহারা কঙ্কালসার ও ক্ষুধাতুর। নিজের বাছুরকেই বা কি দিবে, এবং গৃহস্থকেই বা কি দিবে? আমার মনে হয় শীঘ্রই এমন আইন প্রচলন হওয়া দরকার, যাহাতে প্রত্যেক গ্রামে যথেষ্ট পরিমাণ গো-চারণের মাঠ সুরক্ষিত থাকে।

এই যে প্রায় পাঁচ কোটি বাঙ্গালী—ইহারা এবং ইহাদের শিশুগণ কতটুকু দুধ খাইতে পারে? দুধই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর খাদ্য (A Perfect Food) অর্থাৎ ইহাতে শরীর গঠনের যাবতীয় উপাদান বিদ্যমান। শৈশবে ও বার্দ্ধক্যে দুগ্ধই প্রধান খাদ্য হওয়া উচিত। এই যে আজ বাঙ্গালীজাতির এই প্রকার শারীরিক অবনতি ও দুর্ব্বলতা তাহার প্রধান কারণ দুগ্ধের ন্যায় পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব। আর মাছের তো কথাই নাই। সর্ব্বত্রই দেখিলাম একটাকা পাঁচসিকার কমে সের মিলে না। বিশেষতঃ এবার পদ্মায় ইলিশ মাছেরও দুর্ভিক্ষ।

বাঙ্গালী আজ তাহার উদর শাকপাতা ডাটা প্রভৃতি কদর্য্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ করে। অর্থাৎ পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে (malnutrition) বাঙ্গালী জাতির সর্ব্বনাশ হইতেছে। আর এই যে ম্যালেরিয়া আষ্টে-পৃষ্ঠে তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে, তাহারও প্রধান কারণ, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে তাহার resisting power বা রোগ বাধা দিবার ক্ষমতা হ্রাস পাইয়াছে। বারান্তরে বাঙ্গালী জাতির ঘোর দারিদ্র্যের বিষয় বলিবার বাসনা রহিল।

বাঙ্গালী—মরণের পথে

(অর্থ-নৈতিক সমস্যা)

২০।২৫ বৎসর যাবৎ আমি নিরবচ্ছিন্ন চীৎকার করিয়া আসিতেছি যে, এই অন্নসমস্যার প্রশ্ন সমাধান করিতে না পারিলে, বাঙ্গালী জাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইবে। গত ৫ বৎসর আমি উত্তর, পূর্ব্ব, পশ্চিম বাঙ্গালার নগরে নগরে—এমন কি, গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়াছি এবং আমার দৃষ্টি কেবল একদিকেই রহিয়াছে—বাঙ্গালীর শারীরিক শোচনীয় অবস্থা, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব। দুগ্ধ—যাহা শিশুদের একমাত্র পরিপোষক এবং যাহাতে অস্থি ও মাংসপেশী গঠনের সমস্ত উপাদান আছে,—তাহা পাড়াগাঁয়েও অনেক সময় টাকায় ৵২৷৹ সের এবং তাহাও দুষ্প্রাপ্য। দরিদ্র, চাষা-ভূষার ছেলে-পিলে অনেক সময় ভাতের মাড় এবং ভদ্রঘরের সন্তানগণ বার্লি প্রভৃতির 'লেই' দিয়া কোন রকমে উদর ভর্ত্তি করে। এইগুলির শ্বেতসার (Starch) প্রধান উপাদান। ইহাতে কালসিয়াম, নাইট্রোজেন প্রভৃতি উপকরণ, যাহা অস্থি ও মাংসপেশী গঠনের প্রধান সহায় হয়, তাহা আদৌ নাই। বাঙ্গালী ছেলেদের বুকের (Chest) পরিধি দিন দিন সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে এবং চেহারাও জীর্ণ-শীর্ণ,—ইহা যে কেবল ম্যালেরিয়া-ব্যঞ্জক তাহা নয়, পুষ্টিকর ও প্রচুর খাদ্যের অভাবও সূচনা করে। একটী মাত্র প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলোচনা করা অসম্ভব। আজ কেবলমাত্র এই কলিকাতা সহরের বাঙ্গালীদের অবস্থান বিষয়ে দুই চারিটী কথা বলিব।

গবর্ণমেণ্টের ও ইংরাজ-বণিকদের রিপোর্টে দেখা যায় যে, এই

রাজধানী কলিকাতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্যের (Export and Internal Trade) অবস্থা দেখিলে মনে হয় যে, কলিকাতার ঐশ্বর্য্য দিন দিন কতই বাড়িতেছে।—বাড়িতেছে বটে, কিন্তু 'বেল পাকিলে কাকের কি?' আমি অনেকবার বলিয়াছি যে, কলিকাতার এই ধনাগম (Bank Deposit) এক্সচেঞ্জ মার্ট প্রভৃতির দ্বারা যাহা প্রতীয়মান হয়, তাহার শতকরা পাঁচভাগও বাঙ্গালীর নয়। একবার চিত্তরঞ্জন এভেনিউ দিয়া যাতায়াত করুন; দেখিবেন দুই ধারেই পাঁচতলা সৌধমালা দিন দিন উঠিতেছে। সেখানে জমি দশ হাজার হইতে পনর হাজার টাকা কাঠা। জিজ্ঞাসা কর, ইহার কয়টি বাঙ্গালীর? সমস্ত বড়বাজার, মুর্গীহাটা, এজরা ষ্ট্রীট, পোলক ষ্ট্রীট প্রভৃতির যত বড় বড় বাড়ী ও গুদাম ঘর, সমস্তই মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, দিল্লীওয়ালা, পার্শি, আর্ম্মেনিয়ান ও ইহুদীদের অধিকৃত। এই গুলির দক্ষিণ হইতে সমস্ত চৌরঙ্গী রোড্ ইংরেজ বণিকদের করতলগত।

কলিকাতার যাবতীয় জুতা-নির্ম্মাতা হয় চীনা, না হয় পশ্চিমা। আমার এক জন আত্মীয়-যুবক, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে জুতার দোকান খুলিয়াছেন। তাঁহার তাঁবে পাঁচ ছয় জন পশ্চিমা চামার কাজ করে। ইহারা প্রত্যেকেই সকাল হইতে কাজ সুরু করিয়া রাত্রি ৯টা ১০টা পর্য্যন্ত অবিরাম পরিশ্রম করে এবং এক জোড়া জুতা না শেষ করিয়া ছাড়ে না। আমি সেদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহাদের প্রত্যেকের রোজগার কত? উত্তর পাইলাম যে, এক জোড়া জুতা তৈয়ারীর মজুরী প্রত্যহ ১॥৵০ আনা অর্থাৎ মাসিক ৫০৲ টাকা। একজন 'চীনা মিস্ত্রী' ইহাদের অপেক্ষাও কর্ম্মঠ ও সুদক্ষ। ইহারা মাসিক একশত টাকার কমে কাজ করিতে রাজী হয় না। কলিকাতার যাবতীয়

রাজমিস্ত্রীও পশ্চিমা। সূত্রধর অর্থাৎ ছুতারমিস্ত্রী চীনাদের সহিত প্রতিযোগিতায় দিন দিন হটিয়া যাইতেছে। চীনারা যে শুধু ভালকাজ দেয় তাহা নহে, ইহারা অধিক কষ্টসহিষ্ণু, মনিবের চোখের আড়াল হইলেও ফাঁকি দিতে জানে না। সুতরাং যদিও ইহারা বেশী মজুরী দাবী করে, P. W. D., রেলওয়ে প্রভৃতি বিভাগে কাজ ইহারা একচেটীয়া করিতেছে। এই সব চীনা মিস্ত্রী অশিক্ষিত এবং তাহারা কতদূর হইতে আসিয়া এদেশ জুড়িয়া বসিয়াছে। ইহাদের কেহ কেহ আবার কলিকাতা সহরে বিরাট কর্ম্মশালা (Carpentry) স্থাপন করিয়াছে। কলিকাতার যাবতীয় মোটর চালক ও মোটরের মিস্ত্রী প্রায়ই পাঞ্জাবী। ইহারা সংখ্যায় পাঁচ ছয় হাজারের কম হইবে না, ভবানীপুর অঞ্চলে বড় বড় উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছে।

কলিকাতার যাবতীয় কুলী মজুর, রাঁধুনী বামুন, বেহারা, দারোয়ান, ডাকপিয়ন, কনেষ্টবল সমস্তই অবাঙ্গালী। আজকাল সমস্ত কলিকাতা ও সহরতলী—ভবানীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে যাবতীয় বড় বড় মিঠাইয়ের দোকানও পশ্চিমা হালুইকরগণ অধিকার করিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই এসমস্ত ক্ষেত্রেই বাঙ্গালী ছিল। গঙ্গা এবং অন্যান্য নদীতে যত মাঝি মাল্লা—তাহারাও বাঙ্গালী ছিল, এমন কি, খেয়াঘাটওলা পর্য্যন্ত এখন পশ্চিমাদের। বজবজ হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিবেণী পর্য্যন্ত গঙ্গার দুই ধারে প্রায় ৮২টী পাটের কল আছে। বলা বাহুল্য ইহার একটিও বাঙ্গালার নয়। মাত্র সম্প্রতি দুইটী মাড়োয়ারীরা খুলিয়াছেন। এই সমস্ত পাটের কলে অন্যূন চারি লক্ষ মজুর আছে। ১৯০৬ সালের একটি সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে, ২০ বৎসর পূর্ব্বে (অর্থাৎ ১৮৮৬ সালে) ঐ সব কলে সমস্ত শ্রমিকই বাঙ্গালী ছিল ; কিন্তু আজ শতকরা ৫ জন বাঙ্গালী হইবে কিনা সন্দেহ।

নিম্নলিখিত তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে, কলিকাতায় অন্য প্রদেশ হইতে আগত অবাঙ্গালী এবং চীনাদের সংখ্যা কত এবং গত ৩০ বৎসরে তাহাদের সংখ্যা কিরূপ বাড়িতেছে :—

১৮৯১

কোন প্রদেশ হইতে আসিয়াছে	কলিকাতায় সংখ্যা
বিহার-উড়িষ্যা	১৪৯৭৪২
যুক্তপ্রদেশ	৫৪১১০
রাজপুতানা ও মধ্যপ্রদেশ	৮৯১২
পাঞ্জাব	৩৫৯১
বোম্বাই	১৫৪৭
মাদ্রাজ	১২২১
চীন	৭৬৬

১৯০১

বিহার-উড়িষ্যা	১৬৫৩১৩
যুক্তপ্রদেশ	৯০৪১৪
রাজপুতানা	১৪৭০১
মধ্যপ্রদেশ	১৯২৬
পাঞ্জাব	৬৬৫৮
বোম্বাই	২০৬৪
মাদ্রাজ	১৯২২
চীন	১৭০৯

১৯১১

বিহার উড়িষ্যা	২০৪৪৮৪
যুক্তপ্রদেশ	৮৯৬৯৫

কোন প্রদেশ হইতে আসিয়াছে	কলিকাতায় সংখ্যা
রাজপুতানা	২০৪৪৪
মধ্যপ্রদেশ	২৬৬৬
পাঞ্জাব	৮৬৩৫
বোম্বাই	৫১৩০
মাদ্রাজ	৩০১৪
চীন	২৩৪৯
১৯২১	
বিহার-উড়িষ্যা	১৮৫৬৩৫
যুক্তপ্রদেশ	৬৭৫৩৪
রাজপুতানা	২৮২৫২
মধ্যপ্রদেশ	৪৭৪৭
পাঞ্জাব	৮৯৫৫
বোম্বাই	৮০৩৬
মাদ্রাজ	৩৪২৫
চীন	৩০৪১

কলিকাতায় ও সহরতলীতে অ-বাঙ্গালীদের শতকরা হিসাব।

১৯২১

কলিকাতা সহর	৩৪·৬১
সহরতলী	৩১·৭৫
হাওড়া	৪০·৪৬

সমগ্র কলিকাতায় মিঠাইয়ের দোকানের সংখ্যা—৯৬৭টী, সহরের বিভিন্ন অংশে মিঠাইয়ের দোকানের সংখ্যা এইরূপ :—

১নং ডিষ্ট্রীক্ট	৩৪৫

২নং ডিষ্ট্রীক্ট	১৯২
৩নং ,,	৭৬
৪নং ,,	১৬২
কাশীপুর	৬২
গার্ডেনরীচ	৭৯
মাণিকতলা	৫১

(হেল্‌থ অফিসারের রিপোর্ট হইতে প্রাপ্ত।)

এই সমস্ত দোকানের মধ্যে পশ্চিমা হালুইকরের সংখ্যা দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পাইতেছে। কবি গাহিয়াছিলেন—

নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে
পর দাসখতে সমুদায় দিলে।

যদিও এ কয়টি কথা রাজনৈতিক পরাধীনতার সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু আজ অর্থনৈতিক হিসাবে দেখিলে মনে হয় যে, বাঙ্গালীর মুখের গ্রাস অ-বাঙ্গালীরাই কাড়িয়া লইতেছে। অর্থাৎ কেবল যে, ব্যবসা-বাণিজ্য হইতে বাঙ্গালী বিতাড়িত হইয়াছে তাহা নহে, তৎসংক্রান্ত শ্রমিকের কাজ হইতেও তাহারা বহিষ্কৃত হইয়াছে। এমন কি যাহা বাঙ্গালীর এক মাত্র নিজস্ব বলিয়া গর্ব্ব করা হইত— সেই কেরাণীগিরি হইতে মাদ্রাজীরা আসিয়া বাঙ্গালীকে ক্রমশঃ অপসারিত করিতেছে।

বিদেশী রেলী ব্রাদার্স প্রভৃতি অবশ্য চাউলের প্রধান রপ্তানিকারক। কিন্তু অ-বাঙ্গালী কচ্ছী মেমনেরা প্রধানতঃ এই কারবার চালায়। ইহারা অনেকে ইংরাজীও জানে না, কিন্তু ক্রোড়পতি। কলিকাতার যত বড় বড় জহুরী, তাহারা হয় গুজরাটী জৈন, অথবা সিন্ধী হিন্দু!

বাঙ্গালার যে কি সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা নিম্নলিখিত হিসাব

হইতে সহজেই বোধগম্য হইবে। বাঙ্গালাদেশে ২২ লক্ষ অ-বাঙ্গালী। কলিকাতায় মাড়োয়ারী, ভাটিয়া প্রভৃতি যাহারা কায়েমী বসতবাটী করিয়াছেন, কেবল তাঁহারাই সপরিবারে বাস করিতেছেন। অবশিষ্টাংশ সকলেই এখানে একাকী আসিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে। যদি এই ২২ লক্ষ হইতে স্ত্রীলোক ও শিশু দুই লক্ষ বাদ দেওয়া যায় তাহা হইলেও ২০ লক্ষ রোজগারক্ষম অ-বাঙ্গালী বাঙ্গালাদেশে ধরিতে হইবে। সহরের যাবতীয় ধনাঢ্য মাড়োয়ারী, ভাটিয়া প্রভৃতির তো কথাই নাই। বাঙ্গালাদেশে পাট, ধান, সরিষা, ভুষিমাল, এ সমস্তের কারবারই এখন প্রধানতঃ মাড়োয়ারীদের হাতে এবং যাবতীয় আমদানী ও রপ্তানীর অধিকাংশ মুনাফা ইহাদের লভ্য। অবশ্য এখানে ইংরাজ বণিকদের কথা বলিতেছি না। এখন এই বিশলক্ষ অ-বাঙ্গালীর মাসে গড়পড়তা রোজগার ৫০ টাকা ধরিলে বোধ হয় অযথা হইবে না। ২০ লক্ষ লোকের গড়পড়তা রোজগার ধরিলে প্রতিমাসে অন্ততঃ ১০ কোটী টাকা এবং বৎসরে ১২০ কোটী টাকা অ-বাঙ্গালীর হাত দিয়া বাঙ্গালাদেশ হইতে শোষিত হয়। আর অধিক কি বলিব।

প্রায় এক পক্ষকাল খুলনার সন্নিকটে সিদ্ধিপাশা, দৌলতপুর, নৈহাটী, বাগেরহাট প্রভৃতি স্থানে ঘুরিয়া স্বগ্রাম রাড়ুলী কাটীপাড়ায় কয়দিন যাবৎ অবস্থিতি করিতেছিলাম। সিদ্ধিপাশায় আসিয়া শুনিলাম গত আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে চারি শত লোক এক প্রকার ভীষণ কালান্তক ম্যালেরিয়া রোগে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। আজুগড়া এবং অন্যান্য স্থানেও এই প্রকার মহামারী হইয়া গিয়াছে। গ্রামবাসীদিগের মধ্যে যাহারা “কৃতী” অর্থাৎ একটু ইংরাজী লেখা পড়া শিখিয়াছে, তাহারা অন্নচিন্তায় দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যাহারা গ্রামে পড়িয়া রহিয়াছে তাহারা এক প্রকার নির্জ্জীব, অলসভাবে—তাস, পাশা খেলিয়া,

দিবাতেও এক দফা গাঢ় নিদ্রার পর পরকুৎসা এবং কাহাকে "এক ঘরে" করিবে, মামলা মোকর্দ্দমা করিয়া কি প্রকারে উচ্ছন্ন যাইবে ইত্যাদি ব্যাপারে দিন কাটাইতেছে। অর্থাৎ শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পল্লী সমাজে' অঙ্কিত চিত্র সর্ব্বত্রই প্রযোজ্য। জলাশয়গুলি ইতিমধ্যেই শুকাইয়া আসিতেছে। আর দুই এক মাস পরে কেবল অনেক স্থলে লোকেরা 'কাদার গোলা' পান করিবে; সেই জল আবার গো-মহিষাদি পঙ্কিল করে। স্ত্রীলোকগণও স্নানের সময়ে সেই জলে মূত্র ত্যাগ করে এবং নানাবিধ সংক্রামক ব্যাধির সংস্পৃষ্ট কাপড়, কাঁথা কাচে। এই কারণেই কলেরা, আমাশয়, প্রভৃতি রোগ ছড়াইয়া পড়ে। এই গেল এক দফা।

সম্প্রতি গো মড়ক এখান হইতে বরাবর দক্ষিণ সুন্দরবন সন্নিকটস্থ আবাদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মড়কে গো দম্পতি এক প্রকার নির্ব্বংশ হইয়া আসিয়াছে। খুলনায় দুধ বার আনা পর্য্যন্ত পাকী সের দরে বিক্রয় হইয়াছে। গ্রামগুলিতেও এক প্রকার দুধের দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। কেহ বলিতে পারেন এটা সাময়িক দুর্ঘটনা (Special Case), কিন্তু সাধারণ (Normal) অবস্থাও নিতান্ত শোচনীয়। খুলনায় এবং অন্যান্য জিলার সহরে ছয় আনা সেরে হামেসা দুধ বিক্রয় হয়। ভাবী বাঙ্গালী জাতির জীবনী শক্তি ইহাতে কি প্রকারে হ্রাস হইয়া যাইতেছে, তাহা যাঁহারা রসায়ণ শাস্ত্র ও শরীরবিদ্যার তত্ত্ব কিছু অবগত আছেন তাঁহারা সম্যক বুঝিতে পারেন। এখন শিশুদিগকেও বার্লী, মেলিন্‌স্ ফুড (Mellins food) দিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করান হয়। অবশ্য যাহারা একটু অবস্থাপন্ন তাঁহারা বিলাতী জমা দুধ (Condensed milk) হরলিক সাহেবের তৈয়ারী দুধ (Horlick's milk) ইত্যাদি ব্যবহার করেন কিন্তু এই দৈন্য প্রপীড়িত বাঙ্গালীর কয়জন যাহাদের

দৈনিক আয় মাত্র ⁄৬ পয়সা ইহা যোগাইতে পারে? ফলকথা, শিশু-দিগের অস্থি ও মাংস গঠনের একমাত্র উপযুক্ত খাদ্য দুগ্ধ। আমি বন্যাপ্লাবিত রাজসাহী জেলার আত্রাই অঞ্চল হইতে নদীয়া, যশোহর ও খুলনার গো-জাতির দুর্দ্দশা দেখিয়া অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। ইহাদের আকৃতি যেমন খর্ব্ব, দেহ তেমনি জীর্ণশীর্ণ কঙ্কালসার। খাদ্যাভাব ও পালনে অযত্ন ইহার প্রধান কারণ। এখন আর গো-চারণের মাঠ নাই। তাহা ছাড়া গৃহস্থগণের অবহেলা, শ্রমবিমুখতা ও তাচ্ছিল্য এই দুর্দ্দশার জন্য দায়ী। আমার নিজ গ্রামের ৬০ বৎসরের পূর্ব্বের অবস্থা নখদর্পণের ন্যায় দেখিতেছি। তখন দুধের সের দুই পয়সা ছিল এবং প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে গোয়ালভরা সবলকায় গরু থাকিত। একজন অশীতিবর্ষ বৃদ্ধের মুখে শুনিলাম ১২৬৫ সালে তিনি ক্রিয়া কর্ম্মের জন্য ৫৲—৬৲ টাকা মণ মূল্যে ছানা ক্রয় করেন এবং ইহারও কিছু পরে খাঁটী সুগন্ধযুক্ত ঘৃত টাকায় ⁄১৷০ পাঁচ পোয়া করিয়া মিলিত। তিনি বলিলেন—এবং আমারও এই ধারণা ও অভিজ্ঞতা—যে এখনকার যুবকগণ ও কুলবধূরা গরুর জাব দেওয়া, গোয়াল পরিষ্কার করা —এক কথায় যাহাকে গো-সেবা বলে—তাহা এক প্রকার ছাড়িয়া দিয়াছে। তখন আবার প্রত্যেকের বাড়ীতে তিনটী চারিটী করিয়া বিচালীর গাদা গরুর খোরাকীর জন্য মজুত থাকিত।

এখনকার স্কুল-কলেজের পড়া ছেলেরা গো-সেবা করিতে নিজেকে হেয়জ্ঞান করে, কাজেই দুধ খাইতে পায় না। এক ভ্রান্তিমূলক সংস্কার যে, গরু অনেক জবাই হয় বলিয়া দুধের পরিমাণ কমিতেছে। ইংরাজ জাতির মত গো-খাদক জাতি আর নাই; কিন্তু ইংলণ্ডে গরুর যত্ন ও পালন কত বেশী তাহা বলা যায় না। সেখানে গরুর জন্য ঘাসের ও গাঁজর এবং প্রকাণ্ড মূলা জাতীয় "Mangel Wurzel" প্রভৃতির স্বতন্ত্র

চাষ হয়। এক একটা গরুর আধ মণ দুধ হয়। ঠিক ছয় বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন লণ্ডনে ছিলাম, তখন একটা গরু একদিন ৩।৪ বার দোহনের পর একমণ দুধ দিয়াছিল। লণ্ডন, ম্যানচেষ্টার, লীডস্ প্রভৃতি সহরে যেখানে শীতকালে বরফ পড়ে, সেখানে শয্যোত্থানেরও পূর্ব্বে গৃহস্থের ঘরে ঘরে প্রচুর পরিমাণে দুধ আসিয়া বিলি হয় এবং রাস্তায় রাস্তায়, Dairyতে দুধ, ক্রিম, মাখন অজস্র পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে যদি কখনও গো-মড়কের সূত্রপাত হয়, তখনই হুলুস্থূল পড়িয়া যায়,—Anthrax, Foot and mouth-disease, প্রভৃতি সংক্রামক রোগ যাহাতে না ছড়াইতে পারে, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রকৃষ্ট উপায় লওয়া হয়। আক্রান্ত পশুকে একেবারে পৃথক করিয়া ফেলা হয় এবং অনেক সময়ে তৎক্ষণাৎ তাহাকে হত্যা করিয়া ভস্মসাৎ করা হয়। কিন্তু আমরা, হিন্দুই হই, আর মুসলমানই হই—মা শীতলা ও মাণিক পীরের দোহাই দিয়া মানত করি বা জড়ভাবে বসিয়া থাকি। এদিকে এই প্রকারে জেলাময় গো-জাতি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ এক একবার গো-মড়কে যত গরু হারাই, ইংরাজরা সম্বৎসরে খাইয়া তাহার এক ভগ্নাংশও নষ্ট করিতে পারে না। যদি খাইলেই জাতি ধ্বংস হইত তাহা হইলে মুরগী ও তাহার ডিম এতদিন অপ্রাপ্য হইত।

খাদ্যের পক্ষে আর এক সর্ব্বনাশ উপস্থিত। আমার ছেলেবেলায় এ অঞ্চলের নদী সকল মাছে পরিপূর্ণ ছিল। আধমণী বড় বড় ভেটকী কথায় কথায় মিলিত। 'এক পুঁজী' (নয়টা) বড় গল্‌দা চিংড়ী ৪।৫ পয়সায় পাওয়া যাইত, এখন তাহা চোখে দেখা দায় এবং তাহার মূল্য অন্ততঃ নয় আনা। আমাদের দেশে ধীবরেরা অজ্ঞ, মূর্খ। তাহারা জাল ফেলিয়া চুণা, পুঁটি ও বড় মাছ সবই তুলিয়া ফেলে। ইংলণ্ডের নদী সকলে বাচ্চা মাছ ধরা নিষেধ। আমেরিকা ও ইংলণ্ডের মাছের

চাষের (Pisciculture) জন্য বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত আছেন। ষ্টীমার ও রেলওয়ে হইয়া গ্রামের সমস্ত মাছ ঝাঁটাইয়া কলিকাতাভিমুখে চলিয়া যাইতেছে; দেশের লোকের জন্য কিছুই থাকে না। ফলকথা মাছ দুধই বাঙ্গালীর প্রধান পুষ্টিকর খাদ্য ছিল এবং তাহার অভাবই স্বাস্থ্য-হানির প্রধান কারণ। পুষ্টিকর খাদ্য এখন দেব-দুর্ল্লভ। বাঙ্গালীর উদর এখন শাক, পাতা অর্থাৎ নটে শাক, কলমী শাক, পুঁইশাক, থোড় ইত্যাদির দ্বারা পূর্ণ হইতেছে। সামান্য ছোট চিংড়ী, চুণামাছ ইহার সহিত মিশ্রিত করিয়া এবং অপর্য্যাপ্ত লঙ্কা ও সরিষা বাটনা দিয়া চচ্চড়ী প্রস্তুত করিয়া কতক স্ত্রীলোক মনের প্রবোধ দেন যে, তাঁহারা সধবা।

আর এক সর্ব্বনাশ উপস্থিত। কলিকাতায় এখন মোড়ে মোড়ে চায়ের দোকান এবং এই সংক্রামক ব্যাধি মফঃস্বলের কলেজে এবং গ্রামেও বিস্তার হইতেছে; কেবল ঢক্ ঢক করিয়া যুবকগণ চা পান করে। চার খাদ্য হিসাবে কোন মূল্য নাই, কেবল স্নায়ুর উত্তেজক মাত্র ও অজীর্ণ রোগের আকর। সেদিন বাগেরহাট কলেজে ছেলে-দিগকে এই প্রকার বিষ পান করিতেছে কেন জিজ্ঞাসা করিলাম। ইহারা প্রতি পেয়ালা চার পয়সা দিয়া ক্রয় করে। আমি বলিলাম যদি একসের চিড়া ।০ ও একসের নূতন গুড় ⁄০ (যাহা সেখানে যথেষ্ট মিলে) একবারে ক্রয় করিয়া রাখ তবে অন্যূন পনর দিনের জলখাবার সংস্থান হয়। এবং প্রতিবার দুই পয়সা হিসাবে পড়ে। আর ইহার সহিত যদি একটা কলা ও একটু নারিকেল কোরা মিশাইতে পার তাহা হইলে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় অর্থাৎ রাসায়নিকভাবে ইহাকে perfect food কহে। একটা "দুম্যো" অর্থাৎ যাহার শাঁস একটু শক্ত হইয়াছে এরূপ নারিকেল দুইদিন ভাগ করিয়া খাওয়া যায়; তাহা ছাড়া আমি

নিজে সর্ব্বদাই নূতন পয়রা গুড়ের (আমাদের এখানে মৌঝোলা গুড় বলে), তৈয়ারী মুড়ির চাক্‌তী বড় টিনের কৌটায় মচমচ অবস্থায় সংরক্ষিত করি এবং প্রত্যহ উপাদেয় বলিয়া আহার করি। "ডাব" "ডুম্যো" ও "ঝুনা" নারিকেল খাদ্য হিসাবে মূল্যবান্। আমি স্বয়ং এইগুলির রাসায়নিক বিশ্লেষণ (Chemical analysis) করিয়াছি। ইহাদের শাঁসে তৈলাক্ত পদার্থ প্রচুর আছে। বাঙ্গালীর ঘরে এখন ঘি একপ্রকার দেখাই যায় না, আর তৈলও যাহা ব্যবহার হয় তাহা কলের। কিন্তু এই নারিকেল কোরায় যথেষ্ট তৈলাক্ত উপকরণ বিদ্যমান; এমন কি ইহাকে ঘৃতের বিনিময় (Substitute) বলা যায়। নারিকেল কোরা গালিয়া যে 'দুধ' বাহির হয় তাহাতে আমড়া দিয়া উত্তম অম্বল তৈয়ার হয় এবং নারিকেলের যে সমস্ত মেঠাই—রসকরা, চন্দ্রপুলি যেমন মুখরোচক তেমনি খাদ্য হিসাবে পুষ্টিকর। অবশ্য এখনও পাড়াগাঁয়ে ইহার চলন আছে, কিন্তু সহরের শিক্ষা ও সভ্যতাভিমানী বাঙ্গালী-যুবকগণের কপাল পুড়িয়াছে; তাঁহারা ডাবের জলটুকু খাইয়া আসল জিনিষটা ফেলিয়া দেন; এমন যে সুন্দর 'নেওয়াপাতি' তাহা আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়। এই প্রকারে দেখা যায় কলিকাতার এক একটা ডাবের দোকানে স্তূপীকৃত ছেঁদা করা ডাব গড়াগড়ি যাইতেছে। এমন রুচির বিকার হইয়াছে যে, ডাব কাটিয়া তাহার শাস খাইলে পাছে লোকে ছোটলোক বলে এই ভয়ে আসল জিনিষটুকু খাইতে সাহস হয় না। হায়রে বাঙ্গালী! তুমি কি কুগ্রহের পাকে সকলই হারাইতে বসিয়াছ!

নারিকেলের প্রস্তুত মিঠাই খাওয়া এখন সহরে এক প্রকার ফ্যাসন বিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ঘৃতপক্ক নানাবিধ খাবার না হইলে চলে না। এই 'ঘৃত' যে কি তাহা বলাই বাহুল্য। ইহাতে খাঁটি ঘৃত

কতটুকু ! গরুর চর্ব্বি, শুকরের চর্ব্বি, বড় বড় অজগরের চর্ব্বি, সময়ে সময়ে তাহা ভিন্ন মাটীবাদাম, মহুয়া প্রভৃতির তৈল থাকে। আর খাবারগুলি যে প্রকার অনাবৃত রাখে, মাছি ভন্ ভন্ করিতেছে ও ধূলায় ধূসরিত হইতেছে। সত্য বটে কাঁচের আধারের ভিতরে রাখিবার নিয়ম, কিন্তু সে কেবল আইন বাঁচান মাত্র। আজ কাল খাঁটি ঘি ৩৲ টাকা সেরের কম মিলে না তাহা দ্বারা প্রস্তুত মিঠাই রাজরাজড়া, আমীর, ওমরাহ ভিন্ন অন্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। কিন্তু ফ্যাসানের ধন্য মহিমা ! এই সমস্ত ভেজাল অভক্ষ্য মিষ্টান্ন খাইব, তবু গুড় নারিকেলের প্রস্তুত দ্রব্যাদি ছুঁইয়া হীনতার পরিচয় দিব না। চিড়া, মুড়ি ও খইতে ভেজাল চলে না, কিন্তু এ সব জিনিষ শিক্ষিত যুবকগণের অনুপাদেয়, অখাদ্য ও অস্পৃশ্য। সম্প্রতি College of Scienceএ আমার ছাত্রগণকে একটী ভদ্রলোকের দোকান হইতে ফরমাইস দিয়া প্রায় সাড়ে তিনশত টাটকা মুড়ির মোয়া আনিয়া খাইতে অর্পণ করি। আমার উদ্দেশ্য এই যে এই প্রকারে ইহার ব্যবহার প্রচলিত হউক এবং বর্ত্তমান কুরীতিগুলিও দেশ হইতে অন্তর্হিত হউক। এ বিষয়ে এত লিখিবার আছে যে এক প্রবন্ধে তাহা সমাপন করা দুঃসাধ্য।

২১

চা-পান না বিষপান ?

জিলা খুলনার দক্ষিণাংশের নদ-নদীতে এক প্রকার মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নাম 'গাগড়া'। জনসাধারণ এই মৎস্যকে 'হাবা' বলিয়াও অবিহিত করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর মৎস্যের বিশেষত্ব এই যে, এই মৎস্যের সম্মুখে টোপ ফেলিলেই উহারা টোপ দর্শনমাত্রেই গিলিয়া ফেলে, বিন্দুমাত্র ভাবনা-চিন্তা বা দ্বিধা বোধ করে না। আমার মনে হয়, সমগ্র বাঙ্গালী জাতি এই 'হাবার' মত 'হাবা' নামে অভিহিত হইবার উপযুক্ত; কেন না, বিদেশীয়—বিশেষতঃ ইংরাজ বণিকের টোপ দর্শনমাত্রে গিলিতে অভ্যস্ত জাতি, বাঙ্গালীর মত ভূভারতে দ্বিতীয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেন, তাহা বুঝাইতেছি।

এ দেশে ইংরাজ বণিকদিগের নানা কাজকারবার আছে, তন্মধ্যে চা-বাগিচার বাণিজ্য অন্যতম। যে চা-বাগিচায় আড়কাঠিরা কুলী চালান করে এবং এদেশের কুলীরা যে সকল চা-বাগিচায় মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া বাগিচার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করে, অথচ যাহার ফলভোগ করে বিদেশীয় ইংরাজ বণিক, সেই সকল চা-বাগিচা ধনসম্পদের আকর-ভূমি—এক একটা ক্ষুদ্র রাজ্য বলিলেও হয়। ইংরাজ বণিক এমন অনেক চা-বাগিচা এদেশে গড়িয়া তুলিয়াছেন। এগুলি বৃহদায়তন জমিদারীবিশেষ। দার্জ্জিলিঙ্গ, জলপাইগুড়ি ও আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে এই জমিদারীগুলি অবস্থিত। এই সকল চা-বাগিচা হইতে বৎসরে কোটি কোটি মুদ্রার চা দেশবিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। কিন্তু আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি নাই, ঘৃতাহুত হুতাসনের মত উহা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত

হয় ও ভীষণ চটচুটা রবে জ্বলিয়া উঠে। ইংরাজ কোম্পানীরা এই চা-চালানী ব্যবসায়ে রাজার রাজ্যের আয় উপভোগ করিতেছেন বটে, কিন্তু তাহাতেও তাহাদের আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয় নাই। তাঁহারা দেখিলেন, বাঙ্গালার পৌনে পাঁচ কোটী লোককে, পরন্তু সমগ্র ভারতের ৩০ কোটী অধিবাসীকে চা-খোর করিতে পারিলে টাকার মাচায় বসিয়া টাকার ছিনিমিনি খেলা সম্ভবপর হয়—টাকার গাছ পুতিয়া চুণি-পান্নার ফল পাড়িয়া খাওয়া যায়। দুঃখ এই,—এই গর্দ্দভ জাতি (বাঙ্গালী বা ভারতবাসী) আপনার মঙ্গল বুঝে না! বুঝিবেই বা কিরূপে? তাহারা যে নাবালক নালায়েক জাতি। না হইলে তাহারা এমন স্বর্গীয় সুধার মত চা-পানের মর্ম্ম বুঝে না? এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এক পেয়ালা চা-পানে কত তৃষ্ণা দূর হয়!—সেই চা-পান না করিয়া তাহারা পান করে কি না সরাই-কুঁজায় রক্ষিত শীতল পানীয় জল, সরবৎ, ঘোল, ডাব? ছিঃ ছিঃ! সান্ত্বনা এইটুকু যে, বিলাত-ফেরত অথবা তথাকথিত শিক্ষিতদের মধ্যে চা-পানের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। ইহা মন্দের ভাল। কিন্তু সাবালক ইংরাজ বণিক নাবালক দেশীয়দিগকে ত চা-পানের সুখ হইতে বঞ্চিত রাখিতে পারেন না, কেন না, তাঁহারা যে এই নাবালক জাতির অভিভাবক! অতএব তাঁহারা স্থির করিলেন যে, এই জাতিকে চণ্ডু, চরস, গাঁজা, অহিফেনের মত চায়ের নেশাতেও নেশাখোর করিতে হইবে।

তখনই চা-করদিগের সলাপরামর্শ জল্পনা-কল্পনা চলিল। সে আজ ২০৷২৫ বৎসর পূর্ব্বের কথা। তখন লর্ড কার্জ্জন ভারতের ভাগ্যবিধাতা বড় লাট। তাঁহার ন্যায় 'ভারত-হিতৈষী' যে চা-করদিগের পরামর্শ মথিলিখিত সুসমাচারের মত হজম করিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। লর্ড কার্জ্জন চায়ের উপর কিছু সেস্ অর্থাৎ শুল্ক

নির্দ্ধারণ করিলেন। এই সেস্ সংগ্রহের ফলে সরকারী তহবিলে কয়েক লক্ষ টাকা জমিতে লাগিল। টাকাটার সদ্ব্যবহার হইতেও বিলম্ব হইল না। Tea Association বা য়ুরোপীয় চা-কর সমিতি এই অর্থসাহায্যের ফলে কলিকাতা সহরের মোড়ে মোড়ে চায়ের দোকান খুলিলেন এবং পরার্থে দধীচির অস্থিদানের ন্যায় বিনামূল্যে জনসাধারণকে অমূল্য চা-সুধা বণ্টন করিতে লাগিলেন। তৃষ্ণার্ত্ত পথিক বিনামূল্যে সুধাপান করিয়া শ্রান্তদেহে স্ফূর্ত্তি ও সজীবতা আনয়ন করিল। এ দিকে এক পয়সার প্যাকেট চা বিনামূল্যে জনসাধারণের মধ্যে বিতরিত হইতে লাগিল। এই পরোপকারী বণিক জাতি এইরূপে এ দেশে চা-রূপ অপরূপ টোপ ফেলিলেন, আর 'হাবা' মাছের ন্যায় হাবা বাঙ্গালী জাতি সর্ব্বাগ্রে ছুটিয়া গিয়া কোঁৎ করিয়া সেই টোপ গিলিয়া ফেলিল। সেই জাতি শেষে চায়ে এমন নেশাখোর হইয়া উঠিল যে, গুরু ইংরাজকেও সে নেশার বিদ্যায় পরাজিত করিল।

নেশার এই একটী লক্ষণ যে, সময়মত নেশার জিনিষ না পাইলে হাই উঠিতে থাকে, গা গুলাইয়া উঠে, গা-গতোর ভাঙ্গিয়া পড়ে, মন অস্থির ও চঞ্চল হইয়া উঠে! আফিমখোর যতই দরিদ্র হউক না, তাহার ওক্তমত পরিমিত প্রমাণ অহিফেনের বড়ি বা গুলী পাইবার জন্য করিতে না পারে, এমন দুষ্ক্রিয়া জগতে নাই। অনেকে পোষা পাখীকে সরিষা বা তিল পরিমাণ অহিফেন খাওয়াইতে শিখান। এই পাখীকে পিঞ্জর হইতে মুক্ত করিয়া দিলেও, সে আকাশে-বাতাসে যথেচ্ছা বিচরণ করিয়া বেড়াইলেও নিয়মিত সময়ে অহিফেন সেবনের জন্য পিঞ্জরে ফিরিয়া আসিবেই। যতক্ষণ তাহার প্রভু তাহার বরাদ্দ যোগান না দেন, ততক্ষণ সে ছট্‌ফট্ করিতে থাকে। নেশার এমনই মহিমা!

বাঙ্গালী জাতিকেও চায়ের নেশাখোর করিবার নিমিত্ত ইংরাজ বণিকেরা কত রঙ্গ-বেরঙ্গের তর-বেতর বিজ্ঞাপন দিয়াছেন—জলের মত পয়সা ঢালিয়া কত হ্যাণ্ডবিল, কত প্লাকার্ড প্রচার করিয়াছেন। থিয়েটারে, বায়স্কোপের অভিনয়ে এবং মঞ্চের দৃশ্যে, ট্রামে, বাসে, বাড়ীর প্রাচীরে, ট্রেণে, ষ্টেশনে, বাজারে, গঞ্জে, হাটে, মেলায়, পূজা-পার্ব্বণে, কোথায় চায়ের বিজ্ঞাপন ছড়ান হয় নাই? এমন কি বক্তার বক্তৃতায়, গানের ছড়ায়, কেতাবের প্লটে চায়ের কথা উঠিয়াছে—সংবাদ পত্রের স্তম্ভে বিজ্ঞাপনের ঘটার কথা না-ই উল্লেখ করিলাম। একে কোটীপতি ধনকুবের ইংরাজ বণিক, তাহার উপর তাঁহার সহায় স্বয়ং প্রবল প্রতাপ সরকার বাহাদুর। এ সোণায় সোহাগায়—মণিকাঞ্চন যোগাযোগে কি না সম্ভব হয়? তাই প্রচারের ও বিজ্ঞাপনের ফলও ফলিয়াছে! পূর্ব্বে প্রভাত হইলে লোক 'কা কা' রব শুনিয়া শয্যাত্যাগ করিত, এখন 'চা চা' ডাক দিয়া শয্যা ত্যাগ করে! অতি প্রত্যূষে অলি-গলির চায়ের দোকানে বাঙ্গালী বাবুকে বাসিমুখে চা-পান করিতে যাইতে দেখা যায়—দোকানে সারি সারি বেঞ্চে বাবুদিগকে চায়ের জন্য ভোরের অন্ধকারেও হা-প্রত্যাশী হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। হায় রে নেশা!

প্রকৃত প্রস্তাবে, চা **খাদ্য নহে,** উহা **উত্তেজক** (Stimulant) মাত্র। আমার মনে আছে, বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট সার চার্লস ইলিয়ট একবার বলিয়াছিলেন যে, "Ganja is a concentrated food, গাঁজা ঘনীভূত খাদ্যদ্রব্য।", এক ছিলিম গাঁজায় দম দিয়া পাল্কীবেহারারা একদমে এক ক্রোশ ছুটিয়া যায়, বাঁকুড়া জিলার রসুইয়া বামুন এক ছিলিম গাঁজা চড়াইয়া মাথায় গামছা বাঁধিয়া রাশীকৃত লুচি-মোণ্ডা অথবা অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া ফেলে। এই

হিসাবে মদিরাও খাদ্যসার। যে হেতু, এক গেলাস গলাধঃকরণ করিয়া কত লোক কত রকম সুকর্ম্ম-কুকর্ম্ম করিয়া ফেলিতে পারে। চা-ও এই শ্রেণীর খাদ্য। যিনি একবার চায়ের মোহিনী শক্তিতে বশীভূত হইয়াছেন, তাঁহার আর নিস্তার নাই। সময় মত চায়ের পেয়ালা না পাইলে প্রাণ অস্থির হইয়া উঠে, মন চঞ্চল হয়, কাজে 'আঠা' লাগে না। যে গৃহস্থ-গৃহে একবার এই মোহিনীর প্রবেশলাভ ঘটিয়াছে, সে গৃহের আর মঙ্গল নাই। গৃহের আবালবৃদ্ধবনিতা নিত্য দুইবেলা চায়ের জন্য 'ধরনা' দিয়া থাকে। এমন কি, কোনও কোনও গৃহে দুগ্ধপোষ্য শিশুরাও চায়ের নেশায় বিভোর হইতে শিখিতেছে। আক্ষেপের কথা, পিতামাতা বা অভিভাবকরা ইহা দেখিয়াও সর্ব্বনাশের প্রতীকার সাধনে উদ্যোগী হইতেছেন না! বরং অনেক অভিভাবক এই নেশায় অভ্যস্ত হইতে বাড়ীর ছেলেমেয়েকে প্রশ্রয় দিয়া থাকেন।

এক পিয়ালা চায়ে সারবান্ পদার্থ কিছুই নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হোমিওপ্যাথিক ডোজে কয় ফোঁটা দুধ ও একটু চিনি থাকে বটে, কিন্তু উহাকে পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে গণ্য করা যায় না। আমি বোম্বাই সহরে দেখিয়াছি যে, পথে পথে যেখানে 'বিশ্রান্তি-ভবন' আছে, সেখানে আফিসের কেরাণী বাবুরা প্রত্যূষে ৭টায় আফিসে যাইবার পথে এক কাপ চা পান করিয়া লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে আফিসে ছুটেন। আবার আফিসের কাজে অবসাদ বা ক্লান্তি আসিলেই 'বিশ্রান্তি-ভবনে' দৌড়াইয়া যান। তাঁহারা দিনে এইরূপ ৪।৫ বার চা পান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কৈফিয়ৎ এই,—"আমরা গরীব কেরাণী, ক্ষুধা পায়, খাই কি? চা খাইলে ক্ষুধা মরিয়া যায়।" কি সর্ব্বনাশকর অধোগতি! ক্ষুধামান্দ্যই যেন প্রার্থনীয়! এই চা যে অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণতা বা ডিস্‌পেপসিয়ার মূল কারণ, তাহা বলাই বাহুল্য।

অধুনা হাটে-বাজারে, পথে-ঘাটে, তটে-বাটে, রেলে-ষ্টীমারে, যেখানে যাও, দেখিবে, চায়ের ডিপো বা চায়ের কলসী। কেবল বাবুরা নহে, চাকর-বাকর, মুটে-মজুর, গাড়োয়ান-কোচম্যান,—সারেঙ্গ-খালাসী সকলেই চায়ের নেশায় ক্রীতদাস হইয়া উঠিতেছে। চতুর ইংরাজ বণিক দূরে দাঁড়াইয়া মুচকিয়া হাসিতেছে, আর মজা উপভোগ করিতেছে—'হাবা' কেমন টোপ গিলিয়াছে! বাঙ্গালাদেশে যত চা উৎপন্ন হয়, তাহার শতকরা ৯৭ ভাগ ইংরাজ বণিকের চা-বাগিচায় তৈয়ার হয়, মাত্র ৩ ভাগ দেশীয়রা উৎপন্ন করে। অর্থনীতির দিক্ দিয়া দেখিলেও বুঝা হায়, ইহাতে কোন্ জাতির সর্ব্বনাশ হইতেছে। যে ভাবে বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে চা প্রসারলাভ করিতেছে, তাহাতে মনে হয়, আর ৫।৭ বৎসরের মধ্যেই গ্রাম্য কৃষকগণও লাঙ্গল চষিতে চষিতে চায়ের পিয়ালায় চুমুক না মারিলে জমীর পাট করিতে পারিবে না। যদি ৩০ কোটী ভারতবাসীর এক-পঞ্চমাংশও চায়ের বশীভূত হয়, ৬ কোটী ভারতবাসী যদি অন্যূন এক পয়সাও চায়ের জন্য নিত্য খরচ করে, তাহা হইলে প্রত্যেকে মাসে ৮ আনা এবং বৎসরে ৬ টাকা,—এই হিসাবে বৎসরে ৩৬ কোটী টাকা ইংরাজ বণিকের পকেট পূর্ণ করিবে। ইহাও ভারতের এক-পঞ্চমাংশ লোকের হিসাব মাত্র, ইহার অধিক লোক যে চা খায় না, তাহা বলা যায় না; পরন্তু প্রত্যেকে এক পয়সাই যে চায়ের জন্য ব্যয় করে,—তাহার অধিক ব্যয় করে না, তাহারই বা স্থিরতা কি?

এই চা-পানে বাঙ্গালী জাতির স্বাস্থ্যের যে কি সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহাও পরে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। এই প্রবন্ধে খাদ্য-সমস্যার অবতারণা করা হইল মাত্র।

২২

পল্লীর ব্যথা *

কলিকাতার রম্য হর্ম্ম্যবাসী সুখসেবী জমীদার ও ব্যারিষ্টারবর্গ পল্লী-গ্রামের দুর্দ্দশা কল্পনার নেত্রে দেখেন বটে, কিন্তু তাহার প্রকৃত অবস্থা অতি অল্প লোকই বুঝিতে পারেন। খুলনা জিলার এমনই দুর্দ্দশা যে, ২।১ ঘর জমীদার ব্যতীত—যেমন সাতক্ষীরা ও নকীপুর—সকলেই প্রায় বারো মাস সহরতলীতে বাস করেন। গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে, খুলনা জিলার এই প্রকার অন্যূন এক শত জমীদার, তালুকদার, গাঁতিদার প্রভৃতি বিদেশে অবস্থান করেন। সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গে প্রজাবর্গের সম্বন্ধ শুধু নায়েব, গোমস্তা প্রভৃতি কর্ম্ম-চারীর ব-কলম। মাত্র তিন সপ্তাহ হইল সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি স্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইয়াছি। সেগুলি আবার লবণাক্ত প্রদেশ; দেখিলাম, নৌকাযোগে জালা পূর্ণ করিয়া প্রায় এক 'গণের' পথ হইতে একটু মিষ্ট পানীয় জল আনিয়া লোক প্রাণধারণ করিতেছে। কোথাও বা দেখি যে, কাহারও জমীদারীর অন্তর্ভূত একটি উচ্চ প্রাইমারী স্কুল কোন রকমে অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছে। এক জন জমীদার মাসে এক টাকা চাঁদা দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাও কয়েক বৎসর দিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। এই শ্রেণীর জমীদার যখন ফসলের সময় মফঃস্বলে পদার্পণ করেন, তখন প্রজাগণের থর-হরি কম্প—'বর্গী এল দেশে' এইরূপ আতঙ্ক উপস্থিত হয়। আবার বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, এই শ্রেণীর এক জমীদারের বিরুদ্ধে

* খুলনা জিলা সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ, ২০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪।

তাঁহার প্রজাগণ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করিয়াছে, তিনি যেন আর তাঁহার জমীদারীতে সশরীরে না আইসেন। বাকী-বকেয়া খাজনার উপর নজর ও সেলামী দিতে প্রজাগণের প্রাণান্ত হয়। অবশ্য, এ বিবরণ জমীদার সাধারণের উপর প্রযোজ্য, এমন আমি বলিতেছি না। তবে এ প্রকার নমুনা নিতান্ত বিরল নহে। সুখের বিষয়, সাতক্ষীরার জমীদারগণের প্রজারঞ্জক বলিয়া পুরুষানুক্রমে খ্যাতি আছে এবং তাঁহাদের জমীদারীর ভিতর অন্যায় অত্যাচার একবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কয়েক মাস হইল, কৃষি-কমিশনে সাক্ষ্য দিবার সময় বলিয়াছিলাম যে জমীদার যদি দেশবাসী হইয়াও প্রজা-পীড়ক হন, তাহা হইলেও দেশের মঙ্গল। কেন না, পুষ্করিণী খনন, পুরাতন দীঘির পঙ্কোদ্ধার প্রভৃতি তাঁহাদের নিজ ব্যবহার্য্য জলের জন্য করিতেই হয়। তাহা ছাড়া বারো মাসে তের পার্ব্বণে যে টাকা ব্যয় হয়, সে টাকা দেশেই থাকিয়া যায়। কিন্তু কলিকাতাবাসী জমীদারগণ প্রজার অর্থ শোষণ করিয়া চৌরঙ্গীতে বিলাস-ভবনে বাস করেন; তাঁহাদের গৃহসজ্জা ও নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য, মোটর-গাড়ী, বিজলী বাতি ও পাখা, আরাম-কেদারা প্রভৃতি বিলাসের অঙ্গ, সমস্তই বিদেশী। এই সকল জমীদারকে আমি জিজ্ঞাসা করি, তোমরা জমীদারীর আয়ের কত ভগ্নাংশ প্রজাবর্গের উন্নতিকল্পে ব্যয় কর? এই ত গেল অনুপস্থিত জমীদারদিগের কথা। তাহার পর পল্লীগ্রামের আর এক সর্ব্বনাশ, যিনি একটু লেখাপড়া শিখিয়া মাথা তুলিয়াছেন, তিনি একবারে দেশছাড়া। শরৎ চট্টোপাধ্যায় 'পল্লী-সমাজে' যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালার সকল পল্লীর উপর প্রযোজ্য। যত অকর্ম্মা অশিক্ষিত 'রদী মাল,' তাহারাই গ্রামে থাকিয়া যত রকম কোন্দল, মামলা-

মোকর্দ্দমা, বিবাদ বিসংবাদ কুড়াইতে ব্যস্ত। গ্রাম হইতে নৈতিক বা অর্থ-নৈতিক উন্নতি একেবারে তিরোহিত হইয়াছে। জমীদার ও শিক্ষিত লোকমাত্রই দেশত্যাগী বলিয়া প্রাচীন কালের বড় বড সরোবর প্রায় মজিয়া আসিতেছে। জল-নিঃসরণের পথ ও জঙ্গল কাটার অভাবে ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি ভীষণ আকার ধারণ করে। এই খুলনারই কয়েকটি গ্রামে ঘুরিয়া খবর পাইলাম যে, বন্য শূকরের অত্যাচারে কৃষিকর্ম্ম করা দায়; বিশেষতঃ আলু-কচুর চাষ অসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। এই ত দেশের অবস্থা; অথচ দেশে টাকা ছড়ান রহিয়াছে। বিদেশীরা আসিয়া ইহা মুঠো মুঠো কুড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। সামান্য দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি; তাহা সাত-ক্ষীরার লোক বুঝিবেন। খুলনার সদর ও সাতক্ষীরা মহকুমার দক্ষিণ ভাগে 'নোনা গাঙ্গে' অনেক স্থানে ঘুসো চিংড়ী ধরিবার খটী আছে।

এই সমস্ত নদীর জলকর আমাদের; যে জেলেরা এই মাছ ধরে, তাহারাও আমাদের প্রজা; যেখানে মাছ শুকায়, সে-ও আমাদের নিজের জমী। অথচ বাল্যকাল হইতে দেখিতেছি, বোম্বাই অঞ্চলের নাখোদা বণিকৃগণ এই জেলেদিগকে বড় বড় ডেকৃচী কিনিয়া দেয় ও টাকার দাদন দেয় এবং শুকনা মাছ প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী করে। কিন্তু আমরা কি এতই অর্ব্বাচীন যে, এই ঘরের দুয়ারে যে ব্যবসাটা চলিতেছে এবং যাহা হইতে বিদেশীরা লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতেছে, তাহা হইতে আমরা সামান্য জলকর ভিন্ন আর কিছুই পাই না? আর একটি দৃষ্টান্ত দিই, আপনারা সকলেই জানেন যে, কপোতাক্ষতীরবর্ত্তী এই সাতক্ষীরা মহকুমারই অন্তর্ভুক্ত বড় দলে'র কিরাট হাট আছে, এখানে বৎসরে লক্ষ লক্ষ টাকার মাল আমদানী-রপ্তানী হয়। কিন্তু ইহার প্রধান লভ্যাংশ মাড়োয়ারীগণ

করায়ত্ত করিয়াছে; তাহারা লোটা-কম্বল সম্বল লইয়া কত দূর-দেশ হইতে আসিয়া অতর্কিতভাবে এখানকার সমস্ত ব্যবসায় হস্তগত করিয়াছে। অথচ আমরা আমাদের ছেলেদিগকে ৫ বৎসর বয়স হইতেই বিদ্যালয়ে পাঠাই, পাঠের তাড়নায় তাহাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ করি—একটার পর আর একটা, তাহার উপর আর একটা পাশ করাই, পরে হীনবীর্য্য অস্থিকঙ্কালসার যুবকগণ চাকরীর অভাবে হা-অন্ন হা-অন্ন করিয়া হৃদয়-বিদারক চীৎকার করিতেছে।

তুমি সহরের দিকে যতই দৃষ্টিনিক্ষেপ কর না কেন, আদমসুমারীর বিবরণে জানা যায়, শত করা ৫।৬ জন মাত্র সহরে বাস করে। আর বাকী ৯৪।৯৫ জন ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ম্যালেরিয়াগ্রস্ত হইয়াও পাড়াগাঁয়ে বাস করিতে বাধ্য। এই জনসঙ্ঘ লইয়াই ত বাঙ্গালী জাতি। আমরা কলিকাতায় বসিয়া যতই রাজনৈতিক আন্দোলন করি না কেন, যত দিন না আমরা এই বিপুল জনসংঘের মধ্যে লোকশিক্ষা বিস্তার করিতে পারিব, তত দিন রাজপুরুষদের নিকট কোন প্রকার যে দাবী-দাওয়া আদায় করিতে পারিব, তাহা মনে হয় না। এখন আর এক অদ্ভুত নেশা জাতিকে অভিভূত করিয়াছে, অর্থাৎ কাউন্সিলে প্রবেশ। এই উন্মত্ততায় কাহাকেও বা ২০।২৫।৩০ হাজার, এমন কি, লাখ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করিতে দেখা গিয়াছে। সে দিন এক জন বিশিষ্ট এবং অভিজ্ঞ সংবাদপত্রসেবীর সহিত আলাপ করিতে করিতে আমি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলাম যে, এই নির্ব্বাচনব্যাপারে সমগ্র বাঙ্গালায় অন্যূন ১২।১৫ লাখ টাকা ব্যয় হইয়াছে। তিনি হাসিয়া বলিলেন, ৫০ লাখ টাকার এক পয়সা কম নহে। কাউন্সিলে ঢুকিয়া বড় বড় গগন-ফাটান ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া দেশোদ্ধার করা বড়ই সহজ ব্যাপার। কিন্তু এই যে,

পল্লীতে কোটি কোটি অজ্ঞ বর্ণজ্ঞানশূন্য নরনারী, তাহাদের সহিত তোমার কি সংযোগসম্বন্ধ রহিয়াছে? আমি নিজে রসায়নাগারে গবেষণা তুচ্ছ করিয়াও দেশহিতকর নানা কার্য্যে কাউন্সিলপদপ্রার্থী অনেকের কাছে ভিক্ষাপাত্র লইয়া দ্বারস্থ হইয়াছি; কিন্তু যিনি অম্লান-বদনে কাউন্সিলে প্রবেশ করিবার জন্য ২০।৩০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন, তিনিই আবার আমাকে রিক্তহস্তে ফিরাইয়া দিয়াছেন। এখন আবার বড় বড় নেতার 'বোলচাল' শুনি, কাউন্সিলে ঢোকা বিড়ম্বনা মাত্র। গভর্ণমেণ্টকে হারাইয়া দিলেও যদিচ্ছাচারী সার্টি-ফিকেসন করিবে। যদি সত্য সত্যই ইহার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হয়, তবে পল্লীসংস্কার কি সংগঠন মুখের কথা না হইয়া কার্য্যে পরিণত করা হয় না কেন?

তুমি সহরতলীতে থাক, আবার গ্রীষ্ম পড়িলেই শৈলবিহারে যাইয়া অর্থের শ্রাদ্ধ কর। অথচ তুমি নেতা বলিয়া সাধারণের কাছে মান-সম্ভ্রম চাও। ইহা কি প্রহসন নহে? আজ হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ সমস্যা জটিল হইতে জটিলতর হইয়া দাঁড়াইতেছে। হিন্দু বল, মুসলমান বল, ব্রাহ্মণ বল, অব্রাহ্মণ বল, সকলেই ত এই বাঙ্গালার মাটী, বাঙ্গালার জল ও বাঙ্গালার হাওয়ায় পরিপুষ্ট। সকলেই ইহার সমান অধিকারী। তবে এ গৃহ-বিবাদে আজ দেশ জর্জ্জরিত কেন? আমার মনে হয়, বাঙ্গালার গ্রামই প্রকৃত মিলন-মন্দির। যদি অনুন্নত শ্রেণী বা তথাকথিত অস্পৃশ্য শ্রেণী বুঝিত যে, জমীদার ও শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রকৃতপক্ষে তাহাদের হিতাকাঙ্ক্ষী, তাহা হইলে কখনই এই আত্মকলহরূপ বহ্নি ইন্ধন পাইত না। জমীদার ও প্রজায়, শিক্ষিতে ও অশিক্ষিতের মধ্যে, এমন এক প্রাচীর ব্যবধান রহিয়াছে যে, কখনই জনসাধারণ ভাবিতে পারে না যে, উহারা তাহাদের বন্ধু। এই

যে ঝগড়া, ইহার কারণ গূঢ়তর—মনোবৃত্তিমূলক। আজ যদি আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে দেশকে তুলিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতাম, তাহা হইলে অগ্রে এই বিপুল জনসংঘকে আমাদের সহিত একতাসূত্রে আবদ্ধ করিতাম; তাহাদিগের অভাব-অভিযোগে কর্ণপাত করিতাম। কিন্তু তাহাদের সহিত আমাদের একেবারে ফারখৎ!

এই সাতক্ষীরা ও সদর মহকুমার লবণাক্ত অঞ্চলের বড়ই দুর্দ্দশা। এখানকার মালিক অসংখ্য; এই জন্য মিলিয়া মিশিয়া বাঁধ-বন্দী সুচারুরূপে হয় না। এই কারণে নোণা জল ঢুকিয়া অনেক ক্ষেত্র পর পর অজন্মাগ্রস্ত হইয়া থাকে। কেবল বরুণদেবের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়; ষোল আনা ফসল ত এক প্রকার উপন্যাসের কথা হইয়াছে। ২।৪ বৎসর অন্তর ৮ আনা ৬ আনা ফসল জন্মিয়া থাকে। এই কারণে জমীদার, গাঁতিদার, প্রজা সকলেই দুর্দ্দশাগ্রস্ত। এই দক্ষিণাঞ্চলের একমাত্র উপজীবিকা আমন ধান্য। এই জন্য এই অঞ্চলকে একফসলী বলা যায়। যদি ফসল না হইল, তাহা হইলেই হাহাকার। অনেক লোকের মাদুর বুনিয়া কোন রকমে গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান হয়। কিন্তু ইহাও বঙ্গদেশের একটী প্রাকৃতিক নিয়ম দেখিতে পাই, যে অঞ্চলের লোক যতই অভাবগ্রস্ত, সে অঞ্চলের লোক আবার ততই অলস ও উদ্যমশূন্য। এই 'একফসলী' অঞ্চলে বছরে ৯ মাস লোকের কোন প্রকার কাজকর্ম্ম থাকে না। কিন্তু ইহারা অযথা এই সময় আলস্যে যাপন করে। ইহাদের ভিতর যদি এমন কোন গৃহশিল্প প্রবর্ত্তন করা যায়, যাহাতে এই অবসরকালে কিছু কিছু রোজগার করিতে পারে, তাহা হইলে দুঃখ-দৈন্যের অনেক উপশম হয়। তাঁত ও চরকা স্থানে স্থানে প্রচার করিয়া অনেক অর্থ ব্যয় করা গিয়াছে; কিন্তু দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে যে, আমাদের প্রচেষ্টা তাদৃশ সফলতা লাভ করে

নাই, কিন্তু আবার পুরাতন অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়াইয়া নবীন উদ্যোগের সহিত কয়েকটি কেন্দ্রে কায আরম্ভ হইয়াছে। সাধারণ লোক পরিশ্রম করিতে নারাজ; এমন কি, ধান একবার পাকিয়া উঠিলে ঘর হইতে নড়িতে চাহে না। পরদেশী আসিয়া ধান কাটিয়া মলিয়া গোলায় তুলিয়া দিবে এবং কৃষকগণ পায়ের উপর পা দিয়া বাজারের ভাল মাছ ও বিলাসদ্রব্য কিনিবে।

বিলাসিতার স্রোত কলিকাতা হইতে পল্লীগ্রামের অন্তস্তম প্রদেশ-কেও প্লাবিত করিতেছে। যেখানে সেখানে হুঁকার পরিবর্ত্তে সিগারেট; আবার যেখানে যেখানে জিলা বোর্ডের রাস্তা আছে, সেইখানেই মোটরবাস চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। সে দিন বাগেরহাটে দেখিলাম, সহর হইতে ষাটগম্বুজ মাত্র ৪ মাইল দূরে অবস্থিত। চাষীরা বাঁকে করিয়া তরি-তরকারী বিক্রয় করিতে আসেন। কিন্তু ঘরে ফিরিয়া যাইবার সময় ২ আনা ৩ আনা দিয়া মোটরে চড়িয়া বসে। আসামের শিলচরে গিয়াও এই প্রকার দৃশ্য দেখিয়াছি। পাহাড়ীরা পিঠে করিয়া দ্রব্যসম্ভার বেচিতে আসে। ঘরে ফিরিবার সময় মোটর চড়িয়া আরামে যায়, অথচ এই সমস্ত কৃষিজীবী জমীদার ও মহাজনের নিকট ঋণে ডুবিয়া আছে এবং শিশুসন্তানদিগকে একটু দুধও জোগাইতে পারে না। আর তাহারা প্রতিদিন সিগারেট ও মোটরে বেশ ২ পয়সা ব্যয় করে। আমি অনেকবার বলিয়াছি, হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার ও বিলাত-ফেরত জাতিমাত্রই সর্ব্বাপেক্ষা স্বদেশদ্রোহী। কেন না, স্বদেশজাত দ্রব্য ব্যবহার তাঁহাদের নিকট অসভ্যতার পরিচায়ক। হুঁকা, আল-বোলা ও ফুরসীতে ধূমপান করিলে তাঁহাদের জাতি যায়। আর তাঁহারাই ফ্যাসানের উৎস! আর জনসাধারণকেই বা কি দোষ দিব? বাবুরা যাহা করেন, তাহারা তাহারই অনুকরণ করে। ইহাতে দেশের

যে কি সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা ২।১টি দৃষ্টান্তে উপলব্ধ হইবে। ১০ বৎসর আগে বাঙ্গালা দেশে ৫০ লক্ষ টাকার সিগার আমদানী হইত। ২ বৎসর পূর্ব্বে যে রপ্তানী দ্রব্যের তালিকা প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, উহা দেড় কোটীতে উঠিয়াছে। কিন্তু গত বৎসর হইতে বিলাতের অনেক ফার্ম্ম যে প্রকার নানা রকমের ও নানা মার্কার চুরুটের বিজ্ঞাপন প্রচার করিতেছে এবং ইহার ফলে পাড়াগাঁয়ে পর্য্যন্ত বিদেশী চুরুট যে প্রকার ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে, ১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দে এই আমদানী চুরুটের পরিমাণ অন্যূন ৩ কোটি টাকা হইবে। এ কি বিড়ম্বনা! এই বাঙ্গালা দেশ তামাকের আকর বলিলেও হয়। আর এই সাতক্ষীরার সন্নিকট কালোরোয়া চিটাগুড়ের একটি প্রধান আড়ত; অথচ 'দা-কাটা' তামাক খাওয়া এক প্রকার ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে। মোটর-গাড়ীর আমদানীও দেখা যাইতেছে যে, এই কয়েক বৎসরে কয়েক কোটি টাকা বাড়িয়াছে। একবার ভাবিয়া দেখুন, আমেরিকার দৈনিক মাথা পিছু আয় পৌনে ১৩ টাকা। ইংরাজ জাতির মাথা পিছু আয় পৌনে ৭ টাকা। আর আমাদের মাথা পিছু আয় না হয় বড় জোর ২ আনা। অথচ আমরা বিলাতী নেশায় বিভোর হইয়া বিলাতী জাতির অনুকরণে কোটি কোটি টাকা অকারণে বিদেশে পাঠাইতেছি, আর দিন দিন হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া অকূল-পাথারে ডুবিতেছি।

কলিকাতাবাসী খুলনার জমীদারবর্গ—যাঁহাদের প্রজার মা-বাপ হওয়া উচিত—তাঁহারা যে তাঁহাদের কর্ত্তব্যপালন করেন না, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং তাঁহাদের উপর কিছু তীব্রভাষা প্রয়োগ করিতেও বাধ্য হইয়াছি। তবে এ কথা বলা আমার উচিত যে, এমনও অনেক জমীদার আছেন, যাঁহারা ন্যায্য খাজানা পাইলে নিজেদের সৌভাগ্যবান্

মনে করেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি, প্রজাবর্গের-আর এক ভীষণ বিপদ উপস্থিত। যাহারা তাঁহাদের স্বগ্রাম, এমন কি স্বশ্রেণী ও পাড়া-পড়শীর মধ্যে গণ্য, তাহাদের মধ্যে অনেকে এখন প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের প্রধান শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোন কোন প্রজা, যাহারা একটু হিসাবী ও মিতব্যয়ী হইয়া একটু শ্রীমন্ত, তাহারা এখন তাহাদের প্রতিবেশীদিগকে এমন কড়া সুদে ও সর্ত্তে টাকা দাদন করিতেছে যে, বন্ধকী জমীজমা সমস্ত বিক্রী করিয়া সহজেই পাওনাদারের করতলস্থ হয় এবং এই জমী এক প্রকার খাস হইয়া তাহারা বর্গাদাতা হিসাবে যে সমস্ত প্রজার সর্ত্ত উচ্ছেদ হইয়াছে, তাহাদের দ্বারা চাষ করায়, ফসল হইলে তাহারা সুদে আসলে এবং চাষের খরচার বাবদ প্রায় সমস্ত ফসলই নিজ নিজ গোলায় তুলে। হতভাগ্য জোত্রহীন প্রজাগণ এ প্রকার দাসখত লিখিয়া এই বর্গাদাতাদিগের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সুদূরের জমীদার অপেক্ষা এই বর্গাদাতাগণই ভীষণ অত্যাচারী। ইহাদের কবল হইতে প্রজাসাধারণকে রক্ষা করা নিতান্ত দরকার।

এই ব্যাধির মূল নিরাকরণ করিতে হইলে লোকশিক্ষা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার হওয়া দরকার। ইহারা হিতাহিতজ্ঞানবিবর্জ্জিত; ফসল হইলেই কি করিয়া উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া টাকা উড়াইয়া দিবে, সে জন্য ব্যতিবস্ত হইয়া পড়ে। বাজারে ৩ গুণ চতুর্গুণ দরে মাছ কিনিবে; তাহার পর চোখের তৃপ্তিকর 'দেখনাই' বিলাতী মাল-কিনিবার জন্য পাগল হইয়া উঠে; এমন কি, সাইকেল, কলের গান বাদ পড়ে না। আবার একবার অজন্মা হইলেই দিশেহারা হইয়া এই সমস্ত বিলাসদ্রব্য নামমাত্র মূল্যে বেচিয়া ফেলে। তাহার পর বৃটিশ রাজত্বের প্রারম্ভ হইতেই মামলা-মোকর্দ্দমায় দেশ উচ্ছন্ন

হইল ; এখন প্রজাবর্গের মধ্যেও এই মামলাস্পৃহা বলবতী হইতেছে। আবার দেখা যায়, একটু ভাল ফসল হইলেই মোকর্দ্দমার সংখ্যা বেজায় বাড়ে; বৃটিশ রাজত্বের পূর্ব্বে জমীদারই নিজ নিজ অধিকারে সমস্ত মামলা নিষ্পত্তি করিতেন এবং গ্রামে পঞ্চায়েৎ কর্ত্তৃক সালিশী বিচারে অনেক বিবাদ-বিসংবাদ মিটিয়া যাইত। কিন্তু এখন সে সমস্ত প্রাচীন সনাতন প্রথা লোপ পাইয়াছে। গভর্ণমেণ্টেরও যত কোর্ট-ফি বাড়ে, ততই সুবিধা। রাজনৈতিক আন্দোলনকারীর মধ্যে আমাদের দেশে ব্যবহারাজীবিগণই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। মামলা-মোকর্দ্দমা কমিলে উকীল, ব্যারিষ্টার, মোক্তার, টাউট প্রভৃতির অন্ন যাইবে। সুতরাং তাঁহারা স্বার্থের মূলে কুঠারাঘাত করিবেন কেন? পূর্ব্বে গ্রামের মাতব্বর বা পঞ্চায়েৎ বিবাদী বিষয় নখদর্পণের মত দেখিতেন; সুতরাং অতি সহজেই ন্যায়বিচার হইত। এখন মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, ধাপ্পা দিয়া আদালতের চোখে ধূলা দেওয়াই প্রধান উপায়। এই জন্য প্রবল পক্ষেরই জয়। যে দুর্ব্বল, বৃটিশ-আদালতে তাহার সুবিচার আশা করা বৃথা। এক দিকে কোর্ট-ফি, উকীলের ফি, মূলতুবীর পর মূলতুবী, নিম্ন আদালত হইতে উচ্চ আদালত, আবার উচ্চ হইতে উচ্চতর বিচারালয়—এই প্রকারে এক একটা মোকর্দ্দমা বছরের পর বছর চলিতে থাকে! ইহাতে বাদী প্রতিবাদী উভয়েই সর্ব্বস্বান্ত হয়। মুসলমান বাদশাহের সময়েও দীনদুঃখী সাক্ষাৎভাবে আসিয়া আবেদন-নিবেদন করিতে পারিত। কাবুলের বর্ত্তমান আমীর আমানুল্লা খাঁ পূর্ব্বকার এই প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া বিচারপ্রার্থী দরিদ্র প্রজাদের দুঃখের কাহিনী শুনানীর জন্য সপ্তাহে সপ্তাহে এক দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দয়ার্দ্রচিত্ত গভর্ণমেণ্ট কোর্ট-ফি ভিন্ন কাহারও আবেদন গ্রাহ্য করেন না।

৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে গ্রামে গ্রামে গোয়াল-পোরা গরু থাকিত। গোচারণেরও অনেক মাঠ ছিল এবং বর্ষাকালে গরুর খাদ্যোপযোগী যথেষ্ট পল, বিচালী সংগ্রহ থাকিত। এখন পাটের চাষ বাহুল্য হওয়ায় এবং সকল শ্রেণীর একমাত্র উপজীব্য কৃষি হওয়ায় সমস্ত গোচারণের মাঠ ঘেরাও হইয়াছে। এখন আর ধর্ম্মের ষাঁড় দেখা যায় না। উপযুক্ত বৃষের অভাবে গোজাতি দিন দিন অবনতি প্রাপ্ত হইতেছে। গোজাতি যেমন আকারে খর্ব্ব, তেমনই অস্থিকঙ্কালসার। খুলনা সহরে বর্ষাকালে টাকায় দেড় সের দুই সের দুধ, তাহাও মিলা ভার। পাড়াগাঁয়ে অনেক সময় টাকায় ৩।৪ সের দুধ, তাহাও আবার দুষ্প্রাপ্য। ফল কথা, দুধের অভাবে শিশু সন্তান পুষ্টিলাভ করিতে পারে না এবং বাঙ্গালী জাতি ক্রমশঃই হীনবীর্য্য হইয়া পড়িতেছে।

যাহা হউক, আর পল্লীগ্রামের দুর্দ্দশার কাহিনী বিবৃত করিয়া আপনাদিগের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে চাহি না। সকলের অপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা সংঘবদ্ধ হইয়া কোন কায করিতে পারি না। দেশের যাহা কিছু অভাব-অভিযোগ, দুর্দ্দশা, তাহার বিমোচনের জন্য আমরা হাঁ করিয়া গভর্ণমেণ্টের দিকে তাকাইয়া থাকি। হয় গভর্ণমেণ্ট, না হয় বিধাতাপুরুষ আমাদের সমস্ত অভাব কুলাইয়া দিবেন। আমরা নিজে কিছু করিব না; হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিব। জলকষ্ট? ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ঘাড়ে সমস্ত ভার চাপাইয়া দিব, কিন্তু ভুলিয়া যাই যে, জিলাবোর্ডের আয় মাত্র ৪ লক্ষ টাকা। তাহা হইতে নিম্নশিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তা মেরামত প্রভৃতি বাদ দিলে অতি অল্প টাকাই থাকে। তাহা দ্বারা এই ১৪ লক্ষ লোকের অভাবমোচন কিছুতেই হইতে পারে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই খুলনার অধিকাংশ স্থানই এক-ফসলের দেশ; ৯ মাস যদি নিরবচ্ছিন্ন আলস্যে না কাটাইয়া আমরা

'গীতা' দিয়া কায করিতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে যে কত শত শত পুষ্করিণীর ও দীঘির পঙ্কোদ্ধার হয়, তাহা বলা যায় না। ফল কথা এই, উদ্যমহীনতাই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল হইয়াছে। আমরা সমস্তই বুঝি, কিন্তু কায করিবার ক্ষমতা নাই। আমরা কি প্রকার অলস ও উদ্যমহীন, তাহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ দিতেছি। প্রায় পাঁচ সপ্তাহ হইল, বাগেরহাট কলেজের সন্নিকটে এক জন চাষী গৃহস্থের বাড়ীর সন্নিকটে দেড় কাঠা পরিমাণ একটি পুকুর দেখিলাম। আমার এক জন সঙ্গী দেখাইলেন যে, পুকুরটি কচুরীপানার চাপে বুজিয়া গিয়াছে। শুধু যে জল দূষিত হইতেছে, তাহা নহে, ইহাতে মাছও বাঁচিতে পারিবে না। প্রত্যেক দিন স্নানের সময় যদি কাস্তে হাতে করিয়া এক জন দুই জন মিলিয়া আধ ঘণ্টাকাল এই ধাপ কাটে, তাহা হইলে এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত পানা নির্ম্মূল হয়। কিন্তু এই "একফসলী" দেশে দিব্য হাত-পা কোলে করিয়া গৃহস্থ সুখে নিদ্রা যায়। ফলতঃ এ প্রকার উদ্যমহীন অলস জাতির পরিণাম বড়ই শোচনীয়।

আমরা বছরের পর বছর প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, খুলনা জিলায়, এমন কি, সমগ্র বাঙ্গালায় হিন্দু-সমাজের মেরুদণ্ড ধোপা, নাপিত, কুমার, কামার প্রভৃতি শ্রেণী একেবারে লোপ পাইতেছে। কায়স্থ, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি শ্রেণীর মধ্যে মেয়ের বিবাহ দেওয়া একটি দায়স্বরূপ হইয়াছে, উপরিলিখিত নিম্নশ্রেণীর মধ্যে অধিক পণে আবার কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করিতে হয়। কাজেই ৪০।৪৫ বছর বয়সে ২ শত হইতে ৪ শত টাকা পণে ৯।১০ বর্ষ বয়স্ক মেয়ে ক্রয় করিতে হয়। ইহারা অল্পদিন পরেই যুবতী বিধবা রাখিয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করে। এই সমস্ত কারণে সমাজের কি বিষময় ফল হইতেছে,

তাহা বলা যায় না; আর ইহাদিগেরই বা দোষ দিব কি? আমি গোষ্ঠীপতি মৌলিক, আমার বংশমর্য্যাদা রক্ষার জন্য আমাকে কুলীনকে কন্যাদান করিতে হইবে এবং কুলীনের মেয়ে ভিন্ন আমার বিবাহ করিবার সাধ্য নাই। অথচ এ প্রকার ব্যবস্থা মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, এমন কি, রঘুনন্দনেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তবে কেন এ শৃঙ্খল আমি পায়ে পরি? নৈতিক দুর্ব্বলতাই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল। দৈহিক পক্ষাঘাত অপেক্ষা মানসিক পক্ষাঘাত আরও অধিকতর ক্ষতিকর; কিন্তু বুঝিয়া সুঝিয়াও আমাদের সমাজের নানাবিধ অনিষ্টকর প্রথা নিরাকরণ করিতে অগ্রসর হইতে পারি না। তাই বলিতেছি, এই মানসিক দুর্ব্বলতা পরিহার করিতেই হইবে,—যদি আমরা টিকিয়া থাকিতে চাই।

পরিশেষে একটু আশার বাণী বলিয়া উপসংহার করিব। এই সাতক্ষীরার সন্নিকটে অর্থাৎ আশাশুনি, বুধহাটা, মিত্র তেঁতুলিয়া প্রভৃতি কেন্দ্রে খুলনার দুর্ভিক্ষের পর হইতেই বাজিতপুরের আশ্রমের সেবক-বৃন্দ কয়টি সেবাশ্রম খুলিয়াছেন। তাঁহারা অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করিতেছেন এবং ম্যালেরিয়া, কলেরা, এমন কি গোমড়ক উপস্থিত হইলে যথাসাধ্য ঔষধ বিতরণ করিতেছেন এবং নিজেরা যাইয়া জীবনসংশয় করিয়া আর্ত্তের সেবা করিতে ত্রুটি করেন না।

খুলনার পরপারেও তাঁহারা আর একটি সুন্দর সেবাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন এবং নরনারায়ণের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন।

খালিসপুরের ত্যাগী অক্লান্তকর্ম্মী একনিষ্ঠ সাধক শ্রীযুত যামিনীভূষণ মিত্র খালিসপুরে আশ্রম খুলিয়া পার্শ্ববর্ত্তী অনেকগুলি গ্রামে চরকা চালাইতেছেন, এবং চরকার সূতার কাপড় সেই অঞ্চলে বুনাইয়া খদ্দর

প্রস্তুত করিতেছেন। যাহাতে এই সদনুষ্ঠানগুলি বাঁচিয়া থাকিতে পারে তাহার জন্য খুলনাবাসিমাত্রেরই যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। যদি অর্থাভাবে এই অনুষ্ঠানগুলি মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত হয়, তাহা হইলে বড়ই গ্লানির বিষয় হইবে। মহেশ্বরপাশার একজন কৃতী সন্তান—শ্রীযুক্ত হরি চরণ ঘোষ—এই মহৎ উদ্দেশ্যে অনেক অর্থ-সাহায্য করিতেছেন। তিনি স্বগ্রামে যাহাতে এক হাজার চরকা নিয়মিত চলে, তাহার ব্যবস্থা করিতে সংকল্প করিয়াছেন। এই শ্রেণীর আশ্রম যতই নানা কেন্দ্রে স্থাপিত হয় এবং যাহাতে এই শ্রেণীর ত্যাগী যুবক দেশের কল্যাণব্রতে জীবন সমর্পণ করিতে পারেন, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। পল্লীর ব্যথানিবারণের এইগুলিই প্রকৃত ও প্রকৃষ্ট পন্থা।

সম্পূর্ণ।